স্বদেশী

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্যবিষয়ক
মাসিকপত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক
শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

তৃতীয় খণ্ড।
১৩১৪—১৫ সাল।

কলিকাতা।
১৮৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, 'স্বদেশী কার্য্যালয়' হইতে
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ দ্বারা
প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২, দুই টাকা।

তৃতীয় খণ্ড স্বদেশীর সূচীপত্র।

—:*:—

বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠা।

তৃতীয় খণ্ড । } অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ } ১ম সংখ্যা ।

বন্দে মাতরম্

সফল পূজা ।
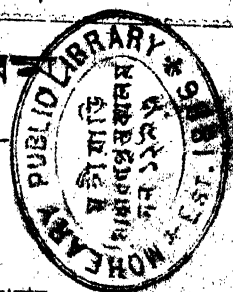
এসেছি গো দ্বারে তোর, জননি আবার,
শুষ্কফুল তপ্ত-অশ্রু ভগ্নপ্রাণ ল'য়ে ;
চাপি' অতীতের স্মৃতি বুকের মাঝার,
ভগ্নকণ্ঠে নূতনের গান যাব গেয়ে ।

সুজলা সুফলা শ্যামা তুই গো জননি !
একবার দাঁড়া ওই শূন্য দ্বারদেশে—
একবার দেখা তোর স্নিগ্ধমূর্ত্তিখানি ;
সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া চলে যাই হেসে ।

কত ভক্ত পূজে তোরে জবা বিল্বদলে,
আমি দিব তপ্ত অশ্রু—যা আছে সম্বল ।
হবে না কি তৃপ্তি তোর শুধু আঁখিজলে ?
থাক্ তবে, ফিরে যাই, এ পূজা নিষ্ফল ।

ত্রিশ কোটি-বক্ষঃরক্তে পূজিব যে দিন,
দেখিব কেমনে মোরে ফিরাস্ সে দিন ।

নববর্ষ।

—০:(০):০—

যাঁহার কৃপায় মূকও বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, সেই অচিন্ত্যশক্তি সর্ব্বাশ্রয় শ্রীভগবানের কৃপায় "স্বদেশী" তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। বর্ষারম্ভে সম্পাদকের দুই একটা কথা বলিবার বা একটু সূচনা লিখিবার প্রথা আছে। প্রথাটা আধুনিক নয়—প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং আমরাও সেই প্রাচীন প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া দুই চারিটা কথা বলিতে পারি।

বলিবার মত বিশেষ কথা কিছুই নাই। আবর্ত্তনশীল কালচক্র অনাদিকাল হইতে আসিতেছে, যাইতেছে; তাহার নূতনত্ব বা পুরাতনত্ব কিছুই নাই; তাহা নিত্য, নির্ব্বিকার, অনাদি, অনন্ত। কিন্তু আমরা এই অখণ্ড কালচক্রের বৈচিত্র্যশূন্য বিরাটরূপ দেখিতে পারি না, তাই তাহার মধ্যে বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের কল্পনা করিয়া লইয়াছি, মাস, পক্ষ, তিথি, বর্ষ, যুগ, কল্প প্রভৃতি অসংখ্য ভাগে তাহাকে বিভক্ত করিয়াছি, এবং তাহার মধ্যে আপনাদের সুখদুঃখের একটা হিসাব রাখিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছি। এই জন্যই এই অনাদি অনন্ত কালচক্রের মধ্যে আমরা একটা নূতন পুরাতনের রূপ দেখিতে পাই। তাই আমরা অতীতকে প্রণাম করিয়া চিরবিদায় দিই, নববর্ষকে সাদরে আলিঙ্গন করি। আশার দাস আমরা—এই অজ্ঞাত অপরিচিত নূতনের মধ্যে কত সুখের কল্পনা করিয়া উৎফুল্ল হই; হাসিতে হাসিতে তাহাকে আহ্বান করি, তাহার অদৃষ্ট সৌন্দর্য্যের মধ্যে নন্দনের চির প্রফুল্লতা দেখিতে পাই। কিন্তু এসকল দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা নূতন ও পুরাতনের ভক্ত। সেই নূতন পুরাতনের কথাই এস্থলে আলোচ্য।

স্বদেশীর ২য় বর্ষে উল্লেখযোগ্য অনেকগুলি ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জামালপুরের অত্যাচার, লাজপৎ রায়ের ও অজিত সিংহের নির্ব্বাসন (অধুনা মুক্ত), বিপিনচন্দ্র পালের কারাবাস, সভাবন্ধের আইন এইগুলিই প্রধান। কেন না এই স্মরণীয় ঘটনাগুলি হইতেই স্বদেশী আন্দোলন প্রভূত সফলতা লাভ করিয়াছে। ইহাদের কার্য্যফল দেখিয়া আমরা এ ঘটনাগুলিকে দুর্ঘটনা নামে অভিহিত করিতে পারি না।

দুর্ঘটনাও যে না ঘটিয়াছে এমন নহে। সামান্য দুর্ঘটনা নয়, বঙ্গের সাহিত্য-গগন হইতে তিনটী সমুজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে। আমাদের পরম সহায় প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য শ্রদ্ধেয় দামোদর মুখোপাধ্যায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন; হিতবাদী সম্পাদক নির্ভীকচেতা; কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সাগরগর্ভে সমাহিত হইয়াছেন, সন্ধ্যাসম্পাদক কর্ম্মযোগী ব্রহ্মবান্ধব স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। জানিনা আর কোন বৎসরে বাঙ্গালায় এমন নিদারুণ ক্ষতি হইয়াছিল কি না এবং ইহাদের অভাব কখনও পূর্ণ হইবে কি না।

বর্ষারম্ভে আপনাদের কাজের একটা জমা খরচ দেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র, আমাদের কার্য্যও সামান্য; সে সামান্য কার্য্যের জমাখরচ দিবার কিছুই নাই। ফলাফলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা কার্য্য করি নাই, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি চালিত হইয়া যাহা করিয়াছি, তাহার ফলাফল সর্ব্বকার্য্যনিয়ন্তার হস্তে; সুতরাং সে কার্য্যের আর জমাখরচ কি দিব।

নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে গিয়া আমরা হয়তো অনেকের বিরাগ-ভাজন হইয়াছি। কিন্তু সেজন্য আমরা কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত নহি। প্রয়োজন হইলে আমাদিগকে আরও অনেক অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতে হইবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, আমরা যেন ব্যক্তিবিশেষের অপ্রীতি-আশঙ্কায় এই কঠোর কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত না হই; এবং বিদ্বেষবুদ্ধি যেন আমাদের হৃদয় অধিকার না করে।

এক্ষণে আমরা সহৃদয় গ্রাহক, অনুগ্রাহক এবং লেখকবৃন্দকে যথোচিত সাদর সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক নবোৎসাহে বুক বাঁধিয়া নূতন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। হে সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বেশ্বর নারায়ণ! তোমার করুণাই আমাদের একমাত্র সম্বল। সে করুণাকণা লাভে আমরা যেন কখনও বঞ্চিত না হই। আমরা যেন কার্য্যের ফলাফল তোমার চরণে অর্পণ করিয়া অবিচলিত চিত্তে কর্ত্তব্যপথে বিচরণ করিতে পারি; জ্ঞানহীন ক্ষুদ্র মানব আমরা, তোমার সর্ব্বমঙ্গলময়ত্বে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া যেন অকাতরে সর্ব্ববিধ দুঃখ ও বিপদকে আলিঙ্গন করিতে পশ্চাৎপদ না হই।

তবে এস নববর্ষ! অতীতের শোক দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, সম্পদ বিপদ সকলকে পশ্চাতে রাখিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে তোমাকে আলিঙ্গন করি। তুমি হতাশের আশা, ব্যথিতের সান্ত্বনা, অশান্তের শান্তি, তাই তোমাকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করি; অতীত সান্ত, তুমি অনন্ত, অতীত পুরাতন তুমি নূতন, তাই তোমাকে

সাদরে আহ্বান করি। অতীত ভুক্ত তুমি ভোগ্য, অতীত অন্ধকার তুমি আলোক, তাই তোমাকে উৎফুল্ল হৃদয়ে অভিবাদন করি। এস নববর্ষ! তোমার নবারুণ-রাগবিমণ্ডিত সৌম্যমূর্ত্তি লইয়া, তোমার সে সৌম্যমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে আমরা নবীন উৎসাহে হৃদয় বাঁধিয়া কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করি।

বন্দে মাতরম্।

নবাব শামস্ জেহান বেগম।

—:০:—

বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার শেষ নবাব-নাজিম স্বর্গগত মহামান্য সৈয়দ মনসুর আলী খাঁ বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী মাননীয়া নবাব শামস্ জেহান বেগম সাহেবা ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মুরসিদাবাদ নগরে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি আরব দেশের বিখ্যাত 'সাদাতে-হাসেনী-অল্-হোসেনী' বংশ-সম্ভূতা ছিলেন। আমাদের প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মহাম্মদ (দঃ) এর দৌহিত্র ও মহাবীর হজরত আলী (রাঃ) র পুত্র এমাম হাসেনের পুত্রের সহিত এমাম হোসেনের কন্যা বিবি ফাতেমা সগরার বিবাহ হয়। সেই বিবাহের ফলে যে পবিত্র বংশের উৎপত্তি হয়, সেই মহদ্বংশই আরবে 'সাদাতে-হাসেনী-অল্-হোসেনী' নামে বিখ্যাত। পবিত্র ভূমি মক্কার সরিফগণও এই পবিত্র বংশ-সম্ভুত। পাঠকগণ দেখিবেন, এরূপ পবিত্র ও মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের উক্ত মহীয়সী মহারাণীর চরিত্রে তাঁহার লোক-প্রখ্যাত গুণাবলীর সমাবেশ হইয়াছিল।

মাননীয়া নবাব বেগম সাহেবা উচ্চকুলোদ্ভবা হওয়াতেই বঙ্গ-বেহার-উড়িষ্যার শেষ নবাব-নাজিম স্বর্গগত মাননীয় সৈয়দ মনসুর আলী খাঁ বাহাদুরের সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় স্থিরীকৃত হয়। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া শুভ বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দুই লক্ষ টাকা প্রদান করেন। নবাব-নাজিম বাহাদুর নিজের তহবিল হইতে আরও দুই লক্ষ টাকা এই বিবাহোৎসবে ব্যয়িত করেন। সুতরাং বিবাহ ব্যাপার ও উৎসবাদি কিরূপ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা আর বিশদ করিয়া না বলিলেও চলে।

নবাব বেগম সাহেবার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে—১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এই শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের পরই মাননীয়া নবাব বেগম সাহেবা

মুরসিদাবাদের নবাব-পরিবারের কর্ত্রী পদে উন্নীত হইয়া 'বাঙ্গালার নবাব বেগম' উপাধিতে বিভূষিতা হয়েন। এই বিবাহের অমৃতময় ফলস্বরূপ ১৮টী পুত্র কন্যা জন্মলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তন্মধ্যে তিনটী মাত্র সন্তান জীবিত ছিলেন এবং অবশিষ্ট সন্তানগুলি পিতামাতার হৃদয়ে দারুণ শোক-শল্য বিদ্ধ করিয়া শৈশবাবস্থাতেই কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছিলেন। উক্ত সন্তান-ত্রয়ের মধ্যে একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা ছিলেন। পুত্র প্রিন্স্ সৈয়দ এস্কেন্দার আলী মির্জ্জা ওরফে সুলতান সাহেব ৩৬ বৎসর বয়সে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় নশ্বর মানবলীলা সম্বরণ করত আমাদের শেষ নবাব নাজিমের বংশ লোপের পথ সুগম করিয়া যান। জ্যেষ্ঠা তনয়া নবাব শাহার বানু বেগম সাহেবার সহিত পূর্ণিয়া জেলার সুজাপুর ষ্টেটের স্বত্বাধিকারী খাগড়ার নবাব সাহেবের বিবাহ হয়।

১৮৮৪ অব্দে মুসলমানের আঁধার জগৎ আরও আঁধার করিয়া মাননীয় নবাব নাজিম বাহাদুর পরলোক গমন করিলে নবাব বেগম সাহেবা পুত্র ও বহু সংখ্যক লোকজন সমভিব্যাহারে আরবের কারবালা ভূমিতে ধর্ম্ম কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য গমন করেন। তিনি আরবে পঁহুছিলে তুর্কীরাজকর্ম্মচারিগণ ও তত্রত্য সাধারণ জনমণ্ডলী তাঁহাকে যথোচিত সম্মান সৎকারে গ্রহণ করেন। কারবালা ক্ষেত্রে প্রায় দুই লক্ষ টাকা বিবিধ দায় ধর্ম্মের কার্য্যে ব্যয়িত করিয়া তথাকার আপামর সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কারবালার ভারতীয় মুসলমান ছাত্রবর্গের শিক্ষা সৌকর্য্যার্থ একটি মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য তিনি ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান করেন। সাত মাস কাল কারবালায় অবস্থিতি করার পর বেগম সাহেবা ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করত বোম্বাই নগরীতে একটি সুন্দর বাড়ী ও প্রচুর আয়ের একটি সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। তথা হইতে এক বৎসর পরে তিনি রাজধানী মুরসিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলে মুরসিদাবাদবাসিগণ তাঁহাকে পরমানন্দে গ্রহণ করেন। কিছুদিন মুরসিদাবাদে অবস্থিতি করার পর তিনি পুনরায় বোম্বাই যাত্রা করেন।

১৮৮৭ অব্দে আমাদের অধুনা স্বর্গগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'সুবর্ণজুবিলীর' সময়ে মাননীয়া নবাব বেগম সাহেবা তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার জন্য খাঁ বাহাদুর মির্জ্জা সুজায়েত আলী বেগ সাহেবকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেন। খাঁ বাহাদুর সাহেবের ইংলণ্ডে শিক্ষার ব্যয়ভারও তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৮৮ অব্দে মাননীয়া বেগম সাহেবা পুত্র এবং অনুচরাদি সমভিব্যাহারে পুনরায় আরবদেশে পবিত্র মক্কা ও মদিনা ধামে তীর্থযাত্রা করেন। তিনি সুয়েজ-খালে উপনীতা হইলে মিসরের মাননীয় খেদিভ বাহাদুরের ন্যাভাল অফিসার (Naval officer) আবদর রহমান বেগ সাহেব তাঁহাকে সসম্ভ্রমে গ্রহণ করেন। তথা হইতে তাঁহার পুত্র ইংলণ্ডে গমন করতঃ খাঁ বাহাদুর মির্জ্জা সুজায়ত আলি বেগ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া ইউরোপের নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। প্রিন্স্ ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মাননীয়া নবাব বেগম সাহেবা জেদ্দা যাত্রা করেন। তথা হইতে মক্কা ও মদিনায় ধর্ম্মকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়া সদলবলে বোম্বাই প্রত্যাগমন করত ১৮৯৩ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করেন। এই সময়ে তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রিন্স্ সুলতান সাহেব কলিকাতায় ইহ লীলা সম্বরণ করেন। ইহার পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নবাব বেগম সাহেবাকে অন্যান্য ভর্ত্তা বাদে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা পেন্সনের আদেশ প্রদান করেন।

নবাব বেগম সাহেবা অতিশয় দানশীলা রমণী ছিলেন। ১৮৯৩ অব্দে একমাত্র তনয়ের মৃত্যু জন্য শোকগ্রস্ত হওয়ার পর হইতেই তাঁহার দানশীলতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। এ পর্য্যন্ত তিনি ৮ (আট) লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি কেবল দানে মুক্তহস্তা ছিলেন, এমন নহে; প্রত্যেক সাধারণ হিতকর কার্য্যেও তাঁহার গভীর সহানুভূতি ও উৎসাহ বর্ত্তমান ছিল। তিনি অনেকগুলি হিতকর অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষিকা এবং কাউণ্টেস্ ডফারিণ-ফণ্ডের সহকারিণী পৃষ্ঠ-পোষকা ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি-কল্পেও তাঁহার অশেষ যত্ন ছিল। এই যত্নের অভিব্যক্তি স্বরূপ তিনি নিজ ব্যয়ে কলিকাতায় একটি বালিকা-মাদ্রাসা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ অব্দে নবাব বেগম সাহেবা ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয়িত করিবার জন্য প্রচুর সম্পত্তি 'ওয়াকফ্' করেন। সেই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যয়াদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য একটি কমিটিও সংগঠিত করিয়া গিয়াছেন।

১৮৯৮ অব্দে স্বর্গগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া, নবাব বেগম সাহেবাকে 'ইম্পি-রিয়াল্ ক্রাউন্ অব ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ সি, আই, উপাধিতে ভূষিতা করিয়া সম্মানিতা করেন। এইরূপে বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যার শেষ নবাব নাজিম বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী মাননীয়া নবাব শামস্ জেহান বেগম সাহেবা সি, আই, অশীতি বর্ষকাল আপন গৌরব-প্রভায় গৌড়দেশ প্রভাসিত রাখিয়া, গত ১৩১২ সালের ৮ই বৈশাখ শুক্রবার তাঁহার কলিকাতাস্থ আবাস-ভবনে মানব-লীলা সমাপন করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তৎপরদিন শনিবার রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়ে মহাসমারোহে

তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁহার অভাবে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের যে বিষম ক্ষতি সাধিত হইল, তাহার পূরণ আর কিছুতেই হইবার নয়।

নবাব বেগম সাহেবা মুসলমান সমাজে একজন আদর্শ-মহিলা ছিলেন। তাঁহার দানশীলতার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। তিনি বৎসরে যে এক লক্ষ টাকা পেন্সন প্রাপ্ত হইতেন, তাহার অধিকাংশই তিনি সাধারণ-হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত করিতেন। লেডি ইলিয়ট্ হোষ্টেল, ট্রাষ্ট্ ফণ্ড, মহম্মেডানএংলোওরিয়েণ্টাল কলেজ আলিগড়, মেলেঙ্গি ওয়ার্ড, মার্কাস স্কোয়ার, মেট্রোপলিটান ক্লব, বালিকা মাদ্রাসা ইত্যাদি বহুল সদনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার দানশীলতার কথা অক্ষয় অক্ষরে চিরদিন গ্রথিত থাকিবে। তাঁহার বদান্যতায় দরিদ্র মুসলমান সমাজের অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। তিনি যেন মূর্ত্তিমতী দয়া ছিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট দয়াপ্রার্থী হইয়াছে, সে কখনও বিফল মনোরথ হয় নাই। তাঁহার তিরোভাবে দরিদ্র মুসলমান সমাজ একজন জননী-হারা হইয়াছে! তাঁহার অভাবে দেশের দীনহীনেরা আশ্রয়শূন্য হইয়াছে! তাহার তিরোধানে দেশের সৎকার্য্য সমূহ একজন প্রকৃত পৃষ্ঠপোষিকার পৃষ্ঠপোষকতা লাভে বঞ্চিত হইয়াছে! হায়! দুর্ভাগ্য মুসলমানের সেই প্রচণ্ড গৌরব-মার্ত্তণ্ডের এই যে শেষ রশ্মিটুকুও কালের কোলে ঢলিয়া পড়িল—অনন্ত কালের জন্য তাহার অঙ্গে মিশিয়া গেল, তাহার পুনরাবির্ভাব কি আর কখন হইবে না? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা কি কে জানে।

এ প্রসঙ্গে খাঁ বাহাদুর মির্জ্জা সুজায়ত আলি বেগ সাহেবেরও বিশেষ সুখ্যাতির কথা আছে। দান ধর্ম্মের কার্য্যে মির্জ্জা সাহেবই নবাব বেগম সাহেবার পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনিই বেগম সাহেবাকে দেশহিতকর কার্য্যে সাহায্যাদি করিতে সর্ব্বদা উৎসাহ দান করিতেন। খাঁ বাহাদুর সাহেবের মত একজন উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তিকে পরামর্শদাতারূপে প্রাপ্ত হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। নবাব বেগম সাহেবা যে বিপুল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, এখন তাহার আয় পূর্ব্বের মত দেশহিতকর কার্য্যাদিতে ব্যয়িত হইতেছে কি না, জানি না। পরিশেষে বিধাতার নিকট নবাব বেগম সাহেবার পরলোকগত আত্মার সদগতি প্রার্থনা করিয়া, আমরা এখানে নিতান্ত কাতর হৃদয়ে এই শোকাবহ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। *

* ১৩১২ সালের ২২শে বৈশাখের "মিহির ও সুধাকরে" প্রকাশিত বিবরণ হইতে সঙ্কলিত।

নিয়তি।

—(০)—

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"রাজকুমারগণ! আপনারা নিরস্ত হউন, আমি ভবিষ্যৎ গণনায় অসমর্থ।"

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে একদা গভীরা রজনীতে চিতোর নগরীর সমীপবর্ত্তী নাহরামুগরার চারণী দেবীর মন্দিরে চারিজন রাজপুত স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন। চারিজনই যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত; সকলেরই মুখে উৎকণ্ঠার চঞ্চল ছায়া। ইঁহাদের মধ্যে একজন চিতোরাধিপতি রায়মল্লের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সূর্য্যমল্ল। অপর তিনজন রায়মল্লের তিন পুত্র সঙ্গসিংহ, পৃথ্বীরাজ এবং জয়মল্ল। পিতা বর্ত্তমানেই চিতোরসিংহাসনের ভাবী অধিকার লইয়া ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে অপেক্ষাকৃত শান্তিপ্রিয় জ্যেষ্ঠ সঙ্গ প্রস্তাব করিলেন, নাহরামুগরার চারণী দেবীর পরিচারিকা সন্ন্যাসিনী যাহাকে নির্ব্বাচিত করিয়া দিবেন সে-ই সিংহাসনের অধিকারী হইবে। জ্যেষ্ঠের এই প্রস্তাব সঙ্গত বিবেচনায় পৃথ্বীরাজ এবং জয়মল্ল স্ব স্ব অদৃষ্ট পরীক্ষা মানসে পিতৃব্য সূর্য্যমল্লের সহিত অদ্য চারণী দেবীর মন্দিরে সমবেত হইয়াছেন।

সম্মুখে দীপাধারে ক্ষুদ্র দীপ জ্বলিতেছিল। ক্ষুদ্র দীপের ক্ষীণ রশ্মিরেখা সকলের উদ্বেগপূর্ণ মুখের উপর নাচিতেছিল। অদূরে প্রৌঢ়বয়স্কা মন্দিরাধিকারিণী সন্ন্যাসিনী বসিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিনীর দৃষ্টি স্থির, গম্ভীর, প্রোজ্জ্বল। সকলেই নীরব। গভীর নীরবতায় মন্দির সমাচ্ছন্ন।

সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"রাজকুমারগণ! আপনারা নিরস্ত হউন, আমি ভবিষ্যৎগণনায় অসমর্থ।"

সন্ন্যাসিনীর বাক্য শ্রবণে সকলেই পরস্পর মুখের দিকে চাহিলেন। পৃথ্বীরাজ বলিয়া উঠিলেন,—"আপনাকে ভবিষ্যৎগণনার জন্য অনুরোধ করিতেছি না। আমাদের মধ্যে কে চিতোর সিংহাসনে উপবেশন করিবার যোগ্যপাত্র, আপনি তাহাই নির্ব্বাচিত করিয়া দিন।"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"কিন্তু সে নির্ব্বাচন সকলের প্রীতিকর না হইতে পারে।"

সঙ্গ বিনীত ভাবে বলিলেন,—"প্রীতিকর না হইলেও তাহাই আমরা শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত।"

সন্ন্যাসিনী ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিলেন,—"আপনি প্রস্তুত হইলেও সকলেই যে তাহাতে সম্মত হইবে তাহার নিশ্চয়তা কি। আমিতো একাধিক ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিতে পারিব না?"

রাজকুমারগণ সোৎসুক দৃষ্টিতে সন্ন্যাসিনীর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখেরদিকে চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসিনী নীরবে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন,—"রাজকুমারগণ! আপনারা সকলেই বীর, সকলেই সমান শক্তিশালী। সুতরাং স্ব স্ব শক্তি প্রয়োগে এ বিরোধের মীমাংসা করিতে পারেন।"

পৃথ্বীরাজ উদ্ধতভাবে বলিলেন,—"না, তাহা হইতে পারে না। অকারণ ভ্রাতৃরক্তে পবিত্র সিংহাসন কলঙ্কিত করিতে পারিব না।"

সন্ন্যা। তবে কি করিবেন?

পৃ। আপনাকেই ইহার মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে।

সন্ন্যা। কিন্তু সে মীমাংসা যদি আপনার অনুকূল না হয়?

পৃ। তখন—তখন আপনাকে আর বিরক্ত করিব না।

সন্ন্যা। কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিয়া আমি অপরের ক্রোধভাজন হইব কেন?

পৃ। সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। রাজপুত, স্ত্রীজাতির—বিশেষতঃ আপনার ন্যায় সন্ন্যাসিনীর অবমাননা করিতে সাহসী হইবে না।

সন্ন্যাসিনী নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন; সকলেই উদ্বেগ-চঞ্চল দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাজপুত্রচতুষ্টয় দুইটী পৃথগাসনে বসিয়াছিলেন। একটীতে পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল, অপরটীতে সঙ্গসিংহ এবং সূর্য্যমল্ল উপবিষ্ট। কিয়ৎক্ষণপরে সহসা সন্ন্যাসিনী, সঙ্গসিংহ যে আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, নীরবে সেই আসনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। সে নির্দ্দেশের অর্থ সকলেই বুঝিলেন, সঙ্গই যে সন্ন্যাসিনীর নির্ব্বাচিত একমাত্র চিতোরাধিপতি, তাহা পৃথ্বীরাজ বুঝিতে পারিলেন। বুঝিবামাত্র তাঁহার নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল, নিরাশায়, ক্রোধে হৃদয় উন্মত্তবৎ হইল। তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য উদ্ধতপ্রকৃতি পৃথ্বীরাজ লম্ফ দিয়া অসি হস্তে সঙ্গসিংহকে আক্রমণ করিলেন। সূর্য্যমল্ল মধ্যস্থলে

পড়িয়া সেই প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে সঙ্গসিংহকে রক্ষা করিলেন। এই অবসরে সন্ন্যাসিনী পার্শ্বদ্বার খুলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

পিতৃব্যের সহায়ে সঙ্গর জীবনরক্ষা হইল দেখিয়া পৃথ্বীরাজ ক্রোধভরে সূর্য্যমল্লকে আক্রমণ করিলেন। সূর্য্যমল্লও নিরস্ত্র ছিলেন না; তিনিও অসি কোষমুক্ত করিয়া আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন।

তখন সেই দেবীমন্দির মধ্যে রাজ্যলিপ্সু রাজপুত চতুষ্টয়ের ভীষণ সংগ্রাম বাধিল। পরস্পরের আঘাতে পরস্পরের অঙ্গ হইতে শোণিতধারা নির্গত হইয়া দেবীমন্দির প্লাবিত করিল। অস্ত্রের ঝনঝনায় গভীরা রজনী শব্দময়ী হইয়া উঠিল। তুচ্ছ রাজ্যলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া ভ্রাতা, ভ্রাতার শোণিতপানের জন্য পিশাচমূর্ত্তিতে নৃত্য করিতে লাগিল; স্নেহ, মমতা, মনুষ্যত্ব দূরে পলায়ন করিল। হায় লিপ্সা!

অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলিল। সেই দেবীমন্দিরে—পাপসংস্পর্শশূন্য পবিত্র নিকেতনে অনেকক্ষণ এই পৈশাচিকলীলার অভিনয় হইল। সকলেই অপরের বিনাশ কামনায় প্রাণপণে অসিচালনা করিতে লাগিলেন। শেষে সঙ্গসিংহ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। প্রচণ্ড পরাক্রমশালী পৃথ্বীরাজের অস্ত্রাঘাতে তাঁহার একটী চক্ষু চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া গেল। শেষে তিনি পৃথ্বীরাজের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া মন্দির ত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। গভীরা যামিনীর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া রাজপুত্র সঙ্গসিংহ ঊর্দ্ধশ্বাসে আশ্রয়ান্বেষণে ছুটিলেন। জয়মল্ল অসি হস্তে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজও গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন। অজস্র শোণিতস্রাবে তাঁহারও অসিমুষ্টি ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে শিকার পলায়িত দর্শনে তিনি স্বীয় অসি কোষবদ্ধ করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। সূর্য্যমল্লও ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া ধীরপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। সহসা পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল,—"সূর্য্যমল্ল!"

সূর্য্যমল্ল ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু অন্ধকারে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি গমনোদ্যত হইলেন। অমনই পশ্চাৎ হইতে অনুচ্চস্বরে কে যেন বলিল,—"সূর্য্যমল্ল। তুমিও সন্ন্যাসিনীর লক্ষিত ভাবী চিতোরাধিপতি।"

সূর্য্যমল্ল ফিরিয়া পুনর্ব্বার মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আলোক লইয়া মন্দির, মন্দিরবাহির তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু আর

কোন শব্দই শ্রুত হইল না। তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলেন। তখনও যেন তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল,—তুমিও সন্ন্যাসিনীর লক্ষিত ভাবী চিতোরাধিপতি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন চিতোর স্বাধীন। রাণা রায়মল্ল চিতোরের সিংহাসনে উপবিষ্ট। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রিয়দাস পাপিষ্ঠ আলাউদ্দীন, লোকললামভূতা পদ্মিনীর অলৌকিক রূপে মুগ্ধ হইয়া চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। সে আক্রমণে চিতোরের কি শোচনীয় দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নাই। ইহার কিছুদিন পরে, অরি সিংহের পুত্র মহাবীর হামির স্বীয় বাহুবলে চিতোরের উদ্ধার সাধন করেন। হামিরের পুত্র ক্ষেত্র সিংহ, ক্ষেত্র সিংহের পুত্র লক্ষ সিংহ, এবং তৎপুত্র মুকুল, ক্রমে চিতোর-সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। মুকুলের পর তদীয় পুত্র কুম্ভ, সিংহাসনে আরোহণ করিলে, মালবরাজ মহম্মদ একবার চিতোর নগরী আক্রমণ করেন। কিন্তু রাণা কুম্ভের অসাধারণ বাহুবলের নিকট তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। কুম্ভের তিন পুত্র—রায়মল্ল, উদা এবং সূর্য্য মল্ল। কথিত আছে, কোন কারণে রাণা কুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া জ্যেষ্ঠপুত্র রায়মল্লকে নির্ব্বাসিত করেন। ইহার পর উদা—রাজপুতকুলকলঙ্ক পাষণ্ড উদা, ছুরিকাঘাতে পিতার অমূল্য জীবন বিনষ্ট করিয়া, পিতৃরক্ত-কলঙ্কিত সিংহাসনে আরোহণ করে। কিন্তু অধিক দিন তাহাকে রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিতে হয় নাই। সিংহাসনারোহণের পাঁচ বৎসর পরে রায়মল্ল আসিয়া সবলে সিংহাসন অধিকার করিলেন। নরপিশাচ উদা পলায়ন করিয়া দিল্লীর যবনসম্রাটের চরণতলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইবার অভিপ্রায়ে স্বীয় কন্যাকে তাঁহার করে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু পাপিষ্ঠের এই পাপ অভিসন্ধি পূর্ণ হইল না। দিল্লী হইতে স্বরাজ্যে আগমন কালে পথিমধ্যে বজ্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হইল।

রাণা রায়মল্লের তিন পুত্র—সঙ্গ সিংহ, পৃথ্বীরাজ এবং জয়মল্ল। তিন ভ্রাতাই বীর, সাহসী এবং যোদ্ধা। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সঙ্গ কিঞ্চিৎ শান্ত প্রকৃতি। মধ্যম পৃথ্বীরাজ গর্ব্বিত, উগ্রস্বভাব, হঠকারী। জয়মল্ল কিঞ্চিৎ লোভপরায়ণ, অস্থিরচিত্ত। যে গৃহবিপ্লবে ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে,ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে ক্রমে সেই অন্তর্বিপ্লবাগ্নি

জলিয়া উঠিল। পিতা বর্ত্তমানেই তাঁহারা ভাবী সিংহাসন লাভের জন্য স্ব স্ব অধিকার স্থাপন করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ইহার ফল, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা অতঃপর তাহার পরবর্ত্তী অংশ প্রদর্শন করিব।

দেবীমন্দির হইতে পলায়ন করিয়া সঙ্গ, পৃথ্বীরাজের ভয়ে আর গৃহাভিমুখে যাইতে সাহস করিলেন না। তিনি সমস্ত রাত্রি পরিভ্রমণ করিয়া, শিবান্তি প্রদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক প্রাতঃকালে জনৈক রাজপুতের গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই রাজপুত উদাবৎ বংশীয় জনৈক ধনশালী ব্যক্তি,—নাম বীদা। প্রভাতে তিনি বিদেশ গমনাভিপ্রায়ে সজ্জিত হইয়া তোরণ দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় সঙ্গ, রক্তাক্ত দেহে আসিয়া তাঁহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, বিপন্নকে আশ্রয় দান, রাজপুত জাতির চিরন্তন ধর্ম্ম। বীদা তৎক্ষণাৎ সঙ্গকে অভয় দিয়া স্বগৃহে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

ইহার অনতিকাল পরেই, জয়মল্ল শিকারভ্রষ্ট শ্বাপদের ন্যায় অসিহস্তে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সঙ্গকে পরিত্যাগ করিবার জন্য বীদাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বীদা তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। আশ্রিতের জন্য রাজপুত জীবন দিতে পারে, কিন্তু আশ্রিতকে ত্যাগ করিয়া শরণাগতপালন-রূপ মহাব্রত ভঙ্গ করিতে পারে না। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া জয়মল্ল বীদাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। বীদাও তাহাতে পশ্চাৎপদ নহেন। তখন সেই স্থানে দুই বীরের তুমুল অসিযুদ্ধ উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর বীদা সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিলেন। আশ্রিতবৎসল রাজপুত আত্ম-জীবন বিসর্জ্জন দিয়া আশ্রিতের জীবন রক্ষা করিলেন।

যে সময়ে বীদা ও জয়মল্লের মধ্যে দ্বন্দযুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে সঙ্গসিংহ বীদার গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। দ্বন্দযুদ্ধে জয়মল্লও বিশেষরূপে আহত হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি আর সঙ্গের অনুসরণ করিতে না পারিয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

এদিকে রাণা রায়মল্ল যখন বুঝিতে পারিলেন যে, উদ্ধতস্বভাব পৃথ্বীরাজই সকল অনর্থের মূল, তাঁহার জন্যই ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিষম বিদ্বেষানল প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহারই দোষে জ্যেষ্ঠপুত্র সঙ্গ নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন ক্রোধে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি পৃথ্বীরাজকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাকে রাজ্যত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে যাইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। পিতার এই কঠোর আদেশে পৃথ্বীরাজের হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না।

তিনি তৎক্ষণাৎ পাঁচজন মাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া গদবার প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আর সঙ্গ—রাজকুমার সঙ্গ একা পথে পথে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে আজমীর প্রদেশস্থ এক ক্ষুদ্র কৃষকপল্লীতে উপস্থিত হইলেন এবং আত্মগোপন পূর্ব্বক তথায় জনৈক ছাগপালকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে থাকিয়া জীবিকার জন্য তাঁহাকে ভীল রাখালদিগের সহিত গো, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি পশুচারণ করিতে হইত। কিন্তু সে কার্য্যে সঙ্গের কিছুমাত্র অভ্যাস বা পটুতা ছিল না। সুতরাং সর্ব্বদাই তাঁহাকে ছাগরক্ষকদিগের নিকট বিবিধ তাড়না সহ্য করিতে হইত। এমন কি, সময়ে সময়ে তাহারা তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিত। কিন্তু সঙ্গ দূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া নিয়তির এই কঠোর তাড়না অবিচল হৃদয়ে সহ্য করিতে লাগিলেন। যে নিয়তির অলঙ্ঘ্য চক্রের নিষ্পেষণে আজি তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা, তিনি সেই নিয়তিরই ভক্ত সেবক। সুতরাং দিবাবসানে ভুষিমিশ্রিত গোধূম চুর্ণের অর্দ্ধদগ্ধ পিষ্টক ভোজন করিতে করিতে তিনি স্থিরভাবে নিয়তিচক্রের পুনরাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

নিয়তি-চালিত মানব! সংসার-সমুদ্রের ভীষণ আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া নিরাশা-মথিতচিত্তে প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হইবে মনে করিতেছ? হতাশ হইও না, সময়ের প্রতীক্ষা কর। আবার সুদিন আসিবে; তখন ঐ উদ্বেল সমুদ্রেরই একটী ভীমতরঙ্গ তোমাকে এমন এক মনোরম উপকূলে তুলিয়া দিবে, যাহা তুমি কখন স্বপ্নেও কল্পনা কর নাই। সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ, উত্থান পতন, সকলই নিয়তির নিত্যপরিবর্ত্তনসম্ভূত অচিরভোগ্য এক একটী ফল; আর তুমি মানব নিয়তির দাস মাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"এ কার চিত্র রাজকুমারি!"

"তোর মনোচোরের।"

"আমার মনোচোরের চিত্র তোমার হাতে কেন?"

"চোর গ্রেপ্তার করেছি।"

"আমি তো তোমায় সে ভার দিই নাই?"

"ভার না দিলেও আমি ইচ্ছা করেই ভার নিয়েছি।"

"আমার জন্য তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?"

"আমি কখন্ কি করি, কি দেখি, তা জান্‌বার জন্য তুই এত ছট্‌ফট করিস্ কেন?"

"মন মানে না বলে।"

"তাই তোর মনোচোরাকে ধ'রে তোর মনটা ঠিক করবার চেষ্টায় আছি।"

"মনচোরা তোমার না আমার?"

"মর পোড়ারমুখি, আমার মন আবার কে চুরি করবে?"

"যে পাকা চোর।"

"তেমন চোর তো আমি আজও দেখ্‌তে পাই না।"

"কিন্তু আমি দেখেছি।"

"কোথায় দেখ্‌লি?"

"ঐ যে তোমার হাতে।"

"এতো ছবি।"

"ও চোরের হুলিয়া।"

তোড়াটঙ্কের সন্নিহিত আরাবল্লী পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত বেদলোরের দুর্গমধ্যে একতম সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া রাণা শূরতানের প্রিয়তমা কন্যা তারাবাই স্বীয় পরিচারিকা যমুনার সহিত পূর্ব্বোক্ত রহস্যালাপ করিতেছিল। তারা এখনও অবিবাহিতা; তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশবর্ষ হইবে। প্রভাতে উন্মেষোন্মুখী নলিনীর ন্যায়, নববর্ষাবারিসংস্পৃষ্টা জাহ্নবীর ন্যায় তাহার নবযৌবনোদ্ভিন্ন সুকুমার লাবণ্যরাশি ধীরে ধীরে সর্ব্বাঙ্গে ছাইয়া পড়িতেছে। নব বসন্তাগমে প্রবৃদ্ধা বল্লরী ধীরে ধীরে নবপল্লবরাগ-রঞ্জিতা হইতেছে, অষ্টমীর আধচন্দ্র মধুর পূর্ণিমা-সম্মিলনের জন্য ধীরে ধীরে এক একটী বর্দ্ধিত কলাকে আলিঙ্গন করিতেছে। তারা সুন্দরী। তাহার সৌন্দর্য্যে চন্দ্রের ঔজ্জ্বল্য আছে, পদ্মের সৌরভ আছে, জাহ্নবীর পবিত্রতা আছে। সে সৌন্দর্য্য-জ্যোতিতে রাজপুতনার সর্ব্বত্র আলোকিত।

কিন্তু তারা কেবল এই সৌন্দর্য্যটুকু লইয়াই সন্তুষ্ট নহে। সে রাজপুতের মেয়ে। কুসুমভূষণ অপেক্ষা অসিচর্ম্মই তাহার নিকট অধিক সুন্দর। প্রেমসঙ্গীত অপেক্ষা বীরত্বের নীরসকাহিনীই তাহার অধিক প্রিয়। তারা বাল্যকাল হইতেই বীর-ধর্ম্মের অনুরাগিণী। সে, পিতার নিকট বসিয়া বসিয়া সাগ্রহে নিষ্ঠুর যুদ্ধকাহিনী

শ্রবণ করে, শুনিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি যেন উল্লাসে নাচিতে থাকে। ঝুলন পূর্ণিমায় শোলাঙ্কি-রাজকুমারীর সহিত বাপ্পারাওয়ের মিলন শুনিয়া সে মুখ বিকৃত করে, কিন্তু অসি-মাত্র-সম্বল বাপ্পার চিতোর অধিকার শুনিতে শুনিতে তাহার নেত্রদ্বয় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। পদ্মিনীর মনোহর উপাখ্যান শুনিতে শুনিতে সে আত্মহারা হয়। প্রণয়ের সুকোমল আলিঙ্গন অপেক্ষা শত্রুহস্তচালিত তরবারির কঠোর স্পর্শ অধিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে। তারা যুদ্ধ করিতে জানিত, ঘোড়ায় চড়িতে পারিত। তাই এত সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী হইলেও তারা সৌন্দর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা নহে।

যমুনা বলিল,—"রহস্য রাখ, এখন চিত্রখানা কার দেখি।"

তারা, যমুনার হস্তে চিত্র প্রদান করিল। চিত্র হস্তে লইয়াই যমুনা চমকিত হইয়া বলিল,—"এ যে পৃথ্বীরাজের চিত্র।"

ঈষৎ হাসিয়া তারা বলিল,—"একেবারে আকাশ হ'তে পড়িলি যে?"

যমুনা। সাধে কি পড়ি। তুমি কি মনে করেছ, পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে?

তারা। চিত্র দেখিলেই বুঝি বিবাহ করিতে হয়? তবে তো তুইও চিত্রখানা দেখ্‌লি, তোরও বিবাহ হবে।

য। তোমার দেখায় আর আমার দেখায় অনেক তফাৎ। ঠাকুর অনেকেই দেখে; কেউ বা বাহিরের চোখে দেখে, কেউ বা মনের চোখে দেখে।

তা। আমি ঠাকুরও দেখি নাই, দেবতাও দেখি নাই, শুধু একজন মানুষের ছবি দেখছিলাম।

য। কিন্তু এত মানুষ থাকতে ঐ মানুষের ছবিটাই এত পছন্দ হ'ল কেন?

তা। তুই বাঁদী, তা'র কি বুঝ্‌বি। এমন ছবি রাজপুতনায় বুঝি দুটী নাই।

যমুনা হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তুমি পৃথ্বীরাজকে ভালবেসেছ।"

তারা বলিল,—"যে বীর, তা'কে সকলেই ভালবাসতে চায়।"

য। রাজপুতনায় বীরের অভাব নাই।

তা। না থাকিতে পারে।

য। তবে সকলকে ছেড়ে পৃথ্বীরাজের উপরেই তোমার এত টান কেন?

তা। এমন চাঁদ থাকিতে সূর্য্যমুখী সূর্য্যের দিকেই চেয়ে থাকে কেন?

য। জ্বলে পুড়ে মরবার জন্য।

তা। কিন্তু তাতেই তার সুখ।

য। তার সুখের মুখে ছাই। এখন আমার একটা কথা শুনবে কি?

তা। কি কথা?

য। পৃথ্বীরাজকে ভালবাসিও না।

তা। কেন?

য। তাহার সহিত তোমার বিবাহ অসম্ভব।

তা। কারণ?

য। তোমার পিতার প্রতিজ্ঞা শুনেছ কি?

তা। কি প্রতিজ্ঞা।

য। যে ব্যক্তি পাঠানের হাত হ'তে তোড়াটঙ্ককে উদ্ধার করিতে পারিবে, তাহাকেই তিনি কন্যাদান করবেন।

তা। পৃথ্বীরাজই তোড়াটঙ্ক উদ্ধারে সক্ষম।

য। কিন্তু তার বর্ত্তমান অবস্থা কিছু শুনেছ কি?

তা। শুনেছি তিনি এখন পিতৃ-আজ্ঞায় নির্ব্বাসিত।

য। তবে?

তা। অগ্নি যেখানেই থাক, চিরদিন কখন প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। একদিন না একদিন সে আপন প্রভাব বিস্তার করে।

য। কিন্তু চিত্র দেখেই একেবারে এতটা ভাল নয়।

কুন্দদশনে অধর চাপিয়া সহাস্যে তারা বলিল,—"কিসে ভাল, কিসে মন্দ, তুই বাঁদী কি বুঝবি?

যমুনা হাসিতে হাসিতে বলিল,—"কিন্তু আমি এটা বুঝি যে, একবার মন হারালে আর ফিরে পাওয়া যায় না।"

তা। তোর কি কখনও মন হারিয়েছিল?

য। তা হ'লে কি তুমি আজও আমাকে খুঁজে পেতে।

তা। কোথায় যেতিস্?

য। চাঁদের আলোয় ব'সে, গলায় মাধবীলতার নরম ফাঁস জড়িয়ে মদন ঠাকুরের ফুলবাগানে ফুলের কলিতে কলিতে হারান মন খুঁজে বেড়াতাম।

তারা উঠিয়া যমুনার চুলের গোছা ধরিল। যমুনা হাসিতে হাসিতে কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল। তারপর উঠিয়া, তারার উপর একটা বক্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, মৃদুস্বরে গাহিল,—

"কানু হেরব ছিল মনে সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ।
তবধরি অবোধী মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝয় না পারি॥"

তারা তাহার পৃষ্ঠদেশে একটী সোহাগের কিল মারিয়া বলিল,—"মর পোড়ারমুখি, কানুকে দেখতেই যদি সাধ ছিল, তবে দেখে আবার পরমাদ কেন?"

যমুনা গাহিল,—

কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পরহাতে দেলা।
না জানিয়ে কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর॥"

হাসিয়া তারা বলিল,—"প্রাণটা অমনি রাস্তায় পড়ে আছে কি না, চুরি করলেই হ'ল।"

যমুনা বলিল,—"সিদেল চোরের কাছে রাস্তা আর সিন্ধুক দুইই সমান।"

ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

এ যেন সে তারই গলা

আধ সুললিত আধ দীর্ঘ ক্ষীণ;—
ঝঙ্কারে পুলিনে যেন কার বীণ!
চন্দ্রমুখী নিশি—ঝিল্লিরব তুলি,
গাহে সাথে সাথে আপনারে ভুলি;
অই আসে, হোথা হতে অদৃশ্য অদূর,
এ যেন সে তারি গলা চেনা চেনা সুর!

নদীর এ পারে আসে প্রতিধ্বনি,
আনন্দে অধীরা মধুর রজনী;
পিকবধূ শুনি সরমে বিভোর;
তাপিত অপাঙ্গে উদে অশ্রুলোর;
কার এ তরুণ তান, ধ্বনিছে মধুর;
এ যেন সে তারি গলা চেনা চেনা সুর!

গভীর নিশীথে বসি দূর বনে,
আলাপে বেহাগ কেগো নিরজনে?
জোছনার বুকে বেড়াইতে আসি,
মনে কি পড়েছে, কারো রূপরাশি!
আহা মরি, অই শুন, নহে দীর্ঘ দূর,—
এ যেন গো তারি গলা চেনা চেনা সুর!

গাওলো সুন্দরি গাওনা আবার?
কেন গো থামিল করুণ ঝঙ্কার!
গাও একবার শুনি প্রাণভরি,
প্রেম মাখা তানে ডুব দিয়া মরি;
লো সুন্দরি, গাও ফিরে, স্তব্ধ হলে কেন!
এ সুর লাগিছে প্রাণে চেনা চেনা যেন!

শ্রীজগৎ প্রসন্ন রায়।

জ্যোতিষ রহস্য।

——:•:——

(৮ম প্রস্তাব)

রাহু ও কেতু।

রাহু ও কেতু গ্রহ নহে। পৃথিবী ও চন্দ্র কক্ষার উত্তর এবং দক্ষিণ সংলগ্ন স্থান দুইটিকে, যথাক্রমে রাহু ও কেতু বলে। অর্থাৎ উত্তর সংলগ্ন স্থানের নাম রাহু, আর দক্ষিণ সংলগ্ন স্থানের নাম কেতু। চন্দ্র, যথাকালে এই দুই স্থানে

উপস্থিত হইলে, আমাদিগের আবাস স্থান, এই পৃথিবীর উপর কোন এক বিশেষ শক্তি প্রকাশ করে বলিয়া, রাহু ও কেতুকে গ্রহ নাম প্রদান পূর্ব্বক গণনাদি করা যায়। বাস্তবিক, রাহু ও কেতু গ্রহ নহে,—চন্দ্রের পাত মাত্র। *

রাহু ও কেতু হইতে, বিভিন্ন রাশির ভিন্ন ভিন্ন ফল দৃষ্ট হয়। প্রাচীন আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদগণ, ইহাদিগকে গ্রহরূপে কল্পনা করিয়া, কি রাশি, কি জাতক, কি অপর কোন বিষয় সম্বন্ধে শুভাশুভ গণনা করতঃ, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফলিত জ্যোতিষে রাহু ও কেতুর নির্দ্দিষ্ট ফল অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। রাহু ও কেতুকে ধরিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ 'নবগ্রহ' স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নবগ্রহ স্তোত্র মধ্যে রাহু ও কেতু লইয়া নয়টী গ্রহ পূর্ণ হইয়াছে। পাঠকপাঠিকাগণ জানিবেন যে, গ্রহগণের ন্যায় উক্ত দুইটী চন্দ্রপাত হইতে সর্ব্বদাই শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়াই, উহারা পর্য্যায়ক্রমে ৮ম ও ৯ম গ্রহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে উহারা গ্রহ নহে—নিরাকার—পরন্তু, গ্রহগণের ন্যায় শুভাশুভ ফলদাতা বটে।

সমুদায় গ্রহেরই গতি বামাবর্ত্তে অর্থাৎ গ্রহগণ, মেষরাশি হইতে, বামাবর্ত্তে বৃষ, এবং তৎপরে, মিথুন প্রভৃতি রাশি ঘুরিয়া, পুনর্ব্বার মেষরাশিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ নিয়মে সকল গ্রহই দ্বাদশ রাশি পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু রাহু ও কেতুর গতি এই নিয়মের বিপরীত। ইহারা দক্ষিণাবর্ত্তে পরিভ্রমণ করিয়া, মেষ রাশি হইতে মীন, মীন হইতে কুম্ভ, কুম্ভ হইতে মকর প্রভৃতি রাশি অতিক্রম করিয়া, পুনর্ব্বার যথাকালে মেষ রাশিতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

রাহু ও কেতু বক্রগতি দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে ১৮ বৎসর, ৭ সাত মাস, ১৮ আঠার দিবস, ১৫ পনর দণ্ডে, একবার রাশিচক্র ঘুরিয়া আইসে। ইহাদের দৈনিক গতি ৩ তিন কলা, ১০ দশ বিকলা, এবং ৪৫ পঁয়তাল্লিশ অনুকলা। একদণ্ডের গতি—কলাদি—০। ৩। ১০। ৪৫ প্রত্যনুকলা। ইহারা প্রতিবৎসর ১৯ অংশ, ১৯ কলা, ও ৪৪ বিকলা করিয়া রাশিচক্রে সরিয়া থাকে। ইহাদের

* পাত—Nodes are the two opposite points where the orbit of a planet seems to intersect the ecliptic. That where the planet appears to ascend from the south to the north side of the ecliptic, is called the ascending or north node, রাহু। And the opposite point where the planet appears to descend from the north to the south, is called the descending or south node. কেতু।

প্রত্যেক রাশি ভোগের কাল ১ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন। রাহু ও কেতুর (প্রত্যেকের) এক রাশি ভোগের কাল স্থূল হিসাবে ১৮ মাস ধরিলে, প্রত্যেকের, প্রত্যেক হোরা ভোগের কাল ৯ নয় মাস, প্রত্যেক দ্রেক্কাণ ভোগের কাল ৬ ছয় মাস, প্রত্যেক নবাংশ ভোগের কাল ২ দুই মাস, প্রত্যেক দ্বাদশাংশ ভোগের কাল ১।। দেড় মাস, এবং প্রত্যেক ত্রিংশাংশ ভোগের কাল ১৮ আঠার দিবস মাত্র হইয়া থাকে। রাহু ও কেতু উভয়েরই, রাশিভোগের পরিমাণ কাল একই প্রকার হইয়া থাকে। কখনও ভিন্নরূপ হয়।

দৃষ্টি।—রাহু যে রাশিতে বাস করে, সেই রাশিতে, এবং সেই রাহুস্থিত রাশির একাদশ রাশিতে রাহুর দৃষ্টি থাকে না। রাহু যে রাশিতে বাস করে, সেই রাশির তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম রাশিতে রাহুর দ্বিপাদ দৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। রাহু যে রাশিতে অবস্থিতি করে, সেই রাশির দ্বিতীয় ও দশম রাশিতে রাহু ত্রিপাদ দৃষ্টি প্রদান করিয়া থাকে। এবং রাহু যে রাশিতে থাকে, সেই রাশির পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও দ্বাদশ রাশিতে, রাহু পূর্ণদৃষ্টি (৬০ কলা) প্রদান করিয়া থাকে।

কেতুর দৃষ্টি নাই। মতান্তরে—কেতুর দৃষ্টি, রাহুর দৃষ্টির ন্যায়; এবং কোন কোন মতে, কেতুর দৃষ্টি অপরবিধও দেখিতে পাওয়া যায়। কেতুর দৃষ্টিসম্বন্ধে নানা মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ক্ষেত্রাদি।—মেষাদি দ্বাদশ রাশির মধ্যে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট রাশি নাই, যে রাশিটীকে রাহু অথবা কেতুর ক্ষেত্র বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কুম্ভ রাশিকে রাহুর এবং সিংহ রাশিকে কেতুর মূলত্রিকোণ অর্থাৎ আনন্দের স্থান বলিয়া গণনা করা হয়। মিথুন রাশি রাহুর উচ্চ স্থান। এই রাশির ২০ কুড়ি অংশ রাহুর সু-উচ্চ বা সুতুঙ্গ বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। ধনু রাশি কেতুর তুঙ্গ বা উচ্চ রাশি। এই রাশির ৬ ছয় অংশ কেতুর সু-তুঙ্গ বলিয়া অবধারিত আছে। ধনুরাশি রাহুর নীচ স্থান। রাহু এই রাশির ২০ কুড়ি অংশে থাকিলে সুনীচস্থ হয়। মিথুন রাশি কেতুর নীচস্থান। কেতু এই রাশির ৬ ছয় অংশে থাকিলে সুনীচস্থ হইয়া থাকে।

কারকতা।—রাহু পাপগ্রহ ও অন্ত্যজ জাতি বলিয়া কথিত। উহা সিংহ রাশিতে থাকিলে এবং জাতকের দশম ও একাদশ গৃহে শনিগ্রহযুক্ত হইলে ঐশ্বর্য্য ও রাজ্যকারক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কেতুও পাপগ্রহ, এবং প্রায়

সকল সময়েই মন্দফল প্রদান করিয়া থাকে। কেতু, অপর কোন পাপগ্রহ-যুক্ত হইয়া থাকিলে অতিশয় অশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে।

রাহু নৈর্ঋত কোণের অধিপতি।

মিত্রামিত্র—বুধ ও বৃহস্পতি, এই দুই গ্রহ, রাহুর মিত্র বা শত্রু গ্রহ নহে। পরন্ত, সমভাবাপন্ন। শুক্র ও শনি, এই দুই গ্রহ রাহুর মিত্র। রাহুর অতিমিত্র নাই। রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল, এই তিন গ্রহ রাহুর শত্রু গ্রহ। তন্মধ্যে রবিগ্রহ রাহুর অতি শত্রু বলিয়া খ্যাত।

বুধ ও বৃহস্পতি এই দুই গ্রহ, কেতুর সমগ্রহ। উহারা কেতুর শত্রু বা মিত্র নহে—পরন্তু সমভাবাপন্ন। রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল, এই তিন গ্রহ, কেতুর মিত্র। তন্মধ্যে চন্দ্র ও মঙ্গল অতিমিত্র বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। শুক্র ও শনি, এই দুই গ্রহ কেতুর শত্রু; এবং উহারাই আবার পরম শত্রু বলিয়া অবধারিত আছে।

গোচরফল।—রাহু ও কেতু মানবের জন্ম রাশিতে উপস্থিত হইলে, নানা প্রকার শারীরিক পীড়া ও মানসিক কষ্ট উপস্থিত হয়। উহারা জন্ম রাশির দ্বিতীয় রাশিতে থাকিলে, অর্থনাশ হয়। তৃতীয় রাশিতে থাকিলে, সম্মান বৃদ্ধি হইয়া থাকে। চতুর্থ রাশিস্থ হইলে, মিত্রাদির হানি ও দুর্ভাবনা হয়। পঞ্চম রাশিগত হইলে, মানসিক ক্লেশ ও নানা কার্য্যহানি হয়। ষষ্ঠ রাশিতে সমুপস্থিত হইলে, জাতকের শত্রুনাশ ও সুখবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সপ্তম রাশিগত হইলে, যাত্রাদিতে অশুভ, শত্রুপক্ষ হইতে ভয়, নানা প্রকার বিপদ ও স্ত্রীর পীড়া হয়। অষ্টম রাশিতে উপস্থিত হইলে, নানা প্রকার রোগাক্রান্ত ও বিপদাপন্ন হইতে হয়। নবম রাশিগত হইলে, মানবের প্রায়ই প্রবাস গমন ঘটিয়া থাকে। দশম রাশিতে বাস করিলে, মানবের সম্মান ও পদবৃদ্ধি হইয়া থাকে। একাদশ রাশিতে উপনীত হইলে, মিত্র, সম্মান, ও নানা উপায়ে অর্থলাভ হয়। রাহু ও কেতু দ্বাদশ রাশি-গত হইলে, মানবের বিবিধ রোগ, শোক ও নানা প্রকার বিপদ এবং বধবন্ধন ভয় হয়।

রাহু ও কেতুর গোচরফল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপরে কেতুর যে গোচরফল লিখিত হইল, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। আমরা সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ও প্রামাণ্যগ্রন্থ "জ্যোতিষ প্রকাশের" মতই গ্রহণ করিলাম। এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু দেখিতে বা জানিতে হইলে,পাঠক "শুদ্ধি দীপিকা" পুস্তক দেখিবেন। "বৃহজ্জাতক" "নরজাতক" প্রভৃতি বহুবিধ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও, এ বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে।

ফলবৃদ্ধি।—রাহু, অপর যে কোন গ্রহের সহিত সংযুক্ত বা সম্মিলিত হয়, সেই গ্রহেরই শুভফলের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রাহুযুক্ত হইলেই সেই গ্রহের শুভফল বৃদ্ধি হয়। ইহার বৈপরীত্যে, কেতু যে কোন (শুভ বা অশুভ) গ্রহের সহিত সংযুক্ত হয়, সেই গ্রহেরই শুভফলের হ্রাস ও অশুভ ফলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দশাদি।—ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ, এই তিন নক্ষত্রে রাহুর দশা হইয়া থাকে। রাহুর দশাভোগের কাল ১২ দ্বাদশ বৎসর মাত্র। প্রতি নক্ষত্রে ৪ চারি বৎসর মাত্র দশা ভোগ হইয়া থাকে।

অষ্টোত্তরীদশা মতে (এই মতটী বঙ্গেই বিশেষভাবে প্রচলিত দেখা যায়) কেতুর দশা নাই। উক্ত দশা মতে, মনুষ্যকে কেতুর দশা ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু বিংশোত্তরীয় মতে, কেতুর ৭ সাত বৎসর কাল দশা ভোগ হইয়া থাকে। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী দশা গণনা একরূপ নহে, পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। অষ্টোত্তরী দশা মতে, মানবের ১০৮ বৎসর, এবং বিংশোত্তরী দশা মতে মানবের ১২০ বৎসর পরমায়ু ধরিয়া গণনা করা হয়। সুতরাং ফল মিলিবার সম্ভাবনা কোথায়? ইহা ভিন্ন ত্রিংশোত্তরী প্রভৃতি আরও কয়েকটী দশা আছে। বঙ্গদেশে কেবল মাত্র অষ্টোত্তরী দশা মতে কোষ্ঠী ঠিকুজীর গণনা হইয়া থাকে। বিংশোত্তরী দশা মতে মঘা, মূলা ও অশ্বিনী, এই তিন নক্ষত্রের যে কোন নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে কেতুর দশায় জন্মগ্রহণ করা হয়। প্রতি নক্ষত্রেই কেতুর দশা ৭ সাত বৎসর হইয়া থাকে। অষ্টোত্তরী দশার গণনা এরূপ নহে। ভারতবর্ষে সকলই প্রভেদ দেখা যায়। এমন প্রভেদের স্থান জগতে আর নাই। এই প্রভেদেই আমাদিগকে দীন হীন ও মলিনভাবাপন্ন হইতে হইয়াছে। এদেশে এমন দুই ব্যক্তিকে দেখা যায় না, যাহাদের মত পরস্পর একরূপ হইয়া থাকে।

প্রিয়।—রাহুর প্রিয়—দূর্ব্বা ও চন্দন।

কেতুর প্রিয়—কুশ ও কর্পূর।

গ্রহদোষ শান্তি।—রাহুর দোষ শান্তির নিমিত্ত, তাহার প্রীত্যর্থে মণির মধ্যে গোমেদক, ধাতুর মধ্যে লৌহ এবং উদ্ভিজ্জের মধ্যে চন্দনের মূল ধারণ করিলে রাহুর দোষ-শান্তি হইয়া থাকে। রাহুর প্রীতির নিমিত্ত, গোমেদক মণিই ধারণ করা প্রশস্ত। ধাতুর মধ্যে লৌহই রাহুর প্রিয়।

কেতুর দোষ-শান্তির নিমিত্ত, ও তাহার প্রীত্যর্থে মণির মধ্যে বৈদূর্য্য ও

মরকত মণি, ধাতুর মধ্যে লৌহ এবং উদ্ভিজ্জের মধ্যে অশ্বগন্ধার মূল ধারণ করিলে, কেতুর দোষ-শান্তি হইয়া থাকে। * কেতুর প্রীতির নিমিত্ত বৈদূর্য্য ও মকরত মণি ধারণ করাই বিধেয়। কারণ এই দুই রত্নই কেতু-দোষশান্তির অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া বর্ণিত আছে। ধাতুর মধ্যে লৌহই (রাহুর ন্যায়) কেতুর অত্যন্ত প্রিয়বস্তু।

বর্ণ।—রাহুর বর্ণ - গাঢ়কৃষ্ণ।

কেতুর বর্ণ—ধূম্র।

রাহু ও কেতু উভয়েই পাপ ও অমঙ্গলজনক গ্রহ বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, জ্যোতিঃশেখর।

মোহশেল।

—(•)—

রামায়ণে লিখিত আছে—লক্ষ্মণকে কোনমতে পরাস্ত করিতে না পারিয়া দশানন শক্তিশেল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার চেতনা হরণ করিয়াছিলেন—লক্ষ্মণ মৃতপ্রায় পতিত রহিলেন - পরে গন্ধমাদন হইতে বিশল্যকরণী আনীত হইল এবং সেই সঞ্জীবনী ঔষধের গুণে কালের কবল হইতে লক্ষ্মণ মুক্তিলাভ করিলেন।

আজ ইংরাজ সমগ্র ভারতের বক্ষে শক্তিশেলের পরিবর্ত্তে মোহশেল নিক্ষেপ করিয়াছে। সে বুঝিয়াছে, এই বীরপ্রসূ ভারতভূমিতে একচ্ছত্র অধীশ্বর হইতে

* গ্রহযামলাদি গ্রন্থে, হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, গ্রহদোষ শান্তির যে সকল বিধান লিখিত আছে, তাহাতে জানা যায় যে, গ্রহদোষ শান্তির জন্য শ্রীশ্রীজগদীশ্বরের আরাধনা, পূজা, গ্রহদিগের বীজমন্ত্রাক্ষর জপ এবং গ্রহদেবতাদিগের পূজা করিতে হয়। তৎপরে ঘৃতসংযুক্ত গ্রহ সমিধ দ্বারা হোম করা, এবং তাহার ধূম গাত্রে স্পর্শ করাইতে হয়। এতদ্ভিন্ন, গ্রহদোষ শান্তির জন্য তান্ত্রিক মতে, আরও অনেক প্রকার প্রক্রিয়া লিখিত আছে, এবং যোগশাস্ত্রের বিধানমতে কুম্ভকাদি করিয়া মৃত্যুকে পরাজয় করিতে পারিলে, দীর্ঘজীবী হওয়া যায়। ভাগ্যরা সইলে যেরূপ যোগাযোগ্য হয়, সেইরূপ ঘৃতসংযুক্ত গ্রহসমিধের হোমের ধূমে, মানবদেহে যে গ্রহ-আকর্ষণে রসাদি জন্মে, তাহা নষ্ট হইয়া গ্রহদোষ শান্তি হইতে পারে। আকাশের ব্যাপার সহজে বুঝা সুকঠিন। তবে, ফলদ্বারা তাহার প্রত্যক্ষতা ও সত্যতা জানা যায়।

"ফলিত জ্যোতিষ," ২য় খণ্ড—২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইলে, এই বিপুল প্রজা-বৃন্দের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে হইলে, এই মোহ-শেলই তাহার অমোঘ অস্ত্র। সে আরও বুঝিয়াছে, যে দেশের লোক বাহুবলে এক সময় জগদ্বিখ্যাত ছিল, যাহাদের অতীতের গৌরব-কাহিনী শুনিলে এখনও বিদেশী মাত্রেরই প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, তাহাদের সে শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইলে বল অপেক্ষা কৌশলেরই বিশেষ প্রয়োজন—রাজনীতি অপেক্ষা কূটনীতিরই অধিক আবশ্যক। তাই সে ভারতবাসীকে ঘুম পাড়াইবার আয়োজনের ত্রুটি করে নাই; এবং তাহার এ চেষ্টাও বিফল হয় নাই। ইংরাজ এ দেশে যাহা করিয়াছে, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ভাবুকই স্বীকার করিবেন, তাহা তাহার স্বজাতির স্বার্থ-রক্ষার জন্য, স্বীয় রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর করিবার জন্য,—ভারতবাসীর উপকারের জন্য নয়। ভারতবাসীর ক্রন্দনে তাহার সভ্য প্রাণ বিগলিত হয় না—বুভুক্ষিত ভারতবাসীর আর্ত্তনাদে তাহার কোমল প্রাণে আঘাত লাগে না। ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত চক্ষের উপর দিয়া দিন দিন চলিয়া যাইতেছে। সে বলে, সে সভ্য, ভারতবাসী অসভ্য। সে বলে, সে আমাদিগকে সভ্যতার সোপানে নিস্বার্থ ভাবে হস্ত ধারণ করিয়া তুলিয়া লইতেছে। তাহার এ মিথ্যাচরণ যদি সভ্যতার নিদর্শন হয়, সেই যদি সভ্যতার আদর্শ স্বরূপ হয়, তবে আমি বলি, অমন সভ্যতায় আমাদের কাজ নাই, অমন সভ্যতা আমরা চাহি না।

পাঠক! যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ইংরাজ আমাদিগকে অচেতন ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ করিয়া রাখিয়াছে, এবং যাহাকে আমি মোহশেল নামে অভিহিত করিয়াছি, তাহা সাধারণের নিকট অর্থ নামে পরিচিত। অনেকেই হয়ত বলিবেন যে, কলিযুগে অর্থই পরমার্থ, অতএব তাহা ভারতবর্ষে না হইবে কেন? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমাদের এ অবস্থা কে করিয়াছে? ভারতবাসীর সরল অন্তঃকরণে এ পিপাসা জাগাইয়া কে তাহাকে নির্জীব করিয়া রাখিয়াছে? ইহার উত্তরে আমি বলিব—বিদেশী বণিক। ইহার উত্তরে আপনিও বলিবেন—বিদেশী বণিক। অবশ্য আমাদের আর দোষ নাই, এমন কথা বলি না। একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবাসীর কি অবস্থা ছিল, আর আজই বা কি হইয়াছে। বলুন দেখি, বিদেশীই ভারতবাসীকে অর্থমোহে মুগ্ধ হইতে শিখাইয়াছে কিনা?—শান্তিপ্রিয় ভারতের সুখ সাচ্ছন্দ্যই তখনকার পরমার্থ ছিল। আর এখন?—এখন অর্থই পরমার্থ বা (আমার ভাষায়) অনর্থ হইয়াছে।

অর্থ-লোলুপ ইংরাজ বণিক্ আমাদিগকে অর্থের মহিমা জানাইয়া দিয়াছে। এই অর্থবলে—এই অর্থের লোভেই সে ভারতে রাজ্য পাতিয়াছে, এবং ইহারই চাক্‌চিক্যে আজ ভারতবাসীকেও মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ভারতের অস্থিমজ্জা শোষণ করিয়া, ভারতের ধনধান্য লুটিয়া লইয়া, ভারতবাসীকে আজ এমন অবস্থায় ফেলিয়াছে যে, অর্থ না হইলে তাহার একদিন চলে না—একদিন না খাটিলে তাহার একমুষ্টি অন্নের উপায় হয় না। যে জাতির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এক সময় তাহাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে চিরদিনের মত আবদ্ধ ছিল, যাহাদিগকে কখন হা অন্ন! হা অন্ন! রবে চীৎকার করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইত না, আজ তাহাদের সমস্তই, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত অর্থের উপর নির্ভর করিতেছে কেন? যে 'শস্যশ্যামলা' রাজ্যে কখনও দুর্ভিক্ষের উল্লেখ নাই, সেই ভারতের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই এদেশে স্থায়ী বাস আরম্ভ করিয়াছে। অমরকবি বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদেরই একটিকে উপলক্ষ্য করিয়া আনন্দমঠ লিখিয়া গিয়াছেন। আর আজকাল প্রতি বৎসরই অন্নকষ্ট, প্রতিদিনই কত শত প্রাণী অকালে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে আত্মসমর্পণ করিতেছে। ইহারই বা কারণ কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবাসীর আজ শোচনীয় অবস্থা। সে আজ অর্থের জন্য পূর্ব্বপুরুষগণের যশ-গৌরব বিস্মৃতির তিমিরগর্ভে নিমজ্জিত করিতে কুণ্ঠিত নয়। সে অর্থান্বেষণে এত ব্যস্ত যে, পূর্ব্ব-কীর্ত্তিকলাপ একবার স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে তাহার তুলনা করিয়া ইংরাজকে ধন্যবাদ দিবারও অবসর পায় না। অর্থের জন্য আজ সে এত অন্ধ যে, তাহার মানব-জীবনের অমূল্য রত্ন স্বাধীনতা ধন ইংরাজপদে একবার আত্মভ্রমে বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া তাহা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টাকেও আজ কর্ত্তব্য মনে করে না। ইংরাজ "কলাটি খাইয়া চপাটি ফেলিয়া" না দিলে আজ আর ভারতবাসীর উদরান্নের সংস্থান হয় না।

হে ইংরাজ! তোমার কূটনীতির সাহায্যে যে ত্রিশকোটি বীরকে আজ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছ, তাহাতে বাস্তবিক তোমার খুব বাহাদুরী আছে। তুমি যে কোটি কোটি বিষধর কালসর্পকে আত্মবিস্মৃত করাইয়া রাখিয়াছ, তাহার জন্য বাস্তবিকই তুমি ধন্যবাদের পাত্র। অর্থই তোমার মূলমন্ত্র, আবার এই অর্থই তোমার অনর্থকর হইবে, ইহা স্থির জানিও।

হায় অর্থ! তোমার মোহিনীমূর্ত্তিতে আজ ভারত—শুধু ভারত বলি কেন, সমগ্র পৃথিবীই মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তুমি সূর্য্য-কিরণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল, তুমি

মধু অপেক্ষাও সুমিষ্ট (১)। তোমার প্রাধান্যে আজ জাতির প্রাধান্য, তোমার অভাবে সমস্তই অভাব। সভ্য জগতে তুমই আজ হর্ত্তা-কর্ত্তা-নিয়ন্তা। আর ভারতে—তোমার প্রিয়ভূমি ভারতে এখন শুধু ছায়া মাত্র রাখিয়া গিয়াছ। সেই মায়াময়ী ছায়ার পশ্চাতে মরীচিকা-প্রতারিতের ন্যায় কোটি কোটি জীব অনর্থক ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কোটি কোটি ভারতবাসী প্রতারিত হইয়া অবশেষে তোমার জ্বালাময় কিরণে পতঙ্গের মত ঝাঁকে ঝাঁকে অকালে জীবনাভিনয় শেষ করিতেছে।

আর ভারতবাসি! তোমার অবস্থা দেখিয়া হিংস্র পশুরও দয়া হয়, কিন্তু হৃদয়বান ইংরেজের দয়া হয় না। তাই বলি, আর দয়ার পাত্র হইয়া কাজ নাই, এখন নিজে নিজের পথ দেখ। আর্য্যের বংশধর হইয়া এখন কি করিতেছ, তাহার জন্য অনুশোচনা কর। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কি হেয়-জীবন যাপন করিতেছ তাহা চিন্তা কর; বারান্তরে তাহা সবিস্তার বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু ভাই জীবন কি এতই সস্তা? স্বাধীনতা কি এতই অল্পমূল্যে বিক্রয় হয়? আর অর্থই কি এত অমূল্য জিনিষ যে, তাহার অন্বেষণে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতে হয়? চক্ষু কি একবার ফুটিবে না? ইংরাজ-নিক্ষিপ্ত মোহ-শেল কি খসিবে না? বিশল্যকরণী কি আনীত হইবে না?

শ্রীহরিহর দে।

শিখ-গুরু। *

—(০)—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নানক।

পাঠানেরা যখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ভারত শাসন করিতেছে, সেই সময় ভারতবর্ষের এক কোণে একটি ক্ষত্রিয়-পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সে আজ প্রায় সার্দ্ধ চারিশত বর্ষ পূর্ব্বের কথা। তখন ভারতবাসী কতকটা পরাধীন হইলেও,

1 Money Money Money—
Brighter than sunlight and sweeter than honey.

* শিখগুরু 'শিখসম্প্রদায়' গ্রন্থের একটি অধ্যায় (Par)। এই অধ্যায়ে শিখগুরুদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

হীনবীর্য্য হয় নাই, তখনও তাহাদের প্রাণে নবীন আশা জাগিত, তাহারা দেশের মঙ্গলের জন্য ভাবিতে পারিত, আত্মোৎসর্গ করিত। জনৈক দার্শনিক ঠিকই বলিয়াছেন—পরাধীনতা জাতির মৃত্যুবাণ। সে দিনের ভারতবাসীর সহিত আধুনিক ভারতবাসীর তুলনা হয় না। আজ আমরা জড়-মৃৎ-পিণ্ডবৎ! জীবনে আশা নাই, প্রাণে আকাঙ্ক্ষা নাই, হৃদয়ে বল নাই, চক্ষে তেজঃ নাই—আমরা সব হারাইয়াছি।

সময় না আসিলে কর্ম্মের ফল পাওয়া যায় না। সময় না আসিলে কাজের লোকও পাওয়া যায় না। আজ লোকাভাবে হাহাকার করিতেছ, সময় আসুক দেখিবে, দেশে লোকের অভাব নাই। আজ কর্ম্মক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইতেছ না, সময় আসুক দেখিবে, তোমার সম্মুখে অনন্ত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু এ সময় আপনি আসে না; সাধ্য-সাধনা করিয়া আনিতে হয়। আমরা যদি বাঁচিতে চাই—মুক্তি পাইতে চাই, তবে সে শুভ সময় আনিবার জন্য, মহাপুরুষের আবির্ভাবের জন্য আমাদিগকে পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

মহামতি নানক যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জন্য ক্ষেত্র রচিত হইতেছিল। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে গোরক্ষনাথ ও কবীরের চেষ্টায় আপাঞ্জাব হিন্দুস্থান ধর্ম্মপ্রেমে মত্ত ছিল। *

নানক শিখধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক। তিনি আজীবন ঈশ্বর-প্রেমী ছিলেন। বাল্যকালে ঈশ্বর-চিন্তাই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। যৌবনে সেই প্রেমের বশেই সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন। ঈশ্বর-সেবা করিয়াই জীবন কাটাইয়াছিলেন।

পঞ্জাবের লাহোর প্রদেশে ভট্টি জিলার অন্তর্গত তালবান্তি † গ্রামে সূর্য্য-বংশসম্ভূত কালুবেদীর ঔরসে ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে নানক জন্মগ্রহণ করেন। ‡ তাঁহার

* চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গোরক্ষনাথ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবীর ধর্ম্মজগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

† পঞ্জাবে দুইটী তালবান্তি গ্রাম বর্ত্তমান আছে। যেটি ইরাবতীর তীরে অবস্থিত, নানক সেই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ম্যালকম্ সাহেব ভুলক্রমে বিপাশার তীরবর্ত্তী তালবান্তির নাম করিয়াছেন। নানকের জন্মস্থান আজকাল 'নানকাণা' নামেও পরিচিত। এখানে একটি গুরুদরবার আছে। ইহা শিখদের একটি তীর্থ।

‡ নানকের দুইটি জনমশাখী আছে। একটি অপরটির অনুকৃতি মাত্র।

পিতা কালু একজন সামান্য ব্যবসায়ী ছিলেন। * পুত্রকে সেই কার্য্য শিখাইবার জন্য তিনি যথেষ্ট প্রয়াস পান। কিন্তু নানক ত' ব্যবসায় করিবার জন্য জন্মেন নাই,—তিনি মহৎকার্য্যের জন্য জন্মিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমানকে একসূত্রে বাঁধিয়া ভারতের ধর্ম্মভাব প্রবল মাত্রায় জাগরিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং পুত্র ব্যবসায় শিখিলেন না।

বাল্যকাল হইতে নানক অত্যন্ত চিন্তাশীল ও ঈশ্বর-পরায়ণ হওয়ায়, পিতা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। সাথী বালকদের সহিত মনের ভাব না মিলায় তিনি প্রায়ই নির্জ্জনে সময় ক্ষেপণ করিতেন। কাজেই নানককে সংসারী করিবার জন্য পিতা উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। একদিন তিনি নানককে কতকগুলি টাকা দিয়া বলিলেন, অমুক স্থান হইতে লবণ কিনিয়া অমুক স্থানে বিক্রয় করিয়া আইস। নানক টাকা লইয়া বাহির হইলেন। সঙ্গে চাকর বালা রহিল। এই বালা পরে তাঁহার একটি প্রধান শিষ্য হইয়াছিল। সে যাহা হউক, যাইতে যাইতে নানক দেখিলেন যে, কতকগুলি ফকির অনাহারে কষ্ট পাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তাহারা তিন দিন কিছু মুখে দেয় নাই। তখন তিনি বালাকে বলিলেন—"আজ টাকা লইয়া যে লাভ করিতে যাইতেছি, তাহা পার্থিব লাভ। পার্থিব লাভ ক্ষণস্থায়ী। আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, এই অর্থ দিয়া উহাদের উদর-জ্বালা নিবারণ করি। ইহাতে যে লাভ হইবে, তাহা পারলৌকিক, তাহাই অসীম।" বালা নানকের প্রস্তাবে মত দিলে নানক সাদরে সেই অর্থ ব্যয় করিয়া ফকিরদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন, এবং ফকিরেরাও আহারান্তে তাঁহাকে লইয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্ষণকাল অতিবাহিত হইলে, নানক রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিলেন। পিতা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কত লাভ হইল?" পুত্র সাহ্লাদে উত্তর করিলেন—"বাবা! সে অর্থ ফকিরের সেবায় ব্যয় করিয়াছি। পার্থিব লাভ লইয়া কি করিবেন, আপনার জন্য অপার্থিব লাভ আহরণ করিয়াছি।" পিতা, পুত্রের এরূপ আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহাকে নানারূপ তিরস্কার ও এমন কি প্রহারও করিলেন। †

কিন্তু তাহা হইলেও স্থানে স্থানে কিছু প্রভেদ দেখা যায়। প্রথমটিতে দেখা যায় যে, তিনি বৈশাখ মাসে ও দ্বিতীয়টির মতে কার্ত্তিক মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

* ইহার কিঞ্চিৎ জমীজমাও ছিল। সে কালের প্রায় সকল লোকেরই এরূপ জমীজমা থাকিত।

† জনমশাখীতে দেখা যায় যে, পিতা কালু নানককে কুড়ি টাকা দিয়া-

ভট্টিবংশীয় রায়বুলার তখন ঐ জেলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। একদিন তিনি পথ দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দেখেন যে, মাঠে একটি রাখাল নিদ্রিত রহিয়াছে। তাহার মুখে সূর্য্যের তেজঃ আসিতেছে। কিন্তু একটি সর্প তাহার চক্র দিয়া, যাহাতে তাহার মুখে রৌদ্র না আসে, তাহার চেষ্টা করিতেছে। ঐ ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া তিনি কৌতূহল পরবশ হন ও রাখালের পরিচয় লয়েন। তাহাতে জানিতে পারেন যে, রাখালের নাম নানক। পরে নানকের ঐ ফকির-সেবার কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, তিনি অত্যন্ত প্রীত হন ও বুঝেন যে, এই বালক, কালে একজন মহাশয় ও জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি হইবেন। তিনি নানকের বাটী আসিয়া কালুকে তাঁহার ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন ও দুই হাত তুলিয়া নানককে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলেন। এ দৃশ্য দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া গেল। *

ছিলেন। পঞ্জাবের ইতিহাস-সঙ্কলয়িতা সৈয়দ মহম্মদ লতিফ মহাশয় চল্লিশ টাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। লতিফ বলেন যে, নানকের পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে এ ঘটনা ঘটে।

জনমশাখীতে এই ব্যাপারটি বেশ বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। তাহা পাঠে দেখা যায় যে, নানক ফকিরদের আহার করাইতে চাহিলে তাঁহারা প্রথমে অস্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে শেষে আহারে বাধ্য হন।

কেহ কেহ বলেন, বালা, নানকের এ কার্য্যে বাধা দানের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। বরং জনমশাখীতে দেখা যায় যে, বালা নানকের প্রস্তাবে সম্মতিই দিয়াছিলেন। আর যদি বালা সম্মতি না দিতেন তবে বালক নানক এতটা সাহস করিতে পারিতেন কি না সন্দেহস্থল। তিনি যতই সংসার-বিরাগী হউন না, পিতার অবাধ্য ছিলেন না।

নানক যে স্থানে ফকিরদের আহার করাইয়াছিলেন, সে স্থান শিখদের নিকট বড়ই পবিত্র। 'খারা সাওদা' নামে তাহা পরিচিত।

* প্রথম জনমশাখীতে দেখা যায় যে, ইহা নানকের নয় বৎসর বয়সের সময় ঘটে। কিন্তু অন্যান্য বিবরণে দেখা যায় যে, তাঁহার কৈশোর অতিক্রমে ইহা ঘটিয়াছিল। ফলতঃ সময়টা ঠিক্ করিয়া বলা যায় না। কিন্তু এ ঘটনাটি স্মরণ রাখিবার জন্য শিখেরা উক্ত রঙ্গস্থলে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছে। Latif's History of the Panjub. p. 248.

এরূপ ঘটনাতে অবিশ্বাস স্থাপনের কোন কারণ দেখা যায় না। ইতিহাসে এরূপ ঘটনার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। নূরজাহানের বৃত্তান্ত ত' সকলে জ্ঞাত আছেন। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে 'প্রদীপে' এরূপ দুইটি ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছিল। একবার ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্ব্বর্ত্তী কোন গ্রামে একটি

নানকের একটী ভগ্নী ছিল, তাহার নাম নানকী। দৌলত খাঁ * লোদীর গোলাধ্যক্ষ জয়রামের সহিত নানকীর বিবাহ হইয়াছিল। কালু এখন পুত্রকে কার্য্য শিখাইবার জন্য ও মন ফিরাইবার জন্য জয়রামের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নানক সুলতানপুরে যাইয়া ভগ্নীপতির সহিত কার্য্যে মনোযোগ দিলেন। কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে নানকের অবহেলা ছিল না; তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। কিন্তু এরূপ পার্থিব কার্য্যে তাঁহার তৃপ্তি ছিল না; ঈশ্বরের কথা ভাবিতে পারিলেই তাঁহার মনে শান্তি আসিত। নানক কার্য্যক্ষেত্রে যাইয়া সকলকে পরিতুষ্ট করেন। † তাঁহার সহিত যাহারা কার্য্য করিত, তাহারা সকলেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিল। নানক স্বাধীন ভাবেই কার্য্য করিতে পারিতেন। তাঁহার কার্য্য কথা শুনিয়া দৌলত খাঁ কিছু চিন্তিত হন, ভাবেন—বালক বুঝি বাজে খরচ করিয়া অনর্থক টাকা উড়াইয়াছে। এই বিশ্বাসে নানকের হিসাব পরীক্ষা করিতে যাইয়া দৌলত আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। বালক এত গুছাইয়া কাজ করিল কিসে! হিসাবে দেখা গেল, ব্যয় বাদে যাহা থাকার আশা করা যায়, তাহা অপেক্ষা তিন শত একুশ টাকা বেশী রহিয়াছে।

এরূপ সন্তোষের সহিত কার্য্য করিয়া নানক যখনই সময় পাইতেন, তখনই ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। তাঁহার এ ভাব দেখিয়া ভগ্নী নানকী কতদিন তাঁহাকে অনুযোগ করিয়াছে; কিন্তু স্থির চিত্ত কখন টলে না। মুক্ত বাতাস পাইবার জন্য বালকের প্রাণ সর্ব্বদাই অস্থির হইত। দিন দিন পুত্রের এরূপ ভাবান্তর হইতেছে দেখিয়াও স্নেহময় পিতা কালু পুত্রের আশা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী লাখোকীর অধিবাসী মূলা নামক জনৈক ক্ষত্রিয়ের কন্যা সুলক্ষীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন। এ বিবাহ যখন হয়, তখন নানকের বয়স প্রায় বিশ বৎসর হইবে। ‡

রমণী রন্ধনে নিবিষ্ট আছেন, এমন সময় একটি সর্প তাঁহাকে একেবারে জড়াইয়া উঠিয়াছিল। শেষে সাপটি নিজেই ছাড়িয়া যায়। আবার একবার এক এণ্ট্রান্স স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শিশুপুত্রকে ঐরূপ সাপে জড়াইয়াছিল। বালক মেজেয় শুইয়া ঘুমাইতেছে, এমন সময় একটি কেউটে সাপ আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। শেষে আপনিই ছাড়িয়া চলিয়া যায়।—প্রদীপ, কার্ত্তিক [illegible] সাল। তৃতীয় বর্ষ।

* পরে ইনি পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

† জনমশাখী।

‡ কেহ কেহ বয়সের একটু গোল করিয়া ফেলিয়াছেন। লতিফ ষোল বৎসর

বিবাহ হইল বটে; কিন্তু নানক তাহাতে সুখী হইলেন না। তাঁহার মন আরও খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু কি করিবেন, বাঁধা পড়িয়াছেন। কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছায় আবার কার্য্যে মন দিলেন। এইরূপে কয়েক বর্ষ সুখে দুঃখে কাটিয়া গেল। বত্রিশ বর্ষ বয়সে নানকের একটি পুত্র জন্মে। পুত্রের নাম হইল—শ্রীচাঁদ।

পুত্র হইল, সংসার বন্ধন আরও দৃঢ় হইল। কিন্তু নানক, বোধ হয়, ভাবিলেন, এইবার তাঁহার পিতৃঋণ শোধ হইল, এখন তিনি কতকাংশে মুক্ত। যাহা হউক, এইরূপ ভাবে আরও চারি বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতঃকালে তিনি স্বভাব-সুলভ চিন্তামগ্ন আছেন, এমন সময় জনৈক মুসলমান ফকির তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন—"হে নানক! কি ভাবিতেছ? এ সব কার্য্য ত্যাগ কর, পারলৌকিক অনন্তধনের প্রত্যাশী হও।" এই কথা শুনিয়া যুবকের মনে কি এক নবীন তেজঃ আসিল, এতদিনে তিনি পথ খুঁজিয়া পাইলেন। যখন মানুষ কোন বিষয় ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া সন্দেহ-দোলায় দুলিতে থাকে, তখন অপরের একটি মাত্র কথায় তাহার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়, ভবিষ্যতের সমস্ত রহস্য তাহার চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। শুনা যায়, লালাবাবুও নাকি এরূপ একটি কথায় জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক, ফকিরের কথায় নানক তাঁহার আদর্শ খুঁজিয়া পাইলেন। যুবক সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ করিয়া গোলার শস্যগুলি দরিদ্রদিগকে দান করিলেন ও তিন দিন একটি জলাশয়ের ধারে বাস করিলেন। এই তিন দিন তিনি গভীর সমাধিতে কাটাইয়া দেন। শুনা যায়, এই সময় ধার্ম্মিক খিজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

গোলা শূন্য হইয়াছে শুনিয়া দৌলত খাঁ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং জয়রামকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। * নানক এই সংবাদ পাইয়া সত্বর

বয়সের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ অনুমানের মূল কোথায় জানি না। আমরা জনম-শাখী গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ দেখি যে, ১৫৪৫ সম্বতে নানকের বিবাহ হয়। নানকের জন্ম ১৫২৬ সম্বতে হইয়াছিল। কাজেই প্রায় কুড়ি বৎসর হয় না কি?

* Vide History of the Punjab, and the rise, progress and present erudition of the sect and Nation of the sikhs.—Published by H. Allen and Co. to London in 1846.

দৌলতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন যে, জয়রাম ইহার জন্য আদৌ দোষী নহে, গোলার জন্য তিনিই দোষী। কাজেই জয়রামের ও নানকের হিসাব পরীক্ষা করা হইল; পরীক্ষায় জয়রাম নির্দোষ প্রতিপন্ন হইল। নানকের জনমশাখীতে দেখা যায়, এবারও হিসাবে নানকের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, এবারও হিসাবে অধিক টাকা দেখান হইয়াছিল। * তখন দৌলত খাঁ জয়রামকে মুক্তি দিলেন ও আবার তাহাকে তাহার পূর্ব্বপদে অধিষ্ঠিত করিয়া সস্নেহ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অতঃপর নানক ফকিরী অবলম্বন করেন। তাঁহার এই গৃহত্যাগের তিন মাস পরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র লক্ষীদাস জন্ম গ্রহণ করে।

নানক অতঃপর সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। † এই সময় সিংহল দ্বীপের রাজা শিবনাভি তাঁহাকে ধর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা পান— সুখাদ্য, ভাল ভাল কাপড়চোপড়, সুন্দরী রমণী প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে লুব্ধ

* এবার হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, নানক ৭৫০৲ টাকা নবাবের নিকট পাইবেন। সেই টাকা যাহাতে তাঁহার স্ত্রীপুত্রেরা পান, এজন্য তাঁহার শ্বশুর মূলা নবাবের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু নবাব বলেন যে, নানক সে টাকা ফকিরদের দিতে বলিয়াছেন। ইহাতে মূলা বলেন 'নানক পাগল হইয়া গিয়াছেন। কাজেই টাকা তাঁহার স্ত্রীপুত্রদের প্রাপ্য।' নবাব উত্তর করিলেন—'নানক যদি বাস্তবিকই পাগল না হইয়া থাকেন, তবে সে টাকা ফকিরদেরই দেওয়া হইবে।' পরে নবাবের অনুমতি মত মূলা নানকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন—উভয়ের অনেক ধর্ম্ম কথাবার্ত্তা হইল। মূলা সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়া যথাযথ ঘটনা বিবৃত করিলেন। নবাব কি করিবেন, ভাবিয়া বড় মুস্কিলে পড়িলেন তিনি জয়রামকে ডাকাইলেন। সেও কোন সৎপরামর্শ দিতে পারিলনা। কাজেই নানককে ডাকা হইল। নানক আসিলে টাকার কথা উত্থাপন করা হয়। নানক বলেন—'আমি যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছি, এখন আপনি যাহা বুঝেন, করুন।' ইহাতে সকলের মত লইয়া নবাব সেই টাকার অর্দ্ধেক নানকের স্ত্রীপুত্রদের ও অপরার্দ্ধ ফকিরদের দিলেন।—দ্বিতীয় জনম শাখী—১৭ শাখী। Hughes (T. P.) সাহেব তাঁহার A Dictionary of Islam গ্রন্থের ৫৮৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, নানক দৌলতের অধীনে কাজ করিবার কালে যাহা কিছু বেতন পাইতেন, তাহা হইতে আপনার ভরণ পোষণের অংশ মাত্র রাখিয়া সমস্ত ফকিরদের বিলাইয়া দিতেন।

† নানক পাঁচবার ভ্রমণে বহির্গত হন। প্রতিবার ভ্রমণের শেষে এক একবার গ্রামে ফিরিতেন; কিন্তু বাড়িতে থাকিতেন না। তাঁহার প্রথম ভ্রমণ

করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু নানক তৎপ্রদত্ত কোন প্রলোভনেই মুগ্ধ হন নাই। ইহাতে তাঁহার চরিত্রের ধৈর্য্য ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার রীতিমত পরীক্ষা হইল। তিনি রাজাকে পারলৌকিক জীবনের কথা বুঝাইতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে রাজাকে স্বীয় মতে দীক্ষিত করিয়া লয়েন। সিংহলে তিনি দুই বৎসর পাঁচ মাস বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে অবস্থান কালে শিষ্যদের উপদেশ দিবার জন্য 'প্রাণ সাংলী' রচনা করেন। পরে ইহা আদি গ্রন্থে প্রথমে সন্নিবিষ্ট হয়। পরে নানক সমস্ত হিন্দুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া পারস্য হইয়া মক্কায় ও মদিনাতে উপস্থিত হন। মক্কাতে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। একদিন তিনি একটি মসজিদের নিকট নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময় একটি মোল্লা রাগত ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি কোন সাহসে দেব-মন্দিরের দিকে পদ রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছেন? নানক উত্তর করিলেন—যে দিকে দেব-মন্দির নাই, এমন দিকে আমার পা সরাইয়া দাও। মোল্লা তাঁহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। ভাবিলেন, বাস্তবিকই ত সর্ব্বদিকে ঈশ্বরের মন্দির। তিনি তখনই নানকের পদচুম্বন করিয়া তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। এই মোল্লার নাম রুকুনুদ্দিন। *

শুনা যায়, নানক স্তাম্বুল পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সেখানে তুর্কীর সুলতানের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। নানকের গুণে সুলতান মুগ্ধ হইয়া প্রজাদের প্রতি সুবিচারে মন দেন। সুলতান তদবধি ফকিরদের আদর যত্ন করিতেন।

ভ্রমণের কালে নানকের অনেক সঙ্গী ছিল, তন্মধ্যে গায়ক মর্দ্দানা, দাস বালা, ভক্ত লহনা ও রামদাসই প্রধান। নানক ঈশ্বরের উদ্দেশে যে সকল গীত রচনা করিতেন, মর্দ্দানা সেই সকল সুর-তান-লয়ে গাহিয়া নানকের প্রাণ মাতাইয়া তুলিতেন।

পূর্ব্বদিকে হইয়াছিল। এসময় তিনি বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশে ঘুরিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ভ্রমণে দক্ষিণ দিকে যান ও সেই সময় সিংহলে উপস্থিত হন। তৃতীয় ভ্রমণ উত্তর দিকে হইয়াছিল। এই সময় কাশ্মীরে এক পণ্ডিতের সহিত তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ হয়। পণ্ডিত তাঁহার ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার চতুর্থ ভ্রমণ পশ্চিমে মক্কাভিমুখে হইয়াছিল। তাঁহার পঞ্চম ভ্রমণ 'গোরিকহত্রি' তে হইয়াছিল। এখানে অনেক সিদ্ধ মহাত্মাদের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। এই গোরিকহত্রি কোথায়, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

* সৈয়দ মহম্মদ লতিফের History of the Punjab. p. 245.

নানক যখন এইরূপ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, সেই সময় ভারতবর্ষে একটি মহা রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়। তাহাতে ভারতবর্ষ হইতে পাঠান রাজ্যের উচ্ছেদ হইয়া মোগল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বাবরই মোগলবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাবর দিল্লীর লুণ্ঠনকারী তৈমুরের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ। তাঁহার পিতা সেখ মির্জ্জা জাক্সারতীস নদীর তীরস্থ ফরগণা রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই বাবর যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সমর-খণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম অভিযান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিন তিনবার চেষ্টা করিয়াও তাহা অধিকার করিতে পারেন নাই। আট বৎসর এইরূপে যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে কাবুল অধিকার করেন, এবং বাইস বৎসর অনবরত যুদ্ধ করিয়া তাহা রক্ষা করেন। তার পর তিনি সিন্ধুনদের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলে উজবেক নামা এক জাতি হিংস্র-স্বভাব তুর্কী ও তাতার কাবুল আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে, কাজেই বাবরকে ফিরিতে হইল। তিনি উজবেকদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত ও বিনষ্ট করিলেন। তারপর আবার সমর-খণ্ড জয় করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু আবার অকৃতকার্য্য হন। এইবার ভারতের প্রতি তাঁহার লোলুপদৃষ্টি পড়িল। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচবার তিনি ভারতে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তারপর ১৫২৬ সালে দিল্লীর রাজবংশে গৃহবিচ্ছেদ হইলে তিনি সেই সূত্র ধরিয়া সদর্পে ভারতে প্রবেশ করিলেন। * পাণিপথ ক্ষেত্রে মোগল-পাঠানে প্রবল সংঘর্ষ হইল। এবার বিজয়-লক্ষ্মী বাবরের প্রতি প্রসন্না। বাবর যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী হইতে পাঠানবংশের উচ্ছেদ ও মোগল বংশের প্রতিষ্ঠা হইল।

হিন্দু রাজন্যেরা ভাবিয়াছিলেন যে, তৈমুর যেমন ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিলেন, এবং লুণ্ঠন করিয়াই স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন, বাবরও সেইরূপ করিবেন। তাই তাঁহারা পাণিপথ যুদ্ধে পাঠানদের সাহায্য করেন নাই। কিন্তু বাবর ত লুণ্ঠনের জন্য ভারতে আসেন নাই, তিনি সুবিধা হইলে এখানে স্বরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, বাবর যাইবার নাম করেন না, ভারতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন, তখন তাঁহারা সমবেত হইয়া মিবারেশ্বর সংগ্রামসিংহকে নেতৃপদে বরণ করিয়া বাবরের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে কার্ত্তিক মাসের পঞ্চম দিবসে বিয়ানার

* J. C. Marshman's History of India.

নিকটবর্ত্তী কন্নুয়া নামক স্থানে হিন্দু-মোগলের সাক্ষাৎ হইল। তথায় যে ভীষণ যুদ্ধ হইল, তাহাতে বাবর ভীষণ ভাবে পরাজিত হইলেন ও তাঁহার সৈন্যগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। * ইহার সপ্তাহ খানেক পরে বাবর মিবাররাজের সহিত সন্ধি করিতে সমুৎসুক হইয়া উঠিলেন। "রাইসীন প্রদেশের অধিপতি তুয়ার বংশীয় শিলাইদি এই সন্ধিবন্ধনের মধ্যস্থ হইলেন। মীমাংসা হইল, দিল্লী ও তদন্তর্ভূক্ত প্রদেশগুলি বাবরের অধীনে থাকিবে, পীলাখালা উভয়রাজ্যের সীমারেখা স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। রাণাকে বাবর বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিবেন।" †

সন্ধি হইল বটে; কিন্তু তদনুসারে কার্য্য হইল না। অচিরে আবার সমরাগ্নি জ্বলিল। ১৬ই মার্চ্চ তারিখে সিক্রীতে হিন্দু-মোগলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। মোগলেরা যায় যায়, এমন সময় বিভীষণ-প্রকৃতি শিলাইদি আপন অধীনস্থ সেনাদল লইয়া বাবরের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। শিলাইদির উপর সম্মুখ-রক্ষী সেনাদল পরিচালনের ভার ছিল। তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতায় হিন্দুর আশা ভরসা সমস্তই নষ্ট হইল—তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও অবশেষে পরাজিত হইলেন।' এ যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহের একটী পদ নষ্ট হয়। ‡

নেতা সংগ্রাম সিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যুদ্ধে হারিলে মিবারে ফিরিবেন না। কাজেই তাঁহার আর মিবারে প্রত্যাবর্ত্তন করা হইল না। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই তিনি স্বর্গস্থ হইলেন। এই সিক্রীর যুদ্ধে রাজপুতের শক্তি এতদূর খর্ব্ব হইয়া গিয়াছিল যে, তদবধি তাঁহারা আর সমগ্র ভারত জয়ের আশা করিতে পারেন নাই।

এইরূপ ভীষণ যুদ্ধের পর মোগল বংশ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু পাঠানেরা ছাড়িবার পাত্র নহে। হুমায়ুনের রাজত্বকালে তাহারা আবার এত বলশালী হয় যে, তাঁহাকে ভারত হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু পাঠানদের কপাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহারা আবার রাজ্য পাইয়াও রক্ষা করিতে পারিল

---

* Marshman and Todd's Rajasthan.

† রাজস্থান—বসুমতী সংস্করণ।

‡ সংগ্রাম সিংহের অপর নাম সঙ্গ। পূর্ব্বে রাজ্য-লোলুপ ভ্রাতা পৃথ্বীরাজের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহার একটী চক্ষু চিরদিনের তরে নষ্ট হয়। পরে ইব্রাহিম লোদীর সহিত যুদ্ধকালে তাঁহার একটি বাহু ছিন্ন হইয়া যায়। আর আজ এই যুদ্ধে তাঁহার একটী পদ গেল। ধন্য সঙ্গ একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন, সন্দেহ নাই।

না। ১৫৫৬ সালের দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধে আবার মোগলবংশ ভারতের ভাগ্য-বিধাতা হইয়া উঠিল।

যাহা হউক, আমরা আমাদের পূর্ব্ব কথায় প্রত্যাবর্ত্তন করি। নানক কত বর্ষ ধরিয়া পরিভ্রমণ করেন ও কোন্ বর্ষে গৃহে সর্ব্বশেষ প্রত্যাগমন করেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে ভ্রমণের সময় ১৫২৬ সালে মোগল-রাজ বাবরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এ সাক্ষাৎ পাণিপথ যুদ্ধের পূর্ব্বে হয়। বাবরের সহিত নানকের ধর্ম্মচর্চ্চা হয়। নানক দৃঢ়তা ও বাগ্মিতার সহিত স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করেন। বাবর নানকের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পরিপোষণের ভার লইতে স্বীকৃত হন; কিন্তু নানক, তৎপ্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বলেন—যিনি সকল জীবের আহারের সংস্থাতা, তিনিই আমার আহার যোগাইবেন। সাধু ও ধার্ম্মিকগণ কেবল তাঁহারই নিকট দান বা পুরস্কার লয়েন। *

এই পরিভ্রমণের সময় তিনি হিন্দুর বেদ ও শাস্ত্রাদি এবং মুসলমানের কোরাণ পাঠ করেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হয় না। কোন পুরোহিত কিম্বা সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলেই তিনি—ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, সুখের পথ কোথায় প্রভৃতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে সদুত্তর দিতে পারেন নাই। †

নানাদেশ পরিভ্রমণের পর অনেক অভিজ্ঞতা লইয়া নানক আবার সংসারী হইলেন। সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন ও এই ভাবে জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া দিলেন। যখন তিনি বতালায় গিয়াছিলেন, সেই সময় কয়েকজন যোগী তাঁহাকে বলে যে, তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাহা অধর্ম্ম। তাহারা তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় ও আপনাদের শক্তির প্রমাণ স্বরূপ কতকগুলি যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করে। নানককেও তাঁহার যাদুবিদ্যা দেখাইতে বলে। তাহাতে নানক বলেন—"ধর্ম্ম-প্রচারকের পবিত্রতা স্বরূপ ধর্ম্মই যথেষ্ট; আত্মমত সমর্থনের জন্য অন্য কিছু সাহায্যের দরকার নাই। এ জগৎ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু (পবিত্রতাময়) স্রষ্টা অপরিবর্ত্তনীয়।" ‡

* একবার বাবরের একটি অভিযানের সময় কয়েকটি শিষ্যসহ নানক ধৃত হইয়া বাবরের নিকট নীত হইয়াছিলেন। Latif's Panjab. and Allen and Co's Panjab.

† Cunningham's (T. D.) A History of the Sikhs.

‡ Allen and co's punjab.

মুলতানে অনেকগুলি মুসলমান ফকির একত্রিত হইয়াছিলেন জানিয়া নানক বতালা হইতে তথায় যান। সেখানে তাঁহাদের ধর্ম্মচর্চ্চা হয়। এক্ষেত্রে আমরা নানকের বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। তিনি মুলতান প্রদেশে প্রবেশ কালে বলিয়াছিলেন—"ক্ষুদ্র গঙ্গা নদী যেমন মহাসাগর দর্শনে যায়, আমিও সেইরূপ এই পীরপূর্ণ দেশে ছুটিয়া আসিয়াছি।" *

এস্থান হইতে তিনি কর্ত্তার পুরে গমন করেন। এইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এখানে নানকের একটি সমাধিমন্দির আছে। কিন্তু আদি মন্দির বর্ত্তমান নাই; ইরাবতীর † খরস্রোতে তাহা অনেক দিন হইল ভাঙ্গিয়া ধসিয়া গিয়াছে; এখন তাহার আর চিহ্নমাত্র নাই। যাহা হউক কর্ত্তার পুর তদবধি শিখদের তীর্থ হইয়াছে। যাত্রীদের এখানে নানকের একখানি বস্ত্রখণ্ড প্রদর্শিত হয়।

শুনা যায় যে, নানকই এই সহরের স্থাপয়িতা। এখানে তিনি একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে ধর্ম্মশালা আজও বর্ত্তমান আছে।

একখানি গুরুমুখী পুস্তক বলে যে, নানক সাত বৎসর পাঁচমাস সাত দিন মাত্র প্রচারক ছিলেন। ‡ কিন্তু শিখ ইতিহাসপ্রণেতা ম্যাক্‌গ্রেগর সাহেব বলেন যে, নানক ষাট বর্ষ পাঁচ মাস সাত দিন গুরুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ কথা সত্য হইলে বলিতে হয়, নানক তাঁহার একাদশ বর্ষ বয়স হইতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। বাস্তবিক কিন্তু তাহা হয় নাই। আমাদের মনে হয়, যদি তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের কাল হইতে গণনা করা হয়, তবে দেখা যায় যে, তিনি প্রায় তেত্রিশ বৎসর গুরু ছিলেন। বোধ হয়, ইহাই ঠিক। §

যাহা হউক, বাবা নানক ৭০ সপ্ততি বর্ষ ইহসংসারে থাকিয়া ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় তাঁহার শিষ্যসংখ্যা অতি নগণ্য ছিল। কিন্তু আজ এই শিষ্য বা শিখ সম্প্রদায় একটি প্রবল জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহামতি নানক কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, আজ তিনি যে ধর্ম্মের প্রচার করিতেছেন, সেই ধর্ম্মবলে কালে ভারতবর্ষে এক মহাশক্তিশালী শিখসম্প্রদায়ের

---

* Cunningham's Sikhs.

† Ravi—রাভী।

‡ Cunningham's Sikhs.

§ Nanak reinged as Gooroo sixty years five months, and seven days—M. Gregor's History of the Sikhs. Hughes সাহেব বলেন, নানক ৩৪ বৎসর গুরু ছিলেন। ইনি অনেকটা আমাদের মতের পরিপোষক।

আবির্ভাব হইবে।* তিনি ধর্ম্মক্ষেত্রে—যখন দেশে ধর্ম্মান্দোলনই প্রবল, তখন জন্মিয়াছিলেন, তাই কেবল ঈশ্বর সেবার কথাই প্রচার করেন; কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী গুরুরা কেবল ধর্ম্মক্ষেত্রে জন্মেন নাই, তাঁহারা দেশের পরাধীন অবস্থায়—যখন লোকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মস্রোত রোধ করিবার চেষ্টা হইতেছিল, সেই সময় জন্মিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের মতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাই তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন—'ধর্ম্ম কেবল ঈশ্বরসেবায় নয়, দেশের সেবাও ধর্ম্ম।' তাই তাঁহারা ক্রমে দেশের রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। †

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূজা

জননি, জননি, কত কাল হ'তে
ঘুমের ঘোরে
চরণ তোমার চেয়েছি পূজিতে
নয়ন লোরে!
জানে না সাধক দেবতা কোথায়,
মগন তথাপি তাঁহারি সেবায়
জীবন ধরে—
তেমতি পূজিতে চেয়েছি তোমায়
ঘুমের ঘোরে!

জননি, জননি, কত কাল হ'তে
বীণার তারে
করুণা তোমার চেয়েছি গাইতে
করুণ সুরে!
ছোট শিশু অই অফুট ভাষায়
কত কি কামনা সতত জানায়
জগত-দ্বারে—
তেমতি গাইতে চেয়েছি তোমায়
বীণার তারে।

* শিখশব্দ সংস্কৃত শিষ্য শব্দেরই অপভ্রংশ মাত্র। উত্তর ভারতে অনেকে 'ষ'কে 'খ'এর ন্যায় উচ্চারণ করে। কাজেই তাহারা 'শিষ্য'কে 'শিখ্য' বলে। গুরুমুখীতে শিখ্যকে শিখ বলা হইয়াছে।

† আমরা এখণ্ডে গুরুদের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব না, সাধারণ ভাবেই সব কথা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। 'শিখ-গ্রন্থ' নামে পরবর্ত্তী খণ্ডে গুরুদের প্রত্যেকের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব ও সেই সঙ্গে ভারতের ধর্ম্মবিপ্লব তত্ত্ব বুঝিতে প্রয়াস পাইব।

জননি, জননি, কত কাল হ'তে
দিবস-রাতি
বর-তনু তব চেয়েছি সাজাতে
কুসুম গাঁথি।
প্রবাসী পতির মোহন মূরতি
সতী মনে মনে সাজায় যেমতি—
ধেয়ানে মাতি'—
সাজাতে তোমায় চেয়েছি তেমতি
দিবস-রাতি।

আজিকার মত তোমায় এমনি
বুকের কাছে
পাইনিত আর কখনো জননি,
জীবন মাঝে।
মনে হয় আজ এতকাল ধরি
যাপিয়াছি শুধু ছেলে-খেলা করি—
সকাল সাঁঝে—
আরত তোমায় পাইনিগো হেন,
বুকের কাছে!

আবেশের পূজা টুটেছে জননি,
ভেঙেছে ভুল—
থামায়ে দিয়েছি করুণ রাগিণী,
ছেড়েছি ফুল।
আজ শুধু দিয়ে হিয়ার শোণিত,
আজ শুধু গেয়ে সংগ্রাম-গীত,
চরণ-মূল
পূজিব জননি, ধারণা-অতীত
ভুলিয়া ভুল।

আর তুমি মাগো, ছায়ার মতন
নহত দূরে—
রাজিছে তোমার কমল-আসন
হৃদয় জুড়ে।
নিজ হাতে আজ লওমা আমার
সকল সাধনা পূজা উপচার
সফল করে—
ছায়ার মতন আজ তুমি আর
নহত দূরে।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বঙ্গভাষা।

—(•)—

সাহিত্যের উন্নতিতে যেমন জাতীয় উন্নতি, তেমনই ভাষার উন্নতিতে সাহিত্যের উন্নতি হইয়া থাকে। ভাষা যতই বিশুদ্ধ, যতই ব্যাকরণানুসারিণী হইবে, ততই তাহার উন্নতি সংসাধিত হয়। অনেকে মনে করেন, ব্যাকরণের সঙ্কীর্ণ-গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ভাষা যতই স্বেচ্ছানুসারিণী হইবে, ততই তাহার প্রসারতা বর্দ্ধিত এবং তাহা নিত্য নবভূষায় সজ্জিত হইতে থাকিবে। সেই সর্ব্বতোমুখী

অবাধসঞ্চারিণী ভাষাই সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে প্রকৃষ্ট সহায়। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যেমন সমাজ ছাড়িয়া মানুষ থাকিতে পারে না, থাকিলেও তাহাতে সংসারের উন্নতি হয় না, বরং বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তেমনই ব্যাকরণ ছাড়িয়া ভাষা একপদও অগ্রসর হইতে পারে না, হইলে তাহার অবনতি অবশ্যম্ভাবিনী। দেহের সহিত জীবনের যেরূপ সম্বন্ধ, ভাষার সহিত ব্যাকরণেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। ভাষা দেহ, ব্যাকরণ তাহার প্রাণ।

কিন্তু অনেকেই এখন ভাষাকে প্রাণহীন করিতে বা দেখিতে সমুৎসুক। তাঁহারা বঙ্গ ভাষার মধ্যে একটা বিকট পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া আপনাদিগকে চিরস্মরণীয় করিতে অভিলাষী। ইহাতে ভাষার গৌরবের হ্রাস কি বৃদ্ধি হইবে, সে দিকে তাঁহাদের বড় একটা দৃষ্টি নাই; তাঁহারা কেবল পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী। কিন্তু এরূপ পরিবর্ত্তনে যে ভাষার সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে, তাহার উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর বোধ হয় তাঁহাদের নাই।

বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী যে ভাষাই হউক না কেন, ব্যাকরণ ছাড়িলে কাহার উন্নতি নাই, অবনতি সুনিশ্চয়। কারণ, ব্যাকরণের বন্ধন আছে বলিয়াই সর্ব্বত্র ভাষার সমতা আছে, স্থানবিশেষে কথিত ভাষার মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকিলেও লিখিত ভাষার মধ্যে বা সাহিত্যে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু এই ব্যাকরণ ছাড়িয়া দিলে এ সাম্য আর থাকিবে না। তখন যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি সেইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিবেন, অপ্রচলিত অশ্রুত ভাষা লিপিবদ্ধ করিয়া সাহিত্যের মধ্যে একটা বিষম গণ্ডগোল বাধাইয়া দিবেন। তখন এক একজনের ভাষা বুঝিবার জন্য এক একখানি স্বতন্ত্র অভিধান ও ব্যাকরণের প্রয়োজন হইবে, ছাত্রগণ একজনের পুস্তক বা অভিধান পাঠ করিয়া ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে পারিবে না, সে জন্য তাহাদিগকে প্রত্যেকের ভাষা, ব্যাকরণ ও অভিধান কণ্ঠস্থ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও নিষ্কৃতি নাই। দিন দিন যতই নূতন লেখকের আবির্ভাব হইবে, নূতন ভাষাও ততই সৃষ্ট হইতে থাকিবে। এইরূপ নূতন নূতন সৃষ্টির ফলে ভাষার পরিণাম কিরূপ হইবে, তাহা চিন্তা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, বঙ্গভাষার এরূপ পরিণাম—এরূপ সর্ব্বনাশ যেন কখনও না ঘটে।

দূর ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান লইয়া দেখিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের কল্পনা নিতান্ত অমূলক নহে। বর্ত্তমানেও অনেকেই ভাষা লইয়া এইরূপ একটা গোলযোগ বাধাইবার চেষ্টায় আছেন। কেবল চেষ্টা নহে,

কেহ কেহ কার্য্যক্ষেত্রেও অগ্রসর হইয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা অন্য জনৈক লেখকের ভাষা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সম্প্রতি 'প্রবাসী'তে "সূর্যাদির পর্যায়ের অর্থ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার লেখক শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়, সাং কটক। উপরে সূর্যাদির ও পর্যায়ের এই স্থলে 'য'ফলার অভাব দেখিয়া অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, আমরা ভুল লিখিয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক উহা আমাদের ভুল নহে, লেখকই এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। কেবল একস্থানে নহে, প্রবন্ধের সর্ব্বত্রই ঐরূপ প্রয়োগ। আরও লেখক কেবল য ফলাকে নিষ্ফলা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতায় অনেক ফলারই মুণ্ডপাত হইয়াছে। এবং অনেক নূতন নূতন শব্দ আসিয়া তাঁহার ভাষার ও প্রবন্ধের কলেবর অলঙ্কৃত (বা কলঙ্কিত) করিয়াছে। আমরা ক্রমশঃ তাহাদের উল্লেখ করিতেছি।

ব্যাকরণের মতে রেফসংযুক্ত হইলে শ ষ স ও হ ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয়। যদিও ইহা বৈকল্পিক অর্থাৎ দ্বিত্ব হইতেও পারে না হইতেও পারে, তথাপি প্রাচীন প্রয়োগানুসারেই ইহার প্রয়োগ অপ্রয়োগ স্থির করিতে হইবে। কারণ প্রাচীন প্রয়োগ বা অভিধানই শব্দ-বিজ্ঞানের মূল। অভিধানে সূর্য্য, আর্য্য, পর্য্যন্ত, পর্য্যায়, কার্য্য, পূর্ব্ব, সর্ব্ব, সর্ব্বদা, দুর্ল্লভ, শর্ব্বরী, মর্ম্ম প্রভৃতি প্রয়োগ আছে, সুতরাং আমাদিগকেও ঐরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে; না করিলে উহা অভিধান-দুষ্ট প্রয়োগ হইবে। আবার বর্ণ, বর্ণনা, কর্ণ, স্বর্ণ, শর্করা প্রভৃতি স্থলে দ্বিত্বের ব্যবহার নাই *, সুতরাং আমাদিগকে ঐরূপ প্রয়োগই করিতে হইবে। অভিধান মানিব না একথা বলা যায় না। কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ অভিধানকেই প্রামাণ্যরূপে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; এবং সন্দেহ স্থলে অভিধানকেই মীমাংসকরূপে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মুগ্ধবোধকার বোপদেব গোস্বামী গ্রন্থশেষে বলিয়াছেন, অভিধানই অর্থাৎ প্রাচীন প্রয়োগই শব্দের নিয়ামক। সুতরাং অভিধান মানিব না বলিলে চলিবে না। ভাষার সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে অভিধানকেই প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

কিন্তু আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক জানি না কি কারণে এই প্রাচীন

---

* প্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় কিন্তু এ স্থলেও দ্বিত্ব প্রয়োগ করেন। 'প্রবাহ' পত্রে প্রকাশিত 'বৈদিকতত্ত্ব' প্রবন্ধে তিনি নির্ণ্ণীত, নির্ণ্ণয়, সম্পূর্ণ্ণ, পর্ণ্ণ, বর্ণ্ণনা, বর্ণ্ণিত প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রবাহ ১ম বর্ষ।

নিয়মের বশবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করেন না। তাই তিনি অবাধে সূর্য্যকে সূর্য, পর্য্যায়কে পর্যায় আর্য্যকে আর্য, পর্য্যন্তকে পর্যন্ত করিয়াছেন। এরূপ অভিধান-দুষ্ট প্রয়োগে তাঁহার কি স্বার্থ আছে তাহা তিনিই বলিতে পারেন, আমরা তো আপাততঃ ভাষার মধ্যে খেচরান্নের সৃষ্টি ব্যতীত ইহার অন্য কোন সার্থকতা দেখিতে পাইলাম না।

কিন্তু ইনি আবার সর্ব্বত্র এক নিয়মের বশবর্ত্তী নহেন। ইনি 'সর্ব্বদা' স্থলে দ্বিত্ববিধান মান্য করিয়া 'সর্ব্বদা' লিখিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্ব, সর্ব্বজ্ঞ, পূর্ব্ব প্রভৃতি স্থলে সর্ব, সর্বজ্ঞ, পূর্ব প্রভৃতি লিখিয়া আপনার স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। পুরূরবা, সরূ প্রভৃতি স্থলে রূ লিখিয়াছেন, কিন্তু নিরূপণ স্থলে রূ লিখিতে নারাজ; সুতরাং সেখানে 'নির্ূপণ' করিয়াছেন। যিনি রূকে দূরীভূত করিয়া র্ূ লিখিতে পারেন, তিনি রু কে র্ু করিলেই তো পারিতেন? বাহুল্যকে বাহ্ুল্য না করিয়া হু রাখিলেন কেন? কিন্তু তাহা হইলে স্বেচ্ছাচার হয় কৈ? শুদ্ধকে শুদ্ধ করিলেন, কিন্তু প্রসিদ্ধকে প্রসিদ্ধই রাখিলেন। শুধ্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে শুদ্ধ, এবং প্রপূর্ব্বক সিধ্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে প্রসিদ্ধ হয়। উভয় পদেই অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে, সুতরাং শুদ্ধের ন্যায় প্রসিদ্ধ করিলেই সকল গোল চুকিয়া যাইত; ভাষাটী সম্পূর্ণ 'বিশুদ্ধ' হইত।

পণ্ডিত স্থলে পংডিত লিখিবার তাৎপর্য্য কি? পন্ড্ ধাতুর উত্তর অন্ প্রত্যয় ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ করিয়া পণ্ডা শব্দ হইয়াছে; পরে তাহার উত্তর ইত প্রত্যয় করায় পণ্ডিত শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইনি পণ্ডিত না লিখিয়া পংডিত লিখিলেন। একবার সন্ধি করিয়া ন স্থানে অনুস্বার করিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার সন্ধি করিয়া ং স্থানে ণ করিতে পারিলেন না। সন্ধি অনিত্য এ আপত্তিও এখানে অসঙ্গত। কারণ একপদ স্থলে সন্ধি অনিত্য নয়—নিত্য। অনিত্য স্বীকার করিলেও কতকটা সন্ধি করিব, কতকটা করিব না ইহা কিরূপ আবদার; সন্ধি অনিত্য বলিয়া তিনি যদি পন্ডিত করিতেন তাহা হইলেও তাঁহার একটা কথা বলিবার সুযোগ থাকিত। তদ্ব্যতীত প্রাচীন অপ্রাচীন কোন অভিধানে কি পণ্ডিত স্থলে পংডিত প্রয়োগ দেখাইতে পারেন? যদি সন্ধির উপরেই এত রাগ তবে তন্নকে তৎন, সংস্কৃতকে সমস্কৃত প্রভৃতি করিলেই তো চলিত? তাহা না করিয়া তন্ন, সংস্কৃত করিলেন কেন?

এতদ্ব্যতীত আশঙ্কা স্থলে আশংকা, বাঙ্গালী স্থলে বাংগালী, অশ্বত্থকে অশ্বৎথ

প্রভৃতি প্রয়োগ দর্শনে বোধ হয়, লেখক মহাশয় এই একটী প্রবন্ধেই ভাষার সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত শেষ করিয়া দিয়াছেন।

আর এক কথা, অবসরকে অবশর করিলেন কিরূপে? অব উপসর্গ পূর্ব্বক সৃ ধাতুর উত্তর অল্ প্রত্যয় করিয়া অবসর শব্দ হইয়াছে। ইহার মধ্যে তালব্য শ কোথা হইতে আসিল? 'যাইতে' ক্রিয়া যা ধাতু হইতে উৎপন্ন; কিন্তু তাহা 'জাইতে' হইল কিরূপে? পরিবর্ত্তন কি এইরূপেই করিতে হয়? ইহা পরিবর্ত্তন-প্রয়াস না অজ্ঞতা?

দুঃখের বিষয়, এই সকল স্বেচ্ছাচার পরায়ণ লেখকগণকে শিক্ষা দিতে কেহই নাই। বঙ্কিম বাবুর অন্তর্ধানের পর হইতে ইঁহারা ভাষার উপর যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়াছেন। এ ব্যাধির চিকিৎসক কি একজনও নাই?

বঙ্গভাষায় যথেচ্ছাচারের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া অনেকদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বলিবার কথা অনেক আছে। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। সুতরাং বারান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। *

শ্রী——

সমালোচনা।

বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত।—(প্রথমভাগ) শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল প্রণীত। প্রকাশক পি, বি, বন্দ্যোপাধ্যায়। ৯ ও ১০ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

বঙ্গসাহিত্যে একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাঙ্গালার ইতিহাসের সম্পূর্ণ অভাব আছে। এমন একদিন ছিল, যখন আমরা ভারতবর্ষের বা বাঙ্গালার ইতিহাসের জন্য বৈদেশিক ইতিহাস-লেখকগণের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতাম। তাঁহারা আমাদের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেন, আমরা তাহাকেই প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া জ্ঞান করিতাম। তাঁহারা বলিলেন, বক্তিয়ার খিলিজি সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া গৌড় জয় করিয়াছিলেন, বঙ্গের শেষনবাব সিরাজদ্দৌলা পাপের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, বাঙ্গালীরা কখনও অস্ত্র ধরিতে জানিত না ইত্যাদি। [illegible] বিনা প্রতিবাদে এই সকল উক্তিকেই সত্য [illegible]

* এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ পাইলে [illegible]

কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী কয়েকজন মনস্বী বঙ্গ-সাহিত্যরথী যখন আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এ সমস্তই অলীক, ভ্রম ও বিদ্বেষপূর্ণ, তখন আমরা প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানের জন্য চেষ্টিত হইলাম। এই চেষ্টার ফলে অনেক নূতন নূতন তথ্য ও সত্য ইতিহাস আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। এখনও আমরা ইতিহাসের অভাব দূর করিতে পারি নাই। ভরসা আছে, কালে এই অভাব দূরীভূত হইবে। এ স্থলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈদেশিকগণ ভ্রম বা বিদ্বেষবশতঃ আমাদের ইতিহাসকে বিকৃতভাবে চিত্রিত করিলেও তাঁহারাই যে আমাদের পথ প্রদর্শক তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা যে মালমসলা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাহারই অধিকাংশ লইয়া আমরা আজ প্রাসাদনির্ম্মাণে অগ্রসর হইয়াছি।

সমালোচ্য পুস্তকখানিও ইতিহাস; ইহাতে প্রাচীন কাল হইতে ১৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস পর্য্যালোচিত হইয়াছে। লেখক যেরূপ প্রভূত পরিশ্রম সহকারে আলোচ্য বিষয়গুলিকে যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অধ্যবসায় ও গবেষণাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। গ্রন্থের ভাষা যেমন সরল তেমনই সুমার্জ্জিত। ইতিহাসের ভাষা এইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থখানি যে সাহিত্য সমাজে আদরের বস্তু হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ খানি প্রথম ভাগ. আমরা ইহার দ্বিতীয়ভাগ দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত রহিলাম।

ছাত্রসখা। (মাসিকপত্রিকা)। ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। পত্রিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহাতে পূর্ণিমা, ভূতত্ত্ব, সদর আলার পরিবার ও নব্যসমাজ, আলোক, আরতি, দুইটী অঙ্ক, লক্ষ্মীবাই, প্রাণিবিজ্ঞান ও ধাঁধা এই ৯টী বিষয় আছে। সুতরাং বিষয়গুলিও যে ক্ষুদ্র হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। তবে ক্ষুদ্র হইলেও বিষয়গুলি ভাল। 'ছাত্রসখা' 'ছাত্রগণের জন্য মাসিকপত্রিকা' বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু ইহা কোন শ্রেণীর ছাত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট তাহা বুঝিলাম না। কারণ, ইহার প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি উচ্চশ্রেণীর ছাত্রের পাঠ্য, কিন্তু অঙ্ক দুইটী নিম্নশ্রেণীর ছাত্রের জন্য। সুতরাং বোধ হইতেছে ইহা উভয় শ্রেণীর জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা ইহা পাঠে অসুখী হইলাম না। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৌষ ১৩১৪।

মিলন-গাথা।

—(০)—

মিলেছি আমরা আজ হিন্দু মুসলমান।
এক মা'র দুটি ছেলে, মা'র কোলে হেলে দুলে,
কর্ত্তব্যের পথে সুখে করে'ছি প্রয়াণ;
ধরা মাঝে সুখী কেবা মোদের সমান॥

বহুদিন—বহুদূরে ছিনু দুই ভাই,
মায়ের করুণ স্বরে, দুটি ভাই হাত ধ'রে,
হরিতে মায়ের দুঃখ মিলিয়াছি তাই।
মায়ের যে মোরা বই আর কেহ নাই॥

জাতীয় জীবন লভি শুভ অবসরে,
মুছিয়াছি অভিমান, হইয়াছি একপ্রাণ,
উড়ায়েছি কর্ম্মপাল কর্ত্তব্য-সাগরে,
সোনার তরণী আজ চলে ধীরে ধীরে।

ঐ দূরে দেখা যায় সাধনা-ভবন;
ধর্ম্মের জোয়ার ধরে, শান্তি-ভূমি লক্ষ্য করে,
অবশ্য আমরা তথা করিব গমন,
'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।'

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

জ্যোতিষ রহস্য।

——:(০):——

(নবম প্রস্তাব।)

হার্শেল।

———

হিন্দু-জ্যোতিষ-শাস্ত্র মতে যে কয়েকটী গ্রহ ফলিত-জ্যোতিষ-গণনায় আবশ্যক হয়, সেই নবগ্রহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ড "স্বদেশী"তে আটটী প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল গ্রহ ব্যতীত আরও বিস্তর গ্রহ ও উপগ্রহ আছে সত্য, কিন্তু তাহাদিগের সকলগুলিই ইদানীন্তন কালে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহাদিগের অনেক বিষয়ই, এক্ষণে, মানব-জ্ঞানের বাহিরে রহিয়াছে। সেই সকল গ্রহাদির মধ্যে, দুই একটির বিষয় মাত্র উল্লেখ করিয়া, গ্রহ সম্বন্ধে আর কিছু না লিখিয়া, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অপরাপর বিষয়ে লেখনী ধারণ করিব।

হার্শেল (Herschel) গ্রহটীর অপর এক নাম য়ুরেনাস্ (Uranus)। ইংরাজী ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ তারিখে, সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ হার্শেল সাহেব (Sir William Harschel) এই গ্রহটী আবিষ্কার করেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে এই গ্রহটীকে, একটী বৃহৎ ধূমকেতু অনুমান করিয়াছিলেন। পরে, বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে, ইহাকে একটী গ্রহ বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেন, এবং ইহার গতিবিধির বিষয় সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। সেই মহাত্মারই নামানুসারে এই গ্রহটীকে, লোকে, হার্শেল বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

পৃথিবী হইতে সূর্য্য ৯১,০০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং হার্শেল গ্রহটী সূর্য্যমণ্ডল হইতে প্রায় ১৭৫৪০০০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবী হইতে ইহা কত দূরে অবস্থিত, তাহা ভাবিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই গ্রহ ৩০৬৮৬ দিন, ১৭ ঘণ্টা, ২১ মিনিটে, একবার মাত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে এবং ৯ নয় ঘণ্টা, ৩০ মিনিটে আপন কক্ষায় একবার ঘুরিয়া আসে। ইহার প্রত্যেক রাশি ভোগের কাল ২৫৫৭ দিন, ৫ ঘণ্টা, ২৬ মিনিট ও ৪৫ সেকেণ্ড। ইহার ব্যাস প্রায় ৩৩ হাজার মাইল। অর্থাৎ পৃথিবী অপেক্ষা

ইহা চারিগুণের কিঞ্চিদধিক। কিন্তু আয়তনে পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ৭০ গুণ বৃহৎ। এই গ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ১৬ গুণ ভারি। *

হার্শেল গ্রহের চারিটী চাঁদের বিষয় বিশেষরূপ জানা গিয়াছে। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতির্ব্বিদ হার্শেল সাহেব ইহার দুইটী চন্দ্র মাত্র আবিষ্কার করেন। ইহার ৫০ পঞ্চাশ বৎসর পরে, বিশিষ্ট ক্ষমতাশালী † দূরবীক্ষণ যন্ত্র-সাহায্যে অধ্যাপক লাসেল সাহেব (Lassel) আর দুইটী চাঁদ আবিষ্কার করেন। এই চারিটী চন্দ্রের (Moons) নাম :—(১) এরিএল (Ariel), (২) আমব্রিয়েল (Umbriel), (৩) টাইটানিয়া (Titania), এবং (৪) অবারণ (Oberon)। এই চন্দ্র চতুষ্টয়ের মধ্যে, একটী চন্দ্র ১৩ তের দিনে, একটী চাঁদ ৮৩ তের দিন, ১২ বার ঘণ্টায়, একটী ২ দুই দিন ১৬ ষোল ঘণ্টায় এবং আর একটী চন্দ্র ৪ চারি দিবসে য়ুরেনাস্ গ্রহটীকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদের মতে, এই অত্যন্ত দূরবর্ত্তী গ্রহটীর আটটী চন্দ্র আছে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ‡

অত্যন্ত ক্ষমতাশালী দূরবীক্ষণ ব্যতীত হার্শেল গ্রহটীকে কোনরূপেই নয়ন-গোচর করিবার সম্ভাবনা নাই। শনি প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় এই গ্রহটীও পাপগ্রহ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইহার বর্ণ শুভ্রের আভাযুক্ত ঈষৎ নীল। এবং ইহাতে দারুণ শীত ও গ্রীষ্মাদির বিষম পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এই গ্রহ মধ্যে সুবৃহৎ পর্ব্বতাদি, নদী ও সমুদ্র আছে ইহা আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণ স্বীকার

* The equatorial diameter of the Planet is estimated at over 33 000 miles, and hence its Volume is 74 times that of the Earth. The density is, however, only 17 (the Earth's being unit), so that the mass exceeds the Earth's mass in the ratis of 12½ to 1.

Encyclœpedia Britannica.

† বর্ণিত চারিটী চন্দ্রের মধ্যে, বহির্ভাগের দুইটী চন্দ্র অনায়াসেই দেখা যায় বটে, কিন্তু অন্তর্ভাগের দুইটী চন্দ্র যন্ত্র-সাহায্যেও সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীষ্ম ও শরৎ ঋতুতেই উহারা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, অন্য সময়ে, মেঘ ও বাষ্পাদি দ্বারা আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন থাকায় উহাদিগকে দৃষ্টিগোচর করা কঠিন হইয়া থাকে। বৃহস্পতির ন্যায়, হার্শেলের চন্দ্রগুলি, দেখিতে সুন্দর ও প্রীতিকর নহে।

‡ Herschel, however, records the discovery of six, and as two of the recognised ones are quite irreconcilable with, any of these, it has been suggested that there are really eight.

Encyclœpedia Britannica.

করিয়া থাকেন; কিন্তু তথায় কোন প্রকার জীবের বাস আছে কি না, এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার কোন স্থির মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

প্রাচীন আর্য্য-জ্যোতির্ব্বিদ মহাশয়গণ যদিও হার্শেল গ্রহ সম্বন্ধে কোন বিষয় উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু, "নবগ্রহের" পর, আরও বহুতর গ্রহাদি আকাশ মণ্ডলে অনবরত পরিভ্রমণ করিতেছে ইহা তাঁহারা স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, জ্যোতিঃশেখর।

নিয়তি।

——:•:——

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তোড়াটঙ্ক বা তক্ষশিলা একটী প্রাচীন রাজধানী। পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ লইয়া এই রাজ্য গঠিত। রাজ্য ক্ষুদ্র হইলেও স্বাধীন। শোলাঙ্কি-বংশীয় রায় শূরতান এই স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীন রাজা। রাজ্যের প্রজাগণ পরম সুখী। শূরতান পরাক্রমশালী, ন্যায়পরায়ণ, প্রজাপালক। সুতরাং তাঁহার অধীনে প্রজাপুঞ্জ কোনরূপ ক্লেশ বা অসুবিধা ভোগ করিত না। কিন্তু সহসা এই ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইল। দুর্দ্দান্ত পাঠানগণ আসিয়া ভীম পরাক্রমে রাজ্য আক্রমণ করিল। শূরতান ক্ষমতাশালী হইলেও প্রচুর সৈন্যবলে বলীয়ান পাঠানগণের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। তাহারা সগর্ব্বে তোড়াটঙ্ক অধিকার করিল। অগত্যা শূরতান তোড়াটঙ্ক ত্যাগ করিয়া আরাবল্লীর পাদদেশস্থ বেদনোর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তোড়াটঙ্কের রাজপ্রাসাদশিরে মহম্মদীয় বিজয়কেতন সগর্ব্বে উড়িতে লাগিল। শূরতান বার বার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পাঠানদিগকে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিলেন। তারাও নিশ্চিন্ত রহিল না। সে বাল্যকাল হইতেই রীতিমত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। সুতরাং প্রিয়তমা জন্মভূমির উদ্ধারের জন্য সেও পিতার সহিত অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিল। সে দৃশ্য কি অপূর্ব্ব, কি সুন্দর! কিশোর-বয়স্কা সুন্দরী রাজপুতকুমারী কুসুমসুকোমলভুজে কঠোর অসি ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে শত্রুবাহিনী বিমর্দ্দিত করিতেছে, করুণহৃদয়া রমণী অকাতরে

অস্ত্রাঘাতে বিপক্ষহৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে। হায়, সে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি কি আর দেখিব না?

কিন্তু বিধাতা বিরূপ; শূরতানের সকল চেষ্টা বিফল হইল; দুর্জ্জয় পাঠান-শক্তির নিকট তাঁহার সকল উদ্যম, সকল শক্তি পরাভূত হইয়া পড়িল।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। এদিকে শূরতানের আদরিণী কন্যা তারা বিবাহযোগ্য বয়সে পদার্পণ করিল। কিন্তু দ্বিতীয় সন্তানসন্ততি না থাকায় স্নেহমুগ্ধ পিতা সহসা কন্যাকে পরহস্তে অর্পণ করিতে পারিলেন না। তিনি আজি কালি করিয়া দিনক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এদিকে বয়োবৃদ্ধির সহিত তারার রূপগুণের খ্যাতি ক্রমে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। চারিদিক হইতে বহু রাজপুত বীর আসিয়া শূরতানের নিকট তারার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিল।

এই সময়ে রায় শূরতানের মনে সহসা এক নূতন কৌশলের আবির্ভাব হইল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বীয় সৈন্যবল দ্বারা তোড়াটঙ্কের উদ্ধার অসম্ভব; সুতরাং কৌশলে ইহার উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। এক্ষণে তিনি স্থির করিলেন, দ্বিতীয় শক্তি দ্বারা পাঠানদিগকে দূরীভূত করিতে হইবে; প্রিয়তমা কন্যার বিনিময়ে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় তোড়াটঙ্ককে অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। তখন শূরতান প্রকাশ্যে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে ব্যক্তি পাঠান হস্ত হইতে তোড়াটঙ্ককে উদ্ধার করিতে পারিবে, তাহাকেই তিনি কন্যাসম্প্রদান করিবেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বিবাহপ্রার্থী অনেক রাজপুত বীরই নিরস্ত হইল। কেহ কেহ এক আধটু চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হইল না।

কিন্তু ইহাতেও শূরতান হতাশ হইলেন না। তিনি জানিতেন, রাজপুতানা এখনও বীরশূন্যা হয় নাই; কেহ না কেহ তাঁহার বাসনা সিদ্ধ করিবে। তারাও পিতার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিল। শুনিয়া সেও হতাশ হইল না। সে জানিত, পৃথ্বীরাজ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহার পিতার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে পারেন।

তারা কখনও পৃথ্বীরাজকে দেখে নাই, কেবল লোক-পরম্পরায় তাঁহার গুণাবলী—তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি শুনিয়াছিল। এই খ্যাতি শুনিয়াই বীরস্বভাবা তারা মনে মনে পৃথ্বীরাজকে ভালবাসিয়াছিল, হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে পৃথ্বীরাজের বীরত্বব্যঞ্জক কল্পিতমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, নিভৃতে মানসোপচারে তাঁহার পূজা

করিতেছিল, মানস-কল্পিত দেবতার চরণে আপনার সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হইতেছিল।

আমরা জানি না, চক্ষে না দেখিয়া কেবল লোকমুখে শুনিয়াই কিরূপে ভালবাসা বা প্রণয়ের উদ্ভব হয়। চক্ষে দেখিলাম না,—যাহাকে ভালবাসিলাম সে সুন্দর কি কুৎসিৎ, মানুষ কি রাক্ষস কিছুই বুঝিলাম না। অথচ তাহার উদ্দেশে আপনার সর্ব্বস্ব—জীবনের সুখদুঃখ সমস্ত ঢালিয়া দিলাম। প্রাচীন যুগেও এইরূপ ভালবাসার কথা শুনা যায়। সীতাদেবী রামচন্দ্রকে না দেখিয়াই কেবল তাঁহার অসাধারণ মাহাত্ম্য শ্রবণে পতিত্বে বরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পাইবার জন্য শিবপূজা করিয়াছিলেন। দময়ন্তী কেবল হংসমুখে নলের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিলেন। সুতরাং এরূপ ভালবাসার উদ্ভব একেবারেই অসম্ভব নহে। তারাও এইরূপে পৃথ্বীরাজকে ভালবাসিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সঙ্গ গেল, পৃথ্বীরাজ গেল, তথাপি জয়মল্ল নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। পৃথ্বীরাজ পিতার আদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছে; তাহার আর ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু সঙ্গ তো ফিরিতে পারে? সে ফিরিলে জয়মল্লের সিংহাসন প্রাপ্তির আশা তো নির্ম্মূল হইবে? সুতরাং সঙ্গ যাহাতে আর না ফিরিতে পারে, জয়মল্ল তাহারই উপায় বিধানে মনোনিবেশ করিলেন। তখন সঙ্গের অনুসন্ধানার্থ চারিদিকে গুপ্তচর প্রেরিত হইল। কিন্তু সন্ধান মিলিল না। জয়মল্ল ভাবিলেন, এ কার্য্যে আপনাকেই অগ্রসর হইতে হইবে; ছদ্মবেশী সঙ্গকে খুঁজিয়া বাহির করা সামান্য দূতের কার্য্য নহে।

কিন্তু কি বলিয়া পিতার নিকট বিদায় লওয়া যায়? পিতার নিকট অভিসন্ধি প্রকাশ পাইলে সকল দিক নষ্ট হইবে। অনেক চিন্তার পর জয়মল্ল পিতার নিকট মৃগয়াযাত্রার অনুমতি চাহিলেন। অনুমতি পাইতে বিলম্ব হইল না। তখন জয়মল্ল দলবলসহ মৃগয়া যাত্রা করিলেন।

জয়মল্ল প্রথমে প্রত্যেক সামন্ত রাজের রাজধানী খুঁজিয়া দেখিলেন, তার পর প্রতি দুর্গে অনুসন্ধান করিলেন, শেষে গ্রাম পল্লী গিরি বন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন। কিন্তু কোথায় সঙ্গসিংহ? জয়মল্ল ভাবিলেন, 'সঙ্গ নাই—ইহলোকে নাই, ইহলোকে থাকিলেও রাজপুতানার মধ্যে সে নাই।' ক্লান্ত অবসন্ন হৃদয়ে জয়মল্ল প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন কালে জয়মল্ল একবার বেদনোর দুর্গে শূরতানের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ করিলেন। সঙ্গের অনুসন্ধান কালে তিনি আর একটী রত্নের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সে রত্ন তারাবাই। জয়মল্ল যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই তারার রূপগুণের সুখ্যাতি শুনিয়াছেন। এক্ষণে একবার সেই রূপগুণের অধিকারিণীকে স্বচক্ষে দেখিয়া সন্দেহভঞ্জন করিতে ইচ্ছুক হইলেন, এবং সন্দেহ ভঞ্জন হইলে তাহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়া যে শূরতানকে ও তদীয় কন্যা তারাকে কৃতার্থম্মন্য করিবেন, এরূপ সঙ্কল্পও করিলেন। এইরূপ দুইটী অভিপ্রায় হৃদয়ে পোষণ করিয়া জয়মল্ল বেদনোর অভিমুখে চলিলেন।

বেদনোর দুর্গ হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে আসিয়া জয়মল্ল শিবির সংস্থাপন করিলেন। বিনা অভ্যর্থনায় এত লোকজন সঙ্গে লইয়া যাওয়া অনুচিত বিবেচনায় জয়মল্ল একা শূরতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

বেদনোর দুর্গে যাইতে হইলে পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। পথ কোথাও উচ্চ, কোথাও নিম্ন, কোথাও সমতল। সেই বন্ধুর পার্ব্বত্যপথে জয়মল্ল ধীরে ধীরে অশ্ব চালনা করিলেন। তখন অপরাহ্ন কাল। অপরাহ্ন কালে পার্ব্বত্য প্রদেশ অতি রমণীয় ভাব ধারণ করে। জয়মল্ল চঞ্চল দৃষ্টিতে পার্ব্বতীয় প্রকৃতির মুক্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন; তাঁহার অশ্ব অপরাহ্নের শীতল বায়ুস্পর্শে নাচিয়া নাচিয়া ধীর-কদমে চলিল।

এইরূপে প্রায় এক ক্রোশ পথ অতিবাহন করিলে সহসা জয়মল্ল পশ্চাতে অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, একটা বেগগামী শ্বেত অশ্ব নক্ষত্রগতিতে তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। অশ্বের উপর বসিয়া এক রমণী। রমণীর মুক্ত কুন্তলদাম বাতাসে উড়িতেছে, বেগে অশ্ব চালনা হেতু বক্ষোবসন ফুলিয়া উঠিয়াছে। রমণীর হস্তে এক সুদীর্ঘ বর্ষা; অপরাহ্ন-সূর্য্যের রক্তরশ্মি উদ্যত বর্ষাফলকে পড়িয়া নৃত্য করিতেছে। জয়মল্ল বিস্মিত, স্তম্ভিত, বুঝি একটু ভীতও হইলেন। ভাবিলেন, কে এ উগ্রচণ্ডারূপিণী রমণী?

কিন্তু ভাবিবার আর সময় হইল না, দেখিতে দেখিতে কক্ষচ্যুতা তারকার ন্যায় রমণী তাঁহার নিকটে আসিয়া পড়িল। জয়মল্ল ত্বরিত গতিতে অশ্ব ফিরাইয়া অসি কোষমুক্ত করিলেন। তখন অশ্বারূঢ়া রমণী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জয়মল্ল গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"সাবধান, আর একপদ অগ্রসর হইলেই মৃত্যু।"

রমণী ভ্রুভঙ্গী করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"তুমি কি রাজপুত?"

জয়মল্ল দেখিলেন, রমণীর মুখখানা বড় সুন্দর, কথাগুলা তদপেক্ষা মিষ্ট; কিন্তু প্রশ্নটা বড়ই কঠোর। তিনি একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন,—"বেশ দেখিয়া বুঝিতেছ না?"

রমণী সহাস্যে বলিল, —"আমি জানিতাম, রাজপুতেরা স্ত্রীলোক দেখিয়া ভয় পায় না।"

জয়মল্ল বলিলেন, —"স্ত্রীলোকে কখন ঘোড়ায় চড়িয়া বর্ষাহস্তে ছুটিয়া আসে না।"

রমণীর নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল; তীব্রস্বরে বলিল,—"যে দেশের পুরুষেরা দেশরক্ষায় অসমর্থ, সে দেশে বাধ্য হইয়া স্ত্রীলোককে ঘোড়ায় চড়িতে হয়—অস্ত্র ধরিতে হয়।"

জয়মল্ল বলিলেন,—"রাজপুত পুরুষের বাহু এখনও দেশ রক্ষায় সমর্থ।"

রমণী বলিল,—"তাহা হইলে তোড়াটঙ্ক হইতে পাঠানেরা কোন্ দিন বিদূরিত হইত।"

জয়মল্ল একটু লজ্জিত হইলেন; বলিলেন, - "তুমি কে?"

রমণী গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—"আমি তোড়াটঙ্কাধিপতির কন্যা।"

বিস্মিত কণ্ঠে জয়মল্ল বলিলেন,—"তোমারই নাম তারাবাই?"

রমণী বলিল,—"হাঁ।"

জয়মল্ল বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তারার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন অপরাহ্নের শান্ত সূর্য্যরশ্মি আসিয়া তারার স্বেদবিন্দুপরিশোভিত কপোলে পড়িয়াছে; কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ স্বেদসিক্ত ললাটে পতিত হইয়া কমলদলশয়িতা ফণিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে; মুক্ত কুন্তলরাশির মধ্যে প্রফুল্লপদ্মের মত মুখখানি,—যেন বীচিবিক্ষুব্ধ কৃষ্ণতড়াগহৃদয়ে চাঁদের পূর্ণ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। জয়মল্ল ভাবিলেন, তারা যথার্থই সুন্দরী; এ সৌন্দর্য্য রাজপুতানার গৌরব।

একজন অপরিচিতকে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তারার একটু লজ্জা হইল; একটু গম্ভীর স্বরে বলিল,—"কি দেখিতেছ?"

বিহ্বলকণ্ঠে জয়মল্ল বলিলেন,—"তুমি যথার্থই সুন্দরী।"

তীব্রস্বরে তারা বলিল, —"তুমি উন্মাদ।"

জয়মল্ল বুঝিলেন, কথাটা বলিয়া ভাল করেন নাই। তিনি মুহূর্ত্তে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "তুমিই কি পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছ ?"

তা। করিয়াছি।

জ। যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিলে ?

তা। হাঁ, কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষোভ নাই।

জ। ক্ষোভ নাই ?

তা। আমি কোন দেশজয়ের জন্য যুদ্ধ করি নাই, দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছি।

জ। দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধে পরাজয় কি পরাজয় নহে ?

তা। পরাজয় হইলেও তাহাতে আমার ক্ষোভ নাই, দুঃখ নাই। শত্রুহস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া একবার হারিয়াছি, আবার যুদ্ধ করিব ; আবার হারি, আবার যুদ্ধ করিব ; শতবার হারিলেও ক্ষুব্ধ বা নিরস্ত হইব না।

জয়মল্ল বলিলেন,—"তুমি রাজপুতনার গৌরব !"

তারা লজ্জায় মুখ নামাইল। ধীরে ধীরে বলিল,—"কিন্তু তুমি এত পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ? তুমি কে ?"

জয়মল্ল বলিলেন,—"আমি চিতোরাধিপতি রাণা রায়মল্লের কনিষ্ঠ পুত্র।"

তারা বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার জয়মল্লের মুখের দিকে চাহিল ; তারপর বদন বিনত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"আমি আপনাকে চিনিতাম না। স্ত্রীলোকের প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন।"

ঈষৎ হাসিয়া জয়মল্ল বলিলেন,—"সে অপরাধে আমিই প্রথম অপরাধী।"

তারা বলিল;—"আপনি এ দিকে কোথায় যাইতেছেন ?"

জয়মল্ল বলিলেন,—"তোমার পিতার সহিত সাক্ষাতের জন্য।"

তারা বলিলেন,—"আসুন, কিন্তু অদ্য বোধ হয় পিতার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে না।"

জ। তিনি কি দুর্গে অনুপস্থিত ?

তা। হাঁ, বোধ হয় কল্য প্রাতেই ফিরিবেন।

জ। তিনি কোথায় গিয়াছেন ?

তা। পাঠানেরা বেদনোর দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য গিয়াছেন।

জ। তুমিও কি তাঁহার সহিত গিয়াছিলে ?

তা। হাঁ।

জ। ফিরিলে কেন ?

তা। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, পাঠানেরা যুদ্ধে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে।

জ। পূর্ব্বে জানিলে আমিও কিছু সাহায্য করিতে পারিতাম।

তা। আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না।

তারার গর্ব্বিতবাক্যে জয়মল্ল মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না। তখন তারা বলিল,—"পিতা না থাকিলেও আপনার আতিথ্য সৎকারে ক্রটী হইবে না।"

সুন্দরী তারার আতিথ্যসৎকার গ্রহণে জয়মল্লের যে ইচ্ছা ছিল না এরূপ নহে, কিন্তু তাহার গর্ব্বিতভাব প্রতিপদে তাঁহাকে বিচলিত করিতেছিল। সুতরাং তিনি বলিলেন,—"কল্য আসিয়া তোমার পিতার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিব।"

"যেরূপ আপনার অভিরুচি" বলিয়া তারা অশ্বে কষাঘাত করিল। অশ্ব তীরবেগে দুর্গাভিমুখে ছুটিল। জয়মল্ল তাহার দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন,—"গর্ব্বিতে! তোমার এ গর্ব্ব আমি চূর্ণ করিব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পিতৃ আজ্ঞায় পৃথ্বীরাজ পাঁচজন মাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া গদবার রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী বন্যগণের উপদ্রবে গদবার রাজ্য তখন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তদ্দর্শনে সুচতুর পৃথ্বীরাজ মনে মনে স্থির করিলেন, কৌশলে এই সকল বন্যজাতিকে দমন করিয়া বশীভূত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে ইহাদিগের দ্বারা অনেক উপকার লাভের সম্ভাবনা। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি মীনাদিগের রাজধানী নদাঁলয় নগরে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার নিকটস্থ অর্থ প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য স্বীয় অঙ্গুলিস্থ বহুমূল্য অঙ্গুরীয়টী ওঝা নামক জনৈক বণিকের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইলেন। ঘটনাক্রমে এই ওঝাই পূর্ব্বে এই অঙ্গুরীয়টী নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং রাজকুমার পৃথ্বীরাজের জন্য সে-ই উহা বিক্রয় করিয়াছিল। এক্ষণে সেই অঙ্গুরীয় দর্শন মাত্র ওঝা তাহা চিনিতে পারিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে পৃথ্বীরাজকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। পৃথ্বীরাজ তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার নির্ব্বাসনের কথা শুনিয়া ওঝার হৃদয় ব্যথিত হইল এবং সে শপথ করিয়া তাঁহার সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইল।

তখন ওঝার পরামর্শে ও চেষ্টায় পৃথ্বীরাজ মীনরাজের অনুচররূপে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার অনুচরেরাও তথায় পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে নিযুক্ত হইল। অদৃষ্ট-চক্রের আবর্ত্তনে রাজকুমার পৃথ্বীরাজ এই বন্যরাজের দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য হইলেন; এবং স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত শুভ সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নিয়তির উপর নির্ভর না করিলে মানুষ বুঝি সংসারে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না।

পৃথ্বীরাজের সহিত যে পাঁচজন অনুচর আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জনের নাম জহ্নু। জহ্নু প্রভুভক্ত, সাহসী, সুচতুর, বুদ্ধিমান। সর্ব্বাপেক্ষা সে-ই পৃথ্বীরাজের অধিক বিশ্বাসের পাত্র।

একদা জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে নদালয় নগরীর প্রান্তভাগে, একটী অনুচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশে এক বৃহৎ শিলাখণ্ডের উপর জহ্নু ও পৃথ্বীরাজ বসিয়াছিলেন। পদতলে ক্ষীণকায়া পার্ব্বতীয়া নির্ঝরিণী কল্‌কল্ শব্দে বহিয়া যাইতেছিল। শুভ্র চন্দ্রকিরণে পার্ব্বত্য প্রদেশ হাস্যময় হইয়া উঠিয়াছিল।

সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পর্ব্বত-পাদদেশে—সেই কৌমুদীস্নাত শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া পৃথ্বীরাজ ও জহ্নু অনুচ্চস্বরে কথোপকথন করিতেছিলেন। জহ্নু বলিতে-ছিল, "তবে কি করিবেন রাজকুমার?"

পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। অদৃষ্ট-নিষ্পেষিত মানবের হৃদয়ে এত কোমলতা কেন জহ্নু?"

জহ্নু বলিল,—"কোমলতা মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক গুণ। কিন্তু সে কোম-লতাকে বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে মানুষ অদৃষ্টযুদ্ধে জয়ী হইতে পারে না।"

পৃথ্বীরাজ নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। জহ্নুও নীরবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রভুর মুখভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জহ্নু বলিল,—"তবে কি চিরদিনই এই বন্যরাজের দাসত্ব করিয়া জীবনপাত করিবেন?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"তাহাও অসহ্য।"

জ। তবে—তবে রাজকুমার, এমন শুভ সুযোগ ছাড়িবেন না।

পৃ। কিন্তু রাজপুত হইয়া কিরূপে বিশ্বাসঘাতকতা করিব?

জ। ইহা বিশ্বাসঘাতকতা নয়, বীরধর্ম্ম।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া পৃথ্বীরাজ বলিলেন—"সত্য।"

সহসা অদূরে যেন কাহার মৃদু পদশব্দ শ্রুত হইল। জহ্নু উঠিয়া দাঁড়াইল; মৃদুস্বরে বলিল,—"চিত্ত স্থির করুন, আমি এক্ষণে চলিলাম।"

জহু, দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল। পৃথ্বীরাজ একা সেই জ্যোৎস্নাস্নাত উপলখণ্ডের উপর বসিয়া স্থিরদৃষ্টিতে তারকা-খচিত নির্ম্মল নীলাকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সহসা পৃষ্ঠদেশে কাহার কোমল হস্তস্পর্শে চমকিত হইয়া পৃথ্বীরাজ ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন পশ্চাতে দাঁড়াইয়া শীলা। তাঁহাকে চমকিত ভাবে চাহিতে দেখিয়া শীলা হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। তাহার সেই উচ্চ হাস্যধ্বনি পর্ব্বতগাত্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া মুক্ত বায়ুপ্রবাহে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পৃথ্বীরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, —"শীলা, এ সময়ে তুমি এখানে?"

শীলা উত্তর করিল,—"এ সময়ে তুমিও এখানে?"

পৃ। আমি বেড়াইতে আসিয়াছি।

শী। আমিও বেড়াইতে আসিয়াছি।

পৃ। এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?

শীলা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—"ঐ গাছতলায় বসেছিলাম।"

পৃ। একা?

শী। হাঁ।

পৃ। ওখানে একা বসিয়া কি করিতেছিলে?

শী। তোমাকে দেখ্‌ছিলাম।

পৃ। তবে এতক্ষণ আমার কাছে এস নাই কেন?

শী। তোমার কাছে যে লোক ছিল।

পৃ। সে লোককে তুমি চেন?

শী। চিনি, সে তোমার বন্ধু।

পৃ। তাহার সহিত আমি কি করিতেছিলাম বল দেখি।

শী। গল্প কর্‌ছিলে।

পৃ। কি গল্প?

শী। তা' আমি শুন্‌তে পাই নাই।

পৃথ্বীরাজ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শীলার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সে মুখে স্বাভাবিক সরলতা ব্যতীত কপটতা বা সন্দেহের কোন ছায়াই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—"আমি যখন যেখানে যাই, তুমিও আমার পশ্চাৎ সেখানে যাও কেন শীলা?"

শীলা একটুও না ভাবিয়া উত্তর করিল,—"যেতে ইচ্ছা হয় বলিয়া।"

পৃ। কেন ইচ্ছা হয়?

শী। তা' জানি না

পৃথ্বীরাজ আর কিছু বলিলেন না; তিনি নীরবে শীলার মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন শুক্লা দশমীর চাঁদ পশ্চিমগগনে একটু হেলিয়া পড়িয়াছে। তাহার শুভ্র কররেখা আসিয়া শীলার কালো মুখখানির উপর পড়িয়াছে; কে যেন যমুনার কালোবুকে স্বুবর্ণস্রোত ঢালিয়া দিতেছে। স্ববঙ্কিম ভ্রুযুগনিম্নে বড় বড় ভাসা ভাসা কৃষ্ণতার চক্ষু দুইটী সদ্যপ্রস্ফুটিত নীল পদ্মযুগলের ন্যায় নাচিতেছে। অবেণীসম্বদ্ধ কুন্তলরাশি পৃষ্ঠ অংস ব্যাপিয়া দুলিতেছে; নৈশসমীরে অসংযত বক্ষোবসন ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। পৃথ্বীরাজ মুগ্ধনেত্রে বেশভূষাবিরহিতা এই অসভ্য মীনবালিকার মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিলেন,—শীলা কি সুন্দর!

তাঁহাকে এইরূপে চাহিতে দেখিয়া শীলা বলিল,—"কি দেখ্‌ছ?"

মুগ্ধকণ্ঠে পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"শীলা, তুমি বড় সুন্দর।"

শীলা হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। পৃথ্বীরাজ একটু লজ্জিত ভাবে বলিলেন,—"হাসিলে কেন শীলা?"

শীলা হাসির বেগ একটু থামাইয়া বলিল,—"তুমি কি বলিলে?"

পৃ। বলিলাম, তুমি বড় সুন্দর।

শী। সুন্দর? সুন্দর কি?

পৃথ্বীরাজ বড় গোলে পড়িলেন। এই সৌন্দর্য্যজ্ঞানবিরহিতা মীন বালিকাকে সুন্দরের অর্থ কিরূপে বুঝাইয়া দিবেন তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। শেষে কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিললেন,—"অনেক রাত্রি হইয়াছে, শীলা, গৃহে যাও।"

তখন উভয়ে সেই পার্ব্বত্য প্রদেশ ত্যাগ করিয়া ধীরপদে নগরাভিমুখে চলিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

দাগের কালি।

(Marking Ink)

আমাদের দেশের ধোপারা ভেলার কষ (ভেলা এক প্রকার ফল, আমাদের দেশের জঙ্গলে অনেক হয়। বেণে দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়—ইহার মূল্য বড় সুলভ। ভেলার কষ উগ্র বিষ, শরীরের কোন স্থানে লাগিবা মাত্র ধুইয়া না ফেলিলে ফোস্কা পড়িয়া থাকে) দিয়া কাপড়ে চিহ্ন দেয়। ভেলার কষে বস্ত্রাদি চিহ্নিত করিলে, চিহ্নগুলি বহুদিবস স্থায়ী হয় সত্য ; কিন্তু ২।৩ বার ধোয়ার পরই ফিকে হইয়া যায়। ভেলার কষে বস্ত্রাদি চিহ্নিত করিয়া, তদুপরি কিঞ্চিৎ টাট্কা চুণ ঘষিয়া দিতে পারিলে, সে চিহ্ন চিরস্থায়ী হয়। ইহা আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত। আমরা এই উপায়েই পরিধেয় বস্ত্রাদি চিহ্নিত করিয়া থাকি। ভেলার কষ হইতে দাগের কালি (Marking Ink) তৈয়ার করিতে পারিলে, সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিয়াও বিশেষ লাভবান হওয়া যায়। কিন্তু প্রস্তুত প্রণালী একটুকু কষ্টসাধ্য। ভেলা গোটা গরম করিয়া (একটুকরা কাপড়ে ঢিলা ভাবে ভেলা গোটা বাঁধিয়া, তাহা ভেলার চতুর্গুণ পরিমাণ জলপূর্ণ হাঁড়িতে কিছু সময় মৃদু তাপে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়) লইয়া, অত্যল্প সময় শুষ্ক ও শীতল হইবার জন্য বাতাসে ছড়াইয়া রাখিতে হয়। শীতল হইলে পর চাপ দিয়া সহজেই কষ বাহির করা যায়। একটী সাঁড়াশী অথবা অন্য কোন লোহার জিনিস দিয়া সজোরে চাপ দিলেই কষ বাহির হইবে। এই কষ শিশিতে রাখিয়া দিলে বহুদিন অবিকৃত থাকে। এইটি কাপড়ে চিহ্নিত করিবার খাঁটী স্বদেশী কালি। ভেলার কষ হইতে দাগের কালি প্রস্তুত করিলে, দুই ড্রাম একশিশির মূল্য মায় শিশি ও কর্ক তিন পয়সার বেশী হইতে পারে না। সুতরাং নাম মাত্র মূলধন লইয়াই এই কালির ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। প্রত্যেক শিশি দুই আনা করিয়া বিক্রয় করিলেও টাকায় টাকা লাভ হয়।

কাপড়ে লেখার ইংরেজি কালি অনেক প্রকারে প্রস্তুত করা যায়। ইংরেজি কালি কিছুতেই ফিকে হয় না বা উঠিয়া যায় না—সব বিষয়েই ভাল। কিন্তু ইংরেজি কালির মূল্য সুলভ হয় না। আমরা নানাপ্রকার দাগের কালি প্রস্তুত এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তন্মধ্যে যে দুইটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং যাহার

প্রস্তুত প্রণালীও সহজসাধ্য, নিম্নে তাহাই বিবৃত হইল। প্রথম প্রকারের কালি আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত।

(১) কিয়ৎপরিমাণ পরিস্কৃত বৃষ্টির জল অথবা পরিস্রুত (চোঁয়ান) জল, দুইটা ভিন্ন ভিন্ন চিনা বাটিতে বা কাচের গ্লাসে কি শিশিতে রাখিয়া, উহার একটীতে ২৷৷০ আড়াই ভরি কাষ্টকি (নাইট্রেট অব সিলভার) ও অন্যটিতে ৩৷৵০ তিন ভরি বার আনা ওজনে সোডা (কার্ব্বনেট অব সোডা) পৃথক্ পৃথক্ দ্রব করিতে হইবে। দ্রব হইলে পর পদার্থ দুইটী একত্র মিশ্রিত করিয়া কিছু সময় রাখিয়া দিলে, অল্প হরিদ্রা বর্ণের দধির মত কতকটা জিনিস বাটির নীচে জমিবে। এই জিনিসটা ভালরূপে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। (একখানি ছাঁকিবার ব্লটিং কাগজের ঠোঙ্গার উপর বাটির সমুদয় জিনিসটা চালিয়া দিলে, জল চুয়াইয়া পড়িবে ও উক্ত দধির মত জিনিসটা ঠোঙ্গায় থাকিয়া যাইবে। তৎপর বৃষ্টি বা চোঁয়ান জল দিয়া ঐ দধির মত জিনিসটাকে ক্রমাগত দুই তিনবার ধৌত করিতে হইবে। ঠোঙ্গার উপর একটু একটু করিয়া জল দিলেই, জলটুকু উহার মধ্য দিয়া চুয়াইয়া পড়িবে এবং ইহাতেই ধৌত হইবে। এই কার্য্যে বৃষ্টির জল অপেক্ষা চোয়ান জলই ভাল।) ধৌত হইলে পর উহা একটী পাথর বাটি কিম্বা চিনা বাটিতে রাখিয়া, উহার সহিত ১ ভরি টার্টারিক এসিড ও ১ ছটাক চোয়ান জল উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে। সমুদয় মিশ্র পদার্থে ২ ভরি চিনি, ৩।৵০ তিন ভরি পাঁচ আনা ওজন আরবি গঁদ (বাবলার আঠাতেও কাজ চলে) এবং ১ তোলা আর্চিল দিয়া ভালরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে। ভালরূপে মিশ্রিত হইলে পর, সমুদয়টুকু ওজন করিয়া, তিন ছটাকের যতটুকু কম পড়িবে তাহা চোয়ান জল দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে। আর্চিল না পাওয়া গেলে Indian Ink (ভুষাতেও কাজ চলে) দিলেও হয়। রং করিবার জন্যই এই দ্রব্যের আবশ্যক। রং হইলে লেখার সময় বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। এই কালিতে ২ ড্রাম অর্থাৎ অর্দ্ধ কাঁচ্চা শিশির ২৪ শিশি হইবে। মোট খরচ মায় শিশি ও কর্ক প্রভৃতিতে ২৷৷০ টাকা বা কিছু বেশী। সুতরাং প্রতি শিশির মূল্য প্রায় দুই আনা। প্রত্যেক শিশি কমপক্ষে ।০ আনা করিয়া বিক্রয় করিলেও (বাজারে মার্কিং কালির মূল্য ।৵০—৷৷০ আনা) টাকায় টাকা লাভ থাকিবে।

(২) কাষ্টকি (লুনার কষ্টিক) অর্দ্ধভরি, চোয়ানজল অর্দ্ধ ছটাক, গঁদের ঘনমণ্ড এক কাঁচ্চা এবং লাইকর এমোনিয়া সিকি কাঁচ্চার কিছু কম একটি পরিষ্কার শিশির মধ্যে একত্র মিশ্রিত করিয়া, উত্তমরূপে ছিপি বদ্ধ করিতে

হইবে। তৎপর উহা অন্ধকার স্থানে (সূর্য্যের আলো যে স্থানে না যায়) রাখিয়া দিতে হইবে। অন্ধকার স্থানে রাখার সুযোগ না থাকিলে, কালবর্ণের শিশি অথবা নীল কাগজে মোড়া সাদা শিশিতে রাখিতে হইবে। লিখিবার সময় বেশ করিয়া বোতলটী নাড়িয়া লইতে হইবে। একটি পেন কলম দিয়া অন্ধকার স্থানে কাপড়ে লিখিয়া, তৎক্ষণাৎ আগুনের উপর ধরিতে হইবে। (আগুনের উপর না ধরিয়া একটী লোহার হাতা অল্প গরম করিয়া ঐ স্থানে ধরিলেও কাজ চলে)। এই লেখাও চিরস্থায়ী। এই উপায়ে দাগের কালি প্রস্তুত করিয়া, গৃহস্থ মাত্রেই অতি সহজ উপায়ে এবং অতি সামান্য ব্যয়ে পরিধেয় বস্ত্রাদি চিহ্নিত করিয়া লইতে পারেন।

শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ।

সুখ ও দুঃখ।

সুখ আর দুঃখ – দু'টী—হয় দুই ভাই ;
নাহি রহে কভু দোঁহে সদা এক ঠাঁই।
সরূপ কেহই নহে ;—উভয়ে অরূপ,
কিন্তু যা'রে ধরে, তা'র হয় ভিন্ন রূপ।
'নাম' মাত্র ধারী দোঁহে, নাহিক আকার ;
বাসস্থান উভয়ের হয় নিরাকার।
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে নাহি দোঁহার ভবন,
অধিকার করি' রহে জীবগণ মন।
উভয়ের হ্রাসবৃদ্ধি আছে নানা ক্রম ;
জ্ঞানিগণে কহে কিন্তু দুইটীই 'ভ্রম'।
প্রকৃত জ্ঞানীর মনে নাহি পায় স্থান,
অজ্ঞানজনের মনে নিত্য অবস্থান।
স্বরূপ যে জানিয়াছে এই দু'জনার,
কর্ত্তৃত্ব না চলে কিছু উপরে তাহার।

সুখদুঃখ ষড়রিপু যোগে তাত্র হয় ;
চাঞ্চল্য আশ্রয় করি' জীবদেহে রয়।
মায়াবদ্ধ মূঢ়জীবে ধরে দুই জন,
মুক্ত জীব পাশে নাহি পশে কদাচন।
বিকৃত মনের ক্রিয়া—দুঃখ আর সুখ।
বুঝিলে সে তত্ত্ব ঘুচে সমূহ অসুখ॥

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

শিখ-গুরু।

—:০:—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অঙ্গদ।

নানকের দুইটী পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ শ্রীচাঁদ, ধর্ম্মচাঁদ নামে এক পুত্র রাখিয়া সংসার ত্যাগ করেন। ইনি উদাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীদাস সংসারী হন ও অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। ধর্ম্মচাঁদের বংশধরেরা আজও 'নানকপুত্র' ও সাহেবজাদা (প্রভু-পুত্র) নামে অভিহিত হয় এবং শিখদের নিকট তাহারা সর্ব্বদা যথেষ্ট সম্মান পায়। তাহাদের কেহ ব্যবসায়ী হইলে শিখ রাজন্য-বর্গের নিকট কতকগুলি অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। * তাহারা এখনও কর্ত্তারপুরে বাস করিতেছে।

নানক মৃত্যুকালে পুত্রদের কাহাকেই শিখগুরু-পদের উপযুক্ত বিবেচনা করেন না। ক্ষত্রিয়বংশ-সম্ভূত ও তিহরণ শাখার অন্তর্গত লহণাকেই তিনি দীক্ষিত করিয়া ও অঙ্গদ নাম দিয়া গুরুপদে অধিষ্ঠিত করেন। লহণা গুরুর অতি প্রিয় ভক্ত ছিলেন।

* The Nanukpotras, or descendants of Nanuk, called also Sahibzadas, or sons of the master, are every where reverenced among Sikhs. And of traders, some privileges are conceded to them by the chiefs of their country.—Cunninghum's History of the Sikhs. chap. 11.

লহণার গুরুপদে দীক্ষিত হওয়া সম্বন্ধে তিনি নানকের দ্বিতীয় জনমশাখীতে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহাদের সারাংশ আমরা দিতেছি। গুরু, লহণাকেই গুরুপদ দিবেন স্থির করিয়াছেন জানিয়া একদিন তাঁহার পত্নী সুলক্ষণা দুঃখের সহিত বলিলেন,—"তোমার দুইটী পুত্র বিদ্যমানেও তুমি গুরুপদ অন্যব্যক্তিকে দান করিতেছ। এ তোমার উচিত কাজ নয়। যখন তোমার পুত্র রহিয়াছে, তখন তুমি তাহা অপরকে কেন দিবে?" নানক সে কথা শুনিয়া হাসিলেন। তিনি বলিলেন,—"দেখিবে, কে কত গুরুভক্ত?" এই সময় সেখানে একটী মৃত মূষিক পড়িয়াছিল। নানক পুত্র শ্রীচাঁদকে বেশ ধীরতা সহকারে বলিলেন,—"বৎস! পায়ে করিয়া উহা ফেলিয়া দাও ত।" শ্রীচাঁদ বাজে কতকগুলি কথা বলিয়া গুরুবাক্য অমান্য করিলেন, মূষিক স্পর্শ করিলেন না। ইহার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে লহণা তথায় উপস্থিত হইলেন। গুরু তাঁহাকে বলিলেন,—"লহণা! পা দিয়া ঐ মূষিকটা দূরে ফেলিয়া দাও ত।" লহণা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তখনই তাহা দূরে ফেলিয়া দিলেন। তখন গুরু স্ত্রীকে বলিলেন,—"এত সেই পর, আর এই আমার পুত্র। কি করিব বল? ধাতা যাহাকে গুরুপদ দেন, সেই উহা ভোগ করিবে; আমি কি করিব।" অতঃপর গুরু লহণাকে অঙ্গদ নাম দিলেন,—উদ্দেশ্য, লহণা তাঁহারই অংশ বলিয়া বিবেচিত হইবেন। (১)

এইরূপ আর একটি ঘটনায় অঙ্গদের গুরুভক্তির প্রকাশ পাওয়া যায়। বিশেষরূপ অনুরুদ্ধ হওয়ায় তিনি নানকের সহচর বালাকে স্বীয় জীবনের কয়েকটি বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। তাহার একস্থলে তিনি বলিতেছেন,—"একটি সহরে একটি পুষ্করিণী ছিল। তাহা পঙ্কে পূর্ণ ছিল। বৃষ্টি হইয়া গেলে সহরের সমস্ত ময়লা সেই পুষ্করিণীতে গিয়া পড়িত। গুরু নানক তাহার নিকটে গিয়া তাহাতে একটী পাত্র ফেলিয়া দিলেন। সেই সময় গুরুর উভয় পুত্র ও আমি (অঙ্গদ) তথায় উপস্থিত ছিলাম। গুরু প্রথমে শ্রীচাঁদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"পুত্র! পুষ্করিণী হইতে পাত্রটি লইয়া আইস।" শ্রীচাঁদ উত্তর করিলেন,—"যাহাকে ওখানে বাধ্য হইয়া যাইতে হয়, সেই যাইবে। অপর কেহ উহা সানন্দে তুলিয়া লইবে।" গুরু তখন লক্ষ্মীদাসকেও সেই আদেশ করিলেন; লক্ষ্মীদাসও দাদার ন্যায় উত্তর করিলেন। তারপর গুরু আমার দিকে ফিরিলেন। আমি আর তাঁহাকে কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া তৎক্ষণাৎ

(১) নানকের দ্বিতীয় জনমশাখী গ্রন্থের ৮৬ শাখী দ্রষ্টব্য।

জলে ঝম্ফ দিলাম ও পুষ্করিণী হইতে পাত্রটি উঠাইয়া লইয়া আসিলাম। আমার কাপড় কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল; কিন্তু আমার মনে এজন্য কত আনন্দ হইতে লাগিল।" (২)

গুরু অঙ্গদ ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে (৩) লাহোরের বিশক্রোশ উত্তরে বিপাসা (বিয়াস) নদীর তীরস্থ খাঁড়ুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালাবধি বড়ই ভক্তি-প্রবণ। পূর্ব্বে তিনি হিন্দু দেব-দেবীর অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। একবার তিনি কাঙ্গড়ার জ্বালামুখীতে দেবীপূজার জন্য গিয়াছিলেন। সেখানে নানকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি নানকের গুণমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। (৪) তদবধি তিনি নানকগত-প্রাণ ছিলেন। নানকের কথা অমান্য করিতে তিনি জানিতেন না। গুরুবাক্য আপ্তবাক্য বিবেচনা করিয়া বিনা দ্বিধায় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। নানকের ভ্রমণকালে তিনি তাঁহার সাথী ছিলেন, একথা স্থানান্তরে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তিনি বড়ই সাত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। শিখধর্ম্মের সেবা করিয়াই তিনি জীবনপাত করেন।

পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর বর্ষ বয়সে অঙ্গদ গুরু হইয়া নানক-নির্দ্দিষ্ট কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতে যত্নবান হয়েন। বালার নিকট তিনি নানকের যতটুকু ইতিহাস জানিতে পারিয়াছিলেন ও নিজে যাহা জানিতেন, তৎসমুদয় তিনি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাই আজ নানকের জনমশাখী নামে আমাদিগের নিকট পরিচিত। শুনা যায় যে, তিনিই গুরুমুখী অক্ষরের আবিষ্কর্ত্তা। যাহা হউক শিষ্যদের জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম করিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি গাথাও লেখেন। পরে সেগুলি আদিগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়।

অঙ্গদ শিষ্য-দান গ্রহণ করিতেন না। তিনি ফকিরের বেশে জীবন কাটাইয়াছিলেন। নিজে শিল্পকার্য্য করিয়া যাহা পারিশ্রমিক পাইতেন, তাহাতেই কোনরূপে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইত। দাসু ও দাতু নামে গুরুর দুইটি

(২) Ibia.

(৩) কোন কোন মতে অঙ্গদ ১৫১০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু তাহা ঠিক নয়।

(৪) নানকের প্রথম জনমশাখীতে দেখা যায় যে, ইহার অনেক পূর্ব্বেই খাঁড়ুর গ্রামে একটি শিখের মধ্যস্থতায় উভয়ের প্রথম আলাপ হয়। Vide Adi Granth. Translated into English by E. Triumpp.

পুত্র ছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই সংসারী হন। কেহই পিতার পদাঙ্কানুসরণ করেন নাই। কাজেই পিতা ইহাঁদের কাহাকেও শিখগুরু-পদ দেন নাই। ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব জনৈক শিষ্যকে তিনি গুরুপদ প্রদান করেন। এই শিষ্যের নাম—অমরদাস। অমরদাস গুরুর উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন।

বার বৎসর, ছয় মাস, নয় দিন গুরুপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, গুরু অঙ্গদ ১৫৫২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ আটচল্লিশ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। খাঁড়ুর গ্রামে তাঁহার একটি সমাধি মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অমরদাস।

অমরদাস গুরু অঙ্গদের বড় প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি গুরুর জন্য অসীম পরিশ্রম করিতেন। গুরুভক্তি তাঁহার বড় প্রবল ছিল। গুরুর কার্য্য করিতে তাঁহার যে আনন্দ হইত, সে আনন্দের তুলনা নাই। ভক্ত অমরদাস গুরুকে তুষ্ট করিবার জন্য কত অসম সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। সাত্ত্বিক-প্রকৃতি অঙ্গদ শিষ্যের যথার্থ মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি মৃত্যুকালে অমরকেই গুরুপদ দিয়া যান।

১৫০৯ খৃষ্টাব্দে বাসর্কা গ্রামে ক্ষত্রিয়কুলান্তর্গত ভালাবংশে অমরদাস জন্মগ্রহণ করেন। এই বাসর্কা গ্রাম এখন অমৃতসর জিলার অন্তর্গত। অমর বাল্যকাল হইতে ঈশ্বরভক্ত ও সাধুসঙ্গ প্রয়াসী ছিলেন। সাধুদের সহিত মিশিতে তাঁহার বড় আনন্দ হইত। তিনি হিন্দুদেবদেবীর বড়ই ভক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের তিনি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন। এই শ্রদ্ধাই তাঁহাকে মুক্তির পথে লইয়া গিয়াছিল।

একদা অমরদাস কোন পর্ব্বোপলক্ষে হরিদ্বারে গিয়াছিলেন। সেখানে একটি ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। ব্রাহ্মণ বড়ই শাস্ত্রভক্ত। হিন্দুর রীতি-নীতি মানিতে তিনি বড়ই অভ্যস্ত ছিলেন, কোথাও কোনরূপ ত্রুটি হইতে দিতেন না। তিনি বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া অমরের নিকট জল চাহেন। অমর জল-দানে ব্রাহ্মণকে তৃপ্ত করেন। ব্রাহ্মণ অমরের উপর বড়ই সন্তুষ্ট হন। ব্রাহ্মণ অমরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, অমর সদ্বংশসম্ভূত। তখন অমরের গুরু কে তাহা জানিবার জন্য তাঁহার বড় ঔৎসুক্য জন্মিল। অমর বিনীতভাবে

উত্তর করিলেন যে, তিনি এখনও দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই—তাঁহার গুরু নাই। একথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সহসা চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"হায়! আমি আজ কি পাপ করিলাম! অদীক্ষিত ব্যক্তির হস্তে জল পান করিয়া প্রাণ রাখিলাম! শাস্ত্র-বিধি লঙ্ঘন করিলাম। আমি এ পাপ হইতে কি করিয়া মুক্ত হইব? জল খাইবার সময় ইহার জল খাওয়া উচিত কি না, একবার ভাবিবারও সময় পাইলাম না। হায়!" মর্ম্মবেদনায় ব্রাহ্মণ বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া অমরের বড়ই লজ্জা হইল। আজ তিনি অদীক্ষিত বলিয়া তাঁহার জল ব্রাহ্মণের নিকট অস্পৃশ্য। তিনিও মর্ম্মাহত হইলেন। তখনই ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন, বলিলেন,—"মহারাজ! আমায় ক্ষমা করুন, আমি বাড়ী গিয়াই দীক্ষা গ্রহণ করিব।" (১)

যথাকালে অমর গৃহে ফিরিলেন; কিন্তু পূর্ব্ববৎ মনের সে শান্তি নাই। তিনি দীক্ষিত হইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইলেন। বিশেষ অনুসন্ধানের পর শুনিলেন যে, অদূরে খাঁড়ুর গ্রামে বাবা অঙ্গদ নামে এক গুরু আছেন। তিনি বাস্তবিকই গুরু। দয়া, স্নেহ, ভক্তি, স্থৈর্য্য, সন্তোষ, ক্ষমা প্রভৃতি গুণাবলীতে তিনি বিভূষিত। তাঁহার অমৃতমাখা উপদেশাবলী শ্রবণ করিলে মানব পাপ-বিমুক্ত হইয়া যায়।

অমরের আর বিলম্ব সহিল না। তিনি অচিরাৎ খাঁড়ুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গুরুকে দেখিয়া তিনি তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন,—"প্রভো! আপনার নাম শুনিয়া আমি আত্মার মুক্তির জন্য আপনার পদতলে উপস্থিত হইয়াছি। দয়া করিয়া আমায় দীক্ষা দিন।" অঙ্গদ তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন; তিনি অমরের ভক্তিতে বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। যথাসময়ে অমরের দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইল। এই সময় তাঁহার বয়স একত্রিংশৎ বর্ষ হইয়াছিল। (২)

তদবধি অমর গুরুসেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিলেন। মনঃপ্রাণ দিয়া গুরু-সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি অঙ্গদের ভাণ্ডার হইতে কিছু লইতেন না। অবসর সময়ে লবণ তৈল ঘাড়ে করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন;

(১) E. Triumpp's Translation of Adi Granth.
(২) ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ।

তাহাতে যাহা লাভ হইত, তাহাতেই তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইত। (১) অপর সময় তিনি নানাভাবে গুরুর সেবা করিতেন। কিন্তু এ সেবা এত গুপ্ত ভাবে হইত যে, গুরু তাঁহার কষ্টের সামান্য অঙ্কুশও পাইতেন না। অনবরত বার বৎসর ধরিয়া তিনি এইরূপ ভাবে নীরবে গুরুসেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু গুণ ত সর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন রাখা যায় না; বস্ত্রাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় তাহা যথাসময়ে লোক-নয়ন-পথের পথিক হইয়া পড়ে। তাঁহার সেবার কথাও ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িল। গুরু তখন তাঁহাকে আনন্দে আপনার করিয়া লইলেন।

গুরু প্রত্যহ প্রাতে নদীর জলে পদ-প্রক্ষালন করিতেন। অমর তিনক্রোশ দূরস্থিত বিপাসা নদী হইতে প্রতি রাত্রে জল আনিয়া রাখিতেন। সেই জলে গুরু পা ধুইতেন। একদিন রাত্রে তিনি যথানিয়মে জল আনিতেছেন। সে রাত্রে ভয়ানক ঝড় উঠিয়াছিল। আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন ছিল। তথাপি তিনি তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নদীতে গমন করিয়া জল আনিতেছেন। পথে একস্থানে বড় পিচ্ছিল হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার পা পিছলাইয়া গেল; তিনি পড়িয়া গেলেন। জল-ভাণ্ড চূর্ণ হইয়া গেল। যেখানে এই ঘটনা ঘটে, সেই খানে একটি তন্তুবায়ের বাটী ছিল; তাঁহার নিজের আবাস স্থানও সে স্থানের অতি নিকটেই ছিল। তাঁতিরা তাঁহাকে বিলক্ষণ চিনিত। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী তাহাদের নিকট গুপ্ত ছিল না। অমর পড়িবামাত্র তাঁতি অকস্মাৎ সে পতন-

(১) ইয়ুরোপীয় ঐতিহাসিকেরা অঙ্গদ ও অমরকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন না। তিনি গুরুর সেবার জন্য সামান্য ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করিতেন, ইহাই তাঁহাদের নিকট অগৌরবের বিষয় বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু গুরুকে দাসের ন্যায় সেবা করা কোন ক্রমেই অগৌরবের বিষয় নহে। শিষ্য যতই পণ্ডিত হউক না, সে গুরুর নিকট ক্ষুদ্র; সে প্রকৃত শিষ্য হইলে গুরুকে কখন হীন ভাবিতে পারে না। যাঁহাকে লোকে মহৎ আদর্শপুরুষ বলিয়া ভাবে, তাঁহার সেবার জন্য কোনরূপ হীন কার্য্য করিতে মানব কুণ্ঠিত হয় না, ইহার দৃষ্টান্ত ত ইতিহাসে অনেক দেখা যায়। শুনিয়াছি, মহাত্মা কর্ম্মবীর শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য যাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, তিনি তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য অতি সামান্য কার্য্যে পর্য্যন্ত নিয়োগ করিতেন। শিষ্যত্ব-প্রার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেও তাঁহাকে চাকরের ন্যায় 'এঁটোমুক্ত' উঠান ঝাঁট, বাসন মাজা প্রভৃতি কার্য্য করিতে হইত। এরূপ করিবার অর্থ কি? সর্ব্বজীবে, অন্ততঃ সকল মনুষ্যকে সমান চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে হইলে অভ্যাসের—সাধনার দরকার। এরূপ ব্যবহার দ্বারা সেই সাধনার কতক কার্য্য করা হয়। কাজেই গুরুর তুষ্টির জন্য চাকরের ন্যায় কার্য্য করা হীন নয়।

শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। কে পড়িল জানিবার জন্য সে তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল। রমণী অমরের সব কষ্টের কথাই জানিত। সে উত্তর করিল—'এ আর কেউ নয়, নিশ্চয়ই অমরদাস। বেচারা রাত্রে নিদ্রার সুখ ত জানেই না, আবার দিনেও একটু বিশ্রাম পায় না।' এই সহানুভূতি সূচক কথায় অমরের চরিত্রের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। যাহা হউক, কোন গতিকে রমণীর এই বাণী গুরুর কর্ণে উঠিল। পরদিন অমর যথাসময়ে গুরুসেবার জন্য উপস্থিত হইলে গুরু তাঁহাকে বিশেষ যত্নের সহিত গ্রহণ করিলেন, বলিলেন,—'তুমি এতকাল অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছ; কিন্তু আর নয়, এবার হইতে আর ওরূপ কষ্ট করিও না। আমি তোমায় পালন করিব। আজি হইতে আমার সম্পত্তি তোমার হইল। আর তুমি গৃহ-হীন নও, বরং গৃহহীনের গৃহ হইলে। যে তোমার পশ্চাদনুসরণ করিবে, সেই ঈশ্বরের আশ্রয় পাইবে।' তদবধি অমর অঙ্গদের প্রিয় সহচর হইলেন। অঙ্গদ তাঁহাকে ভাবী গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

১৫৫২ খৃষ্টাব্দে গুরু অঙ্গদ দেহত্যাগ করিলে অমর দাস গুরু হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ৪৩ তেতাল্লিশ বৎসর হইবে। গুরুপদ পাইয়া অমর খাঁড়ুর হইতে উঠিয়া গোবিন্দ বালে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। গুরুরা যখনই যেখানে বাস করিতেন, সে স্থানই তখন শিখদের কেন্দ্রস্থান হইয়া উঠিত। নানকের আমলে কর্ত্তারপুর ও অঙ্গদের সময় খাঁড়ুর শিখদের প্রধান তীর্থ হইয়াছিল। এখন আবার গোবিন্দ বাল সে স্থান অধিকার করিল।

অমর দাস বড়ই শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি বিনয়, ধৈর্য্য ও কর্ম্মের অবতার ছিলেন। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার সময় শিখসংখ্যা অনেক বাড়ে। তিনি শিখদের আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তিনি নানক-প্রদর্শিত ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। শিখধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি ভারতের নানাস্থানে দ্বাবিংশ জন উপযুক্ত শিষ্য পাঠাইয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি গাথাও রচনা করেন। সেগুলি আদিগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। সেগুলির ভাব বড় সরল ও পরিষ্কার।

শিষ্যেরা গুরুকে যে সকল জিনিস উপহার দিত, তাহা হইতে গুরু গোবিন্দ বালে একটি প্রকাণ্ড কূপ খনন করেন। তাহার চারিদিক প্রাচীরে বেষ্টিত। তাহাতে চুরাশিটি সোপান আছে। শিখদের বিশ্বাস এই চুরাশিটি সোপান

অতিক্রম করিয়া কূপের জলে স্নান করিলে ও স্নানান্তে জপজী পাঠ করিলে মানুষ চুরাশি লক্ষ জন্মের দায় হইতে মুক্ত হয়। এই কূপের পার্শ্বে প্রতি বৎসর প্রকাণ্ড মেলা বসিত। আজও এ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। পথিকদের বাসের জন্য কূপের সন্নিকটে একটি ধর্ম্মশালাও তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন।

স্বীয় শিষ্য-সংখ্যা বাড়িতেছে দেখিয়া অমর উদাসী ও শিখদিগকে পৃথক্ করেন। শুনা যায়, মোগল সম্রাট আকবর তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। (১)

অমরের এক পুত্র ও এক পুত্রী ছিল। পুত্রের নাম মোহন। পুত্রীর নাম মোহিনী। সকলে তাঁহাকে ভানী বলিয়া ডাকিত। ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব রামদাসের সহিত এই ভানীর বিবাহ হয়। জামাতা রামদাস গুরুর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। অমর দাস তাঁহাকেই গুরুপদে নিযুক্ত করিয়া ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে ৯৫ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে গোবিন্দ বালে দেহত্যাগ করেন। বাইশ বৎসর পাঁচ মাস এগার দিন তিনি গুরুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

গোবিন্দবালে তাঁহার একটি সমাধিমন্দির স্থাপিত হইয়াছিল; নদীতে তাহা ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার পবিত্র স্মৃতি ত ভাসিয়া যাইবার নয়।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

নব দক্ষযজ্ঞ

বহুকাল পূর্ব্বে সত্যযুগের প্রারম্ভে ভারতে একবার যে দক্ষযজ্ঞের অভিনয় হইয়াছিল, ভারতের ইতিহাস আজিও তাহার ভীষণ কাহিনী বিঘোষিত করিতেছে। তাহার পর কতদিন—কতযুগ চলিয়া গিয়াছে। এতদিন পরে প্রখ্যাত সৌরাষ্ট্র বা সুরাট নগরে আবার এক নূতন দক্ষযজ্ঞের অভিনয় হইল। ভরসা করি, ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বহুকাল পর্য্যন্ত এ চিত্র অঙ্কিত থাকিবে।

পুরাণোক্ত দক্ষযজ্ঞের সহিত এই বিংশ শতাব্দীর দক্ষযজ্ঞের অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ইহাকে দক্ষযজ্ঞ নামে অভিহিত করা গেল। পুরাণবর্ণিত

(১) Cunningham's History of the Sikhs.

দক্ষযজ্ঞ কেবল মাত্র ব্যক্তিগত সম্মান বা জেদ বজায় করিবার নিমিত্তই সংঘটিত হইয়াছিল, আর এই কলির দক্ষযজ্ঞও ঠিক সেই কারণেই সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এ ক্ষেত্রে ছাগমুণ্ডের অধিকারী কে হইল, তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই, তবে অনেক ভৃগুকেই যে শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন হইতে হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞের সহিত এই দক্ষযজ্ঞের একটু প্রভেদ আছে। সে দক্ষযজ্ঞে ভৃগুর শ্মশ্রুগুম্ফ এবং দক্ষের মস্তক ব্যতীত আর কাহারও কোন ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া পুরাণকর্ত্তারা উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু আধুনিক দক্ষযজ্ঞের ইতিহাস লেখকগণ যে ভয়ানক ক্ষতির উল্লেখ করিয়া যাইবেন, তাহা পাঠে ভবিষ্যদ্‌বংশীয়গণ যে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিবে না, তাহা নিশ্চয়।

এখন কথা হইতেছে, এজন্য দোষী কে? মধ্যপন্থী বা চরমপন্থী এই দুই দলের মধ্যে যজ্ঞভঙ্গজনিত অপরাধে কে অপরাধী ইহা লইয়া কাগজে কলমে অনেক আন্দোলন বা বাদানুবাদ চলিতেছে। উভয় দলই প্রমাণ প্রয়োগে দায়িত্বের বোঝাটা ভিন্ন দলের স্কন্ধে চাপাইতে উদ্যোগী। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহারও উদ্যোগ সফল হয় নাই। সফল না হউক, এই ব্যাপার লইয়া কেবল ভারতে নহে, ভারতের বাহিরেও অনেক কল্পনা জল্পনা চলিতেছে। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যে হাসিবার, সে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে, আর যে কাঁদিবার, সে মুখ ফিরাইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে।

এই যজ্ঞভঙ্গ লইয়া অনেকেই অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিতেছেন; কেহ কেহ ইহার মধ্যে নবীন যুগের অভ্যুদয় লক্ষণ দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়াছেন, কেহ বা মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বসূচনা দর্শনে শিহরিয়া উঠিতেছেন। কিন্তু আমরা তো ক্ষুদ্রবুদ্ধি দ্বারা বহু আলোচনা করিয়াও ইহাতে এতদুভয়ের কাহারও কোন অস্তিত্বের চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না। সুতরাং ইহাতে হাসিবার বা কাঁদিবার কি আছে তাহাতো বুঝিতে পারি না। কারণ, কংগ্রেস নামক পদার্থটী যদি বাস্তবিকই দেশের হইত, দেশের লোকের সহিত যদি ইহার কিছু মাত্র সংযোগ বা সহানুভূতি থাকিত, তাহা হইলে বুঝিতাম, এই কংগ্রেস ভঙ্গে— এই দক্ষযজ্ঞে দেশের আশা ভরসার মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে। কিন্তু আমরা জানি, দেশের নাম করিয়া হইলেও কংগ্রেস প্রকৃত দেশের নয়, ইহা 'দেশহিতৈষী' কতিপয় 'বাবু' সম্প্রদায়ের; ইহা দেশের প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র নয়, বাবুদের বড়দিনের একটা উৎসব বিশেষ। মাহেশের দ্বাদশ গোপাল যেমন এক সম্প্রদায়ের

কুৎসিৎ আমোদ প্রমোদের লীলাস্থল, বড়দিনের উৎসবে কংগ্রেসও তেমনই এই বাবু সম্প্রদায়ের উইল্‌সনের খানা ধ্বংস ও তাহার উদ্গার স্বরূপ কয়েকটা বাঁধি গৎ গাহিবার একটা মেলা মাত্র। সুতরাং ইহার সফলতা বা বিফলতায় দেশের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি আছে বলিয়া বোধ হয় না।

আমরা যে কংগ্রেসের বিরোধী বলিয়া একথা বলিতেছি এমন নহে, স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিতে গেলে ঠিক্ এই কথাটাই সত্য বলিয়া বোধ হয় না কি? আমরা জানি, যাহা দেশের কাজ তাহাতে ব্যক্তিগত মানাপমান বা লাভালাভের প্রত্যাশা থাকিতে পারে না। যে দেশের মঙ্গলের জন্ম হাসিতে হাসিতে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া যায়, সেই দেশের নিকট আমার আমিত্ব কতটুকু? এই আমিত্বটুকু বিসর্জ্জন দিলে যদি দেশের কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তবে কোন্ বুদ্ধিমান দেশহিতৈষী ব্যক্তি সে স্থলে আপনার জেদ বজায় রাখিতে চেষ্টা করে? কিন্তু বর্ত্তমান কংগ্রেস ক্ষেত্রে কি এই নীতিটুকু প্রতিপালিত হইয়াছিল? মধ্যপন্থীই বল আর চরমপন্থীই বল কোন পন্থীই কি এই জেদটুকু ছাড়িয়া আপনাকে ও কংগ্রেসকে দেশের প্রকৃতকার্য্য বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারিয়াছিল? কেন পারে নাই? কেন পারে নাই তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কংগ্রেস দেশের নয়, বাবু সম্প্রদায়ের উৎসব ক্ষেত্র। সাম্প্রদায়িক কার্য্যে কেহ আত্মসম্মান ত্যাগ করিতে পারে না। পারে না বলিয়াই আজি কংগ্রেস পণ্ড হইল, তাহা দক্ষযজ্ঞে পরিণত হইল, দেশের কাজ হইলে উহার পরিণাম কখনই এরূপ হইত না।

যাহা দেশের কাজ নয়, তাহা লইয়া আমাদের আলোচনা করিবার কারণ এই যে, এই ব্যাপারে দেশের মধ্যে একটা বিষম আত্ম-কলহের সৃষ্টি হইতেছে। যে আত্মকলহের জন্য আমরা আজি পরপদানত, স্বদেশ বিদেশ সর্ব্বত্রই উপহাসাস্পদ, সেই আত্মকলহের প্রবল বহ্নি আবার ধীরে ধীরে প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছে। আর সেই কাল-অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতেছেন কাহারা? যাঁহারা দেশের আশা ভরসার স্থল, যাঁহাদিগকে দেশের লোক নেতা বলিয়া দেশের মস্তক বলিয়া জ্ঞান করে তাঁহারা। সাধারণে যাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করিবে, তাঁহারা আজি যে সাধুজনবিগর্হিত পথে অগ্রসর হইয়াছেন, যে কুৎসিৎ নীতির অনুসরণ করিতেছেন, তাহা দেখিলে কাহার না দুঃখ হয়! এই দুঃখেই আমাদিগকে বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হইল।

এক্ষণে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদিগের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন, দেশের এই দুর্দ্দিনে দেশের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহারা এই আত্মকলহ হইতে

নিরস্ত হউন; কংগ্রেস ভঙ্গের জন্য যিনিই দোষী হউন তাহার নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া বৃথা আত্মকলহাগ্নির সৃষ্টিতে ফল কি? এ অগ্নি যত সত্বর নির্ব্বাপিত হয় ততই মঙ্গল। আর এক শ্রেণীর লোক—যাঁহারা দূরে বসিয়া মধ্যস্থরূপে এই বিদ্বেষবহ্নিতে ফুৎকার দিতেছেন, তাঁহারাও ক্ষান্ত হউন।

কংগ্রেস ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া নিরাশার কোন কারণ নাই। কংগ্রেসে সীমাবদ্ধ স্থানে যে মন্ত্র প্রচারিত হইত, আইস, আশায় বুক বাঁধিয়া, অসীম কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া, দেশে দেশে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে, কুটীরে কুটীরে সেই মহামন্ত্রের প্রচার করি—জাতীয় মহাসমিতি নাম সার্থক করি। সান্ত কংগ্রেস ভাঙ্গিয়াছে, আইস, সকলে প্রাণান্ত চেষ্টায় অনন্ত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের জাতীয়তা, ভারতের শক্তি, ভারতের একতার উদ্বোধন করি!

রাজকন্যা সরোজাক্ষী।

—:০:—

অসংখ্য দাসদাসী-পরিবৃত রাজপরিবার মধ্যে যে সুকুমার দেহ শৈশব হইতে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত হইয়া আসিয়াছিল, যে কনককমল দিন দিন শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া রাজহর্ম্ম্যের বিলাস কক্ষ সুশোভিত করিয়াছিল, যাঁহার শিল্পচাতুর্য্য, মিষ্টান্ন প্রস্তুত প্রণালী স্থানীয় সম্ভ্রান্ত কুলললনাগণ আদর্শ করিয়া রাখিয়াছেন, যাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যের কথা স্মরণ করিয়া আজও পর্য্যন্ত ভদ্র অভদ্র সুখী দুঃখী সকলেই বাষ্পপরিপূরিত লোচনে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, যিনি আদর্শ সতী,—সেই প্রাতঃস্মরণীয়া রাজকন্যা সরোজাক্ষীর পতিভক্তি সম্বন্ধে গুটিকতক কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমি আজ অনেক বৎসর ধরিয়া একরূপ সন্ন্যাসীর ন্যায় নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। হিন্দু পরিবারবর্গের মধ্যে প্রাচীন রীতি নীতি লক্ষ্য করা আমার জীবনের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

অর্থের সহিত প্রতীচ্য সভ্যতা বিজড়িত হইয়া অনেক ধনী গৃহস্থকে ঋণের পথে ধীরে ধীরে প্রধাবিত করিতেছে বটে, কিন্তু তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, আজও পর্য্যন্ত হিন্দু রমণীগণই হিন্দুর ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুর

দয়া, হিন্দুর ধর্ম্ম হিন্দুর সতীত্ব একাল পর্য্যন্ত হিন্দু-রমণীগণের কোমল হৃদয় হইতে অপহৃত হইতে পারে নাই বলিয়াই হিন্দু-সমাজের অস্তিত্ব অদ্যাপিও চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। নতুবা অপরাগত আলোকে আমরা এতদিন কোথায় ভাসিয়া যাইতাম তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সধবা বল, বিধবা বল, অনেক হিন্দু মহিলার পতিভক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি বটে, কিন্তু রাজার ঘরে এরূপ আদর্শ সতী ত কোথাও অবলোকন করিলাম না বা শ্রুতিগোচর হইল না। সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি পৌরাণিক সতীবৃন্দের সহিত তুলনা না হইলেও আমাদের রাজকন্যার একটী দৃশ্য,—একটী অমৃতময়ী বাণী যাহা মৃত্যুকালে স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি তাহা প্রত্যেক হিন্দু-রমণীরই অনুকরণীয়। আমি আশা করি, সরোজাক্ষীর এই সংক্ষিপ্ত জীবনী সহৃদয় পাঠক পাঠিকার অন্তরে এক পবিত্র রেখাপাত করিবে।

মুর্শিদাবাদে পলাশী যুদ্ধক্ষেত্রের পাদদেশ ধৌত করিয়া ভাগীরথী নদী সর্পের ন্যায় আঁকিয়া বাঁকিয়া তর তর করিয়া কাটোয়াভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে, দুই পার্শ্বে স্তূপীকৃত শুভ্র বালুকারাশি যেন ভাগীরথীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। পলাশীর সেই প্রকাণ্ড আম্রকাননের কোন চিহ্ন এখন আর দৃষ্টিগোচর হয় না। সে ক্লাইবও নাই, সে আশ্রয়দাতা আম্রকাননও নাই,—আছে কেবল বাঙ্গালীর অপমান আর ইংরাজের বৃথা গর্ব্ব। বড়লাট কুর্জ্জনের নবনির্ম্মিত ক্ষুদ্র মনুমেণ্টটী-ই বর্ত্তমানে সেই অতীত কাহিনীর পরিচয় দিবার জন্য নির্জ্জনে নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই পলাশীক্ষেত্রের উত্তরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হীজলের প্রকাণ্ড বিল, এই বিলের পশ্চিম পার্শ্বস্থ আন্দুলিয়া গ্রামে রাজা ভীম রায় অতীত কালে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা ভীম রায় অনেক সুকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নির্ম্মিত সুবিস্তৃত পরিখা এবং দীর্ঘ দীঘী আজও পর্য্যন্ত এখানে ভীমিরা গড় ও ভীমিরা দীঘী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার অন্তর্গত পরগণে ফতে সিংহ মধ্যে রুদ্রদেবের মন্দির ও সম্পত্তি ভীম রায়ের আর একটী পরিচয়। রাজা ভীম রায়ের পরবর্ত্তী বংশধরগণ কান্দী মহকুমার অধীন জেমোগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। এই রাজবংশে রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের ঔরসে ১২৬৭ সাল ৪ঠা পৌষ রাজকন্যা সরোজাক্ষীর জন্ম হয়।

সরোজাক্ষীর জননীও বাঘডাঙ্গার রাজবাটীর তৃতীয়া রাজকন্যা ছিলেন, সুতরাং পিতৃমাতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সরোজাক্ষী সম্পদ ও বিলাসসাগরে অবগাহন

করিয়া আসিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দুঃখ বলিয়া কোন বস্তু তাঁহার বিলাসসম্ভোগময় কোমল হৃদয় স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় নাই। এদেশে দুলালকালী নাম্নী এক দেবী আছেন, এখানকার লোকে অসময়ে দুলাল কালীর মানত করিয়া সকলকাম হইয়া থাকে।

যেদিন সরোজাক্ষীর জন্ম হয় তৎপূর্ব্ব দিবস রাত্রে তাঁহার জননী স্বপ্ন দেখেন যেন দুলালমণি তাঁহার গর্ভে আসিয়াছেন। সরোজাক্ষীর জন্ম রহস্য সম্বন্ধে এদেশে আরও একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। রাজকন্যার জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই এক অশীতিবর্ষীয়া তৃষ্ণাতুরা বৃদ্ধা রাজবাটীতে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করে। বুড়ির নিবাস কোথায় জিজ্ঞাসা করা হইলে বুড়ি বলিল, "বাবা আমি দুলালকে দেখিবার জন্য বহুদূর হইতে এখানে আসিতেছি, আমার পিপাসা পাইয়াছে। আগে একটু খাবার জল দাও, পরে সব বলিব, আমি আজ এখানে থাকিব।" বৃদ্ধার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই অন্দরে হুলুধ্বনি পড়িয়া গেল, নহবত খানায় নহবত বাজিয়া উঠিল, আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণগণ নির্ম্মাল্য হস্তে রাজবাটী অভিমুখে ছুটিতে লাগিলেন, কাঙ্গালী সমাগমে রাজবাটী পরিপূর্ণ হইল। সদর অন্দর বাজনায় তোলপাড় হইয়া উঠিল। কাজে কাজেই তখন আর বৃদ্ধার পিপাসার কথা কাহারও স্মরণ থাকিল না। সকলে সুস্থ হইলে তখন বৃদ্ধার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। কোন কোন দাসদাসী, বলাবলি করিতে লাগিল, বুড়ি নাকি সাঁপাসাঁপি করিয়া গিয়াছে; কন্যার বুঝি মঙ্গল হইবে না। অন্তর্হিতা বৃদ্ধার আর কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। রাজবাটীর হর্ষ বিষাদে পরিণত হইল।

কি জানি কেন বলিতে পারি না সেই দিন হইতে সরোজাক্ষীর প্রতি রাজা নরেন্দ্র নারায়ণের কেমন এক প্রকার অপার্থিব স্নেহের আবির্ভাব হইল। তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যাকে এক দণ্ডও চক্ষের অন্তরাল করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বুঝি পিতার এই অতিরিক্ত স্নেহই কন্যার সুখের পথে কণ্টক হইয়া উঠিয়াছিল।

সরোজাক্ষী যেমন রূপবতী তেমনই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্না ছিলেন, রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ পণ্ডিত রাখিয়া কন্যাকে সংস্কৃত শিক্ষা দিলেন। মুর্শিদাবাদের নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া বহুবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করাইতে শিখাইলেন, কলিকাতা হইতে মেম সাহেব আনাইয়া উলের ও সূতার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শিল্প-কার্য্য শিক্ষা দিলেন। বালিকা সরোজাক্ষী ১৩শ বৎসরের মধ্যেই এই ত্রিবিদ্যায় অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, ইহার একটীও অতিরঞ্জিত নহে।

তাঁহার শিল্পকার্য্য ও প্রস্তর-খোদিত লতাপাতার নক্সা গুলি অবলোকন করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। রাণীমাতা আজও বলিয়া থাকেন যে, মেম সাহেব রাজকন্যার আগ্রহ ও ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া মাঝে মাঝে বিরক্ত হইয়া পড়িত, কারণ যে সমস্ত কারুকার্য্য শিক্ষা করিতে প্রায় ১ মাস লাগিত তাহা দশ দিনের ভিতর সম্পন্ন করিয়া রাজকন্যা আবার নুতন শিক্ষার জন্য মেম সাহেবকে জিদ করিতেন। বেদ হইতে কতকগুলি উপনিষদ্ সংগ্রহ করিয়া রাজকন্যা নিজে সেগুলির যে সমস্ত সরল ব্যাখ্যা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া পড়িতে হয়।

এতদ্ভিন্ন গীতা ও শঙ্করাচার্য্য হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া তদ্দ্বারা যে একটী উপাদেয় প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বালিকার শৈশবে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া তিনি কবিতা লিখিতেও সুপটু ছিলেন, তাঁহার রচিত প্রসাদী সুরের কয়েকটী শ্যামা বিষয়ক গান পাঠ করিলে সকলেরই ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিতার অস্বাভাবিক ভালবাসাই এই সর্ব্বগুণসম্পন্না বালিকার সুখের পথে কণ্টক হইয়াছিল। কিন্তু আবার ইহাও যথার্থ যে, যদি এই অসামান্য স্নেহ ও সম্পদের মধ্যে থাকিয়া তিনি উপযুক্ত স্বামীর উপযুক্ত ভাল বাসায় অভিভূতা হইয়া পড়িতেন, তবে তাঁহার শৈশবের অপূর্ব্ব গুণরাশি রাজ-সম্পদ ভেদ করিয়া মৃগনাভির ন্যায় সদ্‌গন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িত কি না সন্দেহ স্থল। আজ তিনি দেবীস্থানীয়া হইয়া হিন্দু মহিলাগণের হৃদি-অন্তঃপুরে প্রতিষ্ঠিতা হইতে পারিতেন কিনা ঠিক বলা যায় না।

রাজকন্যার বিবাহের জন্য অনেক রাজা রাজড়ার পত্র উপস্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ মমতার বশবর্ত্তী হইয়া ঠিক করিলেন যে, সরোজকে কোন রাজা রাজড়ার ঘরে বিবাহ দিবেন না, অন্য স্থান হইতে সৎপাত্র আনাইয়া নিজের বিষয় সম্পত্তি দিয়া ঘর জামাই করিয়া রাখিবেন। রাজার এই মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল। তিনি বহুদূর হইতে একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান আনাইয়া স্বগ্রামে স্থাপন করিলেন, তাঁহার নাম পরেশনাথ। পরেশনাথের সহিত রাজকন্যা সরোজাক্ষীর পরিণয় কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। রাজা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পরেশনাথকে লেখাপড়া শিক্ষা দিলেন। কিন্তু পরেশনাথ সঙ্গদোষে নষ্টচরিত্র হইয়া পড়িলেন। পরেশনাথ বড় ক্রুদ্ধ স্বভাব ছিলেন। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ পৃথক্ বিষয় সম্পত্তি বাড়ী বাগান প্রস্তুত করিয়া

দিলেন, কিন্তু পরেশনাথ তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। ভালবাসার বশবর্ত্তী হইয়া রাজা জ্যেষ্ঠা কন্যাকে অধিক সময় নিজের কাছে রাখিতেন। সরোজাক্ষী প্রায়ই রাজবাটীতে থাকিতেন। পরেশনাথ এই সমস্ত কারণে দিন দিন বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই সামান্য কারণ উপলক্ষ্য করিয়া পরেশ নাথের সহিত রাজার মনোমালিন্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। একদিন রাত্রে পরেশনাথ কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া, স্বদেশে প্রস্থান করিলেন, এবং সেখানে গিয়া দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন। তিনি এদেশের মায়া পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু রাজা মধ্যে মধ্যে অনেক অর্থব্যয় করিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া এক আধবার তাঁহাকে এদেশে আনিতেন, তিনি কিছুদিন এদেশে থাকিয়া রাজকন্যার নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রস্থান করিতেন। এইরূপে মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইতে থাকিল, আর রাজকন্যারও সুখশান্তি এই সঙ্গে ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া পড়িতে লাগিল। এই অশান্তির মধ্যেই যেন রাজকন্যার সমস্ত শান্তি মিশ্রিত ছিল, এই সময়েই রাজকন্যার দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও সংস্কৃত চর্চ্চার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সে সমস্ত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। সরোজাক্ষীর কয়েকটী সন্তানসন্ততি শৈশবেই কাল-কবলিত হইয়াছিল, স্বামীর অসৎ ব্যবহারে ও পুত্র কন্যাগণের অকাল মৃত্যুতে সাংসারিক কাজ কর্ম্মের প্রতি যতই দিন দিন বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিলেন, ততই তাঁহার উচ্চ হৃদয় স্বামিভক্তি ও দেব-ভক্তিতে মাতোয়ারা হইয়া পড়িতে লাগিল। স্বামীনিন্দা শ্রবণ করিলে তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না, এমন কি সে দিন তিনি ভালরূপ করিয়া আহার পর্য্যন্তও করিতেন না। যে দিন বাটীর দশজনে স্বামীর দুর্ব্ব্যবহারের কথা তুলিয়া রাজকন্যার সমক্ষে তাঁহার নিন্দা করিত, সে দিন প্রাণান্তেও তিনি অন্নজল মুখে দিতেন না। সরোজাক্ষীর জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম শ্যামা ছিল। শ্যামা প্রায় তিন মাস কাল দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। শ্যামা শৈশব হইতে একখানি অন্নপূর্ণার পট বড় ভালবাসিত। শ্যামার মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে রাজ বাটীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ক্রন্দন করিতেছেন, আর শ্যামার জননী সরোজাক্ষী স্থির হইয়া কন্যার সর্ব্বাঙ্গে চন্দন দ্বারা রাম নাম লিখিয়া দিয়া বলিতেছিলেন, "মা, আমার জন্য কাঁদিও না। এই দেখ আমার চক্ষে ত জল নাই, আমি তোমার মা, আমি কাঁদিতেছি না, তবে মা তুমি দুঃখ

করিতেছ কেন? তুমি যে শ্যামা সন্ধানে চলিতেছ; যাও মা, আমিও তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। এ সময় ভয় করিও না, ভয় করিলে অমঙ্গল হয়। শ্যামা মা আমার! তুমি যে অন্নপূর্ণা পূজা করিতে, অন্নপূর্ণার ছবি বড় ভালবাসিতে; এই দেখ অন্নপূর্ণার পট তোমার হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছি, মা শ্যামা, এই পট স্পর্শ করিয়া প্রার্থনা কর, অন্নপূর্ণা তোমাকে মুক্ত করুন। মা, আর এ সংসারে আসিবার প্রার্থনা করিও না, এ মায়াময় সংসারের সমস্তই দুঃখে পরিপূর্ণ, এ সংসারে আসিয়া আমরা প্রায়ই উর্দ্ধে উঠিতে পারি না, মায়ার ঘোরে ক্রমশঃ নরকের পথেই অগ্রসর হইতে থাকি।"

কন্যার অকল্যাণ স্মরণ করিয়া, রোরুদ্যমান আত্মীয় স্বজনকে দূরে যাইতে আদেশ দিয়া, দুঃখিনী রাজকন্যা একাকিনীই মৃত্যুমুখী যোড়শবর্ষীয়া কন্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে জন্মের মত বিদায় দিলেন। তাঁহার নয়নে একবিন্দুও অশ্রুপাত হইল না বটে, কিন্তু সেই অবসাদগ্রস্ত প্রশান্ত আনন অবলোকন করিয়া যে অতি নিষ্ঠুর, তাহারও অন্তরে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল। বড় সুখের বিষয় যে, রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ তখন আর এ পৃথিবীতে ছিলেন না, তাঁহার বড় আদরের বড় স্নেহের জ্যেষ্ঠ কন্যার শোচনীয় পরিণাম তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিতে হয় নাই।

ক্রমশঃ।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

চিনির কথা।

আজি প্রায় দুই বৎসরের অধিককাল বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য, যাহাতে দেশের অর্থ দেশেই থাকে, বিদেশীর হস্তগত না হয়। তবে দেশের অর্থ একেবারেই যে বিদেশীর হস্তে যাইবে না এরূপ নহে, ইহার মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা যতদূর পারা যায়, বিদেশীর গ্রাস হইতে আপনাদের স্বার্থটুকুকে রক্ষা করিতে হইবে। বিদেশীর অবাধ বাণিজ্যের প্রভাবে দেশ ক্রমেই নিরন্ন হইয়া পড়িতেছে, দেশীয় দ্রব্য সমূহের প্রচলন ও ব্যবহার দ্বারা দেশকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। এই উদ্দেশেই স্বদেশী আন্দোলন এবং বয়কটের উৎপত্তি।

এক্ষণে ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, আমাদের এই উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সুসিদ্ধ হইয়াছে, কি পরিমাণে বৈদেশিক দ্রব্যকে আমরা দেশ হইতে

দূরীভূত করিয়া তাহার স্থলে দেশীয় দ্রব্যকে স্থাপিত করিয়াছি। প্রধানতঃ কাপড়ের ব্যবসায়েই বৈদেশিকগণ এদেশ হইতে বহু পরিমাণে অর্থ শোষণ করিতেছিলেন, কিন্তু এই দুই বৎসরের মধ্যে আমরা তাহার অনেকটা প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছি। যদিও এখনও বিলাতি কাপড়ের আমদানি ও ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে, তথাপি পূর্ব্বের তুলনায় তাহা কিছুই নহে, এবং আমরা সহিষ্ণুতার সহিত অগ্রসর হইতে পারিলে এটুকুও আর থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না।

কাপড়ের পরই চিনি। চিনিতেও বড় কম টাকা বিদেশে যায় না। তাহা ছাড়া বৈদেশিক চিনি যে সকল উপাদানে প্রস্তুত, তাহা আমাদের ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য উভয়েরই অনুকূল নহে। কিন্তু এই চিনির সম্বন্ধে আমরা এখনও কিছু করিয়া উঠিতে পারি নাই। বাজারে বিদেশী চিনিই প্রায় সর্ব্বত্র চলিতেছে, দেশী চিনি নাই বলিলেই হয়। অনেক স্থলে আবার বিদেশী চিনিই দেশী নামে বিক্রীত হইতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এদেশে চিনির কারবার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে শান্তিপুর, কোটচাঁদপুর, সুখচর প্রভৃতি স্থানে চিনির বড় বড় আড়ত ছিল, কিন্তু বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে না পারিয়া অনেক দিন আগেই সে সমস্ত আড়ত উঠিয়া গিয়াছে। এখন আবার নূতন করিয়া পত্তন করিতে না পারিলে দেশী চিনির অভাব মোচন হইবে না।

কিন্তু নূতন করিয়া পত্তন করিতে হইলে মূলধনের প্রয়োজন। দেশের ধনী সম্প্রদায়ই এই মূলধন যোগাইতে সমর্থ। কিন্তু আমরা জানি, বর্ত্তমান ধনী সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ব্যবসা বাণিজ্যের গোলযোগে যাওয়া অপেক্ষা কোম্পানীর কাগজের সুদকেই অধিকতর নিরাপদ জ্ঞান করেন। সুতরাং মূলধনের অভাবে কেবল চিনি কেন, কোন বিস্তৃত কারবারই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। এ অবস্থায় যৌথ কারবার চলিতে পারে। কিন্তু যৌথ কারবারের উপর এদেশের লোকের সেরূপ আস্থা বা আগ্রহ নাই। পূর্ব্বে কয়েকটী যৌথ কারবার ফেল হওয়ায় ইহার উপর লোকের অশ্রদ্ধা হইয়াছে।

আর এক কথা, আমাদিগকে এখন বৈদেশিক চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে বৈদেশিক যন্ত্রাদির সাহায্য লইতে হইবে। নতুবা আমরা কিছুতেই এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। বৈদেশিক যন্ত্রাদির সাহায্যে বিস্তৃতরূপে কারবার চালাইতে পারিলে ইহাতে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা। দেশের ধনিগণ যদি কোম্পানীর কাগজের সুদের মায়া কাটাইয়া এ বিষয়ে মনোযোগী হন,

তবে তাঁহাদের প্রচুর অর্থাগমের সহিত দেশেরও ধর্ম্ম অর্থ উভয়ই রক্ষা পায়। এ সম্বন্ধে কিরূপ ভাবে কার্য্য করিতে হইবে এবং তাহাতে লাভের সম্ভাবনা কিরূপ, আমরা পত্রান্তর * হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(ক) প্রধানতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়—জমিতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইক্ষু আবাদ করিয়া তাহা ষ্টীম পরিচালিত কলের সাহায্যে মাড়িয়া ইক্ষুরস হইতে একবারে চিনি প্রস্তুত করা—ইহাতে চিনি প্রতিমণ ২॥০, ৩৲ টাকা খরচে প্রস্তুত হইতে পারে।

(খ) এতদভাবে ইক্ষু খরিদ করিয়াও কাজ চালান যাইতে পারে—ইহা মধ্যমতর উপায়—ইহাতে প্রতি মণে ৬৲, ৬।০ টাকা হিসাবে পড়তা হইবে।

উপরি উক্ত উপায় অত্যন্ত সহজ হইলেও সাধারণ গৃহস্থ বা অল্প পরিমাণে প্রস্তুতকারকদিগের আয়ত্তাধীন নহে। জমিদার, ধনী মহাজন বা যৌথকারবারী কেবল ইঁহারাই মনোযোগ করিলে উক্ত উপায়ে অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইবেন। যেহেতু একটী সামান্য কারখানা স্থাপন করিতে হইলেও অন্ততঃ পশ্চিমাঞ্চলের মাপের ৪০০/০ চারিশত বিঘা জমি আবশ্যক। প্রতি বৎসর ২০০/০ দুইশত বিঘা জমিতে ইক্ষু আবাদ করিতে হইবে। অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ আগামী বৎসরের ইক্ষু উৎপাদনের উপযোগী করিতে হইবে। ১৫ই পৌষ হইতে ১৫ই চৈত্র পর্য্যন্ত ইক্ষু মাড়াই করিবার প্রশস্ত সময়। এই অল্প কালের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে হইলে তদুপযোগী নবাবিষ্কৃত যন্ত্রাদির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

১। যন্ত্রাদি।

প্রধানতঃ steam পরিচালিত crushing plant (মাড়াই কল) একটী এবং vacuum pan একটী বিশেষ আবশ্যক, এই দুইটা অধিক মূল্যবান। তদ্ব্যতীত turbine (তুরপিন) ২।১টী ও অন্যান্য খুচরা কয়েকটী জিনিস অল্প ব্যয়েই হইতে পারে। সর্ব্ব মোট আনুমানিক ৩০০০০৲, ৩৫০০০৲ টাকা মূল্যের যন্ত্রাদির সাহায্যে ২০০ দুইশত বিঘার উৎপন্ন ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুতকার্য্য সমাধা হইতে পারে। এই উপায়ে প্রত্যহ আন্দাজ ১০০ মণ চিনি প্রস্তুত হইবে।

২। আবাদের প্রণালী।

সাধারণ গৃহস্থেরা বা কৃষকেরা যেরূপ ভাবে আবাদ করে, তাহা অপেক্ষা

---

* প্রবাসী।

উন্নত (বৈজ্ঞানিক) উপায়ে আবাদ করিতে হইবে। কৃষকেরা সারাদি (manure) অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ, এবং যাহা কিছু অভিজ্ঞতা আছে—তাহাও অর্থাভাবে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে অক্ষম, সুতরাং ইহাদের দ্বারা আশানুরূপ ফলোৎপাদনের সম্ভাবনা নাই। যদি জমিতে সময়ানুযায়ী আবশ্যক মত সারাদি নিক্ষেপ করা যায় এবং জমির উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধির অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা যায় তাহা হইলে শেষে অত্যধিক পরিমাণে ফললাভ হইবে। সর্ব্ব প্রথমে এ বিষয়ে লক্ষ্য থাকা উচিত।

৩। ইক্ষুমাড়া।

গৃহস্থেরা গরু দ্বারা চালিত যন্ত্রে মাড়াই করে। ইহাতে ১০০/০ মণ ইক্ষু হইতে প্রায় ৫০/০ মণের অধিক রস বাহির হয় না। কিন্তু বাষ্পপরিচালিত পেষণযন্ত্রে ঐ পরিমাণ ইক্ষু হইতে ৮০/০ মণ পর্য্যন্ত রস বাহির হইতে পারে অর্থাৎ দেড় গুণ অধিক রস পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্রকরণে আবাদ ও এই প্রকারে মাড়াই হইলে উৎপন্ন রস সাধারণতঃ গৃহস্থেরা যে পরিমাণে পাইয়া থাকে, তাহার দুই তিন গুণ অধিক হইবে। রসই চিনির উপাদান— আমাদিগের দেশে এত রস কম আদায় হয় বলিয়াই চিনির দাম এত বেশী পড়িয়া যায়।

৪। রস হইতে একবারে চিনি।

গৃহস্থেরা ইক্ষুরস হইতে রাব বা গুড় তৈয়ারি করিতে প্রতি মণ প্রায় ১৲ টাকা হিসাবে খরচ করিয়া থাকে ; ইহাতে চিনির মূল্য ২॥০,৩৲ টাকা বেশী হয় ; কারণ ২॥০ মণ ৩/০ মণ রাব বা গুড় না হইলে ১/০ মণ চিনি হয় না। যখন একবারে রস হইতে চিনি প্রস্তুত হইতে পারে, তখন গৃহস্থেরা রাব তৈয়ারি করিতে যে খরচ করে, তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক। যে খরচে রাব হয়, সেই খরচেই নূতন উপায়ে চিনি তৈয়ারি হইতে পারে।

৫। পাক-প্রণালী।

দেশীয় প্রণালীতে আমরা চিনি কম পাই, তাহার প্রধান কারণ আরও দুইটী :—

(ক) চিনি সত্ত্ব প্রস্তুত না হওয়ায় রসে এসিডের বা অম্লের অংশ বেশী জন্মায়—অম্লাধিক্য হইলে চিনি উৎপন্ন কম হয়।

(খ) রসটী তিনবার কড়া জ্বালে পাক করিতে হয় (ইহাতে চিনির রং অপেক্ষাকৃত কাল হয়) এবং কড়াপাকে কতক অংশ জ্বলিয়া যাওয়ার উৎপন্ন

চিনির পরিমাণও কম হয়। কিন্তু ষ্টীম পরিচালিত Vacuum Panএর পরিমিত আঁচে একবার মাত্র পাকাইলেই ঐ উপাদান হইতেই পরিষ্কার চিনি অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে। সুতরাং এই পাক-প্রণালীই উত্তম ও লাভজনক।

৬। রিফাইন বা পরিষ্কারকরণ।

বিদেশে যে সকল চিনি প্রস্তুত হয় তাহা প্রায়শঃ Bone Charcoal বা হাড়ের কয়লার দ্বারা পরিষ্কৃত হয়। আমাদের দেশীয় প্রথা মতে এই অস্পৃশ্য বস্তুর কোন আবশ্যক নাই। ইহার পরিবর্ত্তে সাধারণ শেওলা (বা পাটা বা সিমার) দ্বারা অতি সুন্দররূপে, বিশুদ্ধভাবে চিনি পরিষ্করণের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। ইহা অপেক্ষা সহজ ও উৎকৃষ্টতর উপায় আর দেখা যায় না। বিদেশী চিনি দেখিতে যতই পরিষ্কার হউক, উহার স্থায়িত্বগুণ কম, অল্প সময়ের মধ্যে বস্তা রসিয়া যায় ও এসিড আক্রমণ করে। তখন ঐ চিনি হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়; সুতরাং পূর্ব্বেকার ন্যায় তত কার্য্যোপযোগী থাকে না। কিন্তু শেওলা দ্বারা পরিষ্কৃত দেশী চিনি অনায়াসে তদপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী হয় এবং তাহাতে সদ্‌গন্ধ ব্যতীত কখন কোন প্রকার দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না। অতএব রিফাইন করা সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় প্রথাই সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য।

আমরা বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যে সকল কারণে সমর্থ নহি, তাহা—প্রথমতঃ, আবাদের সময় জমির উর্ব্বরতার প্রতি লক্ষ্য না থাকায় উৎপন্ন কম হয়, দ্বিতীয়তঃ, মাড়াই কার্য্যের অসম্পূর্ণতা হেতু রস অনেক কম পাওয়া যায়; তৃতীয়তঃ, কড়াপাকে রস জ্বাল দেওয়ার দরুণ রং খারাপ হয় এবং অনেক জলতি বাদ যায়, আর গুড় করিয়া তাহা হইতে চিনি তৈয়ারি করিলে তদুপরি আরও কিছু অনর্থক খরচা বাড়িয়া যায়। অতএব দেখা গেল, নিম্নলিখিত উপায়ে পূর্ব্বোক্ত ব্যাধিসমূহের প্রতীকার হইতে পারে;—

(১) নিজ আয়ত্তাধীন উপযুক্ত পরিমাণ জমি রাখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদ করা।

(২) ষ্টীম পরিচালিত কলে মাড়াই কার্য্য সম্পন্ন করা।

(৩) ষ্টীমের আঁচে Vacuumএ রস পাক করা।

(৪) শেওলা দ্বারা রিফাইন করা।

তাহা হইলেই অতি সুলভে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ চিনি নিঃসন্দেহে পাওয়া যাইবে।

আমরা কারবারসূত্রে ত্রিহুত অঞ্চলের সাকরি মোকামে আছি। এখানে

অধিক পরিমাণে ইক্ষুর আবাদ হয় সুতরাং রাব ও (গুড়) পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। গত পৌষ মাসে আমরা উপরি উক্ত প্রণালীতে ইক্ষুরস হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার Experiment করিয়া বেশ কৃতকার্য্য হইয়াছি। অবশ্য আমাদের আবশ্যকীয় যন্ত্রাদির অভাবে সাধারণ নিয়মে বলদের দ্বারা ইক্ষু মাড়াই করিতে হইয়াছিল এবং কড়া পাকে রস জ্বাল দিতে হইয়াছিল। পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল—

পরীক্ষার ফলাফল।

১০০/০ মণ ইক্ষু ত ৬২॥০ মণ রস বাহির হইয়াছিল। ঐ রস হইতে ৬।০ মণ চিনি ও (৬।০ মণ সিরা বা চোটা) পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঐ পরিমাণ রসে রাব প্রস্তুত করিয়া চিনি করায় ৪।০ মণের অধিক মাল পাওয়া যায় নাই। উৎপন্ন চিনি, উৎকৃষ্ট বেনারস চিনি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

বিনা কলের সাহায্যে কেবলমাত্র চিরপ্রচলিত সাধারণ উপায় অবলম্বন করিয়া যখন আমরা রস হইতে একবারে চিনি করিলে প্রায় ২/০ দুই মণ চিনি উৎপন্ন বেশী পাইতেছি, তখন আধুনিক কলকারখানায় উন্নত উপায়ে আরও বেশী ফললাভ করিব তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? ইহাও বক্তব্য যে, আমরা পৌষ মাসে এই কার্য্য পরীক্ষা করিয়াছিলাম; তখন প্রকৃতপক্ষে ইক্ষুগুলি মাড়াই করিবার উপযোগী হয় নাই। মাঘ মাসের শেষে বা ফাল্গুন মাসের প্রথমে ঐ পরীক্ষা করিলে নিশ্চয় আরও অধিক চিনি পাওয়া যাইত, যেহেতু ইক্ষু পরিণতাবস্থা প্রাপ্ত না হইলে উহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শ্বেতসার (starch) জন্মে না।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আমি পূর্ব্বে যে প্রকার কলকারখানার প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার আনুমানিক আয় ব্যয়ের একটী তালিকা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ব্যয়—৪০০/০ বিঘা জমির মালগুজারি ৫৲ টাকা হিসাবে ... ২০০০৲

তন্মধ্যে ২০০/০ দুই শত বিঘার আবাদী খরচা প্রতি বিঘা

৭৫৲ টাকা হিসাবে ... ... ১৫০০০৲

ইক্ষু মাড়াই করিয়া চিনি প্রস্তুত করিবার খরচা প্রতি বিঘা

১০০৲ টাকা হিসাবে ... ... ২০০০০৲

মোট খরচা ৩৭০০০৲

আয়—প্রতি বিঘায় ৫০/০ মণ হিঃ উৎপন্ন ১০০০০/০ মণ চিনি মণকরা
৭৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় মূল্য ... ... ৭০০০০৲
ঐ হিসাবে ছোয়া ১০০০০/০ মণ মণকরা ১॥০ টাকা হিসাবে
বিক্রয় মূল্য ... ... ১৫০০০৲
যে ২০০/০ দুই শত বিঘা জমি গর আবাদী থাকিবে, তাহাতে অনায়াসে অন্যান্য ফসল জন্মাইয়া পরে ইক্ষুর জন্য তৈয়ারি করিতে পারা যায়। সুতরাং উহাতেও ন্যূনকল্পে খরচা বাদে ২০০০৲ দুই হাজার টাকার ফসল পাইবার সম্ভাবনা ... ... ২০০০৲

৮৭০০০৲

পূর্ব্বলিখিত খরচা ৩৭০০০৲

মোট লভ্যাংশ ৫০০০০৲

এই হিসাব, আমাদের Experiment এ যে ১০০/০ মণ ইক্ষুতে ৬া০ মণ চিনির বিষয় লিখিত হইয়াছে তদনুযায়ী দেওয়া হইল। যদি পূর্ব্ব প্রস্তাবিত কলকারখানার সাহায্যে চিনি প্রস্তুত করা যায় তাহা হইলে উক্ত ব্যয়ে উক্ত লভ্যাংশ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে বরং অধিক পাইবারই সম্ভাবনা। কেবলমাত্র ষ্টীম চালিত মাড়াই কলে ইক্ষু মাড়াই করিয়া Vacuum Pan এ রস পাক না করিয়া দেশীয় উপায়ে পাক করিলেও উক্ত লভ্যাংশ পাওয়া যাইতে পারে। যেহেতু পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, বলদ দ্বারা চালিত মাড়াই কলে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহাতেই ৬া০ মণ পর্যন্ত রস পাওয়া গেলে ৮/০ মণ পর্য্যন্ত চিনি অনায়াসে পাওয়া যাইবে। ৬া০ মণ হিসাবে উৎপন্ন হইলেও আমরা অক্লেশে বিদেশীয়দিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারি। ৮/০ মণ হইলে ত কথাই নাই। আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকেরা উক্ত পরিমাণ জমি বা কলকারখানা চালাইবার উপযোগী অর্থ সংগ্রহে অসমর্থ বিধায়, সদাশয় জমিদার ও ধনী মহাজনদিগের এবিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। তাঁহাদিগকে এই বিষয় সম্যকভাবে জ্ঞাপন করাই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের দেশস্থ যে কোন জমিদার মহোদয় একার্য্যে ব্রতী হইলে সফলতা লাভ করিবেন। যেহেতু ৪০০/০ কি ৫০০/০ বিঘা কর্ষণোপযোগী জমি নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে নাই এমন জমিদার খুব অল্পই আছেন। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, ভূম্যধিকারী মহাশয়েরা এই

সকল আপাততঃ কষ্টকর, কিন্তু পরিণামে ধ্রুব লাভজনক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সর্ব্বদা কুণ্ঠা বোধ করেন। ইঁহারা সমাজের মেরুদণ্ড। ইঁহাদের উদাসীনতায় সমগ্র সমাজ নিশ্চল।

ভ্রান্তি।

(চতুর্দ্দশ পদী)

অনন্ত সুনীল অই মহা ব্যোম মাঝে,
শশাঙ্কের সহচরী—নক্ষত্র সমাজে ;
অভ্রভেদী তুঙ্গশৃঙ্গ পর্ব্বত মাঝারে,
পদ্মালয়া-জন্মভূমি—মহা পারাবারে ;
জন কোলাহল শূন্য গভীর কান্তারে,
মানবসঙ্কুল মহা নগরী মাঝারে ;
পবিত্র দাম্পত্য প্রেমে, স্নেহে জননীর,
শিশুর কোমল আস্তে—হৃদে বিরহীর ;
বিহগের কলকণ্ঠে, ভ্রমরগুঞ্জনে,
বসন্তের কুসুমিত রম্য উপবনে ;
যেখানে যখনি আমি খুঁজেছি তোমায় ;
বিরাজিছ আত্মপ্রেমে তখনি তথায় ;
বিশ্বময় তুমি দেব, তবু কেন হায় !
একি ভ্রান্তি, শুধা'তেছি—তুমি হে কোথায় ?

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থ-প্রবাহ।

(১)

ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে খৃষ্টীয় ১৭৬৫ অব্দ এক যুগান্তর উপস্থিত করে। লর্ড ক্লাইভ ঐ বৎসর তৃতীয়বার বা শেষবার ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং নাগ-সর্ব্বর মোগল দরবার হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে বঙ্গদেশের দেওয়ানী ভার প্রাপ্ত হন। মোগল বাদশাহের কোন প্রকার ক্ষমতা তৎকালে না

থাকিলেও, লোক দেখাইবার জন্য এক ব্যক্তি ময়ূর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, এবং তৎপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে এদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজবিধিসম্মত শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

লর্ড ক্লাইভ নানা দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে ব্যগ্র হন। কোম্পানীর কার্য্যের অবস্থা শোচনীয়; তাহার ভৃত্যবর্গ কলুষিত চরিত্র, তাহার প্রজাবর্গ উৎপীড়িত। ভারতে অবস্থিতির স্বল্প কালের মধ্যে এই সকল বিষয় সংশোধন করাই ক্লাইভের আন্তরিক বাসনা ছিল। এতৎ সম্পর্কীয় তাঁহার ১৭৬৫ অব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা হইতে কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট সুদীর্ঘ পত্রখানি—যাহা ভারতীয় বিষয়সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা অতি প্রয়োজনীয় স্মারক-লিপি। ক্লাইভ শেষবার ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া বিষয় কার্য্যের যেরূপ অবস্থা পরিদর্শন করেন এবং যে উপায়ে তিনি তাহা পরিশুদ্ধ করিবার কল্পনা করেন তাহা এই পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে ক্লাইভের উক্ত পত্র হইতে কতিপয় বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিলাম।

"(২) দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমি এতদ্দেশে উপস্থিত হইয়া আপনাদের কার্য্য সমূহের এমনি শোচনীয় অবস্থা পরিলক্ষ্য করিতেছি যে, তাহা প্রত্যেক কর্ত্তব্যজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তি—যাহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করার স্পৃহা নিজের স্বার্থ পরিতৃপ্ত করার উৎকট আকাঙ্ক্ষার দ্বারা কণ্টকিত হয় নাই—তদ্রূপ যে কোন ব্যক্তিই উহা দেখিয়া চকিত হইবেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কেবল একমাত্র অকস্মাৎ অবর্ণিত ধনরত্নের অধিকারী হওয়ায় প্রত্যেক রকমের বিলাসিতা—অতি উৎকট রকমের বিলাসিতার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। এই দুই প্রবৃদ্ধ অকল্যাণ সমগ্র প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রতি বিভাগের প্রতি সভ্যকে দূষিত করিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে অগ্রসর হইতেছে; অপরিমিতব্যয়ীর স্বভাব—যাহা উচ্চ নীচের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য, তাহা পরিগ্রহে সক্ষম হইবার নিমিত্ত প্রত্যেক নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তি ধনরত্ন আকড়িয়া ধরিতে চেষ্টিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। * * * ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে যে, ধনাসক্তি পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত চিরাচরিত উপায় অনুসৃত হইবে, অথবা আপনাদেরই ক্ষমতাযন্ত্র তাহাদের প্রভুত্ব বিস্তারের সহায়তা করিবে এবং যে স্থলে কেবল দুর্নীতি তাহাদের অপহরণেচ্ছার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না, সে স্থলে তাহার মাত্রা বর্দ্ধিত হইবে। এতদ্ বিষয়ে উচ্চশ্রেণী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত নিম্নশ্রেণী কর্ত্তৃক মাত্রানুযায়ী অনুসৃত না হইয়াই থাকে না; এই অনিষ্ট সংক্রামক এবং উপরের

সিভিল ও মিলিটারী বিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নস্থ লেখক, পদাতিক এবং সাধারণ বণিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। * * *

"৯। বস্তুতঃ আমার সম্মুখে দুইটী পথ উদ্ঘাটিত; একটী মসৃণ—নানারূপ কল্যাণকর সুযোগ সুবিধায় পরিব্যাপ্ত, ইচ্ছা করিলেই তাহা পাওয়া যাইতে পারে। অপর পন্থটী এখনও অপদদলিত—এবং তাহার প্রত্যেক ধাপই বিপদ সঙ্কুল। আমি যে পন্থা অবলম্বিত হইতে দেখিতেছি, তাহারই আদর্শে আমি শাসনভার গ্রহণ করিতে পারি; অর্থাৎ আমি গবর্ণরের উপাধি উপভোগ করিতে পারিলা সেই পদের সম্মান, গুরুত্ব ও মহত্ত্বকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে দিতে পারি। * * * যাহা হোক্ আর একটী প্রশংসনীয় বিপরীত উপায় আমার সম্মুখে আছে; আমার চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য প্রলোভনের মধ্যে আমার নিজেকে বিশুদ্ধ রাখিয়া আমার পদের কর্ত্তব্য সুনির্ব্বাহ করার ক্ষমতা আমার নিজের বক্ষের মধ্যে আছে। এবং সংস্কারপ্রার্থী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঈর্ষা বা বিদ্বেষ হইতে যে সমুদয় অভিযোগ উত্থিত হইতে পারে তাহাও পরাজয় করিতে সক্ষম হইব। এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ পথ অবলম্বনীয় তাহা নির্ব্বাচন করিতে আমাকে মুহূর্ত্তকালও ইতস্ততঃ করিতে হয় নাই। যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহা আমার নিজের স্কন্ধে পাতিয়া লইয়াছি। আমার পন্থা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, তৎসাধন পক্ষে পরিশ্রম করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি,—এই আশায় আমার সাফল্যের দ্বারা জাতীয় সম্মান ও কোম্পানীর সত্ত্ব সংরক্ষিত হইবে। * *

"১২। কোম্পানীর ভৃত্যবর্গের অধীনে যে সকল ইউরোপীয় এজেণ্ট আছে তাহা এবং তদধীনস্থ অসংখ্য কৃষ্ণকায় এজেণ্ট ও সব-এজেণ্টগণ কর্ত্তৃক যে ভাবে অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে আমার আশঙ্কা হয় যে, এদেশে ইংরাজদিগের নাম চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিবে। * যাহা হউক, অবশেষে আমি এখন একটী কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি যে, তদ্দ্বারা এই সকল বিষয়ে এবং এতদ্ব্যতীত বহুতর অজানিত বিষয়ে সুফল প্রসব করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে সকল অনিষ্টের বা গ্লানিকর কার্য্যের এ পর্য্যন্ত কোনই প্রতীকার করা যায় নাই, সেই সকল নিন্দাজনক কার্য্যেরও গতিরোধ হইবে। এ বিষয়টী হইতেছে—দেওয়ানী অর্থাৎ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের সমস্ত ভূমির এবং রাজস্ব আদায়ের তত্ত্বাবধান করা। মোগল বাদশাহ আমাদের সৈন্য বিভাগ ও ধনাগার হইতে যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে

স্বতই তিনি কোম্পানীকে এই অধিকার প্রদান করিতে প্রস্তুত হন; এবং যেরূপ আশা করা যায় সেইরূপ সাফল্যের সহিতই তাহা নির্ব্বাহ হইয়াছে। নবাবের মানমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত মাসহারা (allouance) এবং বাদশাহের কর অবশ্য নিয়মিতরূপে প্রদান করিতে হইবে; তদবশিষ্ট কোম্পানীর হইবে।

"১১। যতদূর আমার বিবেচনা হয় তাহাতে আগামী বৎসর আপনাদের পূর্ব্বাধিকৃত বর্দ্ধমান প্রভৃতি প্রদেশ সহ এই নূতন অধিকার হইতে প্রায় ২৫০ লক্ষ সিক্কা টাকা আপনাদের রাজস্ব আদায় হইবে; ইহার পর আরও অন্তত: ২০ হইতে ৩০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইবে। শান্তির সময়ে আপনাদের সিভিল ও ও মিলিটারী বিভাগের ব্যয় কখনই ৬০ লক্ষের বেশী হইবে না; নবাবের মাসহারা ইতিমধ্যেই ৪২ লক্ষ এবং বাদশাহের কর ২৬ লক্ষ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ১২২ লক্ষ সিক্কা টাকা বা ১,৬৫০,৯০০ পাউণ্ড ষ্টারলিং লভ্য হইবে।" ইহার পর ক্লাইভ কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের লাভালাভ ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বলিতেছেন;—

"5. Acompetnecy ought to be alloued to all you servants from the time of thier arrival in India, and advantages should gradually increas to each in proportion to his station * * * This certainly would arise from the freightships, from the privileges of trade (the advantages of which you are not unacquainted with), and also upon the profits upon salt, betel, and tobacco, agreeable to the new regulation which we have made in order to rectify the abuses that have been so long committed. * * *"

এই পত্রেই ক্লাইভ আরও লিখিয়াছেন,—

"১৯। দেওয়ানী (Civil) বিভাগ সম্বন্ধে আমার অভিমত বিস্তৃতরূপে নিবেদন করিলাম; এখন সৈনিক (Military) বিভাগ সম্বন্ধে আমার কতিপয় পরীক্ষিত বিষয় আপনাদের গোচরীভূত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। যে বিভ্রাটের কথা আমি সর্ব্বপ্রথমেই আপনাদিগকে বলিয়া বিরক্ত করিতেছি, তাহা সিভিল এলাকার (Civil jurisdiction) মধ্যে মিলিটারী বিভাগের অন্যায় প্রবেশ ও তাহা হইতে শেষোক্তের স্বাতন্ত্র্য লাভের প্রয়াস। একপ্রকারে সমস্ত সৈনিক বিভাগ সিভিল ক্ষমতার বশ্যতা স্বীকার করিবে। যদি কোন সময় তাহারা প্রাধান্য লাভের নিমিত্ত চেষ্টা করে, তাহা হইলে গবর্ণর

ও কাউন্সিল এই মনে করিয়া তাহা দমন করিতে একান্ত চেষ্টিত হইবেন যে, তাঁহারা এই রাজ্যের (settlement) কোম্পানীর ট্রাষ্টি এবং এক দেওয়ানী বিচারালয়ের অধীনে সাধারণের সম্পত্তির রক্ষক।

"২৬। এক্ষণে আমাকে আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতে অনুমতি দেন যে, আমার এক বৃহৎ পরিবার আছে—যাহাদের পিতার আশ্রয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু আমি এই দেশে বাস করিতে আরম্ভ করিয়া আমার স্বাস্থ্য নষ্ট এবং জীবনের সহিত সৌভাগ্যকে বিপন্ন করিতেছি। • • • আমি এক্ষণে কেবল, যে সকল প্রস্তাবের উল্লেখ করিলাম তাহা আপনারা মঞ্জুর করেন কি না এবং যে সকল সংস্কার করা বিধেয় তাহার সহিত আপনাদের মতের ঐক্য হয় কি না, জানিবার আশায় অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। যদি আপনাদের তাহা অভিপ্রেত হয়, তবে যাহা এত সাফল্যের সহিত সূচিত হইয়াছে এবং যাহা আগামী বর্ষের শেষেই সহজেই সুসিদ্ধ হইবে, তাহা শেষ করিবার নিমিত্ত সিলেক্ট কমিটীর সমবায়ে আমাকে ক্ষমতাপন্ন করিবেন। এই সময়ের পর আমি ইউরোপ যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়াছি এবং আশা আছে আপনাদের বঙ্গদেশের উন্নতি-বিধায়ক যে সকল কল্পনা আপনাদের মনে উদিত হইবে, তৎসমুদয় সম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে সশরীরে আপনাদের নিকট উপস্থিত হইব।" *

যে ঘটনায় ভারতবর্ষে ইংরেজ-ক্ষমতা বর্দ্ধনের প্রভূত সহায়তা করে, সেই ব্যাপারের বিবরণ আমরা ক্লাইভের নিজের লিখিত পত্র হইতে বিবৃত করিলাম। একাল পর্য্যন্ত ইংরাজরা ভারতবর্ষে বণিকরূপেই পরিচিত ছিল এবং যদিও ১৭৫৭ অব্দের পলাশী যুদ্ধের পর হইতে তাঁহারা বঙ্গদেশের প্রকৃত অধিপতি হন তত্রাচ দিল্লীর নামসর্ব্বস্ব বাদশাহ কর্ত্তৃক ১৭৬৫ অব্দে দেওয়ানীর সনন্দ প্রদানের পর হইতেই ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিধিসম্মত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বঙ্গদেশ শাসনের দায়িত্ব যথারীতি সংন্যস্ত হয়। যে ভাবে ক্লাইভ সেই দায়িত্ব—কর্ত্তব্য পালন করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বিচার ও শাসন উভয় বিভাগেই তিনি যে সকল সংস্কারের জন্য চেষ্টিত হন তাহা প্রশংসনীয় এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক তাহা সমর্থিত হইয়াছে. কিন্তু যখন আমরা তাঁহার সেই সংস্কার ইচ্ছায় মূল প্রস্রবণ খুঁজিয়া দেখি, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, অপরাপর বিবিধ সংস্কারের ন্যায় তৎসমুদয়ও কেবল ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়া করা হয়; প্রজাসাধারণের স্বার্থের

* House of commons committee's Third Report, 1773.

প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট সমগ্র বঙ্গদেশটি একটী মালেকানা সম্পত্তিরূপে—লাভের ভাণ্ডাররূপে বিবেচিত হয়।

প্রজার স্থানে ত্রিশ মিলিয়ন আদায়ী রাজস্ব হইতে বাদশাহের কর ও নবাবের মাসহারা দিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা এদেশে—এদেশের উপকারের নিমিত্ত ব্যয়িত হইতে পারিবে না, পরন্তু কোম্পানীর লভ্যাংশরূপে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইবে। এক পরাধীন দেশ হইতে প্রতি বৎসর অংশীদারগণের নিকট ইংলণ্ডে দেড় মিলিয়ন ষ্টারলিংএরও বেশী পাঠাইতে হইত। পৃথিবীর মধ্যে এক ধনশালী জাতির ধন বাড়াইবার নিমিত্ত এক দরিদ্র জাতির রাজস্ব হইতে নিরন্তর সুবর্ণস্রোত প্রবাহিত হইত।

এবম্প্রকারে আমরা দেখিতেছি যে, ভারতবর্ষ শাসনের অভিপ্রায়ে ইংরেজ শাসনকর্ত্তাগণের প্রবর্ত্তিত প্রথম সংস্কার প্রণালীটাই সেই মারাত্মক আর্থিক প্রবাহের (Economic Drain) মধ্যে আবর্ত্তিত; সে প্রবাহধারা বর্ত্তমান সময়ে স্ফীত হইয়া আরও বহুতর ষ্টারলিং বেশী চালান হইতেছে। ভারতবর্ষে ইংরেজ পতাকা প্রোথিত হওয়ায় এদেশে ইংরেজ কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত, শান্তি সংরক্ষিত, ন্যায়বিচার বিতরিত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তৃত হইয়াছে,—তজ্জন্য তাহাদের প্রশংসা ন্যায়সঙ্গতরূপেই করা যায়। কিন্তু সেই সূচনার সময় হইতেই ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে আর্থিক সম্বন্ধ অসরল; বৃটিশ শাসনের দেড় শতাব্দী কাল পরে আজ ভারতবর্ষ তাহার বিপুল উপকরণ, তাহার উর্ব্বরা বক্ষ এবং তাহার শ্রমসহিষ্ণু শিল্পনিপুণ অধিবাসী থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর মধ্যে দরিদ্রতম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা 'মিলোফুড', 'নেস্‌লেস্ মিল্ক' এবং 'নেস্‌লেস ফুড' এর ইংরাজি ১৯০৮ সালের সংক্ষিপ্ত দিনপঞ্জিকা (Calendar) দুইখানি উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। Calendar দুইখানি বেশ সুদৃশ্য ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। এজন্য আমরা উক্ত কোম্পানীকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৪।

বাণী-আবাহন।

——:•:——

বৎসরেক পরে কি গো এসেছ জননি!
ভারতি! ভারতে—স্তব্ধ নীরব শ্মশানে?
ল'য়ে অশ্রু-উপহার; ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি
শুনি পুনঃ চলে যাবে নীরবে গোপনে?

নাহি মা, নাহি মা অশ্রু এ ভারতে আর;
নাহি ক্ষীণ বীণাধ্বনি—করুণ রাগিণী;
নাহি নির্জ্জীবের পূজা—অশ্রু-উপচার,
চারিদিকে জীবনের উঠে প্রতিধ্বনি।

আয় মা, আয় মা, তবে ভারতে আবার,
নব মন্ত্রে ভক্ত তোর করে আবাহন;
নব শিক্ষা দীক্ষা, নব জীবনসঞ্চার,
উঠিছে নবীন গীতি ভেদিয়া গগন।

নব মন্ত্রে নব প্রাণে নব উপচারে,
এস গো ভারতি! আজি পূজিব তোমারে।

——•——

অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থ-প্রবাহ।

—:o:—

(২)

১৭৬৭ অব্দে লর্ড ক্লাইভ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে ভেরেলেষ্ট (Verelst) তৎস্থলে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন এবং ১৭৭০ অব্দ পর্য্যন্ত উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তৎপর কার্টিয়ার (Cartier) তৎপদে নিযুক্ত হইয়া ১৭৭২ অব্দ পর্য্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। এতদুভয়ের এই পাঁচ বৎসর শাসনকালেও বঙ্গদেশ পূর্ব্বের ন্যায় কুশাসনে ব্যতিব্যস্ত থাকে। ক্লাইভ কর্ত্তৃক যে শাসন সংস্কার প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা এক রকম dual government, কারণ তখনও নবাব-কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক রাজস্ব সংগৃহীত, নবাবের কর্ম্মচারী দ্বারাই বিচার বিতরিত হইতেছিল এবং নবাবের ক্ষমতার মুখোসের মধ্যেই সমস্ত ব্যাপার আবৃত ছিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী—দেশের প্রকৃত অধিপতিই সমস্ত মুনাফা আদায় করিত; কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা নবাবের কর্ম্মচারী-দিগের প্রতি ভ্রুকুটি করিয়া নবাবের বিচারালয়কে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির ক্রীড়নকে রূপান্তরিত করিয়া নিজেদের লাভের খাতিরে অসীম অত্যাচার করিত। ইংরেজ শাসনকর্ত্তা এ ব্যাপার দর্শন করিয়া তিরস্কার করেন, কিন্তু তাহার গতিরোধে অসমর্থ হন। ইংরেজগণ অজ্ঞতাবশতঃ যে ভাবে শাসন-প্রাকার ভগ্ন করে, তাহাতে দেশীয়গণ তাহাদের কার্য্যে যে ভাবে রাজভক্তি প্রদর্শনে দ্বিধা বোধ করিতে আরম্ভ করে, তাহা পাঠকবর্গ শাসনকর্ত্তার নিজের কথাতেই পাঠ করুন।

কোম্পানীর নিমিত্ত বাৎসরিক দেড় মিলিয়ন ষ্টারলিং মুনাফার ব্যবস্থা করিয়াও ক্লাইভের মন সন্তুষ্ট হয় নাই; তিনি বঙ্গদেশের অন্তর্বাণিজ্য কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের লাভের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হন। তিনি এই গোপন ব্যবসায়ের পথের অন্তরায় সমূহ বিদূরিত করার উপায় উদ্ভাবন করেন। এই ব্যবসা বঙ্গদেশের ইংরেজ-নন্দনগণের বড়ই লাভজনক, কাজেই ক্লাইভ তাহা ত্যাগ করিতে অক্ষম হন। প্রকৃতই লর্ড ক্লাইভ লবণ, সুপারি এবং তামাক এই তিন দ্রব্যের গোপন ব্যবসায় চালাইতে এতই

কৃতসংকল্প হন যে, প্রভু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রকাশ্য আপত্তি সত্ত্বেও কোম্পানীর আদেশের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতঃ কোম্পানীর অন্যান্য কর্ম্মচারীর সহযোগে ১৭৬৫ অব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক মুচলকা (Indenture) সম্পাদন করেন।

কোর্ট অব্ ডিরেক্টর সভা ক্লাইভের লিখিত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের প্রয়োজনীয় পত্রখানি প্রাপ্তে কলিকাতার কমিটীর নিকট ১৭ই মে তারিখে তাহার উত্তর প্রেরণ করে এবং ক্লাইভের নিকটও ঐ তারিখে পৃথক্ একখানি পত্র লিখে। ডিরেক্টর সভা ক্লাইভকে তাঁহার এই সুমহান কার্য্যের নিমিত্ত প্রভূত ধন্যবাদ প্রদান করে এবং বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণের সম্মতি জ্ঞাপন করে। কিন্তু ডিরেক্টর সভাকে ধন্যবাদ যে, সে ক্লাইভের অনুসৃত ও অনুমোদিত আন্তর্বাণিজ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত হয় না। এতৎ সম্বন্ধে সভার অভিমতের সারাংশ এইরূপ ;—

"সিলেক্ট কমিটীর নিকট লিখিত আমাদের পত্রে দানরূপে (by way of donation) যাহা পাওয়া যাইবে—তদ্বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় পরিব্যক্ত হইয়াছে। এবং আরও বলি যে, আমাদের বিবেচনায় অন্তর্বাণিজ্যে যে অগাধ সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, তাহা কেবল গুরুতর অত্যাচার ও উৎপীড়নমূলক কার্য্য দ্বারা হইয়াছে :—এরূপ ঘটনা কোন দেশে কোন সময়ে সংঘটিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে প্রথম যে জ্ঞানলাভ করি তাহা হইতেই আমরা সকলে ঐক্যমত হইয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত ও আদেশ প্রদান করিয়াছি। সুতরাং এ বিষয়ে আমরা সম্মত হইতে পারিলাম না বলিয়া আপনি বিস্মিত হইবেন না।" *

কোম্পানীর ভৃত্যবর্গের পরিচালিত অন্তর্বাণিজ্য ব্যাপারে ডিরেক্টর সভা অস্পষ্টরূপে অযৌক্তিক অভিমত প্রকাশ করে নাই। তাহার ১৭৬৪ অব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারীর পত্রে এই ব্যবসায়দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে এবং ১৭৬৫ অব্দের ১৫ই

* "and you Lordship will not therefore wonder that, after the fatal experience we had of the violent abuses committed in this trade, that we could not be brough to approve of it, cuen in the limited and regulated manner with which it comes to us in the plan laid down in the Committee's proceedings,"—House of Commons Committee's Third Report.

ফেব্রুয়ারীর পত্রে তীব্র ভাষায় উক্ত আদেশেরই পুনরুক্তি হইয়াছে। তত্রাচ তাঁহার ভারতীয় ভৃত্যবর্গ তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নাই। পরিশেষে ১৭৬৬ সনের ১৭ই মে তারিখের পত্রে সভা, ক্লাইভের প্রবর্ত্তিত নূতন নিয়মানুসারে অন্তর্বাণিজ্য পরিচালনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। কিন্তু এ আদেশও অমান্য করা হয় এবং চুক্তি করা হইয়াছে, দাদন দেওয়া হইয়াছে, এই অছিলায় আরও দুই বৎসর কাল অন্তর্বাণিজ্য চালিত হইয়া থাকে।

"we insenesibly broke down the barrir betwixt us and government, and the native grew uncertain where his obidience was due. Such a divided and complicated authority gave rise to appressions and intrigues unknown to any other period the officers of government cought the infection, and being removed from any immecliate control, proceeded with still greater andacity." *

বঙ্গ অধিবাসীগণের জীবনযাত্রার প্রধান উপকরণ কৃষি কার্য্য; তাহাও কোম্পানীর ভৃত্যদের প্রবর্ত্তিত ভূমি বন্দোবস্তের নব প্রণালীর অধীনে অবনতি ঘটে। বহু পুরাকাল হইতে বঙ্গদেশের ভূমি জমিদারগণের বা বংশানুক্রমিক ভূম্যধিকারিগণের অধিকৃত ছিল; তাঁহারা শাসন ক্ষমতাও লাভ করিয়া ছিলেন। নবাবকে নিয়মিত রাজস্ব প্রদান ও প্রয়োজনের সময় নবাবের সৈন্য দলে উপস্থিত হইতে হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাই স্ব স্ব জমিদারীর অন্তর্গত প্রজাগণের সর্ব্ববিধ শাসন সংরক্ষণ করিতেন। প্রজা এবং রায়ত কর্ত্তৃক তাঁহারা 'রাজা' অভিধানে অভিহিত হইয়া দেশের শান্তি রক্ষা, বিবাদ নিষ্পত্তি, পাপের শাস্তি, স্বধর্ম্মের উৎসাহ, ধার্ম্মিকের পুরস্কার, শিল্প কলা ও শিক্ষা বিস্তারে প্রোৎসাহ এবং বিদ্বান ও শিক্ষিতকে পোষণ করিতেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বেচ্ছাচারী নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ ও মীরকাসেম জমিদারগণের ক্ষমতানাশের জন্য লৌহ হস্তে আবির্ভূত হইলেও, তাঁহারা কদাচিৎ প্রথাক্রমে যে সকল সম্পত্তি বংশানুক্রমিক বলিয়া পরিচিত বা বিবেচিত হইত, তাহার উত্তরাধিকারীকে স্বত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেন। ১৭৬০ অব্দে নবাব মীরকাসেমের নিকট হইতে কোম্পানী বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা প্রাপ্ত হইলে, তৎকর্মচারিগণ তত্তৎস্থানে নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন; তাঁহারা জমিদারগণের পৈতৃক স্বত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতঃ রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অতি শোচনীয়ভাবে জমিদার-

* Governor Verelst's letter to the Director, 1769.

গণের জমিদারী প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। "বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর সম্পত্তি ও এলাকা ১৭৬০ অব্দে মীরকাসেম কর্ত্তৃক কোম্পানীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; ঐ দুই প্রদেশে মুরিস গবর্ণমেণ্টের কু-শাসন হইতে সঞ্জাত অশুভ সমূহের কোন ক্রমেই খর্ব্বতা সাধন হয় নাই। পক্ষান্তরে ঐ প্রদেশের বিধ্বংসকর এক প্রণালী ১৭৬২ অব্দে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রকাশ্য নিলামে ভূমিসমূহ তিন বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করা হইতেছে। ঐ সকল নিলামের ক্রেতা—দুশ্চরিত্র ও সামান্য বিত্তশালী ব্যক্তি; এবং যে স্থলে পূর্ব্ব আবাদ কারীরা (farmars) সম্ভবত উপযুক্ত মূল্যের অপেক্ষা নিলামে ডাক বেশী হওয়ায় নিলাম খরিদ করিতে না পারে এবং তদ্ধেতু পূর্ব্ব দখলি স্থান ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হয়, সে স্থলে যাহাদের কোনই অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, তাহারা কোন প্রকারে সত্ত্ব অধিকার মানসে অতিরিক্ত দাদন করে। এবম্প্রকারে বহুসংখ্যক শঠ লুণ্ঠনের সুবিধা পাইয়া দীন দুঃখীর কষ্টার্জ্জিত অর্থে প্রথম বর্ষের খাজানা দিতে সক্ষম হয়।" *

আমরা ক্রমে ক্রমে দেখাইব যে, এই নূতন ও উৎপীড়ক প্রণালী ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্ত্তৃক পরে সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইয়া অধিকতর অসন্তোষ, অনিয়ম ও কষ্টের সৃষ্টি করে। ভেরেল্‌ষ্ট এবং কার্টিয়ারের সমগ্র শাসন কালে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিকট আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের নিমিত্ত জমির রাজস্ব অতি কঠোরতার সহিত আদায় হইতে থাকে। গবর্ণর ভেরেল্‌ষ্ট, কোর্ট অব্ ডিরেক্টরকে লিখিয়াছিলেন,—"পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, তাহাদের ভূমি যখন আমাদের তত্ত্বাধীনে আইসে, তখন আবাদের ও উন্নতির প্রলোভন স্বরূপ আমরা কিছুকালের নিমিত্ত অধিকাংশ জেলায় প্রচলিত নিরিখের হ্রাস করিয়া ছিলাম, পরন্তু বৃদ্ধি করিবার জন্য সামান্য চেষ্টাও করা হয় নাই। • • উনিশ বৎসর কাল আপনাদের রাজস্ব সম্পর্কীয় নানা বিভাগে ও আপনাদের অধিকারের নানাস্থানে কার্য্য করিয়া আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহা হইতে আমার একটী খাঁটি সত্য অভিমত ব্যক্ত করিবার অনুমতি দেন;—কিছু বেশী পরিমাণে খাজানা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা আপনাদের শাসনশক্তির সম্পূর্ণ বহির্ভূত।" †

* Verelst's View of the Rise of the English governor in Bengal, 1772.

† Letter to the court of directors, 1768.

একচেটিয়া এবং বিনাশকর শাসনপ্রথার অধীনে ব্যবসায় বাণিজ্য সতেজ হইতে পারে না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণকে দমন করিতে চেষ্টা করেন সত্য; কিন্তু তাঁহারা নিজেই এক গুরুতর অপরাধ করিয়া বসেন। বঙ্গদেশীয় তন্তুবায়গণের রেশমী বস্ত্রাদি ইংলণ্ডে রপ্তানী হইতে থাকায় বিলাতী তন্তুবায়গণের ঈর্ষ্যাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; তদ্ধেতু এক্ষণে কোম্পানীর প্রাপ্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাপ্রভাবে ইংলণ্ডের শিল্পের উন্নতি ও বঙ্গদেশের শিল্পের অবনতি ঘটাইবার প্রকৃষ্ট প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। ডিরেক্টরদের ১৭৬৯ অব্দের ১৭ই মার্চ্চ তারিখের সাধারণ পত্রে প্রকাশ্যে লিপিবদ্ধ হয় যে, বঙ্গদেশে কাঁচা রেশমের (raw silk) ব্যবসায়ে উৎসাহ দিতে হইবে, পরন্তু অন্যান্য রেশমী শিল্পের অবনতি ঘটাইতে হইবে। তাঁহারা আরও ব্যক্ত করেন যে, রেশম-তন্তুবায়কে কোম্পানীর কুঠিতে কার্য্য করিতে বাধ্য করিতে হইবে এবং নিজেদের বাড়ী বসিয়া কার্য্য করা রহিত করিয়া দিতে হইবে। তাঁহাদের এতৎ সম্বন্ধীয় অভিমত তাঁহাদের নিজের ভাষাতেই শ্রবণ করুন ;—

"This regulation seems to have been productive of very good effects, particularly inbringing over the winders, who were formerly so empleyd, to work in the factories. Should this practice [the winders working in their own hornes] through inattention have been suffered to take place again, it will be proper to put a stop to it, which may now be more effectually done, by an absolute prohibition under severe penalties, by the authority of the government." *

সিলেক্ট কমিটীর অভিমত অনুসারে—'এই পত্রখানি, যাহাতে বাধ্যবাধকতা ও উৎসাহ দুইয়েরই ব্যবস্থা আছে,—বঙ্গদেশের শিল্পের উপর গুরুতর আঘাত করিবে। ইহার ফলে সেই শিল্প কলাসম্পন্ন দেশের আকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইবে এবং বিলাতী শিল্পের অভীষ্টসিদ্ধিকর কাঁচা উপাদানরাশি উৎপন্নের ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইবে।' †

* Ninth Report of the Honer of commen select commettee on administration of gustice in India, 1783.

† Ninth Report.

ক্রমে ক্রমে আমরা দেখিতে পাইব যে, আরও পঞ্চাশৎবর্ষের উর্দ্ধকাল ভারতবর্ষে এই প্রণালী ইংলণ্ড কর্ত্তৃক 'স্থির সিদ্ধান্তের' (Settled policy) ন্যায় চালিত হইতে থাকে; ইহা হাউস অব কমন্‌স সভায় প্রকাশ্য ভাবে নির্দ্ধারিত হয় এবং ১৮৩৩ অব্দ ও তৎপরেও কঠোরতায় সহিত পরিচালিত হইতে থাকে। তাহার ফলে ইহার আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়;—বিলাতী শিল্পের উন্নতির জন্য ভারতের জাতীয় শিল্পকলা সমূহ চিরতরে আত্মবিসর্জ্জন করে। জগতের ইতিহাসে ভারতের এ আত্মত্যাগ জলন্ত ভাষায় চিত্রিত থাকিবে। কিন্তু দেশের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অনিষ্ট সম্ভবতঃ—আর্থিক শোষণ (Economic drain); কোম্পানীর লাভের খাতিরে বা অন্যান্য স্থানের ব্যয় নির্ব্বাহকল্পে বঙ্গদেশ হইতে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এইরূপ আর্থিক প্রবাহ বহিতে থাকে। আমরা নিম্নে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পরবর্ত্তী ছয় বৎসরের বঙ্গের আয় ব্যয়ের এক খতিয়ান হাউস্ অব কমন্‌সের ১৭৭৩ অব্দের চতুর্থ রিপোর্ট হইতে পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সন।	মোট আদায়	বাদশাহের কর, নবাবের মাসহারা, আদায় সরঞ্জামী, মাহিয়ানা, কমিশন প্রভৃতি দিয়া বাকী নেট রাজস্ব	সিভিল, মিলিটারী, পূর্ত্তকর প্রভৃতির মোট ব্যয়।	বাৎসরিক নেট উদ্বৃত্ত
মে—এপ্রিল	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
১৭৬৫-৬৬	২,২৫৮,২২৭	১,৬৮১,৪২৭,	১,২১০,৩৬০	৪৭১,০৬৭
১৭৬৬-৬৭	৩,৮০৫,৮১৭	২,৫২৭,৫৯৪	১,২৭৪,০৯৩	১,২৫৩,৫০১
১৭৬৭-৬৮	৩,৬০৮,০০৯	২,৩৫৯,০০৫	১,৪৮৭,৩৮৩	৮৭১,৬২২
১৭৬৮-৬৯	৩,৭৮৭,২০৭	২,৪০২,১৯১	১,৫৭৩,১২৯	৮২৯,০৬২
১৭৬৯-৭০	৩,৩৪১,৯৭৬	২,০৮৯,৩৬৮	১,৭৫২,৫৫৬	৩৩৬,৮১২
১৭৭০-৭১	৩,৩৩২,৩৪৩	২,০০৭,১৬৭	১,৭৩২,০৮৮	২৭৫,০৮৮

পূর্ব্বোদ্ধৃত খতিয়ান হইতে দেখা যাইতেছে, প্রতি বৎসর বঙ্গদেশের মোট রাজস্বের প্রায় এক তৃতীয়াংশ বিদেশে চলিয়া যাইত। কিন্তু এদেশ হইতে প্রকৃত শোষণের পরিমাণ ইহার ঢের বেশী। সিভিল ও মিলিটারী বিভাগের

ব্যয়ের অধিকাংশই—ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারিগণের বেতন দেনা; তাঁহারা স্ব স্ব উদ্বৃত্ত মজুত টাকা স্বদেশে পাঠাইয়া দিতেন এবং দেশীয় বণিক্ ব্যবসায়িগণকে তাহাদের ন্যায্য ব্যবসা ও শিল্প কার্য্যাদি হইতে বঞ্চিত করিয়া যে অগাধ সৌভাগ্যের অভ্যুদয় হয়, তাহাও এদেশ হইতে বাহির হইয়া যাইত। এমতে বঙ্গদেশ হইতে প্রকৃত শোষণের মাত্রা গবর্ণর ভেরেলষ্ট যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই কতকটা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। ভেরেলষ্ট ১৭৬৬ হইতে ১৭৬৮ অব্দের আমদানী রপ্তানীর তালিকা লিখিয়াছেন। * আমদানী ৬২৪,৩৭৫ পাউণ্ড; রপ্তানী—৬,৩১১,২৫০ পাউণ্ড। অথবা এদেশ আমদানীর দশ গুণ অধিক রপ্তানী করিত। গবর্ণর ভেরেলষ্ট স্বয়ং এই অনিষ্টের মাত্রা পরিলক্ষ্য করেন, কিন্তু তাহার ফলে বঙ্গের অধিবাসীবৃন্দের কি শোচনীয় রূপান্তর সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিতে আর চেষ্টা করেন নাই। আমরা বারান্তরে তাঁহার সে কথার উল্লেখ করিব। †

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

আমার বিবাহ।

—০:*:০—

আমি বিবাহ করিব। এতদিন পরে—এই শেষ বয়সে আমার বিবাহের সাধ হইয়াছে, সুতরাং আমি বিবাহ করিব। হে মায়াবাদী বৈদান্তিক! হে প্রকৃতি-বাদী সাঙ্খ্যপ্রবর! তোমরা একবার সরিয়া দাঁড়াও, আমি বিবাহ করিব। আমি এখন আর তোমাদের কথা শুনিব না; সংসার অনিত্য, মায়াপ্রপঞ্চ; সুখ দুঃখ সেই অনিত্য সংসারতরুর একটা কুহকময় ফল; হর্ষ শোক ভোজের বাজী, পুত্র দারা আত্মীয় বন্ধু সেই বাজির কাল্পনিক অভিনেতা। তোমাদের এ সকল অলীক বাক্‌চাতুরীতে আর আমি মুগ্ধ হইব না; সফল প্রত্যক্ষ ছাড়িয়া বিফল পরোক্ষে আমি আস্থা স্থাপন করিতে পারিব না। আমি এবার বিবাহ করিব।

সংসার যদি অনিত্যই হয়, জীবন যদি মায়ার খেলাই হয়, হয় হউক, তাহাতে আমার কি? এই অনিত্য সংসারে আজি বাদে কালি যাহার অস্তিত্বের চিহ্ন

---

* View of the Rise of the English government in Bengal.

† R. C. Dutt's Indian Trade. Manufactures ac.

মাত্র থাকিবে না—সে সংসারে মায়ার খেলা খেলিতে আসিয়া আমি কি খেলিলাম? কোন্ সুদূর প্রভাতে হাটে আসিয়াছি; সে প্রভাত চলিয়া গেল, মধ্যাহ্ন চলিয়া গেল, অপরাহ্নও যায় যায়, কিন্তু বেচা কেনা তো কিছুই হইল না? আমার হাতের মূলধন হাতেই রহিয়া গেল, কাহারও সহিত তো তাহার বিনিময় হইল না? জীবনের সুবৃহৎ খাতায় লাভ লোকসানের দাগতো পড়িল না? এমন রেখাশূন্য স্মৃতিশূন্য নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রায় ফল কি? এমন উদ্দেশ্যহীন জীবনপথে আর আমি অগ্রসর হইতে পারিব না, সুতরাং আমি বিবাহ করিব; এই শেষ বেলায় ভাঙ্গা হাটে বসিয়া আমি একবার বেচাকেনার সাধ মিটাইব।

বিবাহ তো করিব, কিন্তু মনোমত পাত্রী কোথায়? কে এই অতীতবয়স্ক সংসার-পথের নিরাশ্রয় পথিককে বিবাহ করিবে? এই শেষ বেলায় ভাঙ্গা হাটে বসিয়া কে আমার সহিত বেচা কেনা করিতে সম্মত হইবে? কোন্ সুন্দরী-শিরোমণি এখন আমার এই অবিক্রীত অনাদৃত পণ্য ক্রয় করিতে আসিবে? যখন আসিবার সময় ছিল, তখন তো এ চেষ্টা করি নাই? যখন প্রভাত ছিল, নবোদিত অরুণকিরণে দিগন্ত সমুজ্জ্বল ছিল, তখন তো কাহাকেও ডাকি নাই? যখন দীপ্ত মধ্যাহ্নে অদূরাগত আকুল বংশীধ্বনি সাদরে আমায় আহ্বান করিয়া সাড়া পায় নাই, তখন তো ভাবি নাই যে, এই শেষ বেলায় অস্তগমনোন্মুখ রবির শান্ত কিরণতলে বসিয়া আমাকেও অমনই আকুলস্বরে ডাকিতে হইবে? ডাকিবার সময় গিয়াছে, এখন অসময়ে ডাকিলে কে সাড়া দিবে?

আজি মনে পড়ে, বহুদিন পূর্ব্বে আমারই মত ভাঙ্গা হাটে বসিয়া একজন আমায় ডাকিয়াছিল। কিন্তু আমি তখন সে ডাকের মূল্য বুঝিতে পারি নাই। সেই যে এক মধুময় প্রভাতে জরাভার-প্রপীড়িতা যষ্টিবিন্যস্তন্যুব্জ-দেহভারা চক্রবর্ত্তী ঠাকুরাণী স্খলিতবাক্যে আমায় বর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, তাঁহার সে সম্বোধনেও কি এমনই একটা আকুলতা মিশ্রিত ছিল? কিন্তু আমি তখন তাঁহার সেই প্রেমপূরিত মধুর সম্বোধনে কিছুমাত্র উল্লসিত না হইয়া অধিকন্তু কিয়ৎপরিমাণে ভয়বিমিশ্রিত নেত্রবারি বর্ষণ করিয়াছিলাম। হায়, আজি হয়তো সেই পলিতকেশা গলিতদশনা চক্রবর্ত্তী ঠাকুরাণী অমরাবতীর কোন কুসুমিত পারিজাত তরুতলে বসিয়া এই পলিতকেশ গলিতদশন অভিরাম শর্ম্মার পাত্রী-সংগ্রহে প্রাণান্ত চেষ্টা দর্শনে হাস্যসংবরণে অক্ষম হইতেছেন! তা' তিনি হাসুন, আমাকে কিন্তু বিবাহ করিতেই হইবে।

তোমরা আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার, আমাদের মত লোক বিবাহ করিতে

গেলে পাত্রীর এত অভাব হয় কেন? কোন অবিবাহিত যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারপ্রান্তে বসিয়া বিবাহরূপ বিরাট ভারগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলেও শত শত পাত্রী—কেবল পাত্রী কেন, পাত্রীর চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত আপনাদের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া সেইখানে লুটাইয়া পড়ে, আর আমরা প্রকাশ্যে 'বিবাহ করিব', 'বিবাহ করিব' বলিয়া চীৎকার করিলেও কাহারও সাড়া পাই না কেন? এ বৈষম্যের হেতু কি বলিতে পার? যে সূর্য্যমুখী প্রচণ্ড কিরণে জ্বলিয়া পুড়িয়াও সূর্য্যের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, শীতরশ্মি চন্দ্রকে দেখিয়া সে মুখ লুকায় কেন? ভোজনোপবিষ্ট স্থূলোদর ধনী মহাশয় বার বার অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাঁহার পাতে রোহিতের বৃহৎ মুণ্ড আসিয়া পড়ে কেন, আর তাঁহারই অনতিদূরে ক্ষুধানল-তাড়িত দরিদ্র, অন্নশূন্য পাতে হাত রাখিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে পরিবেষণ-কারীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে কেন? শত শত প্লীহা ফাটাইয়াও যে শ্বেতাঙ্গ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে, সেই একটী মাত্র শ্বেতাঙ্গের গাত্র স্পর্শ করিয়া শত শত কৃষ্ণাঙ্গ শ্রীমন্দিরের শোভা বর্দ্ধিত করে কেন? একজন যাহা না চাহিয়া পায়, আর একজন তাহা চাহিয়াও পায় না কেন? জগতের এ বৈষম্যটুকু কেহ কি দূর করিতে পারে না?

তোমরা—শিক্ষিত নব্যযুবকেরা দল বাঁধিয়া হয় তো বলিবে,—তুমি বৃদ্ধ, জীবনের তৃতীয় ভাগ অতিক্রম করিয়া এক্ষণে তুমি চতুর্থ ভাগে উপস্থিত, তোমার "অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং" এ সময়ে তোমার আবার বিবাহে আকাঙ্ক্ষা কেন? তোমরা তো এখন বিবাহে অনধিকারী। কিন্তু আমি তোমাদিগকে তর্কশাস্ত্রের প্রতিপৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়া দিব যে, বিবাহে আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। কারণ, দেহ বৃদ্ধ হইলেও আমার মন তো বৃদ্ধ হয় নাই? দেহের উপরই জরার অধিকার, মনের উপর তাহার কিছুমাত্র প্রভুত্ব চলে না। আর দৈহিক সম্পর্কের জন্য যে বিবাহ, তাহা শাস্ত্রানুসারে নিন্দিত, মানসিক সম্পর্কের জন্য বিবাহই শাস্ত্রসিদ্ধ এবং যুক্তিসিদ্ধ। সুতরাং যদি শাস্ত্রসঙ্গত বিবাহ করিতে হয়, তবে সে বিবাহে, দৈহিক সম্পর্ক জন্য লালায়িত যুবকবৃন্দ! তোমরা অধিকারী নও, আমরাই তাহার প্রকৃত অধিকারী। অতএব আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি, হে অবিবাহিত যুবকবৃন্দ! তোমরা যদি শাস্ত্রসঙ্গত পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাও তবে এক্ষণে বিবাহ করিও না, যখন আমার ন্যায় পলিতকেশ স্খলিতদন্ত লোলচর্ম্ম হইবে,—তখনই বিবাহ করিও।

বাপু হে, বুঝিয়াছি, আমাদের ন্যায় বৃদ্ধকে বিবাহ করিতে দেখিলে তোমাদের মনে ঈর্ষ্যার উদয় হয়; এবং তজ্জন্যই একটা কাল্পনিক সহানুভূতি বা সহৃদয়তার সৃষ্টি করিয়া বিবিধ অলীক ও অসার যুক্তি প্রদর্শন পুর্ব্বক নির্ম্মম হৃদয়ে কঠোর স্বরে আমাদিগকে বনগমনের অনুজ্ঞা প্রদান কর। হায়, তোমাদের এই নিষ্ঠুরতার ফলে মাদৃশ কত বৃদ্ধকে যে হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষার তুষানল জ্বালিয়া পরলোকের পথে যাত্রা করিতে হইয়াছে তাহা ভাবিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মনে পড়ে কি, তোমাদের এই অত্যাচারের জন্যই একদিন বিবাহার্থী শ্রদ্ধাস্পদ কমলাকান্ত শর্ম্মাকে রক্তমাংসময়ী পাত্রীর আশা ত্যাগ করিয়া ঐ সুদূর গগনবিহারী চাঁদকে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল, এবং এজন্য তিনি ব্যাকরণের নিয়মভঙ্গ করিয়া হি কে শী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কে বলিতে পারে, সে সময়ে তাঁহার নিরাশামথিত হৃদয়ের তীব্র তপ্তশ্বাস তোমাদের উদ্দেশে পতিত হয় নাই।

কিন্তু আমি এতটা পারিব না; চাঁদকে বিবাহ করা আমার সাধ্যাতীত। আমি না হয় দায়ে পড়িয়া হি কে শী করিতে পারি, কিন্তু যখনই মনে হয় যে, আমার কল্পিতা ভাবী নায়িকা ২১৬০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, যখনই ভাবিয়া দেখি যে, তাঁহার ঐ বিশালবপুর মধ্যে ত্রিশ হাজার চল্লিশ হাজার ফিট্ উচ্চ পর্ব্বতমালা, সুবিস্তৃত নদনদী গহ্বরাদি বিরাজিত, তখন বিবাহ তো দূরের কথা, তাঁহার বিরাট রূপ ও আকৃতির চিন্তা করিতেও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। জানি না কোন্ সাহসে কমলাকান্ত শর্ম্মা তাঁহাকে অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

তোমরা এমন মনে করিও না যে, আমার বিবাহে একেবারেই পাত্রীর অসদ্ভাব হইবে। পাত্রী অনেক জুটে, কিন্তু মনের মত তো হয় না?

ফুল—পাত্রী মন্দ নয়, রূপে গুণে, কুলে শীলে সকল দিকেই ভাল। সে যখন বসন্তের নবীন সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে মুখাবরণ উন্মুক্ত করিয়া, চাঁদের কিরণ গায়ে মাখিয়া, সান্ধ্যসমীরণের সহিত হেলিয়া দুলিয়া খেলা করে, তখন বিবাহার্থী কোন্ পুরুষ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হয় বল দেখি? কিন্তু এত গুণ থাকিতেও আমি তাহাকে সহধর্ম্মিণী পদে স্থাপন করিতে পারিলাম না। সকল দিকে ভাল হইলেও সে বড় আল্‌গা মেয়ে, একটুতে গলিয়া যায়। সমীরণের একটু আঘাতে একেবারে লুটাইয়া পড়ে, ভ্রমরের একটু আদরেই একেবারে সোহাগে হৃদয়-দ্বার খুলিয়া দেয়, আবার তপনের একটু তাপেই মলিন হইয়া ঝরিয়া পড়ে। এমন আল্‌গা মেয়ে লইয়া কি সংসার চলে?

আর একটী পাত্রী ছিল—সমুদ্র। এস্থলে আমি বৈয়াকরণিকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কমলাকান্ত শর্ম্মার পথানুবর্ত্তী হইলাম, অর্থাৎ হি কে শী করিলাম। সাগর বেশ মেয়ে, যেমন রূপ, তেমনই গুণ, তেমনই সৌন্দর্য্য। সে যখন নবোদিত সূর্য্যের কিরণরাশি গায়ে মাখিয়া, অনন্ত নীলাকাশের নিশ্চল প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধরিয়া, উর্ম্মিবাহুপ্রসারণে বেলাভূমিকে আলিঙ্গনের জন্য ধাবিত হয়, তখন তাহার সৌন্দর্য্যের সহিত কাহার তুলনা হয় বল দেখি? এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য, এমন প্রেমভরা হৃদয়ের আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বাস আর কোথায় আছে? কিন্তু এত সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী হইলেও সে বড় চঞ্চল মেয়ে, একটুতে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। পবনের একটু মাত্র আঘাতেই সে অস্থির হইয়া গর্জ্জিয়া উঠে, চাঁদের একটু আকর্ষণেই ফুলিয়া উঠিয়া বেলা অতিক্রম করিতে যায়। সুতরাং এরূপ চঞ্চলা নায়িকাকে আমি বিবাহ করিতে পারি না।

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা চপলাসুন্দরী বহুদিন হইতেই আমাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার কাজ অনেক, সুতরাং তাঁহার সহিত মাল্যবিনিময়ের শুভ অবসর ঘটিয়া উঠে নাই। অনেক আষাঢ়ের ঘনঘটাচ্ছন্ন গোধূলিতে বিবাহের শুভ লগ্ন স্থিরীকৃত হইয়াছিল, অনেক পাণ্ডুরমেঘাবৃত শুদ্ধ সন্ধ্যায় উদ্‌গ্রীব হৃদয়ে আমি তাঁহার আশাপথ চাহিয়া বসিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি অবসরাভাবে যথাসময়ে উপস্থিত হইতে না পারায় সে সকল লগ্ন বিফলে গিয়াছে, আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হৃদয় লইয়া আমাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। সুতরাং আমার নিরাশামথিত চিত্ত এবার তাঁহার সহিত মিলনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছে।

তবে কি পাত্রী জুটিবে না? আমার শেষ বয়সের সাধ কি মিটিবে না? অভিরাম শর্ম্মা কি চিরকালই অবিবাহিত থাকিবে? অবশ্য তোমাদের মনোগত অভিপ্রায়টা এইরূপ হইলেও সমদর্শী বিধাতার অভিপ্রায় কিন্তু অন্যরূপ। সুতরাং আমার মনের মত পাত্রী জুটিয়াছে। তোমরা একবার মুহূর্ত্তের জন্য ঈর্ষ্যা দ্বেষ বিসর্জ্জন দিয়া মুক্তকণ্ঠে হরিধ্বনি কর, অভিরাম শর্ম্মার পাত্রী জুটিয়াছে। সুন্দরী-শিরোমণি শ্রীমতী আইন-সুন্দরী আমার পত্নীত্বগ্রহণে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। তোমরা একবার উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি কর।

তোমরা আমার নায়িকাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া স্বীকার না করিলেও আমি প্রাণ ধরিয়া ইঁহাকে পুংলিঙ্গ বলিতে পারিব না। পুরুষে কখনই ক্ষণে ক্ষণে এরূপ বিভিন্নমূর্ত্তি পরিগ্রহে সমর্থ হয় না; রমণী ব্যতীত আর কেহ এরূপে সকলের মনঃপ্রাণ হরণ করিতে পারে না। সুতরাং হে বৈয়াকরণপ্রভৃতিগণ,

ইনি পুংলিঙ্গ নহেন—স্ত্রীলিঙ্গ, হি নহেন—শী। আমি ইঁহাকেই বিবাহ করিব। তোমরা কেহ বরযাত্র হইতে স্বীকৃত আছ?

তোমরা অস্বীকার করিলেও অনেকেই ইহাতে স্বীকৃত আছে, অনায়াসলভ্য মিষ্টান্নের আস্বাদন গ্রহণে রসনাকে সুতৃপ্ত করিতে অনেকেই প্রস্তুত। ঐ দেখ, প্রস্তাব মাত্রেই ঝিল্লী মহাশয় সানাইয়ে পোঁ ধরিয়াছেন, কোকিল বাবাজি অচিরোদ্গত চুতমুকুলের লোভ সংবরণ পূর্ব্বক শুভাগমন করিয়া আসর জুড়িয়া বসিয়াছে; রসিক ভ্রমর মহাশয় ইহারই মধ্যে বাসর ঘরের রসের গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, নবীন বসন্ত ফুলের মালা হাতে লইয়া উপস্থিত; পুরোহিত মহাশয় * * * ধড়া চূড়া বাঁধিয়া মন্ত্রপাঠ করাইতে উদ্যত, পাত্রীপক্ষীয়া সুন্দরীগণ সাজিয়া গুজিয়া হস্তবন্ধনী সূত্রহস্তে দণ্ডায়মান; তবে আর বাকী কি? তবে এস সুন্দরি! এস ভুবনমোহিনি! একবার তোমার ঐ উচ্চ সুখনিবাস পরিত্যাগ করিয়া ভুবনমোহিনীরূপে এই দরিদ্রের ভগ্নকুটীরে পদার্পণ কর। আমি আমার সযত্নগ্রথিত এই কুসুমমাল্য তোমার কণ্ঠে পরাইয়া দিই; তুমিও গাঢ় প্রেমভরে তোমার ঐ কুসুমসুকোমল ভুজপাশে আমাকে আবদ্ধ কর। আমার এত দিনের আশা, এত দিনের আকাঙ্ক্ষা এক মুহূর্ত্তে পূর্ণ হউক, আমার জীবনের সাধনা—আমার লেখনী ধারণ সফল হউক।

শ্রীঅভিরাম শর্ম্মা।

জ্যোতিষ রহস্য।

—•):*:(•—

(দশম প্রস্তাব)

নেপ্‌চুন্‌।

নেপচুন্ (Neptune) গ্রহটী আবিষ্কৃত হইবার বহুকাল পূর্ব্বেই, ইয়ুরেনাস্ (Euranus) গ্রহের গতিবিধি পরিদৃষ্টে বুভার্ড (Bouvard), এ্যাডাম্‌স্ (J. C. Adams), লেভেরিয়ার (M. Leverrier), এয়ারি (Airy) প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ 'অপর কোন একটী (অনাবিষ্কৃত) গ্রহ অবশ্যই আছে, যাহার নিমিত্ত ইয়ুরেনাসের গতির অসামঞ্জস্য বা তারতম্য হইতেছে' এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন। উক্ত মহাত্মগণ স্থির করেন যে, অপর একটী

গ্রহের আকর্ষণ ব্যতীত ইয়ুরেনাস্ গ্রহের গতি কখন দ্রুত এবং কখনও বা বক্র ভাবাপন্ন হইতে পারে না। কেম্ব্রিজ নগরের (Cambridge) অধ্যাপক এ্যাডামস্ সাহেব (J. C. Adams) এ সম্বন্ধে স্বীয় বিস্তৃত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতঃ, অধ্যাপক এয়ারির নিকট প্রেরণ করিলে, তিনি বহু দিবস পর্য্যন্ত ইহার প্রগাঢ় আলোচনায় নিরত থাকেন। পরে, ইংরাজি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে, সুবিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ লেভেরিয়ার (M. Leverrier) এই গ্রহটিকে দেখিতে পান; এবং বার্লিন (Berlin) নগরের জ্যোতিষী পরিদর্শকগণও, সেই সময়ে এই গ্রহটীকে দেখিতে পাইয়া, জনসাধারণের নিকট ইহার বিবরণ প্রকাশ ও এই নবাবিষ্কৃত গ্রহটীকে "নেপচুন্" (Neptune) নামে অভিহিত করেন।

এই অত্যাশ্চর্য্য গ্রহটীকে মানব-জ্ঞান গোচর করিবার জন্য, ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে, অনেকগুলি জ্যোতিষী প্রায় ৫০ বৎসর কাল অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ্যাডামস্ সাহেব এই গ্রহটীর আভাসমাত্র পাইয়া, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ জনসমাজে প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফরাসী জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত লেভেরিয়ারই নেপচুন্ গ্রহের আবিষ্কারকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মানব জাতির আবাস স্থল এই পৃথিবী হইতে সূর্য্য প্রায় ৯১,০০০,০০০ মাইল দূরে এবং সূর্য্যমণ্ডল হইতে নেপচুন গ্রহটী ২৭৪,৬০,০০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত।* নেপচুনের ব্যাস প্রায় ৩৭০০০ মাইল। সূর্য্যমণ্ডল হইতে এরূপ দূরবর্ত্তী অপর কোন গ্রহ এ পর্য্যন্ত আর আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ১০৮ গুণ বৃহৎ এবং ১৬ ষোল গুণ ভারি।† এই গ্রহটী ৬০১২৬ দিনে অর্থাৎ ১৬৪ বৎসর, ৮ মাস, ২৬ দিনে একবার মাত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। সুতরাং ১৩ বৎসর ৯ মাস করিয়া এক এক রাশি ভোগ হয়। ইহার গতিবিধির

---

* Very little can be said concerning Neptune, as its distance is too great for observation. It is at 2,746,000,000 of miles from the Sun, and takes about 165 years (60,126 days) to go round it.

Marvels of Astronomy. p. p. 110.

† Its Volume is 108 times, but its density is only 16 times that of the Earth.

Chamber's Cyclœpedia.

বিষয় চিন্তা করিলে মানসক্ষেত্রে অপূর্ব্ব বিস্ময় রসের সঞ্চার হইয়া থাকে। এই গ্রহটী পৃথিবী হইতে অত্যন্ত দূরবর্ত্তী বিধায়—অপরাপর গ্রহের ন্যায়—ইহার ব্যাস, পরিধি, আয়তন, গুরুত্ব প্রভৃতি এখনও নিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে এই সকল বিষয় শীঘ্রই সুমীমাংসিত হইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে। আজি যাহা অসাধ্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে, কালক্রমে তাহাই সুসাধ্য হইবে, এরূপ আশা করা যায়। এ সকল বিষয়ে, এখনও, ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের অভিপ্রায় জানা গিয়া থাকে।

নেপচুন গ্রহে কোন্ কোন্ ঋতুর সঞ্চার হইয়া থাকে, এ পর্য্যন্ত তাহার স্থির মীমাংসা হয় নাই। কোন কোন গ্রহতত্ত্ববিদের মতে, এই গ্রহে, শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা, এই তিন ঋতুর সঞ্চার হয় বলিয়া জানা যায়। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্র-সাহায্যেও ইহার বাহ্য বিষয়ের উপকরণাদি এ পর্য্যন্ত জ্ঞানগোচর করিতে পারা যায় নাই। নেপচুনে পর্ব্বত, শিলা বা প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় পদার্থ ও বহুদূরব্যাপী জলাশয়, এবং তাহাদের উপরিভাগে ধূম, মেঘ, বাষ্প বা কুজ্ঝটিকা সর্ব্বদাই পরিদৃষ্ট হয়। এই কৃষ্ণবর্ণ গ্রহে কোন জীবের বাস আছে কি না, এ পর্য্যন্ত তাহার কোনরূপ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই।

নেপচুনের একটী মাত্র চন্দ্র বা উপগ্রহ আছে এবং সেইটীর বিষয়ই নানা গ্রন্থে লিখিত আছে। অতি অল্প দিবস হইল ইহার আর একটী চন্দ্রের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার বিষয় উত্তমরূপ জানা যায় নাই। সে চন্দ্রটী নেপচুন হইতে বহুদূরে স্থিত এবং সকল সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। নেপচুন গ্রহটী আবিষ্কৃত হইবার বহুকাল পরে, অধ্যাপক লাসেন সাহেব ইহার নিকটে একটি ক্ষীণ আলোকপিণ্ড পরিদর্শন করিয়া, তাহাকে নেপচুনের উপগ্রহ (Satellite) বলিয়া স্থির করেন। কেম্ব্রিজ নগর হইতে জ্যোতিষী বণ্ড (Bond) এবং পাল্‌কোরা হইতে অধ্যাপক ষ্ট্রাব সাহেব এই পিণ্ডটিকে দেখিতে পাইয়া, উভয়েই স্থির করেন যে, নেপচুনের এই উপগ্রহটি, ৫ দিন, ২১ ঘণ্টায় একবার মাত্র নেপচুন গ্রহকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। *

* Neptune has one moon, which moves round the planet in 5 days 21 hours, and is of great size.

Marvels of Astronomy, p. p. 110.

অপর উপগ্রহটীর বিষয় এ পর্য্যন্ত এমন বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় নাই, যাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। জ্যোতিষানুরাগী এই প্রবন্ধ-লেখকের জীবদ্দশায় উক্ত উপগ্রহ সম্বন্ধে কোন নূতন বা জ্ঞাতব্য বিষয় আবিষ্কৃত হইয়া, তাহার আনন্দ বর্দ্ধন করিবে কি না, তাহা ব্রহ্মাণ্ডপতিই বলিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, জ্যোতিঃশেখর।

স্তোত্রগীতি।*

শ্রী নারায়ণ মাধব বৈকুণ্ঠ বামন।
ম নোময় মনোসিজ ব্রহ্ম সনাতন॥
তী র্থকর তপঃরূপ ত্রৈলোক্যতারণ।
সু রেশ্বর সামগর্ভ গরুড়বাহন॥
শী তিভাব শুভঙ্কর, বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর;
লা ঞ্ছিত শশীসুন্দর পুরুষ পুরাণ॥
বা সুদেব শ্রীগোপাল, চতুর্ভুজ মহীপাল;
লা জভয়দর্পহারী জিষ্ণু জনার্দ্দন,—
দা স অতি হীনমতি, না জানি স্তুতি ভকতি;
সী দাম্যহম্ রক্ষয় কমলারঞ্জন॥ †

শ্রীআঃ——ঘোষ।

---

* রাগিণী কানাড়া, তাল ধামার।

† লেখক স্বীয় পত্নীকর্ত্তৃক শ্রীভগবানের নামগান করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া এই স্তোত্রগীতি রচনা করিয়াছেন, এবং অপূর্ব্ব লিপিকৌশলে তৎসহ প্রিয়তমা পত্নীর নামও সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। লেখকের এই রচনা কৌশল প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। স্বঃ সং।

নিয়তি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শীলা কে? শীলা জনৈক দরিদ্র মীনের কন্যা। একমাত্র মাতামহী ব্যতীত সংসারে তাহার আর কেহই নাই। শীলা দুই বৎসর বয়সে মাতৃপিতৃহীনা হইয়াছে। তদবধি সে বৃদ্ধা মাতামহীর আশ্রয়েই প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র সাহু ও শীলা ব্যতীত বৃদ্ধারও আর কেহ ছিল না। শীলা অপেক্ষা সাহু চারি পাঁচ বৎসরের বড়। সেও বাল্যে মাতৃপিতৃহীন হইয়া এই বৃদ্ধার আলয়ে আশ্রয় লইয়াছে।

বাল্যকাল হইতেই সাহু ও শীলার মধ্যে একটা ভালবাসা জন্মিয়াছিল। সে ভালবাসা যুবক যুবতীর হৃদয়জাত প্রেম বা প্রণয় নহে, একত্র অবস্থান, এক সঙ্গে ক্রীড়া, একত্র ভোজন, একত্র শয়ন প্রভৃতি কারণে বালক বালিকার হৃদয়ে যে ভালবাসার উদ্ভব হয়, ইহাও সেই ভালবাসা। দুইটী পৃথক্ আশ্রয়ের মানব তাহারা, নিয়তিচালিত হইয়া একই আশ্রয়ে—একটী স্নেহধারা উপভোগ করিতে করিতে একত্র পালিত হইয়াছে; বিভিন্ন-প্রদেশাহৃত দুইটী বৃক্ষ ও বল্লরী এক স্থানে রোপিত হইয়া, একই তটিনীর স্নিগ্ধ বারিধারা পান করিতে করিতে এক সঙ্গে এক মৃত্তিকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে, বিভিন্ন দিক্ হইতে আগত দুইটী নদনদী দৈববশে একস্থানে মিলিত হইয়া, একই উদ্দেশে একই সুরে গাহিতে গাহিতে সাগরসঙ্গমে ছুটিয়াছে। দুইজনের প্রাণই একসুরে বাঁধা, দুইজনেই দুইজনের জন্য ব্যস্ত।

নগরের প্রান্তভাগে শীলাদের বাড়ী। বাড়ীতে দুইটী মাত্র ছোট ছোট ঘর বা কুটীর। কুটীরের একটীতে শয়নাদি হয়, অপরটীতে দুইটী মহিষ এবং কয়েকটী ছাগ থাকে। বাড়ীর সম্মুখে একটী বৃহৎ মহুয়া বৃক্ষ। বৃক্ষের পশ্চাৎ ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী। নদী ক্ষীণকায়া, অগভীরা, কিন্তু বেগশালিনী। এই নদী-তীরে বৃক্ষতলে বসিয়া সাহু ও শীলা বাল্যক্রীড়া করিত।

তারপর সাহু যখন বড় হইল, তখন তাহার পিতৃস্বসা তাহাকে মহিষচারণে নিযুক্ত করিল। প্রভাতে সাহু, মহিষ ও ছাগপাল লইয়া পাহাড়ের নিকট

চরাইতে যাইত। কোন কোন দিন শীলা তাহার সঙ্গে থাকিত। পাহাড়ের নিকট মহিষ ছাড়িয়া দিয়া সাহু, শীলার সহিত খেলায় মত্ত হইত। তাহারা পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটিয়া, গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া, ফল পাড়িয়া, লতাপুষ্প ছিঁড়িয়া খেলা করিত। ক্রমে যখন মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণ পর্ব্বতপ্রদেশে অগ্নিবর্ষণ করিত, তখন তাহারা ক্লান্তভাবে নির্ঝরিণীর জল পান করিয়া বৃক্ষতলে বসিত। বসিয়া বসিয়া সাহু বাঁশী বাজাইত, শীলা তাহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া এক মনে তাহা শুনিত। শুনিতে শুনিতে কখন বা সাহুর হাত হইতে বাঁশীটা কাড়িয়া লইয়া সে তাহা নিজে বাজাইতে চেষ্টা করিত। কিন্তু সে সাহুর মত বাজাইতে পারিত না।

অপরাহ্ন কালে উভয়ে মহিষ লইয়া গৃহে ফিরিত। তারপর ভুট্টার অর্দ্ধ-দগ্ধরুটী খাইয়া প্রফুল্ল চিত্তে বৃদ্ধার নিকট গল্প শুনিতে বসিত। বৃদ্ধা গল্প বলিত, তাহারা পরস্পর গলা জড়াইয়া শুইয়া, তাহা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িত।

এইরূপ বাল্যক্রীড়া ও ছুটাছুটীর মধ্য দিয়া শীলা চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিল।

শীলা কালো মেয়ে, তথাপি আমরা বলিব সে সুন্দরী। তাঁহার সেই কৃষ্ণবর্ণে এমন একটা ঔজ্জ্বল্য, এমন একটা লাবণ্য আছে, সেই ভাসা ভাসা চক্ষু দুটীতে এমন একটা সরলতা, এমন একটা মাধুর্য্য জড়িত আছে, সেই একটু মোটা, একটু কাল ঠোঁট দুটীতে এমন একটা মৃদু মধুর হাস্য সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছে, তাহার সেই সুগঠিত, সুপরিণত, সুপুষ্ট কৃষ্ণদেহের মধ্য হইতে এমন একটা সৌন্দর্য্য, এমন একটা কমনীয়তা বিচ্ছুরিত হইতেছে যে, আমরা তাহাকে সুন্দরী না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তোমরা কখনও নবীন জলদজালের শ্যাম রূপ নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছ কি?—সেই শ্যামরূপে স্থির সৌন্দর্য্যের পূর্ণবিকাশ দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছ কি? তবে তাহার সহিত শীলার সৌন্দর্য্যের তুলনা কর। কুলপ্লাবী তড়াগের কালো বুকে তরুণার্ককিরণ-প্রতিবিম্বিত চঞ্চল উর্ম্মিমালার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছ কি? তবে তাহার সহিত শীলার সৌন্দর্য্যের কমনীয়তা অনুভব কর। তোমরা কখনও গৃহিণীর কালোরূপে গৃহ আলো হইতে দেখিয়াছ কি? তবে তাহার সহিত শীলার এই কালোরূপ মিলাইয়া লও।

এখন আবার যৌবনের দীপ্তরশ্মিপাতে শীলার সেই সৌন্দর্য্য আরও উজ্জ্বল, আরও মধুরতর হইয়া উঠিতে লাগিল। কাঞ্চন-সংস্পর্শে নীলমণির শোভা আরও ফুটিয়া উঠিল।

সহসা শীলার স্বাভাবিক জীবনস্রোত বিভিন্নপথে ছুটিল। এই সময়ে পৃথ্বীরাজ আসিয়া মীনরাজের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মীনদিগকে বশীভূত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য তিনি সর্ব্বদা তাহাদিগের সহিত মিশিতে লাগিলেন। তাহাদের নিকটে গিয়া, তাহাদের সুখদুঃখের কথা শুনিয়া, কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তিনি ক্রমে মীনদিগের হৃদয় অধিকারের জন্য চেষ্টিত হইলেন। এইরূপে মিশিতে মিশিতে একদিন শীলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। শীলা তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার মিষ্ট কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িল। সেই দিন হইতে সে নিজের অজ্ঞাতে পৃথ্বীরাজকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল। মধুর বংশীরব-বিমুগ্ধা হরিণী আপনার অজ্ঞাতে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইল।

এখন শীলা আর সর্ব্বদা সাহুর নিকট থাকে না, সময়ে সময়ে কোথায় চলিয়া যায়। কোথায় যায়, কেন যায়, সাহু তাহা কিছু কিছু বুঝিয়াছিল, বুঝিয়া তাহার একটু কষ্ট হইয়াছিল। সময়ে অসময়ে শীলা যে এইরূপে একজন অপরিচিত বিদেশীয়ের পাছু পাছু ঘুরিয়া বেড়ায়, ইহা সাহুর ভাল লাগিত না। সে বারণ করিত, কিন্তু শীলা তাহা শুনিত না। শীলা এখন আর বালিকা নহে,—যুবতী না হইলেও বালিকা নহে; অন্যের দৃষ্টিতে সুন্দরী না হইলেও সাহুর দৃষ্টিতে অ-সুন্দরী নহে; সুতরাং এরূপে একা যেখানে সেখানে যাওয়ায় তাহার বিপদ ঘটিতে পারে, ইহা ভাবিয়া সাহুর কষ্ট হইত। সে শীলাকে কত বুঝাইত, কত স্নেহপূর্ণ তিরস্কার করিত, কিন্তু শীলা তাহার কথায় কাণ দিত না, তাহার তিরস্কার, অনুযোগ হাসিয়া উড়াইয়া দিত। তাহাতে সাহুর অভিমান হইত। কিন্তু তাহার সে অভিমান অধিকক্ষণ থাকিত না। শীলার বিপদের আশঙ্কায় তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিত।

সাহু, শীলাকে ভালবাসিত; কিন্তু সে ভালবাসায় বুঝি কামনার ছায়া ছিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শীলা যখন গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি অনেক। সে আসিয়া দেখিল, তাহার মাতামহী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সাহু ঘুমায় নাই, সে জাগিয়া দ্বারের নিকট বসিয়া আছে। তাহার মুখে ক্রোধচিহ্ন প্রকটিত। শীলা ধীরে ধীরে তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"একি সাহু, তুমি এখনও ঘুমাও নাই?"

সাহু কোন উত্তর দিল না। শীলা আবার বলিল, "কেন সাহু, এখনও জেগে বসে আছ?"

সাহু নীরব। শীলা বুঝিল, সাহুর অভিমান হইয়াছে। তখনই সে আরও নিকটে গিয়া, সাহুর হাতখানি ধরিয়া কোমল স্বরে বলিল, "কি হয়েছে সাহু?"

সাহুর ক্রোধ, অভিমান কোথায় চলিয়া গেল। সে স্থির করিয়াছিল, শীলা ফিরিয়া আসিলে আজি আর তাহার সহিত কথা কহিবে না; কথা কহিলেও খুব তিরস্কার করিবে। কিন্তু শীলার সেই সাদর করস্পর্শে—সেই সুকোমল স্বরে সে আর প্রতিজ্ঞা ঠিক রাখিতে পারিল না। সে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি শীলা?"

শীলা তাহার করতলখানি নিজের করতলে রাখিয়া, তাহার অঙ্গুলিগুলি ধীরে ধীরে নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "কেন সাহু, আজ এ কথা জিজ্ঞাসা কচ্চ?"

সাহু বলিল,—"কেন? দিন দিন তুই কি হতেছিস্ তা' দেখছিস্ কি?"

শী। কি হচ্চি?

সা। পাগল।

শী। পাগল?

সা। পাগল নয়তো কি? তুই এতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই রাজপুত্তটার পেছনে ছিলি?

শীলা নীরবে সাহুর অঙ্গুলি লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। সাহু বলিল, —"আমার একটা কথা শুন্‌বি?"

শী। কি কথা?

সা। তুই আর তার কাছে যাস্ নি।

শী। কেন?

সা। কেন? তুই তাকে যেমন ভালবাসিস্, সে কি তোকে তেমন ভালবাসে?

শী। না।

সা। তবে?

শী। তবে কি সাহু?

সা। তবে কি? যে তোকে ভালবাসে না, তাকে তুই কেন ভালবাসবি? কেন তার কাছে যাবি?

শী। সে রাজপুত্ত, আমি দীনের মেয়ে; সে আমাকে কেন ভালবাসবে?

সাহু গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"কেন ভালবাসবে? তারা মানুষ, আর আমরা কি মানুষ নই?"

শীলা বলিল,—"রাগ কর কেন সাহু, তারা কত সুন্দর, আর আমরা যে কুৎসিৎ।"

সাহু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"তুই কুৎসিৎ? কখনই না।"

শী। তারা সভ্য, আমরা অসভ্য, বন্য।

সা। অসভ্যের কি হৃদয় নাই? বন্যেরা কি ভালবাসা জানে না?

শী। কিন্তু তারা তা' বোঝে না।

সা। এমন নির্ব্বোধ নিষ্ঠুর লোককে তুই কেন ভালবাসবি শীলা?

শী। কেন তা'তো জানি না সাহু!

সা। জানিস্ না জেনে রাখ্, সে রাজপুত, বিপদে পড়ে এখানে আছে, বিপদ কাটলেই দু'দিন পরে আবার চলে যাবে। তখন—তখন তোর দশা কি হবে বল্ দেখি?

শীলা হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"এই ভয়? তখন আর কি হবে? চিরদিন যেমন আছি তেমনই থাকব।"

সাহু গম্ভীরস্বরে বলিল,—"হাসি নয় শীলা, তাকে ছেড়ে তুই আর কখনই আগেকার মত হাসি খেলা নিয়ে থাক্‌তে পারবি না।"

শীলা নীরবে সাহুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সাহু অবনতমুখে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শীলা ডাকিল,—"সাহু!"

সাহু মুখ তুলিয়া চাহিল। শীলা বলিল,—"সাহু, তুমি আমায় ভালবাস?"

সাহু ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"সে কথা কেন শীলা?"

শীলা একটু ভাবিয়া বলিল,—"তোমাকে আমার কাছে একটা শপথ করতে হবে।"

একটু বিস্ময়ের সহিত সাহু বলিল,—"কি শপথ?"

শীলা বলিল,—"শপথ কর, তুমি কখনও সে রাজপুতের কোন অনিষ্ট করবে না।"

সাহু অনেকক্ষণ নীরবে শীলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"তাই হবে।"

তাহার বড় বড় চক্ষু দু'টা জলে পূর্ণ হইয়া আসিল।

তখন উভয়ে নীরবে ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিল। শীলা গিয়া আজ্ঞা-

মহীর পার্শ্বে শয়ন করিল, সাহও নীরবে পৃথক্ শয্যায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু বুঝি মলিন শয্যায় গড়াইয়া পড়িল।

নবম পরিচ্ছেদ।

'আহেরিয়া' মীনরাজ্যের একটী প্রধান উৎসব। প্রতি বৎসরই এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এ উৎসবে রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র সকলেই সমভাবে আনন্দ উপভোগ করে। সে দিন মীনগণ মদ খাইয়া, মাদল বাজাইয়া, নৃত্য গীতে দিন কাটায়। উৎসবের দিন রাজভৃত্যগণও কার্য্য হইতে অবকাশ পায়। সে দিন তাহারা স্ব স্ব পরিজন ও বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া পরাধীনতার নিদারুণ ক্লেশ বিস্মৃত হয়।

কিছু দিন হইতে পৃথ্বীরাজ মনে মনে যে সঙ্কল্প করিয়া আসিতেছিলেন, জহুর উত্তেজনায় ও পরামর্শে যে ভীষণ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, আজি সেই সঙ্কল্প সাধনার—সেই কার্য্যোদ্ধারের শুভ অবসর উপস্থিত। আজি উৎসবের হিল্লোলে রাজ্য প্লাবিত, রাজপুরী রক্ষিশূন্য, প্রজাগণ মদ-বিহ্বল, আনন্দোন্মত্ত। এমন সুযোগ—এমন মাহেন্দ্রক্ষণ কি সহজে মিলে?

কার্য্যজ্ঞ পৃথ্বীরাজ এমন স্বর্ণ-সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। সমস্ত রাত্রি অনুচরগণের সহিত গুপ্ত পরামর্শ চলিল। পরামর্শে স্থির হইল, কল্য অসহায় অবস্থায় মীনরাজকে সংহার করিয়া সিংহাসন অধিকার করা হইবে। এই ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা কার্য্যে অগ্রসর হইতে পৃথ্বীরাজ প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিলেন, কিন্তু সুচতুর জহু বীরধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া, বালিবধ, অভিমন্যুবধ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রভৃতি বহু অন্যায় যুদ্ধের উদাহরণ দিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিল।

সমস্ত দিন ধরিয়া উৎসব চলিল, রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই উৎসবে মত্ত। নগরের চারিদিকে কেবল আনন্দের কল্লোল ছুটিতে লাগিল। কিন্তু হায়, সেই আনন্দকল্লোলের মধ্যে সহসা যে হাহাকারের উচ্চরোল উঠিবে, উৎসব ব্যসনে পরিণত হইবে, তাহা এক নিয়তি ব্যতীত আর কে ভাবিয়াছিল, কে বুঝিয়াছিল।

অপরাহ্ণ কালে পৃথ্বীরাজ নগরভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সকলে আনন্দে বিভোর, মদ্য নৃত্য গীত প্রভৃতি

লইয়া উন্মত্তপ্রায়। স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল ঘটনা দেখিয়া পৃথ্বীরাজ হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন কালে শীলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"শীলা, তুমি উৎসবে যোগ দাও নাই?"

শীলা বলিল,—"না।"

পৃ। কেন?

শী। ভাল লাগে না।

পৃথ্বীরাজ বিস্ময়ের সহিত শীলার মুখের দিকে চাহিলেন। শীলা বলিল,—"আজ তোমার মুখ এমন কেন?"

পৃথ্বীরাজ শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—"কেমন?"

কেমন তাহা শীলা কথায় বুঝাইতে পারে না; কিন্তু সে প্রত্যহ তাঁহার মুখে যে সৌন্দর্য্য যে কমনীয়তা দেখিত, আজি তাহার অভাব দেখিল। সে কেবল নীরবে স্থির ভাসা ভাসা চোক দু'টী তুলিয়া পৃথ্বীরাজের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পৃথ্বীরাজ তাহার সে দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিলেন না; বলিলেন,—"শীলা, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ঘরে যাও।

"যাই" বলিয়া শীলা দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথ্বীরাজ দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে যতক্ষণ দেখা গেল, শীলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল; তারপর পৃথ্বীরাজ দৃষ্টির অতীত হইলে ধীরে ধীরে একদিকে চলিয়া গেল।

উৎসব দিবসের অবসান হইল; পৃথিবীর ম্লানমুখে ধূসর বাস টানিয়া দিয়া সন্ধ্যারাণী ধীরে ধীরে আবির্ভূতা হইলেন। আকাশে নক্ষত্র ফুটিল, চাঁদ উঠিল, কিন্তু নগর মধ্যে সে দিন বুঝি জ্যোৎস্না ফুটিল না. একটা অজ্ঞাত বিপদের ঘন ছায়া আসিয়া উৎসবময়ী নগরীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে দণ্ডের পর দণ্ড অতীত হইতে থাকিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীষণ নীরবতা আসিয়া নগরবাসিগণের হৃদয়ে বিভীষিকার সঞ্চার করিতে লাগিল। রাত্রি প্রহরেক অতীত হইয়া গেল, উৎসবাবসানে অবসাদগ্রস্ত নরনারীগণ সুষুপ্তির কোলে ঢলিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে সেই আনন্দমুখরিত গ্রামের উপর নিস্তব্ধতার করাল মূর্ত্তি নৃত্য করিতে লাগিল। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা অজ্ঞাত হাহাকারের তুমুল কল্লোল উঠিতে থাকিল।

গভীরা রজনীর ভীষণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সহসা রাজপ্রাসাদ মধ্য হইতে একটা আর্ত্তনাদের করুণ রোল উত্থিত হইল। কয়েকজন সশস্ত্র দস্যু অন্তঃপুরে

প্রবেশ করিয়া মীনরাজকে আক্রমণ করিল। রাজা তখন নিরস্ত্র, তিনি অন্তঃপুরচারিণী রমণীমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রীড়া কৌতুকে মগ্ন ছিলেন। দস্যুগণের এই আকস্মিক আক্রমণে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন; রমণীগণ ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজা আত্মরক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া প্রাসাদের পশ্চাদ্দ্বার খুলিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিলেন। জনৈক সশস্ত্র দস্যু অশ্বারোহণে তাঁহার পশ্চাৎ ছুটিল।

হতভাগ্য মীনরাজ অধিক দূর পলায়ন করিতে পারিলেন না, অচিরেই অনুসরণকারী দস্যুর করতলগত হইলেন, এবং আততায়ীর ভীষণ অস্ত্রাঘাতে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি একবার চক্ষু মেলিয়া আততায়ীর মুখের দিকে চাহিলেন; একবার ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"বিশ্বাসঘাতক—"

দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণবায়ু নৈশ বায়ুসাগরে মিশাইয়া গেল। এক খণ্ড মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিল; হাস্যময়ী প্রকৃতি ম্লান আবরণে মুখমণ্ডল আবৃত করিল। আততায়ী দস্যু তখনও অনিমেষনেত্রে প্রাণহীন রক্তাক্ত রাজদেহ পানে চাহিয়া দণ্ডায়মান।

সহসা পশ্চাৎ হইতে কঠোর কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল,—"নিমকহারাম!"

মুহূর্ত্তে দস্যু ফিরিয়া দাঁড়াইল। বক্তা মুহূর্ত্তের জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিল। পরক্ষণেই হস্তস্থিত বর্শা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে একদিকে চলিয়া গেল। তখন দস্যুও লম্ফ দিয়া অশ্বে উঠিয়া নগরাভিমুখে ঘোড়া ছুটাইল।

পরদিন প্রভাতে নগরবাসীরা সবিস্ময়ে দেখিল, পৃথ্বীরাজ—সেই অচিরাগত আশ্রয়প্রার্থী রাজপুত, মীনরাজের সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কার্য্যক্ষেত্র।

কিছুদিন পূর্ব্বে দেশটা যখন বিশালকায় অজগরের মত স্বীয় কলেবর বিস্তৃত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল, তখন কোন গোলই ছিল না; শত আঘাত শত অত্যাচার সে নীরবে আপনার অসাড় পৃষ্ঠদেশ পাতিয়া সহ্য করিতেছিল; ন্যায় অন্যায়, সুবিচার অবিচার কিছুতেই তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না; প্রলয়ের শত ঝঞ্ঝাবাতেও সে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। কিন্তু এখনই

ভাবে চিরদিন কাটিল না, সহসা একদিন কাহার কোন মর্ম্মস্পর্শী আঘাতে—বিধাতার কোন্ উচ্চ আহ্বানে তাহার সে যোগনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, সে চক্ষু মুছিয়া গা ঝাঁড়া দিয়া উঠিয়া বসিল। এইবারেই একটা গোলযোগ বাধিয়া গেল; অন্যায়ের সহিত ন্যায়ের, আঘাতের সহিত প্রতিঘাতের একটা তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দীর্ঘনিদ্রার অবসানে ক্ষুধার্ত্ত কুম্ভকর্ণের ন্যায় সে একেবারে সমগ্র জগৎটাকেই উদরসাৎ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু জগতের লোক তাহার এ অন্যায় আব্দার সহিবে কেন? সুতরাং মধ্যপথে বাধা পড়িল। তখন বিশ্বগ্রাসেচ্ছু ক্ষুধানলের তাড়নায় কেহ কেহ গিয়া রাজদ্বারে অতিথি হইল; চিরদয়াশীল রাজবিধান এই সকল ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে বিমুখ করিতে না পারিয়া সাদরে তাহাদের দুইবেলা উদরান্নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আর যাহারা সেদিকে গেল না, তাহারা চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল; পেটের জ্বালায় উন্মত্ত হইয়া কেহ পুলিস মারিল, কেহ কংগ্রেস ভাঙ্গিল, কেহবা আপনার মস্তক ভক্ষণে আপনি উদ্যত হইল। দীর্ঘনিদ্রার পর জাগরণে এমনই একটা কোলাহল উঠিয়া থাকে।

এই গোলযোগের মূল কারণ—কার্য্যের অভাব। কার্য্যের অভাব বলিলে ঠিক হয় না, কার্য্য নির্ব্বাচনের অভাব। জড় অনায়াসেই এক স্থানে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সেই জড়ে যখন চেতনার সঞ্চার হয়, তখন আর সে একটি সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতির ধর্ম্মই এই। তখন সে ইচ্ছামত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে চায়। শিশু যখন চলিতে শিখে, তখন কি তাহাকে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া রাখিতে পারা যায়? দেশটারও এখন সেই অবস্থা। সে এখন কাজের জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহাকে কার্য্যনির্ব্বাচন করিয়া দেয় কে? যেমন কতকগুলা সৈন্য হইলেই যুদ্ধ চলে না, তাহাদিগকে চালাইবার জন্য একজন সেনাপতি চাই, তেমনই সহস্র সহস্র লোক যখন কাজ করিবার জন্য উন্মুক্ত হয়, তখন তাহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য উপযুক্ত লোকের দরকার। এই খানেই সকলকে নেতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাচনের পূর্ব্বে কার্য্যক্ষেত্রের নির্ব্বাচন চাই। আমাদের প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র কোথায়? এই যে লক্ষ লক্ষ মানবসঙ্কুল বিরাট-সৌধমালা-পরিশোভিত সদাশকটচক্রমুখরিত বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল মহানগরী কলিকাতা, ইহাই কি প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র? কৈ এখানে তো করিবার মত তেমন কাজ খুঁজিয়া

পাওয়া যায় না? এখানে সকলই কলের কাজ, কলের পুতুলের দ্বারাই তাহা এমন নিঃশব্দে সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে যে, সে-জন্য কোন দিনই কাহারও একটু প্রেরণার আবশ্যক হয় না। সুতরাং মানুষের কাজ এখানে কি আছে?

যেখানে হস্তপদবিশিষ্ট মানুষের উপযুক্ত কাজ আছে, তাহাই প্রকৃত কার্য্য-ক্ষেত্র। সে ক্ষেত্র ঐ পল্লীগ্রাম। ঐ মানবকোলাহলবর্জ্জিত দীন কৃষকের আবাসভূমি নিভৃত পল্লীই আমাদের কার্য্যের উপযুক্ত ক্ষেত্র; ঐ ক্ষেত্রে কাজ করিতে পারিলেই আমাদের সাধনা সফলতার দিকে অগ্রসর হইবে। একবার চাহিয়া দেখ, ঐ পল্লীগ্রামের আজি কি দুরবস্থা! আমাদের সুখনিবাস পল্লী ভূমি—যাঁহাকে আমরা "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলিয়া স্তব করি, "বন্দে মাতরম্" বলিয়া যাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হই, সেই স্নিগ্ধশ্যামা স্বর্ণপ্রসবিনী মাতৃরূপিণী পল্লীর আজি কি দুর্গতি! ঐ দেখ, তাহার জলাশয় শুষ্ক, দেবমন্দির সংস্কারাভাবে পতনোন্মুখ, অট্টালিকা ভগ্নস্তূপে পরিণত, শ্যামল শস্যক্ষেত্র মরুভূমি-প্রায়, নিরন্ন অধিবাসিবৃন্দ অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার। এখন তথায় সে স্নিগ্ধ শ্যামচিত্র দেখা যায় না, প্রভাতে সন্ধ্যায় দেবমন্দিরে শঙ্খঘণ্টা নিনাদিত হয় না, চতুষ্পাঠীতে ধর্ম্মশাস্ত্রের আলাপ হয় না, রজনীতে খোল করতালের সহিত সঙ্কীর্ত্তনের মধুর ধ্বনি উঠে না। সে সুখের পল্লী এখন নীরব, শ্মশানসদৃশ।

এখন পল্লীতে আছে শুধু জলকষ্ট, অন্নকষ্ট, আছে পঙ্কিলসলিল জলাশয়, আছে, ঘন জঙ্গল। আর আছে ম্যালেরিয়ার রাজত্ব, পুলিসের শাসন, জমিদারের পাইকের লাল পাগড়ী। এখন আর তথায় একতা নাই দলাদলি আছে, সাহস নাই দুর্ব্বলতা আছে, পরোপকার প্রবৃত্তি নাই, পরানিষ্টের চেষ্টা আছে; সে উৎসবের আনন্দ কল্লোল নাই, প্রেতের উন্মাদ তাণ্ডব-লীলা আছে। সুখের পল্লীর সব গিয়াছে, শুধু একটা কঙ্কালমাত্র পড়িয়া আছে।

এখন আমাদিগকে এই রক্তমাংসহীন কঙ্কালে প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে, সাধনার বলে নির্জ্জীবকে সজীব করিতে হইবে। ইহা যদি না পারি, তবে আমাদের বৃথা জাগরণ, বৃথা আন্দোলন, বৃথা লম্ফঝম্ফ!

কার্য্যটা বড়ই কঠিন; ইহাই কর্ম্মযোগীর নিষ্কাম সাধনা। কিন্তু এই কঠোর সাধনা ব্যতীত মহতী সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় না। সুতরাং যেমন করিয়াই হউক আমাদিগকে এই সাধনার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এ সম্বন্ধে কিভাবে কোন্ পথে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা আমরা

প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিলাম।

"দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্ম্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে, কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ করিব? উচ্চচূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে, তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদেরও কর্ম্মশক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই, তবে প্রত্যেক জিলা হইতে তাহার ভিৎগাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। প্রভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্সের ইহাই সার্থকতা।

প্রত্যেক প্রদেশে একটী করিয়া প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হইবে। এই সভা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে আপনার শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন করিবে—প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সর্ব্বাংশের সকল প্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে—কারণ কর্ম্মের ভূমিকাই জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে তাহার সমস্ত অবস্থা জানা চাই।

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটী মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধাননগর যদি গ্রামের সমস্ত কর্ম্মের এবং অভাবমোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্য্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে, তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চ্চা দেশের সর্ব্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্ম্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহদান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটী করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে; সেখানে কর্ম্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিসের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।

জোৎদার ও চাষী রায়ৎ যতদিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকিয়া চাষবাস করিবে, ততদিন তাহাদের অবচ্ছল অবস্থা কিছুতেই ঘুচিবে না। পৃথিবীতে চারিদিকে সকলেই জোট বাঁধিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছে; এমন অবস্থায় যাহারাই বিচ্ছিন্ন এককভাবে থাকিবে, তাহাদিগকে চিরদিনই অন্যের গোলামী ও মজুরী করিয়া মরিতেই হইবে।

অতএব দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে, সমস্ত একত্র মিলাইয়া বাঁধ বাঁধিবার সময় আসিয়াছে। এ না হইলে ছিদ্র-পথ দিয়া আমাদের ছোট ছোট

সামর্থ্য ও সম্বলের ধারা বাহির হইয়া গিয়া অন্যের জলাশয় পূর্ণ করিবে। অন্ন থাকিতেও আমরা অন্ন পাইব না, এবং আমরা কি কারণে কেমন করিয়া যে মরিতেছি তাহা জানিতেও পারিব না। আজ যাহাদিগকে বাঁচাইতে চাই তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে।

ইউরোপে, আমেরিকায় কৃষির নানাপ্রকার মিতশ্রমিক যন্ত্র বাহির হইয়াছে —নিতান্ত দারিদ্র্যবশতঃ সে সমস্ত আমাদের কোনও কাযেই লাগিতেছে না— অল্প জমি ও অল্প শক্তি লইয়া সে সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নহে। যদি এক একটী গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া নিজেদের সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া দিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তবে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে অনেক খরচ বাঁচিয়া ও কাযের সুবিধা হইয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে। যদি গ্রামের উৎপন্ন সমস্ত ইক্ষু তাহারা এক কলে মাড়াই করিয়া লয়, তবে দামী কল কিনিয়া লইলে তাহাদের লাভ বই লোকসান হয় না—পাটের ক্ষেত সমস্ত এক করিয়া লইলে, প্রেসের সাহায্যে তাহারা নিজেরাই পাট বাঁধাই করিয়া লইতে পারে— গোয়ালারা একত্র হইয়া জোট করিলে, গোপালন ও মাখন ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সস্তায় ও ভালমতে সম্পন্ন হয়। তাঁতিরা জোট বাঁধিয়া নিজের পল্লীতে যদি কল আনে, এবং প্রত্যেকে তাহাতে আপনার খাটুনি দেয়, তবে কাপড় বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেকেরই সুবিধা ঘটে।

সহরে ধনী মহাজনের কারখানায় মজুরী করিতে গেলে শ্রমীদিগের মনুষ্যত্ব কিরূপ নষ্ট হয় তাহা সকলেই জানেন। বিশেষতঃ, আমাদের—যে দেশের সমাজ গৃহের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে গৃহনীতি বিচলিত হইলে ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন জীর্ণ হইয়া পড়ে ও সমাজের মর্ম্মস্থানে বিষসঞ্চার হইতে থাকে, সে দেশে বড় বড় কারখানা যদি সহরের মধ্যে আবর্ত্ত রচনা করিয়া চারিদেকের গ্রাম পল্লী হইতে দরিদ্র গৃহস্থদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনে, তবে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত, বাসস্থান হইতে বিশ্লিষ্ট স্ত্রীপুরুষগণ নিরানন্দকর কলের কাযে ক্রমশই কিরূপ দুর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত হইতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। কলের দ্বারা কেবল জিনিস পত্রের উপচয় করিতে গিয়া মানুষের অপচয় করিয়া বসিলে সমাজের অধিক দিন তাহা সহিবে না। অতএব পল্লীবাসীরাই একত্রে মিলিলে যে সকল যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভবপর হয়, তাহারই সাহায্যে স্বহস্তেই কর্ম্মের উন্নতি করিতে পারিলে সকল দিক রক্ষা হইতে পারে। শুধু তাই নয়, দেশের জনসাধারণকে ঐক্যনীতিতে দীক্ষিত করিবার এই একটী উপায়। প্রাদেশিক

সভা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা একটী মণ্ডলীকেও যদি এইরূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন, তবে এই দৃষ্টান্তের সফলতা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।”

এই উপলক্ষে দেশের জমিদারের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, বাঙ্গালার পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চারের জন্য তাঁহারা উদ্যোগী না হইলে এ কায কখনই সুসম্পন্ন হইবে না। পল্লী সচেতন হইয়া নিজের শক্তি নিজে অনুভব করিতে থাকিলে জমিদারের কর্ত্তৃত্ব ও স্বার্থ খর্ব্ব হইবে বলিয়া আপাততঃ আশঙ্কা হইতে পারে—কিন্তু এক পক্ষকে দুর্ব্বল করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারের শক্তিকে কেবলি বাধাহীন করিতে থাকা আর ডাইনামাইট বুকের পকেটে লইয়া বেড়ান একই কথা—একদিন প্রলয়ের অস্ত্র বিমুখ হইয়া অস্ত্রীকেই বধ করে। রায়তদিগকে এমনভাবে সবল ও শিক্ষিত করিয়া রাখা উচিত যে, ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় করিবার প্রলোভনমাত্র জমিদারের মনে না উঠিতে পারে। জমিদার কি বণিকের মত কেবল দীনভাবে আদায় করিবার পথগুলিই সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত রাখিবেন? কিন্তু সেই সঙ্গে মহৎভাবে স্বার্থত্যাগ করিবার সম্বন্ধ যদি একান্ত যত্নে না রক্ষা করেন, উচিত ক্ষতি উদারভাবে স্বীকার করিবার শক্তি যদি তাঁহার না থাকে, তবে তাঁহার আত্মসম্মান কেমন করিয়া থাকিবে? রাজহাটে উপাধি কিনিবার বেলায় তিনি তো লোকসানকে লোকসান জ্ঞান করেন না? কিন্তু যথার্থ রাজা হইবার একমাত্র স্বাভাবিক অধিকার আছে তাঁহার রায়তদের কাছে। তিনি যে বহুতর লোকের প্রভু, বন্ধু ও রক্ষক, বহুলোকের মঙ্গলবিধান কর্ত্তা; পৃথিবীতে এত বড় উচ্চপদ লাভ করিয়া এ পদের দায়িত্বরক্ষা করিবেন না?

এ কথা যেন না মনে করি যে, দূরে বসিয়া টাকা ঢালিতে পারিলেই রায়তের হিত করা যায়। এ সম্বন্ধে একটী শিক্ষা কোন দিন ভুলিব না। এক সময়ে আমি মফঃস্বলে কোন জমিদারী তত্ত্বাবধান কালে সংবাদ পাইলাম, পুলিশের কোন উচ্চ কর্ম্মচারী কেবল যে একদল জেলের গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে তাহা নহে, তদন্তের উপলক্ষ করিয়া তাহাদের গ্রামে গৃহস্থদের মধ্যে বিষম অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে। আমি উৎপীড়িত জেলেদের ডাকিয়া বলিলাম, তোরা উৎপাতকারীর নামে দেওয়ানি ও ফৌজদারি যেমন ইচ্ছা নালিস কর; আমি কলিকাতা হইতে বড় কৌঁসুলি আনাইয়া মোকদ্দমা চালাইব। তাহারা হাত জোড় করিয়া কহিল, কর্ত্তা, মামলায় জিতিয়া লাভ কি? পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে আমরা ভিটায় টিকিতেই পারিব না।

আমি ভাবিয়া দেখিলাম, দুর্ব্বল লোক জিতিয়াও হারে; চমৎকার অস্ত্র-চিকিৎসা হয়, কিন্তু ক্ষীণরোগী চিকিৎসার দায়েই মারা পড়ে। তাহার পর হইতে এই কথা আমাকে বারম্বার ভাবিতে হইয়াছে, আর কোন দান দানই নহে, শক্তিদানই একমাত্র দান।

একটা গল্প আছে, ছাগশিশু একবার ব্রহ্মার কাছে গিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল, "ভগবান, তোমার পৃথিবীতে আমাকে সকলেই খাইতে চায় কেন?" তাহাতে ব্রহ্মা উত্তর করিয়াছিলেন, "বাপু, অন্যকে দোষ দিব কি, তোমার চেহারা দেখিলে আমারই খাইতে ইচ্ছা করে।"

পৃথিবীতে অক্ষম বিচার পাইবে, রক্ষা পাইবে এমন ব্যবস্থা দেবতাই করিতে পারে না। ভারত মহাসভা হইতে আরম্ভ করিয়া পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে না। সাধু ইচ্ছা এখানে অশক্ত। দুর্ব্বলতার সংস্রবে আইন আপনি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, পুলিস আপনি বিভীষিকা হইয়া উঠে। এবং যাঁহাকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া দোহাই পাড়ি, স্বয়ং তিনিই পুলিসের ধর্ম্মবাপ হইয়া দাঁড়ান।

এদিকে প্রজার দুর্ব্বলতা সংশোধন আমাদের কর্ত্তৃপক্ষদের বর্ত্তমান রাজনীতির বিরুদ্ধ। যিনি পুলিশ কমিশনে বসিয়া একদিন ধর্ম্মবুদ্ধির জোরে পুলিশকে অত্যাচারী বলিয়া কটুবাক্য বলেন, তিনিই লাটের গদিতে বসিয়া কর্ম্মবুদ্ধির ঝোঁকে সেই পুলিশের বিষদাঁতে সামান্য আঘাতটুকু লাগিলেই অসহ্য বেদনায় অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন। তাহার কারণ আর কিছুই নহে—কচি পাঁঠাটীকে অন্যের হাত হইতে রক্ষাযোগ্য করিতে গেলে পাছে সে তাঁহার নিজের চতুর্ম্মুখের পক্ষেও কিছুমাত্র শক্ত হইয়া উঠে, এ আশঙ্কা তিনি ছাড়িতে পারেন না। "দেবা দুর্ব্বলঘাতকাঃ।"

তাই দেশের জমিদারদিগকে বলিতেছি, হতভাগ্য রায়তদিগকে পরের হাত এবং নিজের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষিত, সুস্থ ও শক্তিশালী করিয়া না তুলিলে কোন ভাল আইন বা অনুকূল রাজশক্তির দ্বারা ইহারা কদাচ রক্ষা পাইতে পারিবে না। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সকলেরই জিহ্বা লালায়িত হইবে। এমনি করিয়া দেশের অধিকাংশ লোকেই যদি জমিদার, মহাজন, পুলিশ, কানুনগো, আদালতের আমলা, যে ইচ্ছা সেই অনায়াসেই মারিয়া যায় ও মারিতে পারে, তবে দেশের লোককে মানুষ হইতে না শিখাইয়া রাজা হইতে শিখাইব কি করিয়া?"

চুরির কিনারা।

বাগদীর ছেলে রামা নাম তার,
গ্রামের একটী ধারে।
ছিল না তাহার এ জগতে কেউ
আপনার বলিবারে।
শুধু ছিল তার সুস্থ সবল
অসুরের মত কায়;
বাসনা শূন্য সরল হৃদয়
ছিল না অভাব তায়।
পাতা দিয়া ঢাকা ছোট কুঁড়েখানি,
হেলা তার এক পাশ;
চাল ছিদ্র দিয়া দেখা যেত রেতে
তারাভরা নীলাকাশ।
সারাদিন খাটি পরের মজুরী
সন্ধ্যায় কুটীরে আসি,
মলিন বিছানা পাতি' অকাতরে
ঘুমা'ত সে সারানিশি।
সিত চন্দ্রকর রন্ধ্র পথে আসি
পড়িত তাহার মুখে;
বীজনিত বায়ু ক্লান্ত দেহ তার,
ঘুমাইত রামা সুখে।
আপনি আনিত আপনি খাইত,
খাওয়াতে ছিল না কেউ;
আপনার মনে দিন চলে যেত,
গণিত না রামা ঢেউ।

* * *

একদিন রামা সকালেতে উঠি
কুঁড়ের বাহিরে আসি,
দেখিল, দাঁড়ায়ে লালপাগ বাঁধা
উত্তর-পশ্চিমবাসী।
একজন নয়, সারি সারি সারি.
পিছনেতে জমাদার;
সবিস্ময়ে রামা চাহে একবার
মুখপানে সবাকার।
কথা না বাহির হ'তে মুখে তার,
হাতকড়ি পড়ে হাতে;
টানিয়া তাহারে চৌকীদারদল
লইয়া চলিল সাথে।
পরে একদিন হাকিমের কাছে
বিচার হইল তার;
দেখে বিচারক, ডাকাত বলিয়া
আসামী গেছে স্বীকার।
পাতার কুঁড়েতে ছাউনী ভিতরে
পাওয়া গেছে চোরামাল,—
অবাক হইয়া সাক্ষীদের পানে
চাহে রামা ফ্যাল ফ্যাল।
তারপর রামা চলিল শ্রীঘরে,
সাতটী বছর তরে।
প্রোমোশন হ'ল দারোগা বাবুর
চুরির কিনারা ক'রে।

* * *

সাতটী বছর গত হলে রামা
ফিরিয়া আসিল দেশে;
দেখিল তাহার কুঁড়ে খানি নাই,
(সেথা) চাষীরা লাঙ্গল চষে।

এ জগতে তার আপন বলিতে
ছিল শুধু কুঁড়ে খানি ;
মূর্খ রামা ভাবে,—কি করম দোষে,
কে হরিল তা' না জানি।
ছল ছল চোখে চাহে চারিদিকে
শুধু এক ফোঁটা জল—
পড়িল গড়ায়ে, একটী নিশ্বাস
বহে ভেদি অন্তস্তল।
তারপর রামা কোথা চলে গেল,
কেবা তার খোঁজ রাখে ?
দারোগা বাবুটী পেন্‌সন ভোগ
করিতেছে আজো সুখে।

শ্রীমতী লবঙ্গলতা দেবী।

রাজকন্যা সরোজাক্ষী।

—— o:*:o ——

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কন্যার মৃত্যুর পর হইতে সরোজাক্ষীর অবস্থা ক্রমশঃ কৃশ হইয়া পড়িতে লাগিল। রাজা নাই যে তিনি আবার সাধ্য সাধনা করিয়া পরেশনাথকে এদেশে আনয়ন করিবেন। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পর রাজকন্যাকে রাজকুমারগণ যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন, এমন কি সরোজাক্ষীর পরামর্শ না লইয়া তাঁহারা রাজকার্য্য ও পূজাপার্ব্বণের কোনরূপ ব্যবস্থা পর্য্যন্তও করিতেন না। পিতৃ-বিয়োগের পর হইতে রাজকন্যা আর নিজের বাটীতে পদার্পণ করেন নাই, তাঁহার জননীর নিকটেই বাস করিতেন।

অর্থের অভাবে পড়িয়া আর একবার পরেশনাথ রাজবাটীতে আগমন করিয়াছিলেন। কিছুদিন এখানে থাকিয়া সপত্নীক তীর্থ পর্য্যটন মানসে দাসদাসী সমভিব্যাহারে রাজবাটী পরিত্যাগ করিলেন।

৺বারাণসী ধামে গিয়া সরোজাক্ষী তাঁহার স্বামীর দ্বিতীয়া পত্নী ও তাঁহার সন্তান সন্ততি দিগকে আনাইয়া বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিলেন, পরেশনাথ তাহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি আরও কিছু অর্থ চাহিয়া বসিলেন। কিন্তু তখন রাজকন্যার হস্তে নগদ অর্থ বেশী না থাকায় পতির বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ হইল না। এই স্থান হইতেই উভয়ের মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। পরেশনাথ যাহা কিছু পারিলেন সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এদিকে রাজকন্যাও মনের ক্ষোভে পীড়িতা হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার যে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায় ক্ষীণ আশাটুকু ক্ষণেকের তরে জলিয়া

উঠিয়াছিল তাহা আবার অচিরেই নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িল। রাজকন্যার ভগ্নহৃদয় আর জোড়া লাগিল না, তাঁহার অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল। স্বামীর চরণোদক নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তীর্থ হইতে আসিবার সময় চরণ উদক লইয়া আসিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু মনের কষ্টে তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে বাটী আসিয়া স্বামীর চরণামৃতের জন্য বড়ই অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন।

মধ্যম রাজকুমার দিদিকে অত্যন্ত স্নেহ ও ভক্তি করিতেন, তিনি দিদির অন্তরের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইয়া নিজেই পাদোদক আনিবার জন্য পরেশ নাথের দেশে যাত্রা করিলেন। পরেশনাথকে আনিবার জন্য অনেক উপায় অবলম্বন করা হইল, কিন্তু পরেশনাথ—নিষ্ঠুর পরেশনাথ কিছুতেই আসিতে সম্মত হইলেন না। যখন পরেশনাথ বলিলেন, আমাকে টাকা না দিলে আমি পাদোদক পর্য্যন্ত দিব না, তখন মধ্যম রাজকুমার পাঁচশত টাকা দিয়া পরেশ নাথকে সন্তুষ্ট করিয়া দিদির জন্য স্বামীর পাদোদক লইয়া দেশে ফিরিলেন। সরোজাক্ষী স্বামীর পাদোদক প্রাপ্ত হইয়া প্রাণের সহিত ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মধ্যম রাজকুমার এখনও জীবিত আছেন। আজ তাঁহার গুণে দেশের শত্রুমিত্র সকলেই মুগ্ধ। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার যশঃসৌরভে কান্দী মহকুমা ভরপুর রহিয়াছে। পতিপরায়ণা সতীর আন্তরিক আশীর্ব্বাদই যে ইঁহার যশোরাশির মূল কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রাজকন্যা সেই যে স্বামীসন্দর্শন করিয়া ৺বারাণসী হইতে রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, দীর্ঘ তিন বৎসরের ভিতর আর তিনি বিছানা হইতে উঠিতে পারিলেন না। কাহারও জন্য পৃথিবীর কোন কার্য্যই বন্ধ থাকে না। ভগবানের বিধান কেহই অবরোধ করিতে পারে না। কত পূর্ণিমা কত অমাবস্যা মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল, কেহই রাজকন্যার জন্য ফিরিয়া চাহিল না। পালাক্রমে রাজবাটীতে বারমাসে তের পার্ব্বণও সমাধা হইয়া যাইতে লাগিল; যে শারদীয়া পূজা সরোজাক্ষী ভিন্ন যেন কখনই সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইবে না বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল, তাহাও বেশ নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইয়া যাইতে লাগিল, কোন কার্য্যই রাজকন্যার জন্য মুহূর্ত্তের তরেও আটকাইয়া থাকিল না। বৎসরের প্রত্যেক দিনটীর জন্যও বিছানায় শুইয়া রাজকন্যা কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রকৃতির এক মুহূর্ত্তও তাঁহার জন্য কাঁদিল না। সরোজাক্ষী যখন দশভূজার সম্মুখীন হইয়া স্তবপাঠ করিতেন, তখন মনে হইত

যেন ভগবতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ কথাবার্ত্তা হইতেছে। জগদম্বা যেন আপন তনয়াকে সহাস্যবদনে ক্রোড়ে করিবার জন্য দশভুজ প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কতবার মা জগদম্বা এই রাজবাটীতে আসিলেন, কিন্তু রাজকন্যা আর উঠিয়া মায়ের চরণ দর্শন করিতে পারিলেন না। সরোজাক্ষী বুঝিলেন, আর আমাকে যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মায়ের চরণে ক্রন্দন করিতে হইবে না, জননী তাঁহাকে সত্বরেই বক্ষে তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

রাজকন্যার অবস্থা ক্রমশঃই অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় ডাক্তার কবিরাজ সকলেই হতাশ হইয়া জবাব দিয়া গেলেন। মহাপ্রয়াণের দিন সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে জানিতে পারিয়া তিনি একবার অন্তিমসময়ে স্বামীর চরণ দর্শন করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। পরেশনাথকে তারের উপর তার করা হইতে লাগিল। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন আমি হাজার টাকার জন্য বড়ই দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি, উক্ত টাকা পাইলে সত্বর দেখা করিতে পারি। অর্থের ভরসায় অবশেষে পরেশনাথ রাজকন্যার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরোজাক্ষী এদিকে মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, পরেশনাথ কিন্তু রাজবাটীতে দেখা করিতে গেলেন না। কাল পূর্ণ হইয়া আসিল, ১৩০৭ সালের ৩১শে চৈত্র রাজকন্যা পরেশনাথকে দেখিবার জন্য বড়ই অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন; সরোজাক্ষীর সম্পত্তি হইতে হাজার টাকার এক তোড়া রাজকন্যার হস্তে অর্পণ করা হইল। ৩১শে চৈত্র সন্ধ্যার সময় পরেশনাথ রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজকন্যা বাষ্পবিগলিত লোচনে বলিতে লাগিলেন— "স্বামিন্! আমাকে রুগ্ন বলিয়া আর অশ্রদ্ধা করিও না। তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অনেক ছিল, কিন্তু সে সব কথা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আর আমার নাই, অন্তরের কথা তোমার চরণে সমস্ত প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আরও দু'দিন পূর্ব্বে তোমার চরণ দর্শন পাইলে আমার এ মরণে তৃপ্তি হইত। দুঃখ রহিল সমস্ত কথা তোমাকে বলিয়া যাইতে পারিলাম না। আমার জন্য অন্তরে কত কষ্ট পাইয়াছ দেব! আমার এই অন্তিম সময়ে সে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিও। আমাকে বড়লোক বলিয়া ঘৃণা করিতে, কিন্তু আমার অন্তর একদিনও তোমাকে দেখাইতে পারিলাম না এ ক্ষোভ এই মরণের দিনেও বড়ই অস্থির করিয়া তুলিতেছে। স্বামিন্! তাই আবার বলিতেছি আমাকে ক্ষমা কর, আশীর্ব্বাদ কর, যেন স্থির হইয়া মরণের পথে অগ্রসর হইতে পারি। এই তোমার প্রাপ্য টাকা লও, প্রফুল্ল মনে আমার মস্তকের উপর চরণ অর্পণ কর।"—

অহো! সধবার সিঁথীভরা সিন্দূরের রেখা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, আর পরেশনাথ এক হস্তে টাকার তোড়া লইয়া রাজকন্যার মস্তকে পদ দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মরি মরি, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! ধন্য সতী, ধন্য তোমার পতি-ভক্তি, ধন্য তোমার প্রেম! এ প্রেম এ কলিযুগে যে আমরা পাপচক্ষে দেখিতে পাইব তাহা ত একদিনও স্বপ্নে ভাবি নাই। সেদিন বেণ্টিঙ্ক সাহেব সহমরণ প্রথা তুলিয়া দিয়াছেন, আর এই কয় বৎসরের মধ্যে তাহা উপকথা বলিয়া অনুমান হইতেছে। এই পাপ চক্ষু নিজে না দেখিলে কিছু যে বিশ্বাস করিতে চায় না! তাই বুঝি আজ সতীর পতিভক্তি সন্দর্শন করাইবার জন্য বিধাতা বহুদূর হইতে আমাকে এই মুর্শিদাবাদে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। হিন্দুর ঘরে বিশেষতঃ রাজসংসারে এইরূপ অভাবনীয় দৃশ্য অবলোকন করিলে প্রাণে যে কি এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হয় তাহা সুধীজনেও বর্ণনা করিতে পারেন কি না সন্দেহ! আমাদের ন্যায় মূর্খের ভাষায় সে পবিত্র দৃশ্য অঙ্কিত করিতে যাওয়া বাতুলতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে! আমি যথার্থ বলিতেছি, এই ঘটনার একটীও অতিরঞ্জিত বা কল্পিত নহে।

স্বামী, স্ত্রীর মস্তকে চরণ রাখিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, রাজকন্যা বলিলেন, "এখন আর অশ্রুপাত করিও না, অন্তিম সময়ে আমার অমঙ্গল হইবে। অশ্রু সম্বরণ করিয়া নিজের বাটীতে যাও, টাকা সামলাইয়া রাখিবার বন্দোবস্ত কর, নতুবা মৃত্যু সময়ে তোমার বিপদ ঘটিবে। পার ত রাত্রে আর একবার আসিও।" পরেশনাথ অর্থ লইয়া রাজকন্যার নিজ বাটীতে প্রস্থান করিলেন। আর সে রাত্রে দেখা করিতে আসিলেন না।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, প্রভাতে বৈশাখের নূতন সূর্য্যের উদয় হইবে, নূতন বর্ষে ফল ফুল জীবকুল সকলেই যেন নূতন জীবন লাভ করিবে। প্রকৃতি রাণী পরদিন হইতে বুঝি আবার নূতন সুখদুঃখের আয়োজনে নিমগ্না হইবেন। রাজকন্যার ভোগের বৎসরও শেষ হইল, তাঁহার সহিত নূতনের সম্বন্ধ ছিন্ন হইল, বৈশাখের নবসূর্য্য দর্শন করিবার জন্য তিনি আর কেনই বা থাকিবেন? নূতন বর্ষ আসিয়া তাহার নূতন বন্দোবস্ত করিয়া লউক, রাজকন্যার সহিত ত আর কোন সম্বন্ধ নাই। নূতন বৎসরকে আবাহন করিবার জন্য গৃহী তাহার দোকান পাট সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, পবন আবছায়া ঘোরে কুসুমগুলির অবগুণ্ঠন [illegible] হাসিমুখে নূতন বৎসরকে উপহার দিবার জন্য সতর্ক করিয়া যাইতেছে, কুসুমগুলি যেন লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতির দ্বারে উপস্থিত, বৃক্ষাবলীও যেন

নূতন কণে নূতন পত্রে পরিশোভিত হইয়া নূতন বর্ষকে পূজা করিবার জন্য ব্যস্ত! দোয়েল বাঁশঝাড়ের ডগায় বসিয়া বসিয়া কেবল মাত্র প্রভাতী আরম্ভ করিয়াছে, মাঝে মাঝে পাপিয়া ও বউ কথা কও পাখী নূতন বর্ষকে জাগ্রত করাইবার জন্য যেন এদেশে আসিয়া নূতন গলায় চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। নিশা ও উষার পবিত্র মিলন। আর কিছুক্ষণ পরে পৃথিবী আবার নূতন বৎসরে পদার্পণ করিবে, ব্রাহ্মযোগ যায় যায়। রাজকন্যা চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন, রাজকুমারগণকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পরেশনাথকে ডাকিবার জন্য লোক ছুটিল। সরোজাক্ষী মধ্যম রাজকুমারের হস্ত তাঁহার দুইটী কন্যার মস্তকে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "মধ্যম, আর কেন, আমি ত চলিলাম; তোমার হাতে তারা ও দুর্গাকে সঁপিয়া দিলাম, পার ত উপায় করিয়া যাইও; যতদিন বাঁচে যেন কষ্ট না পায়।" আর যেন কি কথা বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু পারিলেন না; ভ্রাতার হস্তে হস্ত রাখিয়া নূতন বর্ষের পূর্ব্বে পুরাতন রাজকন্যা ব্রাহ্মযোগে মহাপ্রস্থান করিলেন। ১৩০৭ সালের ৩১শে চৈত্রও শেষ হইয়া গেল।

পরেশনাথের সহিত আর দেখা হইল না। যাঁহার জন্মে গভাগণিত একদিন কুষ্ঠিতে লিখিয়াছিলেন, ধরণী পবিত্র হইল, আবার আজ তাঁহারই প্রস্থানে ধরিত্রী অনুতপ্তা হইল। সঙ্গে সমস্তই গেল, থাকিল কেবল কীর্ত্তি, আর থাকিল রাজকন্যার সেই অনুকরণীয় আদর্শ চরিত্র! দুলাল দেবী যে আদর্শ রাখিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গে করিয়া আবার চলিয়া গেলেন, সে জন্য দুঃখ করা বৃথা; কিন্তু রাজরাণী আজো পর্য্যন্ত সরোজাক্ষীর অঙ্কিত ছবিগুলি ও হস্তলিপি সমূহ সযত্নে আহ্নিকের ঘরে রাখিয়া দিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে সেগুলি বাহির করিয়া দেখেন, আর পাগলিনীর ন্যায় ক্রন্দন করিতে থাকেন।

রাজকন্যা সরোজাক্ষী আর এ জগতে ফিরিয়া আসিবেন না, এরূপ আদর্শ স্বামিভক্তি আর এ জীবনে দেখিতে পাইব কি না বলিতে পারি না। পরেশনাথ নির্ব্বংশ হইয়াছেন; তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীও মারা গিয়াছেন। পরেশনাথ এখন সংসারত্যাগী, শুনিতে পাই বৈদ্যনাথের সন্নিকটে কোন নির্জ্জন পল্লীতে একখানি কুটীর প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছেন। রাজকন্যার দত্ত মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া তঙ্কা পাইয়া থাকেন। অন্নদাত্রী পত্নীর একখানি ফটো তাঁহার সেই ক্ষুদ্র কুটীরের দ্বারে ঝুলান আছে, পরেশনাথ সেই ফটোখানি প্রতিদিন দেখেন আর অতীতের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করিতে থাকেন। তিনি রাজকন্যার মৃত্যুর পর আর এদেশে আসেন নাই, ডাকযোগে তাঁহার প্রাপ্য টাকা পাঠান হইয়া থাকে।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

পূজা।

——ঃ*ঃ——

বিশ্ব জুড়িয়া শঙ্খ-নিনাদ
লইয়া আরতি-গান
উঠেছে, জননি, আজিকে উথলি,
আবর্ত্তি' অনন্ত প্রাণ ;
তোমারি গঙ্গা, কাবেরী, যমুনা,
তোমারি নর্ম্মদা, সিন্ধু মেঘনা,
তব ব্রহ্মপুত্র গুমতী, কৃষ্ণা,
লইয়া পূরবী-তান
এসেছে তোমার, মন্দির দ্বারে
আবেশ-উন্মাদ প্রাণ !
তোমার কাননে কুসুম-নিকর
উঠেছে আজিকে ফুটি',
বহু দিবসের, সরা'য়ে আঁধার
স্বরগ-সুবাস লুটি',
আজিকে তোমার কুঞ্জে পাপিয়া
উঠিছে সঘনে মধুর ডাকিয়া ;
আজিকে সাগর লহর তুলিয়া
লাজ-অভিমান টুটি'
তোমারই পূত চরণ-প্রান্তে
এসেছে আবেগে ছুটি' !
চারিদিক তব ঘেরিয়া আজিকে
উঠিতেছে সাম-গান,
সাগর-কল্লোলে, বিহগ-কূজনে
আকুলি' অনন্ত-প্রাণ ;
চারিভিতে তব গিরি হিমবান্ ;
ঊর্দ্ধে তোমার বিপুল-বিমান ;
দিগন্তে তোমার ঊষা জ্যোতিষ্মান্
হিরণ-ঊর্ম্মিমান্ ;
ধরণী জুড়িয়া উঠিয়াছে আজি
তোমার বন্দনা-গান।

প্রকৃতি আজিকে তোমার দুয়ারে
ফুটা'য়ে কুসুম-কলি
এসেছে লইয়া রচিয়া অঞ্জলি
সহস্র বিঘ্ন ছলি',
আজিকে তোমার বিহ্বল সমীর,
আজিকে তোমার তটিনী অধীর,
আজিকে তোমার সন্তান অথির
অসংখ্য শঙ্কা দলি'
এসেছে ছুটিয়া.. তাড়নে তা'দের
যায়নি সাধনা টলি'।

তোমার পবিত্র মন্দির-অলিন্দে
আজ ঘন-কোলাহল,
শূন্য বিদারি' হ'তেছে বিলীন
নির্ঘোষে অবিরল;
আজিকে তোমার অলস-সন্তান
স্নেহ-প্রীতিমান—হিন্দু-মুসলমান
লভিতে সাধনা কঠোর-মহান
মুছিয়া অশ্রুজল,
এসেছে, জননি, চরণে তোমার
লভিতে হৃদয়-বল।

প্রহ্বাঞ্জলি পূজারি তোমার
আকুল-পুলকভরে,—
দাও স্বাধীনতা—আশীষ বরষি'
তা'দের শির'পরে;
দাওগো বাঁধিয়া কঠোর-সাধনা
মিলিত-হৃদয়ে জাগা'য়ে চেতনা;
করহ সংহার—প্রলয়-সূচনা
ধরণী উজল করে;—
জ্বলুক হুঙ্কারে চৈত্যে সমিধ্
হৃদয়-আহুতি তরে!

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

সমালোচনা।

—·:*:·—

সাবিত্রী। শ্রীবসন্ত কুমার বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবৃত। শ্রীশশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় কর্ম্মফলবিদ্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৶০ আনা।

মহাভারতোক্ত সাবিত্রী উপাখ্যান অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কেবল অবলম্বন কেন, ইহাকে মূলের অনুবাদও বলা যাইতে পারে। তবে অনুবাদ অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হওয়ায় ইহা সর্ব্বসাধারণের এমন কি অল্পশিক্ষিতা রমণীগণেরও বোধগম্য হইবার উপযুক্ত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত উপাখ্যানটি গল্পচ্ছলে বর্ণিত হওয়ায় সকলের চিত্তাকর্ষক হইবে বলিয়া বোধ হয়; যে সকল শিক্ষিতা পাঠিকা উপন্যাস পড়িয়া দিন কাটান, তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে আনন্দ ও শিক্ষা উভয়ই পাইতে পারেন। বাঙ্গালীর জাতীয় জাগরণের সহিত পুরাতন ধর্ম্ম ভাবও আবার ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। এ সময়ে 'সাবিত্রী' সকলেরই নিকট আদরণীয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা যে আবার ভারতের গৃহে গৃহে মূর্ত্তিমতী সাবিত্রী দেখিব বলিয়া আশা করিতেছি।

উপসংহারে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে এক পৃষ্ঠাব্যাপী শুদ্ধিপত্র দর্শনে আমরা নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইলাম। শুদ্ধিপত্র ব্যতীত পুস্তকের আরও অনেক স্থানে মুদ্রাকর প্রমাদ দৃষ্ট হয়। পুস্তকখানি স্ত্রীপাঠ্য। স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকে এরূপ ভ্রমবাহুল্য বড়ই দোষের বিষয়।

মুসলমান বৈষ্ণব কবি—সৈয়দমর্ত্তুজা। শ্রীব্রজ সুন্দর সান্যাল সম্পাদিত। মূল্য ।০ আনা।

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে পুণ্যধাম নবদ্বীপে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হইয়া যে নবধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন, যে প্রেম ও ভক্তির স্রোতে ভারতবর্ষ প্লাবিত করিয়াছিলেন, আজিও যাহার পুণ্য প্রবাহ হইতে হরিনামের উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে, সেই ধর্ম্ম, সেই স্রোত কেবল যে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইয়াছিল, এমন নহে; হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেও বহু প্রেমিক ভক্ত মুসলমান ছুটিয়া আসিয়া সেই পুণ্য প্রবাহে

অবগাহন পূর্ব্বক আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ ভক্তিরসপূর্ণ রাধাকৃষ্ণলীলা গান দ্বারা স্ব স্ব হৃদয়জাত অপূর্ব্ব প্রেমোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। সৈয়দ মর্ত্তুজা ইঁহাদেরই অন্যতম। ইঁহার রচিত পদগুলি পাঠ করিতে করিতে ইঁহাকে প্রাচীন প্রেমিক হিন্দু বৈষ্ণব কবি বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ এই সকল পদ এমনই সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত যে, অনেক প্রাচীন হিন্দু কবির রচনা অপেক্ষা এই পদগুলিকে উচ্চাসন দিতে হয়। সৈয়দ মর্ত্তুজার প্রত্যেক পদ হইতেই প্রেমের উৎস উত্থিত হইতেছে। তাঁহার,

ওহে পরাণ বন্ধু তুমি।
কি আর বলিব আমি॥
তুমি সে আমার আমি সে তোমার।
তোমার তোমাকে দিতে কি যাবে আমার॥
কে জানে মনের কথা কাহারে কহিব।
তোমার তোমারে দিয়া, তোমার হইয়া রব॥

পড়িতে পড়িতে প্রেমিক কবি চণ্ডীদাসের

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি।

এই প্রেমরসপূর্ণ সুমধুর পদটী মনে পড়ে না কি? ফল কথা, সৈয়দ মর্ত্তুজা একজন প্রকৃত প্রেমিক কবি; এবং তাঁহার কবিতা বা পদগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যের রত্নস্বরূপ।

'সৈয়দ মর্ত্তুজা'র সম্পাদক মহাশয় এই রত্নগুলিকে সংগ্রহ এবং প্রকাশিত করিয়া যে, বৈষ্ণব সাহিত্যের সবিশেষ উপকার করিয়াছেন এবং সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার এতাদৃশ উদ্যম প্রশংসনীয়। পুস্তকের ছাপাটা বড় ভাল হয় নাই। মূল্যটাও যেন বড় বেশী হইয়াছে। ষোড়শ পৃষ্ঠাত্মক পুস্তকের মূল্য ৵০ আনা হইলেই যথেষ্ট হইত।

৩য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩১৪।

নবযুগ।

ঐ জ্বলে বিশ্বগ্রাসী প্রলয়ের তীব্র হুতাশন,
নাচিতেছে রক্তশিখা পরশিয়া অনন্ত গগন ;
গরজিছে বজ্রনাদে কাঁপাইয়া এ তিন সংসার,
উঠে ভীম প্রতিধ্বনি—ধ্বংস ধ্বংস সংহার সংহার !

ঢাল ঢাল ঢাল সপ্ত সাগরেতে আছে যত বারি,
ধর ধর বজ্র-করে কোষমুক্ত তীক্ষ্ণ তরবারি ;
ধাও ধাও ভীমদর্পে নিবা'তে এ প্রচণ্ড অনল,
কর কর যত পার প্রাণপণে প্রয়াস নিষ্ফল।

ক্ষান্ত হও মূঢ় ! বৃথা এ অনলে দিওনা ফুৎকার,
নিবিবে না প্রলয়াগ্নি, শতগুণে জ্বলিবে আবার ;
ভাবিও না তুচ্ছ ইহা—ইচ্ছামাত্র করিবে দমন,—
কোটি কোটি হৃদয়ের তপ্তশ্বাসে বাড়ে অনুক্ষণ।

একে একে ভস্ম করি অধর্ম্মের যুগ পুরাতন,
নিবিবে এ বহ্নি, পুণ্য নবযুগ করিয়া গঠন।

নিয়তি।

—•:•:•—

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"তুমি পাষাণী!"

বেদনোর দুর্গমধ্যস্থ রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান মধ্যে স্বচ্ছ বাপীতীরে প্রস্তরাসনোপবিষ্টা তারাকে লক্ষ্য করিয়া জনৈক যুবক বলিল,—"তুমি পাষাণী!"

যুবকের কথায় তারা একটু হাসিল। শান্তস্বরে বলিল,—"অনঙ্গ! কেন বৃথা আকাঙ্ক্ষার আগুনে পুড়িতেছ?"

অনঙ্গ বলিল,—"বৃথা?"

তারা বলিল,—"হাঁ বৃথা। তোমার আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব।"

ক্ষুব্ধস্বরে অনঙ্গ বলিল,—"কেন তারা, আমার ভালবাসা কি এতই অসার?"

তা। ভালবাসা অসার নয়; কিন্তু তুমি কি পিতার প্রতিজ্ঞা শুন নাই?

অ। শুনিয়াছি।

তা। তুমি কি পাঠান হস্ত হ'তে তোড়াটঙ্ককে উদ্ধার করিতে পারিবে?

অ। যদি তোমার নিকট আশ্বাস পাই, তবে প্রাণ দিয়াও তোড়াটঙ্ক উদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারি।

তা। তুমি প্রাণ দিলেও তোড়াটঙ্কের উদ্ধার হইবে না।

অনঙ্গ ভ্রুকুটী করিল। তারা বলিল,—"রাগ করিও না অনঙ্গ, অসম্ভব কখনও সম্ভব হয় না। ভাবিয়া দেখ, দুর্জ্জয় পাঠানশক্তির নিকট তোমার শক্তি কত ক্ষুদ্র। স্বীকার করি তুমি বীর, কিন্তু পাঠানেরাও বীরত্বে ন্যূন নহে।"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে অনঙ্গ বলিল,—"তাহারা দস্যু।"

তারা বলিল,—"কিন্তু যে দস্যু একটা রাজ্য জয় করিতে পারে, সে সাধারণ দস্যু নয়।"

অ। কিন্তু পৃথ্বীরাজই কি এই অসাধারণ দস্যুগণের সমকক্ষ?

তা। সে কথা এখন কে বলিতে পারে। তবে পৃথ্বীরাজ মহাবলশালী বীর।

অ। কিন্তু সে নির্ব্বাসিত।

তা। সূর্য্যদেব অধিকক্ষণ অস্তাচলে থাকেন না।

স্বচ্ছ বাপীহৃদয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছিল। উভয় হস্তে বক্ষ চাপিয়া অনঙ্গ তাহাই দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার নেত্রদ্বয় ক্রোধোজ্জ্বল হইল, বুকের ভিতর হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রুদ্ধভুজঙ্গ-শ্বাসের ন্যায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—"তবে কি আমার কোন আশাই নাই?"

তারা স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"অনঙ্গ! তুমি আমার বাল্যের সাথী, ক্রীড়ার সহচর, আমার একটা অনুরোধ রাখিবে?"

উদাস দৃষ্টিতে শূন্যে চাহিয়া অনঙ্গ বলিল,—"কি অনুরোধ?"

তা। বৃথা দুরাশাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া জীবন বিষময় করিও না।

অ। আমার জীবন অনেক দিন হইতেই বিষময় হইয়াছে।

তা। কিন্তু এখনও সাবধান হইতে পার। তুমি সাহসী, বুদ্ধিমান্, বীর। বীরত্বকে সহচর করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও, দেশের মুখ উজ্জ্বল কর। তখন কত শত সুন্দরী তোমার চরণে লুণ্ঠিত হইবে।

রুদ্ধকণ্ঠে অনঙ্গ বলিল,—"কিন্তু তুমি?"

তারা বলিল,—"আমার আশা ত্যাগ কর। আমার হৃদয় আপনার বশীভূত নয়।"

এমন সময় জনৈক পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, রাণা এই দিকে আসিতেছেন। অনঙ্গ ধীরে ধীরে উদ্যান ত্যাগ করিল। যাইতে যাইতে মনে মনে বলিল,—"এ অপমানের কি প্রতিশোধ লইতে পারিব না?"

অল্পক্ষণ পরেই রাও শূরতান আসিয়া কন্যার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, এবং তারার কুসুম-সুকোমল করপল্লবখানি স্বীয় করতলে রাখিয়া স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন,—"কি ভাবিতেছ তারা?"

তারা পিতার দিকে না চাহিয়াই ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—"পিতঃ! আমি যদি কন্যা না হইয়া আপনার পুত্র হইতাম?"

শূরতান সবিস্ময়ে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তাহা হইলে কি হইত তারা?"

তারা বলিল,—"তাহা হইলে তোড়াদিগের জন্য আপনাকে এত ভাবিতে হইত না।"

রাণার মুখমণ্ডল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি সহাস্যে বলিলেন,—"কিন্তু এবার বোধ হয় সে চিন্তার অবসান হইবে।"

তারা পিতার মুখের উপর সোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। শূরতান বলিলেন,—"যুবরাজ জয়মল্ল পাঠান বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন।"

তারার বুক কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব প্রচ্ছন্ন করিয়া বলিল,—"যাত্রা করিয়াছেন?"

শূর। হাঁ, শীঘ্রই আসিয়া পৌছিবেন।

তা। কিন্তু তিনি—তিনি পারিবেন কি?

শূর। তাহা অদৃষ্টের হাত। রাজস্থানের প্রধান শক্তি দ্বারাও যদি তোড়াটঙ্কের উদ্ধার না হয়, তবে বুঝিতে হইবে, বিধাতা একান্ত বিরূপ।

তা। জয়মল্ল কি খুব বীর?

শূ। এইমাত্র তাঁর বীরত্ব প্রকাশের প্রথম অবসর। তবে শুনিয়াছি, তিনিও পৃথ্বীরাজের সমান যোদ্ধা।

তারা নীরবে সান্ধ্যারুণরাগরঞ্জিত আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। শূরতানও নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"এ সময়ে যদি পৃথ্বীরাজ থাকিতেন।"

তারা ব্যগ্রদৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিল। শূরতান গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"ভাবিও না তারা, দুর্দ্দিনের পর সুদিন আসেই, তখন অসম্ভবও সম্ভব হয়।"

কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া শূরতান ধীরপদে প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন।

আমি যাহাকে চাই, সে আমায় চাহে না, আবার আমাকে যে চায় আমি তাহাকে চাহি না। জানি না, হৃদয়ের এ এক কি অদ্ভুত খেলা। বোধ হয়, যাহা সুলভ, যাহা অনায়াসপ্রাপ্য, যাহার জন্য কঠোর সাধনার—ভীষণ সংগ্রামের প্রয়োজন হয় না, তাহা লইয়া মানুষ সন্তুষ্ট হইতে পারে না। যাহা দুর্লভ, যাহা পাইতে হইলে ঘোর জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়, মানুষ তাহার জন্যই লালায়িত। দুঃখবিদ্ধ না হইলে বুঝি সুখের আস্বাদন তেমন মধুর হয় না। কষ্টার্জ্জিত ধনেরই আদর বেশী। মানব-হৃদয়ের ইহাই স্বাভাবিক গুণ—বিচিত্র লীলা। এই বিচিত্র খেলা লইয়া মানব তুমুল জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। শেষে সংগ্রামে হারিয়া, খেলা ফেলিয়া, একটা অরুন্তুদ যন্ত্রণা—একটা উদাস স্মৃতি বুকে চাপিয়া নিভৃতে কাঁদিতে বসে। কাঁদিতে কাঁদিতে পরাভূত ক্ষতবিক্ষত দুঃখময়

জীবনের বোঝা ফেলিয়া, একটা অতৃপ্তির বোঝা লইয়া অনন্তের পথে যাত্রা করে। হৃদয়ের এই গভীর রহস্য—এই বিচিত্র খেলা বুঝিতে বা বুঝাইতে কাহারও শক্তি নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তারা বড় গোলে পড়িল। এতদিন পর্য্যন্ত সে যে একটী আশার ক্ষীণালোক-রেখা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল, তাহাও নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইল। জয়মল্ল আসিয়া যদি তোড়াটঙ্ক উদ্ধার করিতে পারেন, তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে। কিন্তু পৃথ্বীরাজ ব্যতীত আর কাহাকেও যে তারা হৃদয়ে স্থান দিতে পারিবে না,—পতিত্বে বরণ করিবে না? অনেক ভাবিয়াও তারা কোন উপায় দেখিতে পাইল না।

কোন উপায় না দেখিয়া তারা শেষে যমুনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। যমুনা যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনই চতুরা। তারাকে সে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসে, তারার জন্য সে সব করিতে পারে।

তারার কথা শুনিয়া যমুনা সহাস্যে বলিল,—"রাজকুমারি, গরীবের কথা বাসি হলেই মিষ্টি লাগে। আমি তো তখনই বারণ করেছিলাম।"

তারা বলিল,—"তখনকার কথা এখন তুলে কোন ফল নাই। এখনকার উপায় কি বল্।"

যমুনা বলিল,—"এখন উপায়—জয়মল্লকে বিবাহ করা।"

তা। তা' আমি পারব না।

য। না পার, তোমার পিতা তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করবেন বলে আমার মনে হয় না।

তা। ছিঃ, পিতাকে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট করাব?

য। তবে আর একটা উপায় আছে।

তা। কি উপায়?

যমুনা ঈষৎ হাসিয়া, তারার উপর একটা বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া গাহিল,—

"মুড়াব মাথার কেশ　ধরিব যোগিনী বেশ
　　যদি সোই পিয়া নাহি আইল।
এ হেন যৌবন　　পরশ রতন
　　কাচের সমান ভেল।

তারা বলিল,—"মরণ আর কি, এই বুঝি তোমার উপায় ?"

যমুনা গাহিল,—

গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে,
যেখানে নিঠুর হরি।

তারা সহাস্যে বলিল, "সেখানে গিয়ে কি হবে ?"

যমুনা গাহিতে লাগিল,—

মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হঞা।
যদি কারু ঘরে মিলে গুণনিধি
বান্ধিব বসন দিয়া।

তারা বলিল,—"কিন্তু গুণনিধি যদি বাঁধা না দেয় ?"

যমুনা গাহিল,—

আপন বন্ধুয়া আনিব বান্ধিয়া
কেবা রাখিবারে পারে।
যদি রাখে কেউ তেজিব এ জীউ
নারীবধ দিব তারে।

তারা কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল,—"তোমার মুখে আগুন, শেষে বঁধুয়ার হাতে দড়ি ?"

যমুনা হাসিতে হাসিতে গাহিল,—

পুনঃ ভাবি মনে বান্ধিব কেমনে
সে শ্যাম বঁধুয়া হাতে।
বান্ধিয়া কেমনে ধরিব পরাণে,
তাই ভাবিতেছি চিতে।" *

তারা, যমুনার পৃষ্ঠে একটা ছোট রকমের কিল দিয়া বলিল,—"তোর হেঁয়ালী রাখ, এখন কাজের কথা বল্।"

যমুনা বলিল,—"পৃথ্বীরাজকে সংবাদ দিলে হয় না ?"

তারা বলিল,—"সংবাদ দিলেই কি আসবেন ?"

---

* জ্ঞানদাস।

যমুনা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "রুক্মিণীর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে কালাচাঁদ কখনই সাহসী হবেন না।"

তা। "কিন্তু এখন দ্বারকায় যায় কে?

য। লোকের অভাব কি।

কিন্তু তারা ইহাতে সম্মত হইল না। একে তো কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িলে লজ্জার সীমা থাকিবে না, তাহার উপর পৃথ্বীরাজ যদি না আসেন তবে অপমানের একশেষ হইবে। যমুনাও তাহা বুঝিল। বুঝিয়া বলিল,—"আমি গেলে হয় না?"

তারার মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল,—"কিন্তু তুই কি যেতে পারবি?"

য। চেষ্টা দেখতে ক্ষতি কি?

তা। একা যাবি?

য। সঙ্গী জুটিয়ে নেব।

তা। পদবারের রাস্তা জানিস্?

য। না জানলেও জেনে নিতে পারব।

আনন্দে কৃতজ্ঞতায় তারার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। গদগদ স্বরে বলিল,—"যমুনা, তোকে আমি কি বলে আশীর্ব্বাদ করব?"

সহাস্যে যমুনা বলিল,—"সে তখন ফিরে এসে শিখিয়ে দেব, এখন পথখরচটা দাও দেখি।"

তারা বলিল,—"যত অর্থ চাই সঙ্গে নে।"

যমুনা বলিল,—"অর্থ অনর্থ, বিশেষতঃ পথে।"

তা। তবে আর কি?

য। যার জোরে শ্যামচাঁদকে টেনে আনা যাবে।

তারা একটু হাসিয়া পত্র লিখিতে গেল। যমুনাও সঙ্গীর অনুসন্ধানে চলিল।

তোমরা হয়তো মনে করিয়াছ, যমুনা নিশ্চয়ই গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের মত একটা সঙ্গী জুটাইয়া লইবে এবং তাহার মস্তকে অড়হর দাইলের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া একটা রীতিমত হাস্যরসের অবতারণা করিবে। কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ যমুনা সেরূপ বিকট প্রেমাভিনয়ে পটু নহে। সুতরাং সে কোনও গজপতির সন্ধানে না গিয়া একেবারে অশ্বশালায় উপস্থিত হইল; এবং অশ্বরক্ষককে সত্বর একটা দ্রুতগামী অথচ শান্ত অশ্ব সজ্জিত করিতে বলিল। অশ্বরক্ষক জিজ্ঞাসা করিল,—"ঘোড়া কি হবে?"

যমুনা বলিল,—"আমার সাদি।"

অ-র। কবে?

য। আজ।

অ-র। কার সঙ্গে?

য। মানুষের সঙ্গে।

অ-র। তা' তোমার ঘোড়ার দরকার কি?

য। বর আসবে।

অ-র। বরের ঘোড়া নাই?

য। ছিল, সেটা না খেতে পেয়ে মারা গেছে।

অশ্বরক্ষক তখন, এমন গরীব লোকের ঘোড়া পোষা যে অনুচিত এবং তাহাকে সাদি করা যে নিতান্ত অন্যায়, তদ্বিষয়ে নিজের সম্পূর্ণ অভিমত প্রকাশ করিয়া অশ্ব সাজাইতে গেল। এবং অবিলম্বে একটী অশ্ব সজ্জিত করিয়া আনিল। যমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, অশ্বটী শান্ত বটে, তবে দ্রুতগামী কিনা তাহা কার্য্যক্ষেত্রে বিবেচ্য। সে তখন অশ্বরক্ষককে কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিয়া কথাটা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিল। বলিল,—"আমার বরের ঘোড়া নাই, শুন্‌লে লোকে হাসবে।"

অশ্বরক্ষক সহাস্যে কথাটা গোপনে রাখিতে স্বীকৃত হইল। যমুনা অশ্ব লইয়া চলিয়া আসিল।

সেই দিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে অশ্বরক্ষক দেখিল, দিব্য একটী ফুটফুটে ছোকরা সেই ঘোড়ায় চাপিয়া নগরের বাহির হইয়া গেল। অশ্বরক্ষক ভাবিল, লোকটা হয়তো যমুনার বরকে আন্‌তে যাচ্চে। সে স্থির করিয়া রাখিল, পরদিন বরের কাছ হ'তেও কিছু বকশিষ আদায় করতে হবে। সহজে না দেয়, কথাটা প্রকাশ করে দেবার ভয় দেখাবে।

অশ্বরক্ষকের আজিকার দিনটা বড় সুদিন। ছোকরা চলিয়া যাইবার একটু পরেই অনঙ্গসিংহ আসিয়া তাহাকে বলিল,—"তোমাদের সকল ঘোড়াই বোধ হয় আজ ঘরে আছে।"

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অশ্বরক্ষক বলিল,—"কেন?"

ঈষৎ হাসিয়া অনঙ্গ বলিল,—"আমি জানি, এই মাত্র তোমাদের একটা ঘোড়া নগরের বাইরে গেল।"

অশ্বরক্ষক শুষ্কমুখে আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল। তখন অনঙ্গসিংহ

তাহার হাতে একটা আসরফি গুঁজিয়া দিয়া বলিল,—"ভয় নাই, এ কথা আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না।"

অশ্বরক্ষক বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার হস্তস্থিত আসরফির দিকে আরবার অনঙ্গসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে যমুনার সাদির বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল। অনঙ্গসিংহ ঈষৎ হাসিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। অশ্বরক্ষক বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, আজি সে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এমন অতি প্রয়োজনীয় কথাটা কিছুতেই তাহার মনে আসিল না। সে আপনার নির্ব্বোধ মনের উপর বড় চটিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

জ্যোতিষ রহস্য।

—০:*:০—

(একাদশ প্রস্তাব)

অধিপতি নির্ণয়।

রবি হইতে শনি পর্য্যন্ত সাতটী এবং রাহু, কেতু, হার্শেল ও নেপচুন এই চারিটী—সর্ব্বসমেত একাদশটী গ্রহের বিবরণ অতি সহজ ও সরলভাবে "স্বদেশী"র পাঠকগণকে বিদিত করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জ্যোতিষ শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত—গণিত ও ফলিত। গণিতাংশ অতীব দুরূহ ও নীরস বিধায়, ফলিতাংশও তৎসহ বিশদভাবে লিখিয়া পাঠকগণের জ্ঞানগোচর করিয়াছি। শিক্ষার্থিগণের জন্য, এক্ষণে গ্রহ সম্বন্ধে কয়েকটী অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গ্রহ-বিবরণের উপসংহার করিব। পরে 'রাশি' সম্বন্ধে লিখিব ইচ্ছা রহিল। জ্যোতিষ প্রবন্ধ পাঠ করিতে সকলেই যে আগ্রহ প্রকাশ করেন এমন নহে। একটী সুরম্য উদ্যানে আম্র, কণ্ঠাল, লিচু প্রভৃতি সুমিষ্ট ও উপাদেয় ফলের বৃক্ষাদি থাকিলেও, উক্ত বাগানের এক পার্শ্বে দুই একটী তিন্তিড়ী বা চালিতার গাছ থাকিলেও যেমন উহার ক্ষতি হয় না, বরং সময় ক্রমে ঐ সকল নিকৃষ্ট ফলেরও আবশ্যক হইয়া থাকে; যে পুষ্করিণীতে রুই, কাতলা, কালবোস, মিরগেল প্রভৃতি মৎস্য থাকে, তাহাতে কই নাটাও থাকিলে পুষ্করিণীর শোভা নষ্ট হয় না, বরং রোগিগণের ব্যবহারে আইসে। মাসিক বা সাময়িক পত্রে অপর

বিষয়ক বহুতর প্রবন্ধের সহিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের অল্লাধিক আলোচনা দোষাবহ হয় না।

গ্রহগণের মূর্ত্তি। রবি গ্রহ ঘোর রক্তবর্ণ ও গোলাকার এবং গ্রহমণ্ডলের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত। অগ্নিকোণে, অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি শুক্লবর্ণ চন্দ্র। দক্ষিণ ভাগে ত্রিকোণাকৃতি রক্তবর্ণ বিশিষ্ট মঙ্গল। ঈশানকোণে ধনুরাকৃতি পীতবর্ণ বুধ। উত্তর দিকে অষ্টদল কমলাকৃতি পীতবর্ণ বৃহস্পতি। পূর্ব্ব ভাগে চতুষ্কোণাকৃতি শুভ্রবর্ণ শুক্র। পশ্চিমে কৃষ্ণবর্ণ ও সর্পাকৃতি শনি। নৈঋত কোণে মকরের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ রাহু। বায়ু কোণে খড়্গাকৃতি ধূম্রবর্ণ কেতু অবস্থিতি করে এইরূপ হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

গ্রহগণের জন্ম স্থান। রবির জন্ম স্থান কলিঙ্গ দেশ। চন্দ্রের জন্ম স্থান যমুনা। মঙ্গল গ্রহের জন্ম স্থান অবন্তী দেশে। বুধের মগধ দেশে। বৃহস্পতি গ্রহের সৈন্ধব। শুক্রের ভোজকটে। শনির জন্মস্থান সৌরাষ্ট্র দেশে। রাহুর বৈনাটিক পুরে এবং কেতুর জন্ম স্থান অন্তর্ব্বেদীতে। গ্রহগণ নিজ নিজ জন্ম স্থানে প্রবলরূপে স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে।

গোত্রাধিপতি। রবি কাশ্যপ গোত্রের, চন্দ্র আত্রেয় গোত্রের, মঙ্গল ভরদ্বাজ গোত্রের, বুধ আত্রেয় গোত্রের, বৃহস্পতি অঙ্গিরা গোত্রের, শুক্র ভার্গব গোত্রের, শনি কাশ্যপ গোত্রের, রাহু পৈঠীনসী গোত্রের এবং কেতু জৈমিনেয় গোত্রের অধিপতি বলিয়া জানা যায়। গ্রহশান্তি স্থলে গ্রহগণের জন্ম স্থান এবং তাহাদিগের গোত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক শান্তি করিবার বিধান বর্ণিত আছে।

জাতির অধিপতি। রবিগ্রহ ক্ষত্রিয় জাতির, চন্দ্র বৈশ্য জাতির, মঙ্গলগ্রহ ক্ষত্রিয় জাতির, বুধ শূদ্র জাতির, বৃহস্পতিগ্রহ ব্রাহ্মণ জাতির, শুক্র ব্রাহ্মণ জাতির, শনি, রাহু ও কেতু ম্লেচ্ছ চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির অধিপতি হইয়া থাকে। পরাশরের মতে চন্দ্র ও বুধ এই দুই গ্রহ বৈশ্য জাতির, শনিগ্রহ শূদ্রজাতির, রাহু চণ্ডাল জাতির এবং কেতু ম্লেচ্ছাদি জাত্যন্তরের অধিপতি হইয়া থাকে।

গুণের অধিপতি। রবি গ্রহ সত্ত্ব গুণের, চন্দ্র গ্রহও সত্ত্ব গুণের, মঙ্গল তমোগুণের, বুধ রজোগুণের, বৃহস্পতি সত্ত্ব গুণের, শুক্র গ্রহ রজোগুণের এবং রাহু ও কেতু তমোগুণের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত আছে।

রসের অধিপতি। রবিগ্রহ কটু রসের, চন্দ্রগ্রহ লবণ রসের, মঙ্গল

গ্রহ তিক্ত রসের, বুধগ্রহ মিশ্র রসের, বৃহস্পতি গ্রহ মধুর রসের, শুক্রগ্রহ অম্ল রসের এবং শনিগ্রহ কষায় রসের অধিপতি। রাহু ও কেতু তিক্ত রসের অধিপতি বলিয়া জানা যায়।

ধাতুর অধিপতি। রবিগ্রহ পিত্ত ধাতুর অধিপতি। চন্দ্রগ্রহ শ্লেষ্মা ধাতুর অধিপতি। মঙ্গল গ্রহ পিত্ত ধাতুর, বুধগ্রহ সমধাতুর, বৃহস্পতি শ্লেষ্মা ধাতুর, শুক্রগ্রহ বায়ু ধাতুর, শনিগ্রহও বায়ু ধাতুর অধিপতি। ইহাই সাধারণ মত; কিন্তু প্রশ্নাষ্টক চূড়ামণি গ্রন্থের মতে—চন্দ্র ও শুক্র এই দুই গ্রহ শ্লেষ্মা ধাতুর, রাহু ও শনি বায়ু ধাতুর, রবি ও মঙ্গল পিত্ত ধাতুর, এবং বুধ ও বৃহস্পতি, এই দুই গ্রহ সমধাতুর অধিপতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

গ্রহগণের স্বরূপ। রবিগ্রহের স্বরূপ যথা;—আকার চতুরস্র অর্থাৎ নির্দ্দোষ, (সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর) জরদাবর্ণ ঈষৎ কাতর চক্ষু, পিত্ত প্রকৃতি, অল্পকেশ-বিশিষ্ট, ধীমান, দৈবী বুদ্ধি, প্রতাপী, সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট, সংস্কারযুক্ত, শুচি ও শ্যামরক্ত বর্ণবিশিষ্ট। চন্দ্রের স্বরূপ যথা;—ইহা ক্ষীণ ও বর্ত্তুলাঙ্গ; অত্যন্ত কফ বাত প্রকৃতি, মেধাবী, মৃদুবাক্য, সুন্দর চক্ষু, বাগ্মী, বিবেক বুদ্ধি, মিষ্টভাষী, সত্ত্বগুণী, গৌরবর্ণ, চঞ্চল এবং কামাতুর। মঙ্গলের স্বরূপ যথা;—আকার যুবা মূর্ত্তি, উদার স্বভাব, পিত্ত প্রকৃতি, অত্যন্ত অস্থির, কৃশোদর, রক্তগৌরবর্ণ, তমোগুণী, ক্রোধ-স্বভাব, ক্রূর-তীক্ষ্ণদৃষ্টি, মহাপ্রতাপশালী, এবং কামাতুর। বুধের স্বরূপ যথা;—আকার—বালকদেহ, তোৎলা, সতত হাস্যপ্রিয়, সমধাতু প্রকৃতি, বালকের ন্যায় স্বভাব, দূর্ব্বাশ্যাম বর্ণ, অতি বিদ্বান, রজোগুণী ও সত্ত্বপ্রতাপী। বৃহস্পতির স্বরূপ যথা;—প্রকাণ্ড দেহ, কেশ ও চক্ষু কটা (জরদাবর্ণ), শ্লেষ্মাধিক প্রকৃতি, ধর্ম্মানুগ-প্রাজ্ঞ, সুবিদ্বান, সত্ত্বগুণী, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, ও স্থূলোদর। শুক্রের স্বরূপ যথা;—পরম সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট কলেবর, নিত্য সুখাসক্ত, সুন্দর চক্ষু, কফ বায়ু প্রকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশবিশিষ্ট, কচি, আমোদ ও সঙ্গীতপ্রিয়, শিল্পী ও বিজ্ঞানবিৎ, অতীব কামাতুর, বলবান, রজোগুণী এবং সর্ব্বগুণালঙ্কৃত। শনির স্বরূপ যথা;—কৃশ ও দীর্ঘদেহবিশিষ্ট, আলস্যযুক্ত, কপিলবর্ণচক্ষু, স্থূল দশন, কর্কশ ও কঠিন রোম ও কেশযুক্ত, বায়ু প্রকৃতি, নির্দ্দয়, তমোগুণ বিশিষ্ট, কটুভাষী ও ও নির্গুণ। রাহু কেতুর স্বরূপ যথা;—ইহাদিগের আকার অতি ভয়ঙ্কর। নীল এবং ধূম্রবর্ণ, অরণ্যপ্রদেশে স্থিত, বায়ু প্রকৃতি, ও ধীমান্।

সপ্তধাতুর অধিপতি। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতু দ্বারা মানবাদি জীবগণের দেহ গঠিত বর্দ্ধিত ও রক্ষিত হইয়া

থাকে। এই সপ্তধাতুর অধিপতি যথা ;—রবিগ্রহ অস্থির, চন্দ্রগ্রহ রক্তের, মঙ্গল গ্রহ মজ্জার, বুধ মাংসের, বৃহস্পতি মেদের, শুক্র শুক্রের এবং শনিগ্রহ শিরা বা রসের অধিপতি বলিয়া কথিত আছে। বৃহজ্জাতক ও সর্ব্বার্থ চিন্তামণি গ্রন্থের উক্ত মতের সহিত পরাশরের কিঞ্চিৎ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। তিনি বৃহস্পতি গ্রহকে চর্ম্মের অধিপতি স্থির করিয়া গিয়াছেন।

স্থানের অধিপতি। রবি দেবালয়ের অধিপতি, চন্দ্র সলিল স্থানের অধিপতি, মঙ্গল অগ্নি স্থানের, বুধ ক্রীড়া স্থানের, বৃহস্পতি ধন স্থানের, শুক্র শয়ন স্থানের এবং শনিগ্রহ আবর্জ্জনাদিবিশিষ্ট মলিন স্থানের অধিপতি। রাহু গৃহ-কোণের এবং কেতু গৃহ-বহির্ভাগের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সারাবলি গ্রন্থের মতে বুধগ্রহ শয়নাগারের এবং শুক্রগ্রহ বিহার গৃহের অধিপতি।

পঞ্চতত্ত্বের অধিপতি। রবিগ্রহ (মতান্তরে মঙ্গল গ্রহ) অগ্নি তত্ত্বের অধিপতি। চন্দ্রগ্রহ (মতান্তরে শুক্রগ্রহ) জল তত্ত্বের অধিপতি। বুধগ্রহ পৃথ্বীতত্ত্বের অধিপতি। বৃহস্পতি আকাশ তত্ত্বের অধিপতি, এবং শনিগ্রহ বায়ু তত্ত্বের অধিপতি।

পুরুষাদি জাতির অধিপতি। সূর্য্য, মঙ্গল ও বৃহস্পতি এই তিন গ্রহ পুরুষ জাতির অধিপতি। চন্দ্র ও শুক্র স্ত্রী জাতির অধিপতি। বুধ ও শনি, এই দুই গ্রহ ক্লীব জাতির অধিপতি। মতান্তরে—বৃহস্পতি, মঙ্গল ও রবি এই তিন গ্রহ পুরুষ জাতির ; আর চন্দ্র, বুধ, শনি, শুক্র ও রাহু এই পাঁচটী গ্রহ স্ত্রী জাতির অধিপতি।

বর্ণের অধিপতি। রবিগ্রহ তাম্র বর্ণের অধিপতি। চন্দ্রগ্রহ শ্বেত বর্ণের ; মঙ্গল গ্রহ রক্তবর্ণের, বুধগ্রহ সবুজ বর্ণের, বৃহস্পতি গ্রহ গাঢ় হরিদ্রা বর্ণের, শুক্রগ্রহ বিচিত্র বর্ণের (মতান্তরে শ্বেত বর্ণের) এবং শনিগ্রহ কৃষ্ণবর্ণের অধিপতি।

বেদের অধিপতি। বৃহস্পতি গ্রহ ঋগ্বেদের অধিপতি। শুক্র যজুর্ব্বেদের অধিপতি। মঙ্গল সামবেদের অধিপতি। বুধগ্রহ অথর্ব্ববেদের অধিপতি।

জলচরাদি গ্রহ। চন্দ্র এবং শুক্র এই দুই গ্রহ জলচর। বুধ ও বৃহস্পতি গ্রহ গ্রামচর। রবি, শনি, মঙ্গল, রাহু ও কেতু বন ও পর্ব্বতচর বলিয়া কথিত আছে।

ঋতুর অধিপতি। রবি গ্রহ গ্রীষ্ম ঋতুর অধিপতি। চন্দ্র গ্রহ বর্ষা

ঋতুর অধিপতি। মঙ্গল গ্রীষ্ম ঋতুর; বুধগ্রহ শরৎ ঋতুর; বৃহস্পতি হেমন্ত ঋতুর; শুক্রগ্রহ বসন্ত ঋতুর এবং শনিগ্রহ শিশির ঋতুর অধিপতি।

ধাতু ও মূলাদি গ্রহ। চন্দ্র, মঙ্গল, শনি ও রাহু, এই চারিগ্রহ ধাতুগ্রহ বলিয়া খ্যাত। রবি ও শুক্র এই দুই গ্রহ মূল গ্রহ বলিয়া খ্যাত। বুধ ও বৃহস্পতি এই দুই গ্রহ জীবগ্রহ বলিয়া খ্যাত। কেবল পারিজাত গ্রন্থের মতে রবি ও মঙ্গল ধাতু সংজ্ঞক; চন্দ্র ও শনি মূল সংজ্ঞক; বৃহস্পতি ও শুক্র জীব সংজ্ঞক এবং বুধ গ্রহ মিশ্র ধাতু সংজ্ঞক বলিয়া জানা যায়।

প্রভাতাদি গ্রহ। প্রভাত গ্রহ—বুধ ও বৃহস্পতি। মধ্যাহ্ন গ্রহ—রবি ও মঙ্গল। অপরাহ্ন গ্রহ—চন্দ্র ও শুক্র। সন্ধ্যা গ্রহ—শনি ও রাহু।

পূর্ব্বাদি দিকের অধিপতি। রবিগ্রহ পূর্ব দিকের অধিপতি। চন্দ্রগ্রহ বায়ুকোণের অধিপতি। মঙ্গল দক্ষিণ দিকের অধিপতি। বুধগ্রহ উত্তর দিকের অধিপতি। বৃহস্পতি গ্রহ ঈশান কোণের অধিপতি। শুক্রগ্রহ অগ্নি কোণের অধিপতি। শনি পশ্চিম দিকের অধিপতি। রাহু নৈঋর্ত কোণের অধিপতি।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, জ্যোতিঃশেখর।

শিখগুরু।

———•:•:•——

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামদাস।

চতুর্থ গুরু রামদাসের আমল হইতেই শিখদের আদর্শ একটু পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে; কিন্তু তখন তাহা এত অস্পষ্ট ছিল যে, ঠিক্ ধরা যাইত না। পরে পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন মলের সময়ে তাহা একটি নির্দ্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হয় ও পরে ক্রমবিকাশবলে শিখেরা বর্ত্তমান অবস্থায় নীত হইয়াছে। শিখেরা এতকাল সাধারণ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ন্যায় পার্থিবের প্রতি কিছু অশ্রদ্ধ ছিল; কিন্তু রামদাস সে আদর্শের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। পার্থিবের প্রতি যাহাতে তাহাদের নজর পড়ে, তাহার জন্য তিনি কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৫২৪ খৃষ্টাব্দে চক্ বা চক্র গ্রামে ক্ষত্রিয়কুলান্তর্গত সোঢ়ী বংশে রামদাস

জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশমর্য্যাদা নিতান্ত সামান্য নহে। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা এক সময় লাহোরের অধিপতি ছিলেন। এখন সেই বংশ দারিদ্র্য-পঙ্কে নিমগ্ন হওয়ায়, রামদাস মাতুলালয় গোবিন্দবালে প্রস্থান করেন। সেখানে তিনি ভর্জ্জিত শস্য বিক্রয় করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন; তাহাতেই তাঁহার পিতামাতার ভরণপোষণের কতক সাহায্য হইত।

দরিদ্রের সন্তান স্বভাবতই নম্র ও ধীর হইয়া থাকে। তায় কোন উচ্চ বংশীয়েরা যদি ভাগ্যদোষে কখন দরিদ্র হন, তবে তাঁহাদের সন্তানবর্গ স্বতই ধীর, গম্ভীর ও চিন্তাশীল হইয়া থাকেন। রামদাস আজ ভাগ্যদোষে দরিদ্র—পথের ভিখারী। আপনাদের পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণ যে ব্যথিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি সেই সব ভাবনা বশে একটু গম্ভীর ও চিন্তাশীল হন। তাঁহার বুদ্ধিও খুব তীক্ষ্ণ ছিল; অন্যথা একটি পনের ষোল বৎসরের বালকের পক্ষে পিতামাতার ভরণপোষণে সাহায্য করা বড়ই শক্ত ব্যাপার।

যখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ, সেই সময় একদিন তাঁহার জীবনের গতি হঠাৎ ফিরিয়া যায়। একদিন তিনি প্রথামত শস্য বিক্রয় করিতে বাহির হইয়াছেন। অমরদাস তাঁহাকে ডাকিলেন। তখন অমরদাস গুরু হন নাই। অমর দ্রব্য দেখিতেছেন, এমন সময় তথায় এক ঘটক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইল। অমর তাহাকে আপনার বিবাহযোগ্যা কন্যা মোহিনীর জন্য পাত্র দেখিতে অনুরোধ করিলেন। অমরের পত্নী তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি রামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—'পাত্র যেন ঐ বালকটির সমবয়স্ক হয়। তাহা হইলে মানাইবে ভাল।' (১)

পত্নীর এই বাক্য শুনিয়া ধর্ম্মপ্রাণ অমরের একটি কথা হঠাৎ স্মরণপথে উদিত হইল। তিনি ভাবিলেন, কন্যা দুইবার দত্তা হইতে পারে না। পত্নী ঐ বালককেই পছন্দ করিয়াছেন; সুতরাং ঐ বালকই ত' ধর্ম্মতঃ মোহিনীর পতি। কিন্তু ঐ বালকের জাতিধর্ম্ম কি? অমর ভাবিলেন—যদি নীচ কুলে উহার জন্ম হয়, তবে—। অমর আর ভাবিতে পারিলেন না। ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া তিনি বালককে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক স্বীয় পরিচয় দিলে অমরের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি বলিয়া ফেলিলেন—'তুমি সুখে

(১) Adi Granth, translated by E. Triumpp. কোন কোন গ্রন্থে এই ঘটনাটি ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু ত্রিয়ম্প বর্ণিত ঘটনাটি অধিক বিশ্বাসযোগ্য বোধ হওয়ায় তাহাই গৃহীত হইল।

থাক। ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন। তুমি ক্ষত্রিয় না হইলে আমার স্বজাতীয়েরা আমার নিন্দা করিত। অমরের এই একটি কথাতে স্বজাতি-প্রচলিত নিয়মাদি পালনের জন্য তিনি কিরূপ ব্যাকুল ছিলেন, তাহা জানা যায়। আর একটি সত্য ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। তখন শিখেরা বাস্তবিকই হিন্দুধর্ম্মের একটি সম্প্রদায় মাত্র ছিল, হিন্দুধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থাদি মানিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইত না। যাহা হউক, এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই রামদাসের সহিত মোহিনীর শুভ বিবাহ হইয়া গেল। ইহা ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের কথা। (২)

১৫৫২ খৃষ্টাব্দে অমর গুরু হন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। রামদাস শ্বশুর অমরের বড় ভক্ত ছিলেন। তায় তিনি স্বভাবত সুশীল ও ভক্তিপ্রবণ। কাজেই ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগের সময় গুরু, রামদাসকেই গুরুপদ দিয়া যান। রামদাস সে পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কখন ত্রুটি করেন নাই। গুরু হইয়া রামদাস শিখদের জন্য অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সে সব কার্য্যে তাঁহার লোকহিতৈষণার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা তাহার আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

রামদাস যে সময় গুরু হন, সে সময় ভারতাকাশ নিতান্ত নির্ম্মল ছিল না। তখন ভারতের নানাস্থানে যুদ্ধাগ্নি জ্বলিতেছিল। পঞ্জাবেও দুই একটি বিদ্রোহ হয়; কিন্তু তাহা কোন কাজের হয় নাই। নব বিজিত গুজরাটের মোগল শাসনকর্ত্তার ও রাজপুত রাজাদের চেষ্টায় তাহা অকালে নষ্ট হয়।

রামদাসের অনেকগুলি গুণ ছিল। তিনি বড়ই শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। সম্ভব হইলে লোকের উপকার করিবার জন্য তিনি বড়ই ব্যস্ত হইতেন। কোন সুযোগ উপস্থিত হইলে, তিনি তাহা কখন নষ্ট করিতেন না। তাঁহার এ লোক-সেবার গুণে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে।

১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে অম্বরের রাজা মানসিংহ পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এই বর্ষে মহম্মদ হাকিম মির্জ্জা নামে আকবরের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পঞ্জাবে বিদ্রোহ পতাকা তুলেন। (৩) তাঁহার অধীনস্থ এক সেনাপতি এক সহস্র

(২) Cunningham's History of the Sikhs.

(৩) ম্যালিসন সাহেব তাঁহার Akbar গ্রন্থের (In the rulers of India series) ১২৭ পৃষ্ঠায় এই বিদ্রোহ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তারিখ সম্বন্ধে ভুল করিয়াছেন। এই ঘটনাকে তিনি ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের ব্যাপার বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। C. F. Latif's History of the Punjab. page 139 and Dow's Ferista Vol. 11 p. 274.

অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সিন্ধু পার হইয়া অগ্রসর হয়; কিন্তু পথে মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। ইহার অল্পকাল পরেই মির্জা লাহোর সহর অবরোধ করিলেন। মানসিংহ, সৈয়দ খাঁ ও রাজা ভগবান দাস নগর রক্ষার জন্য বিলক্ষণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আকবরও সসৈন্যে লাহোরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিয়া মির্জা পঞ্জাব ত্যাগ করিয়া কাবুলে পলাইয়া যান। রাজপুত্র মুরাদও তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া কাবুলে যান। সেখানে মুরাদের সহিত তাঁহার এক সংঘর্ষ হয়। তাহাতে মির্জা পরাজিত হইয়া পলাইয়া যান। পরে নিরুপায় হইয়া মির্জা ভ্রাতার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইলে আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করেন ও কাবুলের শাসনকর্ত্তৃপদে নিয়োগ করেন। পরে ঐ বর্ষের ১৩ই অক্টোবর মোগলরাজ আকবর লাহোরে উপস্থিত হন ও তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া আগ্রায় চলিয়া যান।

পঞ্জাব হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে আকবরের সহিত রামদাসের সাক্ষাৎ হয়।(৪) আকবর রামদাসের অমায়িকতায় ও সারল্যে মুগ্ধ হন। তিনি গুরুকে বেশ সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন ও গুরুকে বর চাহিতে বলেন। গুরু বলিলেন, তাঁহার কিছু প্রার্থনা নাই। কিন্তু তাঁহার একটি কথা নিবেদন করিবার ইচ্ছা আছে। আকবরের সম্মতি পাইলে তিনি তাহা বলিতে পারেন। তিনি কি বলিতে চাহেন, আকবর তাহা জানিতে চাহিলে, গুরু বলেন—লাহোরে আপনার অবস্থান কালে জিনিষপত্র অনেক খরচ হইয়া গিয়াছে; কাজেই তাহা দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। কিন্তু এখন আপনি লাহোর ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। কাজেই পণ্যের দর হঠাৎ অত্যন্ত কমিয়া যাইবে। তাহাতে প্রজাদের অত্যন্ত ক্ষতি হইবে। আমার অনুরোধ যে, আপনি এ বৎসর প্রজাদের খাজনা মাপ করুন। (৫) আকবর গুরুর এরূপ প্রজা-বাৎসল্য দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হন ও শুনিতে পাই, আকবর তাঁহার পরামর্শানুসারে সে বৎসর তথাকার রাজ সরকারের কর আদায় বন্ধ রাখিয়াছিলেন। যাইবার সময় আকবর গুরুকে কতকগুলি জিনিষ উপহার দেন। তন্মধ্যে বর্ত্তমান অমৃতসর সহরের চতুর্দ্দিকের খানিকটা স্থানও ছিল। যাহা হউক, গুরুর এই দয়ার কথা শীঘ্রই চারিদিকে

(৪) শিখ ইতিহাস প্রণেতা M' Gregor সাহেব বলেন যে, গোবিন্দবালে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়।

(৫) M' Gregor's History of the Sikhs.

বিস্তৃত হইয়া পড়িল। অনেকগুলি জমিদার আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময় গুরুর গুণে শিখ সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়।

গুরু আকবরের নিকট যে স্থানটুকু পাইয়াছিলেন, তাঁহার জন্মস্থান চকগ্রাম তাহার অন্তর্বর্ত্তী ছিল। গুরু তথন চকে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করাইলেন। মধ্যস্থলে একটি মন্দির নির্ম্মিত হইল। হরমন্দর বা হরিমন্দির নামে তাহা সাধারণ্যে পরিচিত। শিখদের বিশ্বাস, এই সরে স্নান করিলে, অত্যন্ত পুণ্য হয়। এখনও প্রতিবৎসর বহু সংখ্যক শিখ এই অমৃত সরে একত্রিত হয় ও স্নান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করে। এই সরের চতুর্দ্দিকে রামদাস অনেকগুলি কুটীর নির্ম্মাণ করেন। তদবধি সে স্থান গুরু চক্ নামে পরিচিত হইল। কিন্তু সে নাম বেশী দিন রহিল না। ক্রমে রামদাসপুর নামে তাহা সাধারণ্যে পরিচিত হইল। কিন্তু তাহাও বেশী দিন স্থায়ী হইল না। অমৃত সরের কথা যতই বিস্তৃত হইতে লাগিল, রামদাসপুরের নাম ভুলিয়া লোকে ততই ইহাকে অমৃতসর বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। যেমন পুরীকে জগন্নাথ ক্ষেত্র বলিয়াই অনেকে জানে, এ রামদাসপুরও সেইরূপ অমৃতসর হইয়া দাঁড়াইল। এই অমৃতসর নাম সেই অবধি অচল হইয়া আছে।

অমৃতসরের মধ্যস্থলে যে মন্দির আছে, একটি সেতু দিয়া তাহাতে যাইতে হয়। এই মন্দিরে গুরুর দরবার বসিত। সম্ভবতঃ ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে (৬) এই অমৃতসরের প্রতিষ্ঠা হয়।

রামদাস অনেকগুলি গাথা লিখিয়াছিলেন। সেগুলি সমস্তই সুন্দর ও পরিষ্কার ভাব-ব্যঞ্জক। সেগুলি পরে আদিগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়।

এতাবৎ কাল ধরিয়া গুরুপদ প্রাপ্তি সম্বন্ধে যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল, রামদাস তাহার অন্যথা করিলেন। তৃতীয় গুরু অমরদাস জামাতাকে গুরুপদ দিয়াছিলেন, কিন্তু রামদাসকে জামাতা বলিয়া দেন নাই, রামদাস উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন বলিয়াই দিয়াছিলেন। ইহাতে একটী আশ্চর্য্য ফল ঘটিয়াছিল। গুরুপদ বংশগত না করিলে শিখ সম্প্রদায় নিশ্চয়ই চিরকাল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মাত্রে আবদ্ধ

(৬) Imperial Gazetter মতে ১৫৬১, কানিংহামের মতে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ। Cyclopædia India etc গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, ৯৬ পাতায় দেখা যায় যে, ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে এই অমৃতসরের প্রতিষ্ঠা হয়। বিচার করিয়া দেখিলে, শেষোক্ত মতই ঠিক্ বলিয়া বোধ হয়।

থাকিত; কিন্তু উহা বংশগত করায় গুরুরা ক্রমে ধনশালী হইতে থাকেন, কাজেই বিলাসের ভাব তাঁহাদের মধ্যে সংক্রামিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তার পর তাঁহারা ধনী হইয়া ধনভোগ করিতে লাগিলেন, রাজার ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। কাজেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সহিত সংমিশ্রিত হওয়ার অনেকটা সুযোগ ঘটিয়া গেল। ফলে তাঁহারা মোগল সম্রাটের কুটিল নেত্রের পথিক হইয়া পড়িলেন। এইরূপ নানা সংঘর্ষণের ফলে আজ শিখ সম্প্রদায় খাঁটী সামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে। রামদাস কি মনে করিয়া গুরুপদ বংশগত করেন, তাহা ঠিক্ জানা যায় না; কিন্তু তাহাতে যে শিখদের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা সত্য। সুতরাং আমরা রামদাস হইতেই শিখদের দ্বিতীয় যুগের অবতারণা দেখিতে পাই, তাহা পার্থিবের প্রতি শিখদিগের দৃষ্টি। ক্রমে এ তত্ত্ব কিরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা আমরা পরে দেখিব।

রামদাসের তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ মহাদেব ফকিরী অবলম্বন করেন। দ্বিতীয় পৃথিচাঁদ (১) সংসারী হন। তৃতীয় অর্জ্জুন মল পিতার অত্যন্ত ভক্ত থাকায়, গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা মার্চ্চ সাতান্ন বৎসর বয়ঃক্রম কালে গুরু রামদাস অমৃতসরে দেহত্যাগ করেন। প্রায় সাত বর্ষ কাল তিনি গুরু ছিলেন। বিপাশা নদীর তীরে তাঁহার একটী স্মৃতিমন্দির শিখেরা নির্ম্মাণ করিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার স্মৃতির জন্য সেরূপ পার্থিব মন্দিরের বিশেষ কোন দরকার ছিল না। শিখদের আদর্শ পরিবর্ত্তনের মূলীভূত কারণ হওয়ায় তাঁহার নাম শিখ-ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে চিরকাল অঙ্কিত রহিবে।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১) রামদাসের দুই পুত্র কি তিন পুত্র—এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছু গোল দেখা যায়। আবার দ্বিতীয় পুত্রের নাম পৃথিচাঁদ কি না, সে বিষয়েও কেহ কেহ সন্দেহ করেন। কাহারও মতে তিনি ধীরমল, কাহারও মতে ভরতমল। দেবীস্থান প্রণেতা ও তাঁহার অনুকরণকারী ম্যালকম সাহেব পৃথিচাঁদের পরিবর্ত্তে ভরতমলের নাম করিয়াছেন। ম্যাক্‌গ্রেগর বলেন, পৃথিদাস। কানিংহাম কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন নাই। তিনি কিন্তু গুরুদের ক্রমানুবর্ত্তিক তালিকাতে পৃথিচাঁদই লিখিয়াছেন। যাহা হউক, এ বিষয় এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে। এতকাল পরে এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার।

কবে।

কবে—বকুলডালে আকুল করা কোকিল গা'বে গান।
কবে—বিনোদ বেশে মলয় এসে ছুটবে ল'য়ে তান॥
কবে—আমবাগানে মুকুল পানে ছুটবে অলিগণে।
কবে—নীল আকাশে উঠবে তারা পূর্ণ চাঁদের সনে॥
কবে—বেল বাগানে প্রভাত হ'লে ফুটবে কত ফুল।
কবে—মধুর আশে উধাও হ'য়ে ধাইবে অলিকুল॥
কবে—নূতন পাতা নূতন লতা নূতন হ'বে সব।
কবে—সোহাগ মাখি তুলবে পাখী বৌ কথা কও রব॥
কবে—ফাগুন মাসে বইবে আগুন প্রেমিক-হৃদি-মাঝ।
কবে—ফুলের বাসে মাত্‌বে ধরা পরবে নূতন সাজ॥
কবে—কুন্দ গোলাপ কনক চাঁপা ফুটবে থরে থরে।
কবে—হাস্‌বে ধরা আস্‌বে বল হৃদয়-দেবী ঘরে॥

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থ-প্রবাহ।

(৩)

শ্রীযুক্ত ভেরেলষ্ট মহোদয় বলিয়াছেন;—"বঙ্গদেশের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হেতু পূর্ব্বে দিল্লীতে যে পরিমাণ অর্থই প্রেরিত হোক্ না কেন, তাহার উপযুক্ত প্রতিদান প্রদত্ত হইত। • • • কিন্তু সে অবস্থার সহিত নবাবের রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থার কি গুরুতর বৈষম্য! • • • অধিকাংশ বিলাতি কোম্পানীই দেশ হইতে অর্থ-সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা প্রতি বৎসরই মূলধন—

ব্যবসায়ের Investments বৃদ্ধি করিতেছে, অথচ দেশের ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত একটা টাকাও দিতে হয় না।" (১)

"এই বিভাগের প্রত্যেক অংশ হইতে প্রচুর পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন হওয়ায়, আপনাদের ধনাগারের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে দেশ হইতে যে বিপুল রপ্তানী-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহার নিশ্চিত ভাবী ফলের কথা মনে করিয়া আমাদিগকে চকিত হইতে হইতেছে।" (২)

"একটি দেশ যতই কেন অর্থশালী হোক্ না, যদি কোন প্রকার কার্য্যকরী সাহায্য প্রাপ্ত না হয় এবং তাহার বাৎসরিক আয়ের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক যদি শোষিত হইতে থাকে, তবে সে দেশ বেশী দিন নিজের অবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না, তাহার অধোগতি হইবেই। এতদ্ব্যতীত আরও এরূপ প্রাসঙ্গিক কারণ পরম্পরা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে দেশের ধনাগমের পন্থা হ্রাস হইতেছে, এবং যদি তাহার নিরাকরণ করা না যায়, তবে শীঘ্রই উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। আমি দেখিয়াছি যে, পূর্ব্বে এদেশ একটি মহা সুবিধা উপভোগ করিত; উহার রাজস্ব হইতে বড় বড় পুরস্কার (Grants) বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বিতরিত হইত এবং দেশের শাসনকর্ত্তাগণের বিলাসিতায় বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইলেও প্রকারান্তরে তাহা দেশের লোকের মধ্যেই থাকিয়া যাইত। কিন্তু এক্ষণে ভূমি সংক্রান্ত সমস্ত কর এক সাধারণ দরিয়ায়—আপনাদের ধনাগারে নিক্ষিপ্ত হইতেছে; কিন্তু আমাদের Investment ও আবশ্যকীয় খরচপত্রের নিমিত্ত যে সামান্য ব্যয় হয়, তদ্ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত সংগৃহীত রাজস্বের এক কণাও দরিয়া হইতে দেশের লোকের মধ্যে পুনঃ বিতরিত হয় না।" (৩)

হাউস অব্ কমন্সের সিলেক্ট কমিটীর ১৭৮৩ অব্দের নবম রিপোর্টে এই Investment ব্যাপারখানার এক বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কমিটী লিখিয়াছেন,—"বহুদিন হইতে বঙ্গদেশের রাজস্বের কতকাংশ পণ্য দ্রব্য ক্রয়ের নিমিত্ত বা ইংলণ্ডে রপ্তানীর নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাকে ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট (Investment) নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। কোম্পানীর কর্ম্মচারিবৃন্দ এই ইন্‌ভেষ্টমেণ্টের বৃদ্ধি সাধনই সাধারণতঃ স্বীয় আদর্শরূপে স্থির করিয়া থাকে; এবং ভারতবর্ষের দরিদ্রতার এই প্রধান কারণই উহার ধনবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধির হেতুরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। বড় বড় জাহাজের অসংখ্য বহর

(১) Letter dated 26 September 1767.

(২) Letter dated 24 March 1768.

(৩) Latter dated 5 April 1769.

প্রাচ্যের মহামূল্যবান দ্রব্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া প্রতি বৎসর বর্দ্ধিত প্রভাবে ইংলণ্ডে আসিতে থাকায়, সাধারণের মনে স্বভাবতই তদ্দেশের সুখসমৃদ্ধির ও ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু সৌভাগ্যের চিত্র—যাহার উদ্বৃত্ত উপাদানে বাণিজ্যিক জগতের এরূপ বিপুলস্থান অধিকার করিতে পারে,—তদ্বিষয়ে এক অনন্ত চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া গিয়াছে। ভারত হইতে এই রপ্তানী পারস্পরিক আদান প্রদান বলিয়াই মনে হয়, এবং তাহার দ্বারা বাণিজ্যে নিয়োজিত মূলধন ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত ও দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। ॰ ॰ ॰"

ভারতবর্ষ হইতে এই স্থায়ী অর্থ-শোষণরূপ অমঙ্গলের বিষয় কেবল যে গবর্ণর ভেরেলষ্ট ও কমন্‌সসভার সিলেক্ট কমিটী কর্ত্তৃক পরিস্ফুটভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু ইংলণ্ডের প্রধানতম রাজনৈতিকও এইরূপ ভাষায় এই প্রথার এতাদৃশ নিন্দা করিয়াছেন যে, যতকাল ইংরেজি ভাষার অস্তিত্ব থাকিবে, ততকাল তাহা সাদরে সর্ব্বত্র পঠিত হইবে। ১৭৮৩ অব্দে ফক্সের (Foxe's East India Bill) ইষ্ট ইণ্ডিয়া বিল প্রসঙ্গে মন্তব্য প্রকাশ কালে সুপ্রসিদ্ধ এড্‌মণ্ড বার্ক মহোদয় ভারতের এই অর্থ-প্রবাহের শোচনীয় পরিণামের বিষয় জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণন করেন। আমরা এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"প্রাচ্য বিজেতাগণ বিজিত প্রদেশকে তাহাদের আপনাদের দেশ করিয়া লইতেন বলিয়া, বিজয়ের পর অতি সত্বরই পশুভাব ত্যাগ করিতেন। যে দেশে তাঁহারা বাস করিতেন সেই দেশের উত্থান ও পতনের সহিত তাঁহাদেরও উত্থান ও পতন ঘটিত। পিতার দল তথায় উন্নতির আশা পুঞ্জীভূত করিত, সন্তানের দল পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিস্তম্ভ সমূহ অবলোকন করিত। তথায় তাহাদের ভাগ্য চির তরে নিয়ন্ত্রিত হইত; তাহাদের চির আকাঙ্ক্ষা এই ছিল যে, তাহাদের ভাগ্য যেন কোন আঘাতেই কোন মন্দ প্রদেশে নিক্ষিপ্ত না হয়। দরিদ্রতা, অনুর্ব্বরতা এবং বিজনতা কখনই কোন ব্যক্তির নিকট তৃপ্তিপ্রদ দৃশ্য হইতে পারে না এবং অতি অল্প লোকই সমগ্র দেশবাসীর অভিসম্পাতের মধ্যে থাকিয়া বৃদ্ধ হইবার কষ্ট সহ্য করিতে পারে। যদি তাহাদের প্রকৃতি বা আকাঙ্ক্ষার তাড়নাতেই তাতার বিজেতাগণকে লৌহ হস্তে শাসন দণ্ড গ্রহণ করিতে হইয়াছিল মনে করা যায়, তত্রাচ একজন লোকের জীবনের স্বল্প সময়ের মধ্যে এই অমঙ্গল দূরীকরণের পর্য্যাপ্ত অবসর পাওয়া যাইত। যদি অত্যাচার ও অবিচার দ্বারাই অর্থ পুঞ্জীকৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহা দেশীয় সঞ্চয় এবং অপর কোন ক্ষমতাশালী ও অমিতব্যয়ীর হস্তদ্বারা ঐ সঞ্চিত ধন দেশবাসীদের মধ্যে পুনঃ বিতরিত হইত।

নানা বিশৃঙ্খলা এবং ক্ষমতার উপর সামান্য রাজনৈতিক বাধা সত্বেও—স্বভাবতই আয়ের বা সংগ্রহের পন্থা বিশুষ্ক হইত না এবং তজ্জন্যই দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্পকলা উন্নত অবস্থায় ছিল। অনুচিত ধনস্পৃহা এবং অন্যায় অপহরণ দ্বারা—জাতীয় ধনের সংরক্ষণ ও তাহার বিনিয়োগ উভয় কার্য্যই সম্পন্ন হইত। কৃষক ও শিল্পিকুল গুরুতর সুদ প্রদান করিলেও যে ধনাগার হইতে পুনরায় তাহাদিগকে ঋণগ্রহণ করিতে হইবে, সেই ধনাগারেরই উন্নতি বিধান করিত। তাহাদের জীবন-সংগ্রামের উপায় পন্থা বহুমূল্যে ক্রয় করিতে হইলেও তাহারা সুনিশ্চিন্ত ছিল এবং সাধারণের কার্য্যের ফলে সমাজের মূল ভাণ্ডার বর্দ্ধিতই

“কিন্তু ইংরেজ শাসনাধীনে এ সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাতার-অভিযান অমঙ্গলদায়ক ছিল, কিন্তু আমাদের এই আশ্রয়ই ভারতের বিনাশের হেতু হইয়াছে। প্রথমোক্তদের শত্রুতা দ্বারা যাহা ঘটিত আমাদের মিত্রতা দ্বারাই তাহা ঘটিতেছে। প্রথম দিন যেমন ছিল, আমাদের বিজয়ের কুড়ি বৎসর পরেও তাহার ফল তেমনি অপরিপক্ক আছে। একজন ইংরেজের পক্ক মস্তকে কি দেখিবার আছে, কোন দেশীয় ব্যক্তি তাহা কদাচিৎ বুঝিতে পারে; যুবকদল—অধিকাংশই বালক তথাকার শাসনকর্ত্তা; তাহারা অসামাজিক ভাবে এবং দেশীয়গণের সহিত সহানুভূতি শূন্য হইয়া বাস করে। ইংলণ্ডে অবস্থান করিলে যে সকল সামাজিক নিয়ম পালন করিয়া চলিতে হইত, তথায় তাহারা তাহা পালন করিতে চায় না এবং অকস্মাৎ সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র হইবার পক্ষে যাহা করণীয় বা প্রয়োজনীয় তৎসাধন ব্যতীত অপর কোন উদ্দেশ্যে তাহারা দেশীয়দিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে না। বয়সের দোষে এবং যৌবনের মাদকতায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা একটীর পর আর একটী গড়াইয়া যায়; এবং দেশীয়গণ দেখিতে থাকে যে, নূতন নূতন শিকারি পাখীর দল বুভুক্ষা নিবৃত্তির নিমিত্ত নূতন খাদ্যান্বেষণের অভিপ্রায়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায়, অসীমভাবে উড়িয়া যাইতেছে। ইংরাজের লভ্যের প্রত্যেক টাকাটী ভারতবর্ষের নিকট হইতে চিরকালের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করে।”

গবর্ণর হেষ্টিংস্‌ এবং এডমণ্ড বার্কের সময় অপেক্ষা বর্ত্তমান ভারত-শাসন প্রণালী অনেকাংশে উন্নত হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষ অর্দ্ধশতাব্দী কাল এমন অবিমিশ্র সুখ-সৌভাগ্য উপভোগ করিয়াছে—যাহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে অজানিত ছিল। ব্যবসায় বাণিজ্য এবং অসঙ্গত শুল্ক করভার হইতে বিমুক্ত হই-

য়াছে। বিচার কার্য্য এবং শিক্ষার বিস্তার হেতু দেশের লোকের মধ্যে এক নূতন জীবনের সঞ্চার হইয়াছে এবং তাহাদিগকে উচ্চতর কার্য্য ও দায়িত্বের উপযোগী করিয়াছে। কিন্তু এতৎ সত্বেও ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিয়ত যে অর্থ-প্রবাহ নির্গত হইতেছে, যাহার অমঙ্গল ফল অবলোকন করিয়া ভেরেল্‌ষ্ট এবং বার্ক তৎকালে তীব্র ভৎর্সনা করিয়াছিলেন, সেই অমঙ্গল-স্রোত আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া বর্দ্ধিত ধারায় প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষকে চিরদরিদ্র ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত রূপে প্রতিভাত করিতেছে।

ভারতের দুর্ভিক্ষ কতকটা অনাবৃষ্টির জন্য ঘটিয়া থাকে; কিন্তু সেই দুর্ভিক্ষের তীব্রতা এবং তন্নিবন্ধন লোকক্ষয় প্রভৃত পরিমাণে লোকের চিরদরিদ্রতার উপর নির্ভর করে। দেশের লোকের অবস্থা সাধারণতঃ স্বচ্ছল থাকিলে, দেশের খাদ্য শস্যের অপ্রতুলতার সময় নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়া স্থানীয় অভাব মোচন করিতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে কাহাকেও দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর করাল কবলে নিপতিত হইতে হয় না। কিন্তু লোকের অবস্থা সম্পূর্ণ অর্থশূন্য হইলে তাহারা নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে আহার্য্য ক্রয় করিতে সক্ষম হয় না এবং কাজেই দেশে শস্যের অসদ্ভাব উপস্থিত হইলে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী অনন্ত পথের যাত্রী হইয়া সকল জ্বালার নিবৃত্তি করে।

১৭৬৯ অব্দে খাদ্য দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতায় ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা সূচিত হয়। কিন্তু সে সময় ভূমির কর পূর্ব্বাপেক্ষাও কঠোরতার সহিত সংগৃহীত হইতে থাকে। "পূর্ব্বে এত অধিক পরিমাণে রাজস্ব কখনও আদায় হয় নাই।" (১) বৎসরের শেষে সাময়িক বৃষ্টিপাত না হওয়ায়, কলিকাতার ইংরাজ কাউন্সিল রাজস্ব অনাদায়ের আশঙ্কা করিয়া ২৩শে নবেম্বর তারিখে কোর্ট অব ডিরেক্টরকে যে পত্র লিখেন তাহাতে দেশবাসীর পরিত্রাণের নিমিত্ত কোন উপায় অবলম্বনেরই পরামর্শ ছিল না। ১৭৭০ অব্দের ৯ই মে র পত্রে তাঁহারা লিখিয়াছিলেন,—"উপস্থিত দুর্ভিক্ষে মৃত্যু সংখ্যা ও ভিখারীর সংখ্যা অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ণিয়ার একটী মাত্র প্রদেশে এক-তৃতীয়েরও অধিক গ্রামবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং অন্যান্য প্রদেশেরও প্রায় তুল্য অবস্থা।"

১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিয়াছিলেন,—"দেশবাসীদিগকে যে দুর্ব্বিসহ বিপদ ও কষ্ট পরাজয় করিতে হইতেছে, তাহা যে কোন ভাষাতে বর্ণনা করিলেও

(১) India office Racords, quoted in Hunter's Anuals Rural Bengal.

অত্যুক্তি হইবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, রাজস্ব সংগ্রহের প্রখরতার উপর এই দুঃখ কষ্ট নির্ভর করে। কিন্তু আমরা আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমরা যেরূপ মনে করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা "অতি অল্পই বাকী পড়িয়াছে।" ১৭৭১ অব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহারা লিখেন,—"বিগত দুর্ভিক্ষের দরুণ গুরুতর কষ্ট এবং প্রভূত পরিমাণে লোক সংখ্যা হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও বর্ত্তমান বৎসরের বন্দোবস্তে বঙ্গ এবং বিহার প্রদেশেই কিছু রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়াছে।" পরবর্ত্তী সনের ১০ই জানুয়ারী তারিখে লিখিত হয়,—"আমরা যেরূপ আশা করিতে পারি সেইরূপ কৃতকার্য্যতার সহিতই বর্ত্তমান বৎসরে প্রত্যেক বিভাগের রাজস্ব সংগৃহীত হইয়াছে।" (১)

ঘোর দুঃখ কষ্টে পড়িয়া যখন মনুষ্যকুল নির্ম্মূল হইতে চলিয়াছে, সেই দুঃসময়ে এরূপ কঠোরতার সহিত কর সংগ্রহের বিবরণ পাঠ করিতে দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয় না কি? এই দুর্ভিক্ষের শেষ ফল নির্ণয়ার্থ কাউন্সিলের সভ্যবৃন্দ দেশের অবস্থা পরিদর্শন করতঃ নির্দ্ধারিত করেন যে, বঙ্গদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা বা দশ মিলিয়ন প্রজা দুর্ভিক্ষে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। প্রত্যেক পল্লীতে, পথিপার্শ্বে এবং বাজারের নিকটে বুভুক্ষায় মৃতপ্রায় ব্যক্তিগণের দুঃখ মোচনের নিমিত্ত কোন উপায়ই অনুসৃত হয় না; কাজেই কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের কার্য্য দোষেই মৃত্যুর সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। কোম্পানীর গোমস্তারা দেশের লোকের কষ্টোৎপন্ন শস্যের দ্বারা লাভবান হইবার নিমিত্ত যে কেবল তাহা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল তাহা নহে, তাহারা পরবর্ত্তী সনের আবাদের উপযোগী বীজ শস্যও কৃষকদিগকে প্রদান করিতে বাধ্য করিত। এই সংবাদ প্রাপ্তে কোর্ট অব ডিরেক্টর ক্ষুব্ধ হন এবং আশা করেন যে, "যাহারা সার্ব্বজনীন দুঃখ কষ্টের দ্বারা নিজেদের লাভবান করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং তদনুরূপ কার্য্য দ্বারা কোম্পানীর সৎকার্য্য প্রণালীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হয় এরূপ অপরাধীদিগকে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করা হোক্।" (২)

কিন্তু কোম্পানীর নিজের স্বার্থে আঘাত লাগিলে এই সদিচ্ছা আর পরিস্ফুট হইবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই এবং এই দুর্ভিক্ষের শেষে দেশের এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা বিধৌত হইয়া গেলেও এবং দেশের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণে ভূমি অকর্ষিত অবস্থায় পতিত রহিলেও বঙ্গদেশের ভূমিকর রেহাই দিবার কোন

---

(১) Ibid. (২) Ibid.

নিদর্শনই আমরা প্রাপ্ত হই না। ১৭৭২ অব্দের ৩রা নভেম্বর তারিখে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস কোর্ট অব্ ডিরেক্টরকে লিখেন,—

"It was naturally to be expected that the diminution of the revenue should have kept an equal pale with the other consequences of so great a calamity. If it did not waso wing to its being violently, kept up to its former standard." (১)

ভূমি-কর সংগ্রহের সমতা রক্ষার এই কঠোরতাকে বর্ত্তমান কালের ভারত শাসন প্রণালীর ভাষায় 'Receeperative Power of India' (?) (ভারতবর্ষের বিনষ্ট দ্রব্যের পুনঃ প্রাপ্তির অদ্ভুত ক্ষমতা) বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। (২)

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

বিধবা বিবাহ ও হিন্দুসমাজ।

সম্প্রতি বিধবা বিবাহের আন্দোলন লইয়া সমাজমধ্যে বেশ একটু হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তদীয় বিধবা কন্যাকে পত্যন্তর গ্রহণ করাইয়াছেন। আন্দোলনের ইহাই মুল কারণ। আশু বাবু ধনী, শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ, তিনি জানিয়া শুনিয়াই সমাজের কঠোর শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়াছেন, ইচ্ছা করিয়াই সমাজের নিদারুণ অভিসম্পাত মাথা পাতিয়া লইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে বলিবার আমাদের কিছুই নাই; এবং সাধারণে যে তাঁহার এই 'সদ্দৃষ্টান্তের' অনুসরণ করিবে, আমরা এরূপ ভ্রান্তবিশ্বাসেরও বশবর্ত্তী নহি। আশু বাবু যত বড় লোকই হউন, সমাজশরীরে তিনি একটী লোম ব্যতীত আর কিছুই নহেন। যতদিন তিনি সমাজের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, ততদিনই সমাজমধ্যে তাঁহার স্থান। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি সমাজ-নিগড় ভঙ্গ করিয়া যথেচ্ছাচারপরায়ণ হইবেন, সেই মুহূর্ত্তেই সমাজ তাঁহাকে তুচ্ছ তৃণবৎ দূরে নিক্ষেপ করিবে। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে এই ব্যাপার লইয়া যে একদল নব্যসংস্কারক আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন এবং অপর সাধারণকে

(১) Idid.
(২) Indian Trade,—Dutt.

আশু বাবুর এই 'মহদ্দৃষ্টান্তের' অনুসরণ জন্য উপদেশ দিতেছেন, তাঁহাদিগকে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

অধুনা আমরা বড় উন্নতিশীল হইয়া পড়িয়াছি। উন্নতির জন্য আমরা না করিতে পারি এমন কাজই নাই। এই উন্নতির ধুয়া ধরিয়াই আমরা এখন যাবতীয় দুষ্কার্য্য বেশ সহজভাবেই সম্পন্ন করিয়া আসিতেছি। আমরা বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, তাড়াতাড়ি সবল হইয়া উঠিতে হইবে, সুতরাং শারীরিক উন্নতির জন্য কুক্কুট মাংস এবং যাহার নাম শুনিলেও হিন্দুগণ কর্ণে অঙ্গুলি স্পর্শ করেন, সেই অমেধ্য অস্পৃশ্য মাংস ভোজন ব্যতীত অন্য উপায় নাই। আমাদের একতা-বন্ধনটা বড়ই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহার উন্নতির জন্য জাতিভেদ প্রথাটা তুলিয়া দিতে হইবে; নতুবা অনেক বিষয়েই অসুবিধা উপস্থিত হয়। পুরাতন ধর্ম্মটা যেমন অসম্পূর্ণ তেমনই বেয়াদব, এক চুল এদিক ওদিক হইলেই চোক রাঙ্গাইয়া বসে, সুতরাং তাহারই উন্নতির জন্য ওস্তাগরের কাঁচিতে তাহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ঠিক মাপ মত করিয়া লইতে হইবে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, হিন্দুর সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে, তাহাতে সমাজশরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং সামাজিক উন্নতির জন্য যেখানে যত বিধবা আছে ধরিয়া তাহাদের এক একটা 'পতি' জুটাইয়া দিতে হইবে। দুর্ভিক্ষের তাড়নায় সংসারটা ক্রমেই অবনত হইয়া পড়িতেছে, তাহাকে উন্নত করিতে হইলে মা বাপ ভাই ভগ্নী প্রভৃতি কতকগুলা কুপোষ্যকে বাদ দিতে হইবে। স্ত্রীজাতির উন্নতি না হইলে দেশ বুঝি জাগে না, সুতরাং তাহাদের উন্নতির জন্য কুলবধূগণকে গড়ের মাঠের খোলা হাওয়ায় ছাড়িয়া দেওয়া হউক। ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলকথা, উন্নতির ধুয়াটা এখন আমাদের সত দুষ্কর্ম্মের আবরণস্বরূপ হইয়াছে। সেই আবরণে আপনাকে ঢাকিয়া আমরা এমন ভাবে অগ্রসর হইতেছি, যাহাতে আমরা সনাতন ধর্ম্ম হইতে, জাতীয়তা হইতে, উন্নতি হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। উন্নতি করিতে গিয়া আমরা ক্রমেই অধঃপতিত হইতেছি।

কিন্তু এই খাঁটী সত্যটা অনেকে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। যাঁহারা ইহার প্রতিকূলবাদী, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কুক্কুট মাংস সেবন করিলেই যদি উন্নতি হইত, তবে মোগল পাঠানের অধঃপতন হইল কেন? বিধবা বিবাহ দিলেই যদি উন্নতি হয়, তবে রোম ও গ্রীসের অধঃপতন হইল কি জন্য? এবং যে সকল নিম্নস্তরের হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ আবহমান কাল প্রচলিত আছে, তাহারা এখনও সমাজের এত নীচে পড়িয়া কেন?

কিন্তু এই সকল অবান্তর বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আমরা দেখাইতে চাই বিধবা বিবাহ হিন্দুসমাজের উপযোগী কি না, এবং তাহার দ্বারা সমাজের কতটা উন্নতি বা অবনতি হয়। এস্থলে আমরা শাস্ত্রের তর্ক তুলিয়া প্রবন্ধ-কলেবর বর্দ্ধিত করিতে চাহি না। কারণ, বহুদিন হইতেই সে তর্ক চলিয়া আসিতেছে, এবং বিভিন্ন মতাবলম্বিগণ সে সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। এ পর্য্যন্ত তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই।

যাঁহারা বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী, তাঁহাদের প্রথম বক্তব্য, হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকায় সমাজমধ্যে ব্যভিচার-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এ স্রোতের প্রতিরোধ করিতে হইলে বিধবাগণকে পুনর্ব্বিবাহিত করা আবশ্যক। কথাটা আংশিকভাবে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও বিধবা বিবাহ দ্বারা সে স্রোত প্রতিরুদ্ধ করা অসম্ভব। কারণ, শাস্ত্রমতে (এস্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতকেই শাস্ত্রীয় মত বলিয়া গ্রহণ করিলাম) অক্ষতযোনি অর্থাৎ দ্বাদশবর্ষবয়স্কা পর্য্যন্ত বিধবারই বিবাহের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যেখানে চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ বা তদধিক বর্ষ বয়স্কা রমণী বিধবা হইতেছেন, সে স্থলে কি উপায় অবলম্বিত হইবে? অনেক স্থলেই এইরূপ বিধবারই সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। সুতরাং ব্যভিচারস্রোত নিবারণ করিতে হইলে ইহাদিগকেও কি পুনর্ব্বার পাত্রস্থা করিতে হইবে? যদি না করা যায়, তবে ব্যভিচার স্রোতের নিবারণ হইবে কিরূপে? আরও, যে ভাগ্যদোষে একবার বিধবা হইয়াছে, সে যে বিবাহিতা হইয়া পুনর্ব্বার পতিহীনা হইবে না, তাহারই বা স্থিরতা কি? তাহা হইলে এক ব্যভিচার নিবারণ জন্য বিধবাকে পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে অর্পণ করিতে হইবে। ইহাই কি সঙ্গত ব্যবস্থা?

দ্বিতীয় কথা, বিধবাদিগের বিবাহ না দিয়া তাহাদিগকে আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে নিক্ষেপ করা ভয়ানক নিষ্ঠুরতা, বর্ব্বরোচিত কার্য্য। কিন্তু যে হিন্দু, দেবতা ব্রাহ্মণে যাহার ভক্তি আছে, ব্রহ্মচর্য্যে যাহার আস্থা আছে, পরলোকে যাহার বিশ্বাস আছে, সে ইহার মধ্যে কিছুমাত্র নিষ্ঠুরতা দেখিতে পায় না। সে বিধবার কঠোর জীবনের মধ্যে যে ব্রহ্মচর্য্যার পবিত্রতা, যে শান্তির শীতলতা, যে নিষ্কাম সাধনার উচ্চ আদর্শ দেখিতে পায়, পাশ্চাত্য সভ্যতার ঠুলি চোখে দিয়া অহিন্দু তুমি—তুমি সে দৃশ্য কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে? তুমি জান ভোগ, হিন্দু জানে ত্যাগ; তুমি দেখ ইহলোকের ক্ষণিক সুখদুঃখ, হিন্দু দেখে পরলোকের অক্ষয় অনন্ত সুখ; তুমি চাও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, হিন্দু চায় ইন্দ্রিয়ের

সংযম। সুতরাং হিন্দুর উচ্চ লক্ষ্য, বিলাস-বাসনাকলুষিত তুমি কিরূপে প্রণিধান করিবে?

স্বীকার করি, সর্ব্বত্র এই ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়ম সুরক্ষিত হয় না। না হইলেই ক্ষতি কি? স্থলবিশেষে ব্যভিচার হয় বলিয়া কি এই সনাতন ধর্ম্মকে বিলুপ্ত করিতে হইবে? পরলোকের উচ্চ আদর্শ ছাড়িয়া ইহলোকের পূতিময় বিলাসপঙ্কে ডুবাইতে হইবে? তুমি যে সমাজকে আদর্শ করিয়া হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে উদ্যত, যে সমাজে স্ত্রী ইচ্ছা করিলেই স্বামী ছাড়িয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে, যে সমাজে পুত্র পৌত্র-পরিবৃতা রমণীও অনায়াসে বিবাহ করিয়া থাকে, তুমি সত্য করিয়া বল দেখি, হিন্দুসমাজ অপেক্ষা সেই পাশ্চাত্য সমাজে ব্যভিচারের স্রোত কি প্রবল নয়? আজি তুমি যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বিধবার তুচ্ছ দৈহিক কষ্ট দর্শনে সহানুভূতির অশ্রুধারায় বক্ষ প্লাবিত করিতেছ, সেই পাশ্চাত্য-সমাজের দিকে একবার চাহিয়া দেখ, তথায় বিধবার অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়; তথাপি সেখানে বৎসরে প্রায় ৬।৭ হাজার জারজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে কেন?

ফল কথা, যেখানে, যে দেশে, যে সমাজে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই পরমপুরুষার্থরূপে গণ্য, সেইখানে, সেই দেশে, সেই সমাজেই ব্যভিচারের আধিক্য পরিদৃষ্ট হইয়া হইয়া থাকে। ভোগে কখনই ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি হয় না; ইন্ধনপ্রাপ্ত বহ্নির ন্যায় তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। একমাত্র সংযম দ্বারাই ইন্দ্রিয়ের এই অশান্ত ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয়। তাই আর্য্যগণ বিধবাদিগকে এই ভোগমার্গে অগ্রসর হইতে না দিয়া নিবৃত্তির পথে টানিয়া আনিয়াছেন; বাসনানলসন্দীপ্ত নরকের পথে ঠেলিয়া না দিয়া চিরশান্তিময় স্বর্গের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তাই এই বিলাসপঙ্কিল সংসারের মধ্যে থাকিয়াও হিন্দুবিধবা তাহাতে নির্লিপ্তা, ব্রহ্মচারিণী, ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি। হিন্দুর সংসারে যদি দেবতা বলিয়া কেহ থাকে, তবে সে ঐ হিন্দু বিধবা। যে পাপিষ্ঠ এই দেবতার মস্তকে ব্যভিচারের মিথ্যা কলঙ্ক সমর্পণ করিতে পারে, সে মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক, মানবাকারে পশু।

সময়ে সময়ে হৃদয়ের দুর্ব্বলতাবশতঃ আর্য্যঋষিগণের উচ্চ লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া, বালবিধবার ঐহিক ক্লেশদর্শনে ব্যথা অনুভব করা যায় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার পুরুষান্তরে সমর্পণ করা কখনই যুক্তি বা ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, দেখা যায় যে, স্নেহ বা মমতার বশবর্ত্তী হইয়া এই সকল স্বামিসঙ্গবর্জ্জিতা বালবিধবাদিগের বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তন করিলেই সমাজমধ্যে

ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইবে। স্বাভাবিক নিয়মবশে এই প্রথা কেবল বালিকাসমাজেই আবদ্ধ থাকিবে না; ইহা বালিকা হইতে ক্রমে কিশোরীতে, কিশোরী হইতে যুবতীতে এবং যুবতী হইতে প্রৌঢ়া সমাজে পর্যান্ত না উঠিয়া নিরস্ত হইবে না। তখন স্থাবর বিষবৎ ইহা সমাজশরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে জীর্ণ শীর্ণ মৃতপ্রায় করিবে; তখন পাশ্চাত্য সমাজের সহিত আর ইহার কোনই পার্থক্য থাকিবে না। না থাকিলে ক্ষতি কি? ক্ষতি যে কি, তাহা যিনি হিন্দু তিনিই বুঝেন, পাশ্চাত্য বিলাসিতার মোহে অন্ধ ব্যক্তিকে বুঝান যায় না। হিন্দু ইহার অপকারিতা বুঝে বলিয়াই আজিও সমাজে এ প্রথার প্রচলন হয় নাই, কখনও হইবে বলিয়াও মনে হয় না।

আর এক কথা, যে সমাজে কুমারীর বিবাহের জন্যই পাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, লোককে কন্যাদায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, সেই সমাজে বিধবাদিগের জন্য পাত্রের আবশ্যক হইলে কি একটা বিভ্রাট উপস্থিত হইবে না? জানি না, কুমারীদিগকে অবিবাহিত রাখিয়া বিধবাদিগকে বিবাহিত করা সমাজের পক্ষে কতটা শ্রেয়স্কর।

ফল কথা, বিধবা বিবাহ যে হিন্দুসমাজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহারা ক্রমশঃ হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে বলিয়া সমাজমধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন দ্বারা তাহার বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে আমরা ভ্রান্ত বলিয়াই মনে করি। কারণ, শাস্ত্রমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অশাস্ত্রীয় বিধবা বিবাহ দ্বারা যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা কখনও হিন্দুপদবাচ্য হইতে পারে না, এবং ঐ সকল অহিন্দু দ্বারা হিন্দুসমাজের কিছুমাত্র পরিপুষ্টি সংসাধিত হয় না। যে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারের পথে বিচরণ করে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির লালসায় যে সমাজের মস্তকে পদাঘাত করে, তাহার দ্বারা সমাজের পরিপোষণের আশা করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, বেশ্যাগণও এই কার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে। বিধবা বিবাহ দ্বারা দেশে অহিন্দুর সংখ্যাই বাড়িবে, হিন্দুর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে না।

আমরা এক্ষণে সংস্কারক মহোদয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি, এক ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ব্যতীত মানবজীবনে কি আর কোন উদ্দেশ্য নাই? পুরুষান্তরে অর্পণ করিয়া সমাজমধ্যে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত করা ভিন্ন বিধবাদিগের জন্য আর কোন সুব্যবস্থা করা যায় না কি? তুমি যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ভোগবিলাস-কেই জীবনের সারসুখ মনে করিতেছ, ভোগলালসা পরিতৃপ্তির জন্য বিধবাকে

ধর্মমার্গ হইতে বিচ্যুত করিতে উদ্যত হইয়াছ, সেই পাশ্চাত্য সমাজেও তো মিস্ কোরেলির ন্যায় প্রসিদ্ধা বহু রমণী আজীবন কুমারীভাবেই যাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন। ভোগবিলাসের লীলাক্ষেত্র পাশ্চাত্য সমাজে যে আদর্শ দেখা যায়, চিরসংযমী হিন্দুসমাজে কি সে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না? বিবাহ ব্যতীত বিধবাগণের কি অন্য কোন পথ নাই?

যদি বিধবাগণের দুঃখে সত্যই কেহ দুঃখিত হইয়া থাকেন, যদি তাহাদের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য কাহারও হৃদয়ে প্রকৃত সহানুভূতির সঞ্চার করে, যদি কেহ তাহাদের যথার্থ মঙ্গলকামী থাকেন, তবে এই শাস্ত্রবিগর্হিত সমাজবিপ্লবকর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহাদিগকে প্রকৃত পথ প্রদর্শন করাই তাঁহার উচিত। বিধবাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা, লোকহিত শিক্ষা, স্বদেশ সেবা শিক্ষা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাতে তাহাদের নিজের মঙ্গলের সঙ্গে দেশেরও প্রভূত মঙ্গল হইবে। তুচ্ছ ভোগবৃত্তি অপেক্ষা এ বৃত্তি কি শ্রেষ্ঠ নহে, বাঞ্ছনীয় নহে? শতবার বিবাহিতা করিলেও যে ব্যভিচারের নিবারণ হইবে না, বিধবাদিগকে এইরূপ কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর করাইতে পারিলে অতি সহজেই তাহা নিবারিত হইবে।

প্রতিহিংসা।

(১)

কুঞ্জবাবু বিজয়েন্দ্রের জ্ঞাতি খুল্লতাত। অল্প বয়সে বিজয়ের পিতা পরলোক গমন করেন, কুঞ্জবাবুর স্নেহেই বিজয় পিতৃহীনের কষ্ট বেশী ভোগ করেন নাই। বিজয়ের বিবাহের সময়, কুঞ্জবাবু পাত্রী নির্ব্বাচিত করিয়া পরমাসুন্দরী লক্ষ্মীরূপিণী বধূ গৃহে আনেন, এবং তিনিই সর্ব্ব প্রথমে মণিমুক্তাখচিত সুবর্ণ বলয় বধূর হস্তে পরাইয়া দিয়া, দম্পতির দীর্ঘজীবন ও সুখসৌভাগ্যের কামনা করেন। কিন্তু অর্থই অনর্থের মূল; একখণ্ড সামান্য জমি লইয়া, খুল্লতাতের সহিত বিজয়েন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ হয়; ক্রমে উভয়ে পূর্ব্ব স্নেহ ভক্তি বিস্মৃত হইয়া, উভয়ের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়ান। সুবিধা পাইলেই পরস্পরে পরস্পরের অনিষ্ট করিতেন। পূর্ব্বে যে ইঁহাদের মধ্যে কখনও সম্প্রীতি ছিল, এখন উভয়কে দেখিয়া তাহা বোধ হইত না। এইরূপ বিবাদের সময়েই একটিমাত্র পুত্র রাখিয়া

বিজয়ের স্ত্রী পরলোক গমন করেন। বিজয়ের জননীও জীবিত ছিলেন না। বিজয় আর বিবাহ করিলেন না, স্বয়ং পুত্রটিকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, জীবনের অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে, মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইতেছে, অতএব গুরুদেবকে আনাইয়া মন্ত্রগ্রহণ করিয়া ভগবানের আরাধনা করি। পরদিন একজন ভৃত্য গুরুকে আনিতে গমন করিল।

(২)

বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে, রৌদ্রে মাটি পর্য্যন্ত তাতিয়া উঠিয়াছে, বিজয়ের বাটীর মহিলাবর্গ গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা রহিয়াছেন, এমন সময়ে গুরুদেব আসিয়া প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলেন। গুরুদেবের আকার দীর্ঘ, শরীর ঈষৎ স্থূল, সুন্দর গৌরবর্ণ সূর্য্যতাপে ঈষৎ রক্তিম দেখাইতেছে, প্রশস্ত ললাট, পরিধানে থান কাপড়। গুরুদেবের পশ্চাতে একজন ভৃত্য, তল্পী বহিয়া আসিতেছে। বিজয়েন্দ্র গুরুকে প্রণাম করিয়া, পদধূলি মাথায় লইলেন, গুরু আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয়েন্দ্র কহিলেন,—"শারীরিক ভাল, কিন্তু সংসারে নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট; কাকা, নানা রকমে জ্বালাতন করিতেছেন; আপনি এখন স্নানাহার করুন, পরে সমস্ত বলিব।"

সুন্দর আসনের উপর বসিয়া গুরুদেব আহার করিতেছেন, সম্মুখে রজত-পাত্রে অন্নব্যঞ্জন ও নানাবিধ মিষ্টান্ন রহিয়াছে, বিজয়েন্দ্র নিকটে বসিয়া কথা কহিতেছেন। গুরুদেব বলিলেন,—"মন্ত্রগ্রহণ করিতে চাহিতেছ, ইহা অবশ্য সাধু বাসনা, কিন্তু দেখ, ভগবানকে ভালবাসার সহিত, জগৎকেও ভালবাসা উচিত; জগতে প্রেমের অপেক্ষা ধন নাই। কোন দরিদ্রের পর্ণকুটির, অমূল্য রত্নরাজিতে ভরাইয়া দাও, তাহাতে সে যত না সুখী হইবে, তাহার ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করিয়া, স্বহস্তে তাহার নয়নাশ্রু মুছাইয়া দাও, সে তদপেক্ষা অধিক সুখী হইবে।"

বিজয়েন্দ্র কহিলেন,—"গুরুদেব! আমিও জগতের লোককে ভালবাসিতে চেষ্টা করি। নিজের মুখে বলিতে নাই, অনেক বিধবাকে মাসিক অর্থ সাহায্য করি, অনেক দরিদ্রের কন্যার বিবাহ দিয়া দিয়াছি, অনেকের ভগ্নকুটির সারাইয়া দিয়াছি, রোগে ঔষধ ও পথ্য দিয়াছি। কিন্তু তাহার আমি গৌরব করিতেছি না, কারণ ইহা প্রত্যেক লোকেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

গুরুদেব কহিলেন,—"হাঁ! তুমি যে অনেক সৎকার্য্য কর তাহা আমি জানি, কিন্তু তুমি তোমার খুল্লতাতের প্রতি মনে মনে সর্ব্বদা বিদ্বেষভাব পোষণ

কয়। ইহা ভাল নহে! আরও দেখ, তিনি তোমায় মানুষ করিয়াছেন। কিন্তু তুমি এইমাত্র তোমার খুল্লতাতের কত নিন্দা করিলে। আমি আসিয়া অবধি দেখিতেছি, তুমি প্রত্যেক্ কথাতেই তাঁহার কথা আনিতেছ।"

বিজয়েন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি জানেন না, তিনি আমায় কত জ্বালাতন করেন। আমার বিরুদ্ধে তিনি কত মন্ত্রণা করিতেছেন, আমার অনিষ্টের জন্য কত অর্থ ব্যয় করিতেছেন, যদি তাঁহার সাধ্য থাকিত, তবে বোধ হয় আমার জীবন বিনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।"—বলিতে বলিতে রাগে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল, বিশাল নয়নদ্বয় অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিলেন,—"তিনি আমায় অনেক কষ্ট দিয়াছেন, প্রতিহিংসায় আমার মন সতত জ্বলিতেছে। তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিব, এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে বিশেষরূপে অপমানিত করিব, তবে আমার নাম বিজয়েন্দ্র রায়।"

যথাসময়ে বিজয়েন্দ্র মন্ত্রগ্রহণ করিলেন এবং তাহার পরেও গুরুদেবকে কিছুদিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন। গুরু ভাবিলেন, শিষ্য ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, যদি কোনরূপে ইহার মন ফিরাইতে পারি; কিছুদিন থাকিয়া যাই। তিনি কুলগুরু, উভয়েরই মঙ্গল কামনা করেন; তিনি বিজয়েন্দ্রকে সতত হিতোপদেশ দান করিতে লাগিলেন।

(৩)

দ্বিতলের উপর, বিজয়েন্দ্র বাবুর বসিবার ঘরে আলো জ্বলিতেছে; দেওয়ালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছবি রহিয়াছে। একখানি ছবিতে শকুন্তলা জননীর কটিদেশ, বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, মাতাও কন্যাকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। একখানিতে দময়ন্তী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, নিকটে হংস রহিয়াছে। আর একখানিতে রাধিকা যমুনায় জল লইতে আসিয়াছেন, যমুনার নীল জলরাশিতে স্বীয় কলস অর্দ্ধেক ডুবাইয়াছেন, শরীর ঈষৎ অবনত হওয়ায়, মস্তকের কৃষ্ণকুঞ্চিত একগুচ্ছ কেশ বুকের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে; পশ্চাতে বনপথ, হরিৎ বনপথে সখীদ্বয় দাঁড়াইয়া। আর একখানিতে একটী নারী, প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়া মাল্য রচনায় নিযুক্তা, সম্মুখে স্তূপাকারে কুসুম রহিয়াছে। রমণীর পরিধানে নীল রেশমী বসন, তাহাতে চুমকীর কাজ, তাহার উপর আলোক পতিত হওয়ায় ঝিক ঝিক করিতেছে, কুন্তল এলাইয়া ভূমতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। আরও দুইখানি অতি দীর্ঘ দর্পণ রহিয়াছে। মর্ম্মরপ্রস্তরমণ্ডিত কাষ্ঠাধারের উপর, বড় বড় সুন্দর পুতুল সাজান রহিয়াছে। পরিষ্কার সাদা বিছানা, তদুপরি বিজয়েন্দ্র বাবু বসিয়া

রহিয়াছেন। নীচে দুইজন লোক বসিয়া আছে। তাহাদের বেশভূষা সামান্য, দেখিলে ছোট লোক বলিয়া বোধ হয়। বিজয় বাবু বলিলেন, "রতন! তা' হ'লে তুমি বলিবে, কুঞ্জবাবুকে আমি আম বেচিয়াছিলাম, দাম চাহিতেই বাবু আমাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করেন।"

রতন বলিল, "যে আজ্ঞা, আমাকে যাহা বলিতে বলিলেন, আমি তাহাই বলিব।"

বিজয় বাবু অন্যকে কহিলেন, "তুমি সাক্ষ্য দিবে, বাবু আমার সম্মুখেই রতনকে প্রহার করেন।" সে কহিল, "যে আজ্ঞা।" বাবু পুনরায় কহিলেন, "তোমরা কত টাকা চাও, বল?" উভয়ে সমস্বরে কহিল, "আমরা কি বলিব, যাহা দয়া করিয়া দিবেন। আমরা আপনাদের খাইয়াই মানুষ।"

বিজয় বাবু কহিলেন, "প্রত্যেককে দুই শত করিয়া দিব।" উভয়ের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, উভয়ে সম্মতি প্রকাশ করিয়া অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিল।

বিজয়েন্দ্র আসিয়া জানালার নিকট দাঁড়াইলেন, বাহিরে অন্ধকার, আকাশে চাঁদ নাই, তারকারাজি জ্বলিতেছে, অন্ধকারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল যেন দৈত্যের ন্যায় দেখাইতেছে, তাহাতে জোনাকীপুঞ্জের দীপ্তি; সম্মুখে কুঞ্জবাবুর প্রকাণ্ড অট্টালিকা, অন্ধকারে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কুঞ্জবাবুর বৈঠকখানা হইতে আলোকের মৃদুরশ্মি আসিয়া বিজয়েন্দ্র বাবুর খড়খড়িতে পড়িয়াছে। গৃহে ঘড়ির টিক টিক শব্দ শুনা যাইতেছে, বাহিরে ঝিল্লীরব। গুরুদেব গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "বিজয়েন্দ্র! আমি সমস্তই শুনিয়াছি, এ সকল কি ভাল? তুমি ঐ নীচ লোকের দ্বারা নালিস করাইয়া, খুল্লতাতকে অপমান করাইতে চাও? পরমেশ্বর তোমায় নানা সদ্‌গুণ দান করিয়াছেন, কিন্তু এই একটী বিষয়ে, কেন যে এরূপ নীচতা প্রকাশ কর, বুঝিতে পারি না।"

বিজয়েন্দ্র কহিলেন, "গুরুদেব! যে দিন মোকদ্দমায় হারিয়াছি, সেই দিন হইতে হৃদয়ে বিষের জ্বালা জ্বলিতেছে। আপনি জানেন না, জগতে প্রতিহিংসা কি ভয়ানক জিনিস! প্রতিহিংসায় বুদ্ধি যায়, বিবেচনা যায়, ইহা সরলকে কুটিল করে, মহৎকে নীচ করে। এ সময়ে অপরের উপদেশবাণী অন্তর স্পর্শ করে না।"

গুরুদেব কহিলেন, "দেখ, শত্রুকে শত্রুতা দ্বারা বিনাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু মিত্রতা দ্বারা তাহাকে জয় করা যায়। প্রেমের দ্বারা অতি পাষণ্ডকেও ভালবাসাইতে পারা যায়।" বিজয়েন্দ্র নীরব রহিলেন।

(৪)

প্রাতঃকাল; মৃদু মৃদু সমীরণ বহিতেছে। বিজয়েন্দ্র বাটীর সম্মুখে রাস্তার উপরে পদচারণা করিতেছেন, ভৃত্যবর্গ কার্য্যবশতঃ ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে। কুঞ্জবাবু স্বীয় বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোন ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতেছিলেন। অন্তঃপুর হইতে বিজয়েন্দ্রের সপ্তমবর্ষীয় পুত্র মুকুল আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "বাবা! নিম্মলা আমাকে মারিয়াছে; আবার ধূলায় ফেলিয়া দিয়াছে।" বিজয়েন্দ্র রুমাল বাহির করিয়া তাহার সুন্দর সুকুমার দেহের ধূলা ঝাড়িয়া দিলেন, এবং সাদরে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। গুরুদেব কুঞ্জবাবুর নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, "এই এক স্বর্গীয় দৃশ্য! পিতাপুত্রে কি মধুর স্নেহের সম্বন্ধ!" কুঞ্জবাবু কহিলেন, "কিন্তু গুরুদেব! পুত্র আবার বড় হইলে, এই স্নেহ ভুলিয়া যায়, সেই বড় আক্ষেপ?" কুঞ্জবাবু মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন।

কথাটা বিজয়েন্দ্রের হৃদয় স্পর্শ করিল। অনেক দিনের পর তিনি একবার পিতৃব্যের মুখ পানে চাহিলেন। শিশুকালে যাঁহার মুখ দেখিলে প্রাণে সুখ ও আনন্দ উথলিয়া উঠিত, রোষের বশ হইয়া, আজ কতদিন বিজয়েন্দ্র তাঁহার মুখ চাহিয়া দেখেন নাই। আজ বহুদিন পরে, বৃদ্ধের জরাজীর্ণ পলিত বিষণ্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া, বিজয়েন্দ্রের যেন সংজ্ঞা হইল। সত্যই ত! মুকুলের মত তাঁহার পিতৃব্যও তাঁহার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতেন; শিশির লাগিবে বলিয়া, সন্ধ্যার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে, পিতৃব্য স্বহস্তে গরম কাপড়ে গা ঢাকিয়া দিয়াছেন; স্নানের সময় ভৃত্যগণ ডাকাডাকি করিলেও, বিজয় যাইতেন না, পিতৃব্যের সহিত স্নান করিতেন, আহার করিতে বসিয়া, তিনি স্বয়ং বিজয়ের মাছের কাঁটা ছাড়াইয়া দিয়াছেন। কিশোর বয়সে, পাড়ার দুষ্টছেলেদের সহিত, বিজয় সাঁতার শিখিতে জলে নামিয়া জলমগ্ন হইয়াছিলেন, একজন ভৃত্য তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় জল হইতে তুলিয়াছিল। চেতন হইলে তিনি কি দেখিয়াছিলেন? পিতৃব্য তাঁহার মৃতপ্রায় দেহ ক্রোড়ে লইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতেছেন। আর একদিন তিনি স্কুল হইতে পলাইয়াছিলেন, সমস্ত মধ্যাহ্ন, বোসেদের আম বাগানে দুষ্ট ছেলেদের সহিত আম, জাম, পেয়ারা খাইয়া পাখীর ছানা পাড়িয়া, ঠিক সময়ে বাড়ী আসেন। সমস্ত কথা জননীর কর্ণগোচর হওয়ায়, তিনি পুত্রকে শাস্তি দিতে ব্যস্ত হয়েন, তখন পুল্লতাত তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া নিবারণ করিলেন, এবং বিজয়কে নানা সদুপদেশ দিলেন। একদিন তিনি যাহাকে অপরের

অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতেন, সে আজ বড় হইয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতেছে। বিজয়ের মন কেমন খারাপ হইয়া গেল, ধীরে ধীরে অন্য মনে স্বীয় শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন।

(৫)

উপরোক্ত ঘটনার পরদিন কুঞ্জবাবুর কন্যার বিবাহ; বাটীতে শত শত লোক যাতায়াত করিতেছে, ছোট ছোট বালক বালিকারা সুন্দর বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া দাসদাসীসহ বেড়াইতেছে, লোকের কলরব, বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। উজ্জ্বল আলোকমালায় ভবন হাসিতেছে, প্রত্যেক গবাক্ষ দিয়া আলোক-রশ্মি বাহির হইতেছে। বিজয়েন্দ্র নিজ গৃহের জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, বাদ্য বাজাইয়া, আলোক জ্বালাইয়া, বহু লোকসহ বর আসিল, বর বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিজয় দেখিলেন, সকল লোকই যেন বিমর্ষ, কাহারও মুখে হাস্য নাই; বাজনা থামিয়া গিয়াছে, গোলমাল অনেক পরিমাণে নিস্তব্ধ। তিনি ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না, নীচে নামিয়া বাহিরে আসিলেন। সম্মুখে একজন লোককে দেখিয়া, কি হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কহিল,—"মহাশয়! বরের পিতা কন্যাকে পছন্দ করিয়া, সম্বন্ধ ঠিক করিয়াছিলেন, এখন সম্প্রদানের সময় কন্যা দেখিয়া বর বলিতেছে, এ মেয়ে কাল, আমি বিবাহ করিব না। কুঞ্জবাবু মহাবিপদে পড়িয়াছেন, বর কিছুতেই বিবাহ করিবে না। অন্য কাহারও সহিত বিবাহ দিতে কুঞ্জবাবুর ইচ্ছা নাই, এমন সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান কি সহজে মিলে? আরও দেখুন, ইহার সহিত অর্দ্ধেক বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

বিজয়েন্দ্র ক্ষণেক নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে কুঞ্জবাবুর বাটীর দিকে চলিলেন। দ্বারের উপর পদার্পণ করিয়া একবার চারিদিকে চাহিলেন। এ বাটীতে কতদিন আসেন নাই; গবাক্ষ, দ্বার, পূর্ব্বেকার সেই বড় আলোটী, সেই পুরাতন ছবিখানি, সমস্তই নয়নে পড়িল। প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ী বাঁধা হিন্দুস্থানী দ্বারবান, কোন ছিন্নবসনা ভিখারিণীর সহিত বিবাদ করিতেছিল, বিজয়েন্দ্রকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

বিজয় সভার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিয়া, ফুলের মালা গলায় দিয়া বর বসিয়া আছে। অঙ্গুলীর হীরার আংটিতে আলো পড়িয়া ঝক ঝক করিতেছে। সম্মুখের আসনে রক্তবস্ত্রপরিহিতা কন্যা বসিয়া আছে, অঙ্গের মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণ অলঙ্কারের দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে। বিজয়কে দেখিয়াই

কুঞ্জবাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, "বাবা বিজয়! আজ বড় বিপদেই পড়িয়াছি,—" কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

বিজয় বলিলেন,—"আপনি অধৈর্য্য হইবেন না, সমস্ত ঠিক করিয়া দিতেছি।" তিনি বরকে গিয়া নানারূপে বুঝাইলেন,—"তুমি সদ্বংশে জন্মিয়াছ, তোমার এরূপ করা শোভা পায় না, ভদ্রলোককে এরূপ সময়ে বিপন্ন করিও না। কন্যা বড় হইলে বেশ হইবে।" ইত্যাদি।

বর সোণার চসমার মধ্য হইতে বিজয়ের মুখপ্রতি চাহিয়া বলিল,—"আমায় ক্ষমা করুন, আমার দ্বারা এ কাজ হইবে না।" একজন কন্যাযাত্র অল্পবয়স্ক যুবা বরকে অনেক অনুরোধ করিতে লাগিল, বর আস্তে আস্তে কহিল,—"আপনি অল্পবয়স্ক, সমস্ত বুঝিতে পারেন। আমি কি নিজের হৃদয় বলিদান দিয়া বিবাহ করিব।" বরের পিতা কহিলেন,—"আমার হাত নাই, এখনকার ছেলে কথার বাধ্য নহে।" সকলে অনেক অনুরোধ করিতে লাগিলেন; বর আর কথা কহিল না, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজয়েন্দ্র ব্যস্তভাবে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা কি করিলে তুমি বিবাহ করিবে বল?"

সবুজ সার্টগায়ে, বুকে রেসমী চাদর বাঁধা, ফুলের মালা পরা বরের ভাই, রহস্য করিয়া বলিলেন,—"আপনার সমস্ত বিষয় যদি বরের নামে লিখিয়া দেন, তবে বিবাহ করিবে।"

বিজয়েন্দ্র বরের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"কেমন হে, এই কথা কি সত্য?"

বর ভ্রাতার প্রতি চাহিয়া সহাস্যে সম্মতিসূচক মস্তক নাড়িল। বিজয়েন্দ্র তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ ব্যক্তির দ্বারা কালি, কলম, কাগজ আনাইয়া, আপনার বাড়ী, জমিদারী, কোম্পানীর কাগজ সমস্ত বরের নামে লিখিয়া দিয়া কহিলেন,— "এই লও, পরে দস্তুরমত রেজিষ্টারি করিয়া দিব।"

সমস্ত লোক বিস্ময়ে স্তব্ধ, বর পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া নীরব! গুরুদেব এক-ছড়া ফুলের মালা লইয়া, বিজয়ের গলায় দিয়া কহিলেন,—"বিজয়! কুঞ্জবাবুর সহিত বিবাদে তুমিই জিতিলে; তোমার প্রতিহিংসা গ্রহণই সার্থক! সুতরাং তুমিই বিজয়মাল্য গ্রহণ কর।"

শ্রীমতী হেমনলিনী মিত্র।

একটী লাভজনক

যৌথ ব্যবসায়ের প্রস্তাব

আজ একটা প্রস্তাব তুলিতেছি—ব্যবসা বাণিজ্যের হিসাবে প্রস্তাবটীর মূল্য ও সার্থকতা আছে। আশা করি স্বদেশীর দিনে সকলেরই এ দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি পড়িবে।

প্রস্তাবটীর সার মর্ম্ম এই—যৌথ মূলধনে চা-বাগান-বহুল জলপাইগুড়িতে একটী চা-বাগান প্রতিষ্ঠার কল্পনা। সকল সময়ে জমা পাওয়া যায় না। ইহাই সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম অসুবিধা। কিন্তু এ বৎসর বেশ সুযোগ ঘটিয়াছে। সরকার বাহাদুর শুধু চা চাষের জন্য ভুটান সরকার হইতে বহু পরিমাণে জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইতেছেন—সরকার বাহাদুর এই জমি আবার বিলিতে বন্দোবস্ত করিবেন। বর্ত্তমানে এই জমি বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বিলম্বে নিরাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। অন্য উপায়ও আছে।

চাষে লাভ ক্ষতি—গত বৎসর চা-তে নিম্নলিখিত ডিভিডেণ্ট (লাভের অংশ) দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা ডিভিডেণ্ট দিয়াছেন—তাঁহাদের স্বদেশী যৌথ কারবার।

গুরঝাঙ ঝোরা	টি	এষ্টেট	১২৫৲ টাকা।
চামুরচি	„	„	১০০৲ „
মোগলকাটা	„	„	৬০৲ „
আঞ্জুমান টি কোং লিমিটেড			৩২৲ „
নিদান ঝোরা টি গার্ডেন			২০৲ „
টোটা পাড়া টি এষ্টেট			৫০৲ „

সুতরাং এক কথায় বলা যায়, colliery business (কয়লার কারবার) এর পরেই এদেশে ইহাই লাভজনক ব্যবসায়।

মূলধন—দুই লক্ষ টাকা মূলধন এই ব্যবসায়ের পক্ষে যথেষ্ট। এক লক্ষ টাকা মূলধনে ৪০০ একর জমিতে চা-চাষ চলে। দুই লক্ষ টাকা মূলধনে ৬০০

একর জমিতে চা'র চাষ ও ব্যবসায় করা চলিতে পারে। জমির খাজানা—প্রথম দুই বৎসরে খাজানা রেহাই দেওয়া হয় ইহাই সাধারণ বিধি। পরে একর প্রতি বাৎসরিক খাজানা ৵০ আনা মাত্র। চতুর্থ বৎসরে।৵০ হইতে ॥০ আনা, পঞ্চম বৎসরে ॥৵০ আনা মাত্র শেষে জমি জরিপ হইবার পর আবাদি জমিতে একর প্রতি বাৎসরিক খাজনা ৵০ দিতে হয়। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

ব্যয়—প্রথম তিন বৎসরেই খরচের মাত্রা বেশী—চতুর্থ বৎসর হইতেই বাগানের আয় হইতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে, পঞ্চম বৎসর হইতেই চা'র বাগানে লাভ দাঁড়ায়।

মূলধনের পরিমাণ একলক্ষ টাকা হইলে ১ম ও ২য় বৎসরে সাধারণতঃ ৪০০০০ টাকা হিসাবে বাৎসরিক খরচ পড়ে। তৃতীয় বৎসরে বক্রী টাকা খরচ করিতে হয়। কর্ম্মচারীর বেতনে মাসিক ৫০০৲ টাকা খরচ পড়ে। ৪র্থ বৎসর যন্ত্রাদি ক্রয় করিতে হয়। কিন্তু তৃতীয় বৎসরে যে চা উৎপন্ন হয় সেই চার মূল্য এবং অল্প টাকা ঋণ হইলেই সেই বৎসরের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। সুতরাং ৪র্থ বৎসরে ব্যয়ের বরাদ্দ বেশী হইলেও আয়ের একটি পথ আছে—তাই আয়ে ব্যয়ে প্রায় সমান থাকে। ৫ম বৎসরে ঋণ শোধ ও ডিভিডেণ্ট দেওয়া হয়। যন্ত্রাদি ক্রয় করিতে প্রায় ২৫০০০ টাকার প্রয়োজন হয়।

নূতন চা বাগান—এ বৎসর জলপাইগুড়ির উকীল সম্প্রদায় দুইটী চা বাগান স্থাপনের কল্পনায় জমি বন্দোবস্ত করিয়াছেন। নদীয়া টি কোম্পানী লিমিটেড আমবাড়ীতে একটী চা বাগান তৈয়ার করাইতেছেন। মোটেমাটে এ বৎসর ৭।৮টী নূতন চা-বাগান জলপাইগুড়িতে স্থাপিত হইবে এরূপ ভরসা পাইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে কোনও লিমিটেড কোম্পানীর অংশ, একটু বিলম্ব হওয়ার চেষ্টা করিয়া পরে কিনিতে পারি নাই। এরূপ অংশ ক্রয়ে আগ্রহ দেখিলেও নূতন নূতন চা বাগান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উঠিতে পারে।

চাষের সময়—অক্টোবরেই চার কাজ প্রকৃত পক্ষে আরম্ভ হয়—কিন্তু প্রথম চা বাগান করিতে হইলে এপ্রিল ও মে দুইমাসে সেই জমি ঠিক করিয়া লইতে হয়। অংশের মূল্য—জলপাইগুড়ির স্বদেশী (চায়) লিমিটেড কোম্পানীতে অংশের মূল্য (তিন কিস্তীতে দেয়) সাধারণতঃ ৫০৲ টাকা হিসাবে ধার্য্য করা হইয়াছে, সুতরাং এই হিসাবে অংশের মূল্য ধার্য্য হইলে অংশ ক্রয়ে কাহারও অসুবিধা বা কষ্ট হইবে না এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে।

সুযোগ—চাবাগানে ২৬ বৎসর সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়াছেন, এরূপ

একজন বিশেষ অভিজ্ঞের সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। তিনি ১৮ বৎসর চা-বাগানে ম্যানেজার ছিলেন—নিজেও আঞ্জুমান ও গুরুঝাড় যোরা টি এষ্টেট স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা—সুতরাং তাঁহার সাহায্য লাভ এই কল্পিত লিমিটেড কোম্পানীর ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে যে সহায়ক হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

জলপাইগুড়িতে ইতিমধ্যে প্রায় ১৩টী স্বদেশী লিমিটেড কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে—তাহারা সকলেই সফলপ্রয়াস ও লাভবান হইয়াছে। ইহাও অবশ্য ভরসার কথা। স্বদেশীর দিনে এই প্রস্তাবে সকলেরই একটু চিন্তা করা কর্ত্তব্য। মতামত ও চিঠিপত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিবেন।

শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ।

রমালয়, ৩৪ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সমালোচনা

আরতি।—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩১৪ সাল।

অগ্রহায়ণের আরতির প্রথমেই শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের চিত্র ও 'শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল' কবিতা সুন্দর ও সময়োপযোগী হইয়াছে। 'রামসদয় কর্ম্মকার' সত্য ঘটনামূলক অত্যাশ্চর্য্য ভৌতিক কাণ্ডবিষয়ক একটী গল্প। লেখক শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। গল্পটী সত্য হইলে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাই বটে। বিশেষতঃ গল্পের মধ্যে সহোদরা স্থলে 'সহোদরী' প্রয়োগ আমাদিগকে আরও আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছে। 'সহোদরী' কি মন্দোদরীর সহিত কোনরূপ সম্পর্কান্বিতা? মহা-ভারতী মহাশয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, বাঙ্গালা, ইংরাজি প্রভৃতি বহুবিধ কাগজেই লিখিয়া থাকেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ব্যাকরণের মস্তক ভক্ষণ করিতে দেখিয়া বড়ই দুঃখ হয়। সহোদর শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ করিলে তাহার উত্তর আপ্ হইয়া সহোদরা হয়, ঈপ্ হইয়া সহোদরী হইতে পারে না, ব্যাকরণের এই সামান্য নিয়মটুকুও যে মহাভারতী মহাশয়ের নিকট অজ্ঞাত

ইহা আমরা জানিতাম না। 'বিধবা বিবাহ' শ্রীপ্রমোদকান্ত বসু। বিধবা বিবাহ যে হিন্দুসমাজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, লেখক বিবিধ সারগর্ভ যুক্তি দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরিশেষে লেখক সত্যই বলিয়াছেন, "হিন্দুবিধবা মানবী-বেশে দেবী। হিন্দুবিধবা না থাকিলে বুঝি হিন্দু পরিবারের পূর্ণতা লাভ হয় না।" 'সাংসার চিন্তা' শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ। মন্দ হয় নাই। 'বিক্রমপুরের ইতিবৃত্ত' শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ক্রমপ্রকাশ্য প্রবন্ধ। এবারে অনেক নূতন কথা আছে। 'ফটিক জল' (কবিতা) শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। কবিতাটী মন্দ হয় নাই। তবে "বারিদে যাচে বারি দীন ফটিকজল" এই চরণটীর অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আমরা জানিতাম, চাতকই মেঘের নিকট ফটিকজল প্রার্থনা করে; কিন্তু 'ফটিকজল'ও যে আবার বারিদের নিকট বারি প্রার্থনা করে, এ তত্ত্ব এই নূতন শুনিলাম। 'উদ্‌ভ্রান্ত' (কবিতা) শ্রীএককড়ি দে। ইহা উদ্‌ভ্রান্ত লেখকের অসংলগ্ন প্রলাপ মাত্র।

"একটী পরাণ সয়, তোমরা সকলে,
কেন ডাকাডাকি এত, একেত পাগল—
কি করিব—কোথা যাব—কোথা গেলে পর—
এ চাঞ্চল্য, এ অনল—থাম চুপ কর—
নিভে যাবে?—নিভে যাবে?—নিভে কাজ নাই"

ইহা কবিতা না উন্মত্তের প্রলাপ? 'ধূমকেতু' শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার। প্রবন্ধটী ভাল। 'সিন্দুরবিন্দুবিধবা-ললাটে' শ্রী—। প্রবন্ধটী ক্রমশঃ চলিতেছে। বিধবা বিবাহের অনুকূলে যে সমস্ত শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই খণ্ডন করিয়া লেখক মহাশয় দেখাইতেছেন যে, বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় এবং অযৌক্তিক। বিধবা বিবাহ যে অশাস্ত্রীয় তাহা হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করেন, তথাপি যে কতকগুলি পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি অযথা ব্যাখ্যা দ্বারা বিধবার পত্যন্তর গ্রহণকে শাস্ত্রীয় মত বলিয়া সাধারণের দৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছেন, তাহার খণ্ডনকল্পে লেখনী ধারণ করিয়া লেখক একটী প্রয়োজনীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। 'প্রসাদ সঙ্গীত প্রসঙ্গ' শ্রীহরিকিশোর ভট্টাচার্য্য। ভক্তের নিকট ইহা অতি সুমধুর।

৩য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩১৪।

অভিযান।

——×:*:×——

শুভ লগ্নে সাঙ্গ করি সর্ব্ব আয়োজন,
লক্ষ চমূ দাঁড়াইয়া স্থির অচঞ্চল ;—,
শান্ত যেন সমুদ্রের ভীষণ নর্ত্তন
ঝটিকার পূর্ব্বাভাস সূচিয়া কেবল!

হে রাজেন্দ্র, বীরশ্রেষ্ঠ, সন্ন্যাসিপ্রবর,
প্রতীক্ষা করিছে সবে ইঙ্গিত তোমার ;
পূর্ণ করি মুহূর্ত্তেকে বিশ্ব-চরাচর
নিনাদ মঙ্গল-শঙ্খ তবে এইবার!

ছুটুক তড়িৎ বক্ষে, নাচুক্ ধমনি,
ক্ষণে ক্ষণে বহ্নিকণা ভাতি জ্যোতির্ম্ময়—
তুলিয়া তাণ্ডব রোল বিকট অশনি
ঘুষুক দিগন্তে তব অনন্ত বিজয়!

প্রাণ দিয়ে, প্রাণ নিয়ে, পেতে হবে প্রাণ,
সার্থক হইবে তবে মহা অভিযান!!

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত।

———

আধুনিক বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজ।

—×•×—

শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজের কি অবস্থা ছিল এবং এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে সুসংস্কারপূর্ণ হইয়া কিরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে তাহারই আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমাদের বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা যে সুরুচিসম্পন্ন ও মার্জ্জিত-হৃদয় হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

পূর্ব্বতন সময়ে বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজ নিরক্ষর এবং জড়ভাবাপন্ন ছিল; তাহাদের ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা ছিল না। সে কালের বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজ পুরুষের ক্রীড়নক ছিল। তাহারা জানিত কর্ত্তব্যই জীবনের সার ব্রত, তাহারা জানিত পিতামাতার সেবাই অক্ষয় স্বর্গ, তাহারা জানিত গুরুশুশ্রূষাই জীবনের মুখ্য কর্ত্তব্য, তাহারা জানিত স্ত্রীজীবনের সংযমশীলতা লজ্জাশীলতা বড় আদরের জিনিস, তাহারা জানিত স্বামীই স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব।

পূর্ব্বতন বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজ গুরুজনের সেবা, অতিথি সেবা, দাসদাসী প্রতিপালন এবং স্বজনের প্রতি মমতাসম্পন্ন ছিল; দেবভক্তি দেবার্চ্চনা ব্রত উপবাস এবং সংযম পরায়ণ ছিল। সে কালের স্ত্রীসমাজে স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন প্রথা ছিল না। স্ত্রী চিকিৎসক, স্ত্রী অধ্যাপক, স্ত্রী শিক্ষক ছিল না। তখনকার সময়ে স্ত্রীসমাজ এত বিলাসের ভাণ্ডারও ছিল না। এত স্বার্থপরতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরূঢ় হয় নাই। তখন স্ত্রীসমাজে দয়া ভক্তি প্রীতি মমতা ও স্নেহের আবাস ছিল। এখন নব্য স্ত্রীসমাজ স্বাধীনচেতা হইয়াছেন। তাঁহাদের চিত্ত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। এখন বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজ আর মূর্খা নাই, অজ্ঞান-জালে জড়িতা নাই। এখন তাঁহারা বিদুষী, এখন তাঁহারা রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতির সকল তথ্যই রাখেন। বহু-পরিবার আর বড় দেখা যায় না। এখন স্ত্রীসমাজ জ্ঞানবতী, তাই নিঃস্বার্থ ভাব ভুলিয়া স্বার্থপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন। পরার্থপরতার আর আদর নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষায় দেবভাব পাইয়া তাঁহারা কর্ত্তব্য জ্ঞান এতদূর পাইয়াছেন যে, গুরুজনের উপর সেবা ভক্তি বিতাড়িত হইয়াছে। স্ত্রীসমাজের আর সে লজ্জাশীলতা নাই, আত্মসংযম নাই, দীনের প্রতি দয়া নাই, অতিথির প্রতি অভ্যর্থনা নাই, দাসদাসীর প্রতি স্নেহ নাই, আত্মীয় স্বজনের উপর মমতাও নাই। প্রতিবেশিনীদিগের দুঃখে সুখে আর সে সহানুভূতি নাই।

নব্য বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজ বয়স্থ ব্যক্তিদিগের আর সম্মান করেন না, গুরুজনদিগের নিকট মস্তক অবনত করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিতা হন। শারীরিক সৌন্দর্য্যসাধনেই তাঁহারা একান্ত যত্নবতী। নব্য স্ত্রীসমাজ বিলাসের ভাণ্ডার; তাই এখন স্বামীর সেবা স্ত্রী করে না, স্বামীই স্ত্রীর সেবায়েত। স্বামী-সেবার কথা শুনিলে অনেকেই হাস্য করেন। স্বামী গুরুজন একথা তাঁহারা অনেকদিন ভুলিয়াছেন। এখন সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ-সুখান্বেষণে ব্যস্ত, সকলেই আত্মসুখপরায়ণা। তাঁহাদের মধ্যে সে বিশ্বজনীন ভালবাসা—সে বিশ্বজনীন প্রেমভক্তি আর নাই। এখন আর কেহ কাহারও সুখে দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে না, কেহ কাহারও বিপদে সম্পদে সাহায্য করে না, কেহ কাহারও ন্যায় অন্যায়ের প্রতিবাদও করে না। সকলেই স্ব স্ব সুখ সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য লইয়াই ব্যস্ত। নিজের স্বামী পুত্র ছাড়া সংসারে যে আর কেহ আপনার থাকিতে পারে, সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, তদ্ব্যতীত কেহ স্বজনের মধ্যে গণনীয়ই নহেন। বঙ্গগৃহের একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে আর সে প্রীতি সদ্ভাব নাই, সে কুটুম্বভরণও নাই; দয়া দাক্ষিণ্য প্রীতি ভক্তি মমতা বাৎসল্য সহিষ্ণুতা স্ত্রীসমাজ হইতে বিদূরিত হইয়াছে; শিক্ষার গুণে তাঁহারা উন্নতহৃদয়া উদারচিত্তা হইয়াছেন; কাজেই স্বজন কুটুম্বপোষণে আর আস্থা নাই। পারিবারিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া নিজের স্বার্থ সুখে জলাঞ্জলি দিতে বা পরের জন্য খাটিতে আর কাহারও ইচ্ছা নাই।

বর্ত্তমান স্ত্রীসমাজ শিক্ষিতা হইয়া নাটক নভেলের আলোচনা করিয়াই আপনাকে ধন্য মনে করেন। বর্ত্তমান স্ত্রীসমাজ বিলাসিতা গৃহসজ্জা অঙ্গরাগ এই তিনটিকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করেন। সংসারে যে তাঁহাদের অসীম কর্ত্তব্যভার রহিয়াছে, তাহা ভ্রমেও মনে করেন না। হৃদয়ের যে সকল সদ্বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন হইলে মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, সে সকল বিষয়ে স্ত্রী-সমাজের আদৌ দৃষ্টি নাই। তাই বলি শত বৎসর পূর্ব্বের নিরক্ষর বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজ ইহা হইতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। পূর্ব্বতন সময়ের গৃহলক্ষ্মীগণ ধৈর্য্যে সহে অতুলনা ছিলেন, আত্মসংযমে যত্নবতী ছিলেন। একান্নভুক্ত গৃহের গৃহিণীরা শাকান্ন খাইয়া হাসিমুখে আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব পোষণ করিতেন, সকলের সুখদুঃখে সহানুভূতি দেখাইতেন। এখন আর সে দিন নাই, সে পূর্ব্বতন স্ত্রীসমাজের ন্যায় পরদুঃখ-কাতরতাও নাই। এখন শিক্ষিতহৃদয়া উচ্চমনা গৃহিণীরা আপনার লইয়াই ব্যস্ত। জানি না, ইহাকে উন্নতি বা অবনতি বলে।

শ্রীমতী ইন্দুমালা দেবী।

প্রতিশোধ।

——+•×——

(১)

ছোট বউ, বড় বউকে বলিল,—"হাঁ দিদি, তোমার বাপের বাড়ী থেকে নাকি তত্ব এসেছে?"

বড়বউ বলিল,—"আস্‌বে না ত কি? তাই ব'লে কি সকলের বাপের বাড়ী থেকে আস্‌বে?"

এ আক্রমণটা ছোট বউয়ের উপর। তা'র বাপ বড় গরীব, কোন রকমে সংসার চালায়। সে বড় একটা তত্ব করিয়া উঠিতে পারে না। বড় বউয়ের বাপ ধনী, নিয়তই তত্ব পাঠায়। সুতরাং বড়বউ গর্ব্বস্ফীতা—ছোটবউ কুণ্ঠিতা, সঙ্কুচিতা।

প্রত্যুত্তরে ছোটবউ বলিল,—"আমার বাপ গরীব, তত্ব দিতে কোথায় পাবেন? তোমার বাপের মত অবস্থা হ'লে তিনিও কত তত্ব করতেন।"

বড়বউ বলিল,—"কত পুণ্যি করলে তবে আমার বাপের মত অবস্থা হয়। তাই ব'লে কি যে-সে লোকের হ'বে?"

ছোটবউ মনে একটু কষ্ট পাইল। কথা কহিল না, চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি কি জিনিস এসেছে, দিদি?"

বড়বউ গর্ব্বভরে বলিল,—"দেখবি? আয়।"

ছোটবউ, বড়বউয়ের অনুসরণ করিল।

(২)

ছোট সংসার, কেবল দুটি ভাই। বাপ মা নাই। দুই জনের দুটি স্ত্রী আছে। তা' ছাড়া সংসারে আর কেহ নাই। বাপ মায়ের জীবদ্দশায় উভয়ের উদ্বহন কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। বড়বউ রূপে বামনী, তবে ধনীর কন্যা; তাই একটু ঝাঁজ বেশী। দেখিয়া শুনিয়া বাপমা, গরীবের মেয়ে আনিয়া কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠের নাম রামলাল, কনিষ্ঠের নাম বিনোদলাল। নিবাস কল্যাণপুরে। পিতা বড় একটা কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ভদ্রাসনটুকু ও কিছু

জমিজায়গা ছাড়া আর কিছু ছিল না। তা' হ'তে মোটা ভাত কাপড়ে বেশ এক রকম চলিয়া যায়।

বিনোদের বয়স যখন ষোল বৎসর তখন তা'র বিবাহ হয়। আঠার বৎসর বয়সে সে বাপ মা হারাইয়া বড় ভাইকে আশ্রয় করে। এখন তা'র বয়স কুড়ি বৎসর। রামলাল তা'র চেয়ে ছয় বছরের বড়। বড় বলিয়াই বিষয়াদি যা' কিছু আছে তা'র তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করিয়াছে। বিনোদ, তাস খেলিয়া, গান গাহিয়া, হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। সে বিষয় কর্ম্ম বুঝে না—সংসারের ধারও ধারে না।

লেখাপড়া বড় একটা কাহারও হয় নাই। কয়েক বৎসর বিদ্যালয়ে বৃথা ঘুরিয়া অবশেষে উভয়ে বিদ্যালয়ে গমনাগমন পরিত্যাগ করিয়াছিল। শুনিতে পাই, তা'দের কোন দোষ ছিল না—দোষটা পণ্ডিতের; তা'র লাঠিলিটের দৌরাত্ম্যে কোন সুবোধ বালক বিদ্যালয়ে টিকিতে পারিত না।

ছোট বউ সুন্দরী। সুন্দরী হইলেও তাহাকে আমাদের পছন্দ হয় না। সে কেমন ঘ্যান-ঘেনে, প্যান-পেনে। তা'র তেজ আদৌ নাই। লোকে ভর্ৎসনা করিলে, কথার উত্তর দেয় না—বরং হাসে। বড় বউ মিথ্যা করিয়া তা'র ঘাড়ে কোন দোষ চাপাইলে, সে নীরব থাকিত,—ম্লানমুখে লোকের তিরস্কার খাইত। কেহ গালি দিলে, গালি না পাল্টাইয়া নীরবে, নিভৃতে কাঁদিত; কেহ একটু আদর করিলে বড় বড় চোখ দুটি ছল ছল করিত। বড় বউ যদি কখন তার চুল বাঁধিয়া দিত, তা' হ'লে ছোট বউ কৃতার্থ হইত। স্বামীর জন্য দু'টা পান লুকাইয়া আনিতে পারিলে সে দিগ্বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করিত। এমন মেয়ে কি ভাল লাগে গা?

দেখ দেখি বড় বউ কেমন! দিনরাত্রি কেমন ফিট্‌ফাট্ হ'য়ে বেড়াচ্ছে। হ'লেই বা সে কাল, কুৎসিৎ; তার বাপের ত টাকা আছে। গায়ে গহনা পরে, সাবানে গা ধুয়ে, সিমলার কাপড় পরে, কেমন ভাবযুক্ত হ'য়ে দিন রাত গজ্‌রে গজ্‌রে বেড়াচ্ছে। আর তেজই বা কি! স্বামীর সঙ্গে একটু মতভেদ হইলে বাঘিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া ছোট লোক স্বামীকে বেশ দু' কথা শুনাইয়া দেয়। স্বামী ত' দূরের কথা, পাড়ার বিড়াল কুকুরও বড় বউয়ের ভয়ে ত্রস্ত, ভীত। এমন না হ'লে আর বউ!

ভায়ে ভায়ে এখন বড় একটা মিল নাই। বিনোদের এক পয়সা দরকার হইলে দাদার কাছে হাত পাতিতে হয়। চাহিলে কখন মিলে—কখন মিলে

না। একটা জামা বা এক জোড়া বিনামা ১৩১০ সালের বৈশাখে মাগিলে ১৩১২ সালের চৈত্র নাগাদ মিলিতে পারে। তা' ছাড়া আবার ঝঙ্কার আছে। তবে সেটা অন্দর বিভাগ হ'তেই বেশী আসে। দাদার অন্যায় তিরস্কার, ভর্ৎসনা বিনোদ অম্লানবদনে সহ্য করে; কিন্তু বউ দিদির তীব্রোক্তিতে তাহার প্রাণ কাটিয়া যায়। বউ দিদি নিয়ত বুঝাইতে চেষ্টা পায় যে, তা'র মত বড়লোকের মেয়ে এই ছোট লোকদের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া তাদের বাগার পুরুষদের উদ্ধার করিয়াছে। বউ দিদির বাক্যবাণ, কঠোরোক্তি, সকলই বিনোদ নীরবে সহ্য করে। কিন্তু যখন সেই অপাপবিদ্ধা, সুকুমারমতি, ছোট বউয়ের উপর হিমাদ্রি-বিদীর্ণকারী বাক্যশেল নিক্ষিপ্ত হয়, তখন বিনোদ ধৈর্য্য হারাইয়া ক্ষিপ্তবৎ হয়। বিনোদের তখনকার অবস্থা দেখিয়া, স্বামী কাছে না থাকিলে সেই প্রচণ্ডা রাক্ষসীও ভয় পায়। কিন্তু ছোট বউ মরমে মরিয়া যায়। ঘটনার পর স্বামী প্রকৃতিস্থ হইলে, তাহাকে নিভৃতে বলে, "কেন, তুমি দিদিকে অমন ক'রে বল? ছি, আমি লজ্জায় মরে যাই। তিনি দিদি, গুরুজন—আমরা দোষ করলে তিনি বক্‌বেন না ত রাস্তার লোক বক্‌তে আসবে?" ইত্যাদি।

(৩)

বড় বউয়ের পাছু পাছু ছোট বউ তত্ত্ব দেখিতে চলিল। দ্রব্য সম্ভারের মধ্যে সৌখীন দ্রব্যের ঘটাটা কিছু বেশী। ফিতা, চিরুণী, গন্ধদ্রব্য, সাবান, পুতুল, খেলানা, সেমিজ, জ্যাকেট প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যে হর্ম্ম্যতল সুশোভিত। সকল জিনিস দেখিয়া ছোট বউ বলিল, "দিদি আমাকে একটা জিনিস দিবে?"

বড় বউ। কি চাও?

ছোট বউ। একশিশি আতর।

বড় বউ। ওসব সৌখীন গন্ধদ্রব্য নিয়ে তুমি কি কর্‌বে! যা'র পরতে কাপড় জুটে না তা'র আবার আতর মাখা কেন?

ছোট বউ আর কিছু বলিল না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেখানে একজন দাসী দাঁড়াইয়াছিল, তার নাম পাঁচি। সে বড় বউয়ের দাসী হইলেও ছোট বউকে বেশী ভালবাসিত। ছোট বউয়ের বিমর্ষ মুখখানি দেখিয়া তা'র প্রাণে বড় ব্যথা লাগিল। সেখানে আর সে দাঁড়াইল না—স্থানান্তরে চলিয়া গেল। কিন্তু ছোট বউয়ের মুখখানি তার প্রাণে গাঁথা রহিল।

দুইদিন পরে বাড়ীতে এক মস্ত গোল বাধিল; বড় বউয়ের আতরের শিশি চুরি গিয়াছে। চোর ধরা বড় কঠিন হইল না—গন্ধেই ধরা পড়িল; সে গন্ধ

চাপিয়া রাখা বড় সহজ নয়। ছোট বউ যে দিকে যায় সেই দিকেই বোঁটা ভাঙ্গা ফুলের গন্ধ। বড় বউ গর্জ্জিয়া ছোট বউকে ধরিল। ছোট বউ বিস্মিত হইয়া বলিল,—"কেন, দিদি, তুমিইত আমায় আতর মাখিতে দিয়াছ।"

অনলে ঘৃতাহুতি পড়িল—বারিধিহৃদয়ে প্রভঞ্জন নাচিয়া উঠিল। বড়বউ চীৎকার করিয়া বলিল,—"আমি তোকে দিয়েছি! চোর! ছোটলোক! মিথ্যাবাদী!"

ছোটবউ স্তম্ভিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। কিছু বলিতে সাহস পাইল না। সে চুপ করিলেও বড়বউ চুপ করিতে পারে না। আগ্নেয় গিরির বিদীর্ণবদন-নিঃসৃত জ্বলন্ত অনলরাশির ন্যায় তাহার মুখগহ্বর হইতে জ্বালাময়ী বাক্যাবলী বিনির্গত হইতে লাগিল। সে বাক্যানলে মানুষ পুড়িয়া ধ্বংস হয়, কিন্তু ছোট বউয়ের ধৈর্য্য পুড়িল না। সে নতমুখে ধীরে ধীরে বলিল,—"দিদি, শিশিটা এনে দিব? আমি ফোটা কতক নিয়েছি বইত নয়।"

এবার বৈশাখী মেঘে বিজলী খেলিল—হুঙ্কার রবে ব্যোম বিদীর্ণ করিয়া দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিল। বড়বউ গর্জ্জিয়া বলিল,—"এত বড় আস্পর্দ্ধা! তোর প্রসাদী জিনিষ আমায় দিতে আসিস্!"

তখন ছোটবউকে ছাড়িয়া ছোট বউয়ের পিতৃমাতৃ এমন কি শ্বশুরকুলের উপর ঝড়ের বেগটা পড়িল। ভাষায় যতদূর গালি দেওয়া সম্ভব ততদূর গালি চলিল। ছোটবউয়ের যে যেখানে আছে—কেহই অব্যাহতি পাইল না। প্রাণ ভরে সকলকে গালি দিয়া বড়বউ অবশেষে ছোটবউকে বৈধব্য-অভিসম্পাত দিল। তখন ছোটবউয়ের মৈনাকতুল্য অটল ধৈর্য্যও ঝটিকায় নড়িয়া উঠিল। সে বলিল,—"দিদি, আমি দোষ ক'রে থাকি আমায় গালি দেও, শাস্তি দেও, যারা নিরপরাধ তাদের কেন গালি দিতেছ?"

এবার উনপঞ্চাশৎ পবন নীল কাদম্বিনীর পাছু তাড়না করিয়া ছুটিল; বড়বউ মুখ ছাড়িয়া হাত ধরিল, উন্মত্ত নর্ত্তনে হর্ম্ম্যতল প্রকম্পিত করিয়া বড়বউ কমলতুল্য কোমল ছোটবউয়ের অঙ্গে পদাঘাত করতঃ তাহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিল।

এমন সময় তথায় বিনোদ আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনোদ যখন সকল কথা শুনিল, তখন সে দ্বাদশ রবির তেজে জ্বলিয়া উঠিল। সে অনলে কোন গ্রহ ভস্মীভূত হইল কিনা জানি না, কিন্তু গৃহের সুখ, ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার

কর্ত্তব্য জ্ঞান, সকলি পুড়িয়া গেল। ক্রোধানলে দেবত্ব আহুতি দিয়া বিনোদ পশুবৎ আচরণে প্রবৃত্ত হইল।

গোলমাল শুনিয়া রামলালও ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ভায়ে ভায়ে বচসা আরম্ভ হইল। বচসায় কখন ঝগড়া মিটে না—বরং বাড়ে। এক্ষেত্রেও ঝগড়া পঞ্চম ছাড়িয়া সপ্তমে উঠিল। রামলাল চীৎকার করিয়া বলিল, "তুই আমার বাড়ী থেকে এখনি দূর হ'।" বিনোদও সমান উত্তর করিয়া জানাইল যে পৈতৃক ভিটায় তাহারও স্বত্ব আছে। ঝগড়া কতদূর গড়াইত বলা যায় না; কিন্তু ইচ্ছামত স্রোতমুখে যাইতে পারিল না। কয়েকজন নিষ্কর্ম্মা প্রতিবেশী অযাচিতরূপে আসিয়া মধ্যস্থ হইল। তাহারা বিনোদকে সস্ত্রীক কিছু দিনের জন্য শ্বশুর বাড়ী গিয়া বাস করিতে উপদেশ দিল। তাহারা বুঝাইয়া বলিল, কিছুদিন বাদে পৈতৃক বিষয় ভাগ করিয়া লইলেই চলিবে।

তাহাদের পরামর্শমত বিনোদও তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর হাত ধরিয়া শ্বশুরালয় অভিমুখে যাত্রা করিল। যাইবার সময়ে দাদাকে শাসাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "যদি বেঁচে থাকি এ ব্যবহারের এক দিন প্রতিশোধ দিব।"

ছোটবউ পিত্রালয়ে যাইতেছে দেখিয়া পাঁচি কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"দাঁড়াও, ছোট বউদিদি, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমি মাইনে চাই না—কেবল দু'টো খেতে চাই। তা'ও যদি না দেও, তবুও তোমার কাছে থাক্‌ব, যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন তোমার সেবা কর্‌ব। একটু দাঁড়াও, বড়বউকে দু'টো কথা বলে নি। দেখ বড়বউ, তোমার মত ছোট লোকের কাছে আমি আর চাকরি কর্‌তে চাইনে। দেখ, আমার কাছে মুখ নেড়ো না—তুমি চোদ্দপুরুষ তুললে, আমি ছাপ্পান্ন পুরুষ তুল্‌ব। একটা কথা তোমায় বল্‌বার জন্য দাঁড়ালুম। যে শিশিটার জন্য তুমি ছোট বউদিদিকে লাথি মারলে, তাড়িয়ে দিলে, সে শিশিটা আমি চুরি ক'রে ছোট বউদিদিকে দিয়েছিলাম। দিয়ে ব'লেছিলাম, শিশিটা তুমি তা'কে দিয়েছ। চুরি করা জিনিস জানতে পারলে ছোট বউদিদি লাথি মেরে শিশিটা ফেলে দিত। তুমি এত অপমান করেছ তবু সে মুখফুটে আমার নাম করেনি। কি বল্‌ব এত দিন তোমার নুন খেয়েছি, নইলে যে লাথি মেরেছ তা'র প্রতিশোধ দিতাম।"

বাধা দিয়া বিনোদ বলিল,—"একদিন এ অপমানের প্রতিশোধ আমি দিব। যে পায়ে তুমি লাথি মেরেছ, যে মুখে দাদা গাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে, সেই—।"

ছোটবউ মুখ চাপিয়া ধরিল—কিছু বলিতে দিল না।

(৪)

শ্বশুরালয় স্বারভাঙ্গায়। যাইতে দুইদিন লাগিল। শ্বশুর বড় গরীব, রাজষ্টেটে সামান্য চাকুরি করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন। তিনি জামাইয়ের গ্রাসাচ্ছাদন ভার লইতে অক্ষম হইলেও দায়ে পড়িয়া লইতে হইল। কিছুদিন বাদে শ্বশুর বিনোদকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপু, এ বয়সে বসে থাক্‌লে ত চলবে না, কিছু কাজ কর্ম্ম করা উচিত। আমি বুড়ো হয়েছি, কেমন করে একা এত বড় সংসার চালাই, বল।"

বিনোদ কথা কহিল না। আবার কিছুদিন গত হইল। শ্বশুর একদিন বলিলেন, "না হয় ভাইয়ের সঙ্গে বিষয় ভাগ করে নিয়ে পৈতৃক ভিটায় থাকগে। আমি আর ক'দিন পারি বল।" বিনোদ বলিল, "ভাইয়ের সঙ্গে বিষয় ভাগ করব না—হাজার হোক তিনি আমার বড় ভাই।" শ্বশুর তখন সরোষে বলিলেন, "না ভাগ করে নেও অন্য কোন উপায় দেখ—নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে আমার ঘাড়ে চেপে থাক্‌লেও চিরকাল চল্‌বে না।" লজ্জায়, ঘৃণায় বিনোদের মুখ লাল হইল। সে উঠিয়া গৃহমধ্যে গেল। সেখানে শ্যালিকা একটু গঞ্জনা দিল। তখন বিনোদের অভিমান-পূর্ণ হৃদয় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করিয়া চলিল।

(৫)

প্রাণের ধিক্কারে গৃহত্যাগ করিয়া বিনোদলাল, জয়পুরে এক উকীলের গৃহে আশ্রয় লইল; এবং পিতামাতার সহস্র অনুরোধে যাহা কখন করে নাই, তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিতে লাগিল; স্থানীয় পুস্তকাগারে যত পুস্তক ছিল একে একে সযত্নে পড়িয়া শেষ করিল। জীবনী, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান একে একে অনন্য-সাহায্যে পড়িল। তাহার অধ্যবসায় দেখিয়া আশ্রয়দাতা উকীল বাবু বিস্মিত হইলেন। বিনোদের আলস্য নাই, কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই—সে দিবারাত্রি অনন্যকর্ম্ম হইয়া পাঠে নিযুক্ত। পুরুষকারের পদপ্রান্তে সিদ্ধি লুণ্ঠিত—চারি বৎসর পরে বিনোদ মনের শান্তি ফিরাইয়া পাইয়া পাঠাগার পরিত্যাগ করিল।

উকীল বাবু, রাজসরকারে বিনোদের একটু চাকরি করিয়া দিলেন। বেতন দশ টাকা মাত্র; কিন্তু বিনোদ তাহাতেই সন্তুষ্ট। অল্পে সন্তুষ্ট থাকিয়া সে সততা ও অধ্যবসায় গুণে ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে লাগিল। সিদ্ধি আকৃষ্ট

হইয়া গাঁথনার গলায় বরমাল্য পরাইয়া দিল ;—বিনোদ দশ বৎসর পরে রাজ সরকারে দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইল।

তখন বিনোদ পরিবার আনিল। পরিবারের পাছু পাছু অনেকেই আসিল। শ্যালক, শ্যালিকা, শ্যালকপুত্র, শ্যালিকাপুত্র সকলেই আত্মীয়তা করিতে বিনোদের কাছে ছুটিয়া আসিল। বিনোদ রাজসরকার হইতে বাস করিবার জন্য প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকা পাইয়াছিল। অল্প দিনের মধ্যে সেই সুবৃহৎ অট্টালিকা আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবে পরিপূর্ণ হইল। সংসারে যে তাহার এত আত্মীয় বান্ধব ছিল তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। এক্ষণে সম্পদের দিনে জগৎ বন্ধুময় হইয়া উঠিল।

সকলে আসিল বটে, কিন্তু কল্যাণপুরের কেহ আসিল না। সে দূরবর্ত্তী গ্রামে বিনোদের সম্পদের কথা পৌঁছায় নাই ; বিনোদও কোন সংবাদ লয় নাই বা পাঠায় নাই। কার কাছেই বা বিনোদ সংবাদ পাঠাইবে? সে গ্রাম হইতে বিনোদের দাদার বাস উঠিয়াছে। কেমন করিয়া উঠিল, তা' বলিতেছি।

রামলাল নিজে লোকটা মন্দ নহে ; তবে স্ত্রীর সম্পূর্ণ শাসনাধীন। স্ত্রীর কর্ত্তৃত্বাধীনে রামলাল ও বিষয়াদি উভয়ই চলিত। বড় মানুষের মন যোগাইতে যোগাইতে রামলাল ও বিষয় হায়রাণ হইয়া পড়িল,—রামলাল ঋণগ্রস্ত হইল, বিষয় বন্ধক পড়িল। বাঁধাবাঁধি না থাকিলে ঋণ কমে না বরং বাড়ে। দেনা যখন দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল, তখন এক বিপদ আসিয়া বড় বউয়ের হৃদয়ে বজ্রাঘাত-তুল্য আঘাত করিল। বড় বউয়ের পিতার একখানি বড় দোকান ছিল। পিতা হঠাৎ দেউলে হওয়ায় সে দোকানখানি উঠিয়া গেল। সেই সঙ্গে খাতক, পাওনাদার সকলে মিলিয়া তাহার স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি নীলাম করিয়া শৃগালের ন্যায় লুটিয়া লইল। সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও সকল ঋণ পরিশোধ হইল না। তাহাকে জেলে দিবে বলিয়া পাওনাদারেরা শাসাইতে লাগিল। পিতার সে বিপদে বড় বউ স্থির থাকিতে পারিল না ;—নিজের অলঙ্কার, স্বামীর ভদ্রাসন প্রভৃতি বেচিয়া পিতার সাহায্যে অগ্রসর হইল। কন্যার সাহায্যে পিতা জেল হইতে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু ঘোর দরিদ্রতায় পড়িয়া রিক্তহস্তে কন্যার গৃহে সপরিবারে আশ্রয় লইল। কন্যারও তখন কিছুই নাই ; ভদ্রাসন, বিষয় সম্পত্তি অলঙ্কার সকলি গিয়াছে। পিতাকে দু'মুঠা খাইতে দিবারও তাহার সামর্থ্য নাই। দেখিয়া শুনিয়া রামলালও নিশ্চেষ্ট ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময় মহাজন আসিয়া বাড়ী দখল করিল। তখন পরামর্শ আঁটিয়া সকলে কল্যাণপুর ত্যাগ করিয়া চলিল।

(৬)

আজ দেওয়ান বিনোদলাল বিচারে বসিয়াছেন। কতকগুলা লোক অভিযুক্ত হইয়া দেওয়ানের সমক্ষে নীত হইয়াছে। অপরাধ গুরুতর। রাজ সরকারের মোহর দস্তখত জাল করিয়া হরিপুর পরগণা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। আজ তাহাদের বিচার—দেওয়ান বিচারক।

আসামীরা সংখ্যায় অনেক—প্রায় দশ বারজন হইবে। প্রধান অপরাধী—বড় বউয়ের পিতা ও স্বামী। বড়বউও অব্যাহতি পায় নাই—সেও একজন আসামী। তাহার ভাই, ভগিনী, মা প্রভৃতি সকলেই অভিযুক্ত হইয়া বিচারাসনের সম্মুখে নীত হইয়াছে। দেওয়ানের অট্টালিকার একতম অংশ বিচারগৃহ। সেই সুপ্রশস্ত বিচারালয় লোকে পরিপূর্ণ। আসামীদের চারিদিকে সিপাহীর দল—বিচারালয়ের চারিদিকে রাজসরকারের কর্ম্মচারিবৃন্দ। আশে পাশে চারিদিকে নীরব দর্শকমণ্ডলী। সাক্ষ্য প্রমাণাদি সকলি গৃহীত হইয়াছে। তবে এখনও হুকুম হয় নাই। হুকুমের প্রতীক্ষায় সকলেই বিচারকের মুখ পানে চাহিয়া আছে। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বিচারক অবশেষে নিস্তব্ধ গৃহমধ্যে ধীরে ধীরে বিচারফল পাঠ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আসামীগণ, তোমাদের অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে। তোমাদের গর্হিত কার্য্যে রাজসরকার বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সেই জন্য আমি রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ তোমাদের দশ সহস্র চলিত মুদ্রায় দণ্ডিত করিতেছি। যতদিন না এই অর্থ দিতে পার, ততদিন কারাগারে আবদ্ধ থাকিবে।"

তখন একজন জমাদার অগ্রসর হইয়া আসামীদের জিজ্ঞাসা করিল, "তোম্ লোগ রূপেয়া দেগা ?"

রামলাল উত্তর করিল, "না, দিবার ক্ষমতা নাই। আজও নাই, বিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেও জন্মিবে না।"

জমাদার বলিল, "তব্ জেলখানামে চলো।"

আসামীদের মধ্যে যাহারা স্ত্রীলোক তাহারা আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না,—হর্ম্ম্যতলে বসিয়া পড়িল। পুরুষেরা সান্ত্বনা দিবে কি, নিজেরাই অশান্ত হইয়া উঠিল। এমন সময় দেওয়ান বিচারাসন হইতে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "জমাদার, একটু অপেক্ষা কর।"

অর্দ্ধ দণ্ড পরে দেওয়ান একটা ছোট পুঁটুলি হস্তে ফিরিয়া আসিয়া দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনাদের মধ্যে যদি কেহ এই গহনা

গুলি আবদ্ধ রাখিয়া পাঁচ হাজার টাকা আমায় কর্জ্জ দেন তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই। এই গহনার মূল্য পাঁচ হাজার টাকা না হইতে পারে, কিন্তু আমার গৃহে আর এক টুকরাও সোণা রূপা নাই।" একজন সম্ভ্রান্ত মহাজন পঞ্চ সহস্র মুদ্রা তখন আনিয়া দিল; কিন্তু গহনা লইল না। বলিল, "আপনার কথার উপর বিশ্বাস করিয়া আপনাকে আমি যথাসর্ব্বস্ব কর্জ্জ দিতে পারি।"

তখন বিনোদলাল, রামলালের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "আমি এতদিন যাহা উপার্জ্জন করিয়াছি তাহা আপনার চরণে অর্পণ করিতেছি। অর্থদণ্ড দিয়া কারামুক্ত হউন।"

রামলাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে বলিল, "টাকা! অর্থদণ্ড! আপনি কে?"

বিনোদ বলিলেন, "দাদা, আমি বিনোদ।"

রামলাল বলিল, "বিনোদ! যা'কে আমি অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি সেই বিনোদ! সেই আমাকে টাকা দিয়া রক্ষা করিতেছে? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?"

বিনোদ কেবলমাত্র বলিলেন, "দাদা, এই আমার প্রতিশোধ।"

শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

বিধবা বিবাহ ও হিন্দুসমাজ।

(২য় প্রস্তাব)

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পুরুষ যখন বিপত্নীক হইলে পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করিতে পারে, তখন স্ত্রীলোক বিধবা হইলে আবার স্বামীগ্রহণ করিতে পারিবে না কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, মানুষের নিকট এ অনুযোগটা না করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার নিকট করিলেই ভাল হয়। কারণ, তিনি পুরুষ ও রমণীকে বিভিন্ন উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়া ভয়ানক একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি পুরুষকে যে সকল শক্তি ও সামর্থ্য দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, রমণীতে তাহার অনেকগুলিই দেন নাই। পুরুষ সংসারের যে সকল ঝঞ্ঝাবাত

অকাতরে মাথা পাতিয়া লইতে পারে, রমণী তাহার সামান্য মাত্র আঘাতেই অস্থির হইয়া পড়ে। পুরুষ এক বৎসরের মধ্যে বহু রমণীতে উপগত হইয়া বহু সন্তানোৎপাদনে সমর্থ, কিন্তু রমণী বৎসরে একটীর অধিক সন্তান প্রসব করিতে পারে না। পুরুষ একসঙ্গে চারি পাঁচটী বিবাহ করিলেও সংসারে বিশেষ কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় না, কিন্তু এক রমণীর বহুস্বামী হইলে সংসার একবারে অচল হইয়া পড়ে, নিত্য সুন্দউপসুন্দের অভিনয়ে স্বামী বেচারাদিগকে শমনভবনের অতিথি হইতে হয় *। আমরা কয়েকটী সামান্য সামান্য কারণের উল্লেখ করিলাম মাত্র, কিন্তু আরও এমন অনেক নিগূঢ় কারণ আছে, যাহাতে রমণী পুরুষ অপেক্ষা অনেকাংশে দুর্ব্বল এবং এক পুরুষ শতবার দারপরিগ্রহ করিলেও রমণীর একাধিক স্বামীগ্রহণ সর্ব্বথা অনুপযুক্ত।

কোন কোন বিজ্ঞ সমাজসংস্কারকের মতে বিপত্নীক হইলেই পুরুষের যেমন ভোগলালসার পরিতৃপ্তি বা ইন্দ্রিয়সমূহ স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম হয় না, তেমনই স্ত্রীলোক বিধবা হইলেও তাহার ভোগ-প্রবৃত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তাহাদের ইন্দ্রিয়নিচয়ও সন্তানোৎপাদনাদি প্রাকৃতিক শক্তি হইতে বঞ্চিত হয় না; কিন্তু মূঢ় হিন্দুসমাজ এই প্রাকৃতিক শক্তিতে বাধা প্রদান করিয়া ভয়ঙ্কর পাপের

* এস্থলে যদি কেহ দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর উল্লেখ করিয়া স্ত্রীজাতির বহুস্বামীগ্রহণের সমর্থন করিতে চাহেন, তবে তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রকৃত পক্ষে দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী ছিল কি না সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ সম্বন্ধে আমরা নিজের মতামত প্রকাশ না করিয়া 'কৃষ্ণচরিত্র' হইতে বঙ্কিম বাবুর মত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি বলিতেছেন,—"আমিও বিশ্বাস করি না যে, যজ্ঞের অগ্নি হইতে দ্রুপদ কন্যা পাইয়াছিলেন, অথবা সেই কন্যার পাঁচটী স্বামী ছিল। তবে দ্রুপদের ঔরস কন্যা থাকা অসম্ভব নহে, এবং তাহার স্বয়ংবর বিবাহ হইয়াছিল এবং সেই স্বয়ংবরে অর্জ্জুন লক্ষ্য বেধ করিয়াছিলেন। * * * অনুক্রমণিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণে দ্রৌপদী স্বয়ংবরের কথা আছে, কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এমন কথা নাই। অর্জ্জুনই তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন, এই কথা আছে।

সমবায়ে ততো রাজ্ঞাং কন্যাং ভর্ত্তৃস্বয়ংবরাম্।
প্রাপ্তবানর্জ্জুনঃ কৃষ্ণাং কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্॥"

যদিও দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, উহার ফলেই অর্জ্জুনকে দ্বাদশবর্ষ বনগমন করিতে হইয়াছিল। ভ্রাতৃবৎসল পাণ্ডবগণেরই যখন এতাদৃশ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তখন আধুনিক যুগে যে কি ব্যাপার ঘটিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

অনুষ্ঠান করে; সুতরাং বিধবাগণকে পুনর্ব্বিবাহিতা করিয়া এই প্রাকৃতিক নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষণ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কথাটা শাস্ত্রসম্মত বা ন্যায়ানুগত না হইলেও বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম গবেষণার অতি সূক্ষ্ম ফল বটে, কিন্তু এই কর্ত্তব্য সাধনের পূর্ব্বে আমরা এই সকল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সংস্কারক মহোদয়দিগকে আর একটা কর্ত্তব্য পালনের জন্য অনুরোধ করিতে পারি। তাঁহারা সামান্য আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন, অনেক স্থলেই পতি-পরিত্যক্তা উপেক্ষিতা সধবাগণ বিধবাদিগের অপেক্ষাও কষ্টে কাল যাপন করিতেছেন, অনেক গৃহেই 'সধবার একাদশী'র সত্য অভিনয় হইতেছে। ইহাদের সংখ্যা বিধবার সংখ্যা হইতে বড় কম নয়। এই সকল জীবৎপতি সধবাগণ কি প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত নহেন, বা ইঁহারা কি সংস্কারকগণের করুণাপূর্ণ দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত? এক্ষণে আমাদের সানুনয় নিবেদন, ইহাদের [illegible] একটা ব্যবস্থা করিয়া পরে বিধবার কষ্ট নিবারণে প্রবৃত্ত হওয়া কি ঠিক হে? অগ্রে সধবাকে প্রকৃত সধবা করিয়া পরে বিধবাকে 'সধবা' করিবার চেষ্টা করাই অনেকটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। যাহারা পতি থাকিতেও দুঃখ-ভোগ করিতেছে, অগ্রে তাহাদের দুঃখ মোচন করিয়া পরে পতিহীনাগণের দুঃখমোচনে যত্নবান্ হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

আর এক কথা, যে সকল স্ত্রীলোক অল্পকালমাত্র স্বামীসুখ সম্ভোগ করিয়া চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ বা ষোড়শ বর্ষ বয়সে বিধবা হয়, তাহাদের কি উপায় হইবে? তাহাদেরও ইন্দ্রিয়নিচয় যে তখনও সন্তানোৎপাদনাদি প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে বঞ্চিত হয় নাই, তাহাদেরও হৃদয়ে যে তখনও ভোগলালসার তীব্র শিখা প্রজ্বলিত, [illegible] যুক্তিবাদী সংস্কারকগণ বোধ হয় তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু এস্থলে প্রাকৃতিক নিয়মকে কিরূপে তাহার স্বভাবসিদ্ধ পথে চালিত করা যাইবে? কি উপায়ে এই সকল বিধবার ভোগবাসনার পরিতৃপ্তি হইবে? এখানে তো বিদ্যাসাগরের দোহাই দিয়া 'হিন্দুমতে বিধবা বিবাহ' চলিবে না? তবে কি এই সকল বিধবাকেও পুরুষান্তরে অর্পণ করিতে হইবে? আমরা বিধবাবিবাহ-প্রবর্ত্তক 'সমাজহিতৈষী' মহোদয়গণের নিকট ইহার একটা সদুত্তর প্রার্থনা করি।

যাঁহারা বলেন, হিন্দুসংসারে বিধবারা দাসীর ন্যায় কালযাপন করে, তাঁহাদিগকে আমরা ভ্রান্ত বলিয়াই বিশ্বাস করি। যাঁহারা হিন্দুর সংসারের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত তাঁহাদের মুখেই এ কথাটা শোভা পায়। প্রকৃত

হিন্দুর সংসারে বিধবারা দেবতার ন্যায় সমাদর পাইয়া থাকেন। দেবসেবার ভার তাঁহাদের উপর, অতিথি সৎকারের ভার তাঁহাদের হাতে, ভাণ্ডার তাঁহাদের জিম্মায়। ধনী ও মধ্যবিত্তের গৃহে এই ব্যবস্থা। তবে যেখানে গৃহস্থের অস্বচ্ছল অবস্থা, সেখানে কোথাও কোথাও বিধবাদিগকে রন্ধনাদি সাংসারিক কার্য্যও করিতে হয়। কিন্তু কি সধবা কি বিধবা, হিন্দুরমণী মাত্রেই রন্ধনাদি সাংসারিক কার্য্যকে কখনও অসম্মানকর বা ক্লেশজনক বলিয়া মনে করেন না, বরং তাঁহারা স্বেচ্ছায় আনন্দের সহিত এই কার্য্যে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন। সুতরাং দেবসেবা, অতিথিসেবা বা রন্ধনাদি সাংসারিক কার্য্যকে কখনই দাসীর উপযুক্ত কার্য্য বলা যায় না। বলিতে হইলে সধবাদিগকেও বহু স্থলেই দাসী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। নব্যসংস্কারক মহোদয়গণ সুবর্ণ-মণ্ডিত চসমার ভিতর দিয়া এই সকল কার্য্যকে দাসীর উপযুক্ত নীচকার্য্য বলিয়া দর্শন করিলেও হিন্দুরমণীগণ যে ইহাকে গৌরবের কার্য্য বা অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা তাঁহারা প্রখরসভ্যতালোকোদ্ভাসিত হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিবেন কি ?

এস্থলে কেহ হয়তো দুই একটা গৃহের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া বলিবেন যে, কোন কোন স্থলে অসহায়া বিধবাগণকে প্রাণান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে তীব্র তাড়না গঞ্জনা এবং অশ্রুধারার মধ্য দিয়া এক মুষ্টি উদরান্নের সংস্থান করিতে হয়। কিন্তু অনেক স্থলেই সধবাদিগকেও যে তদপেক্ষা অধিকতর কষ্টে কালযাপন করিতে হয়, দয়ার্দ্রচিত্ত সমাজসংস্কারক মহোদয়েরা তাহার কোন সংবাদ রাখেন কি ?

আমরা গতবারে বলিয়াছি যে, বিধবা বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে অনেক স্থলেই কুমারীদিগকে অবিবাহিতাবস্থায় থাকিতে হইবে। কেন থাকিতে হইবে, এস্থলে তাহার দুই একটা কারণ প্রদর্শন করিতেছি। প্রথমতঃ, সরকারি লোকগণনার হিসাবে (Census Report) দেখা যায় যে, এ দেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। এই আধিক্য বশতই অধুনা কুমারীদিগের বিবাহের জন্যই সহসা পাত্র পাওয়া যায় না। ইহার উপর আবার যদি বিধবা-দিগের জন্যও পাত্রের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে হয় কুমারীদিগকে অবিবাহিতা থাকিতে হইবে, নতুবা সমাজে আবার বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতে হইবে। কিন্তু আমরা এতদুভয়ের কোনটীকেই শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিতে পারি না।

দ্বিতীয়তঃ, বালবিধবাগণ প্রায়ই সমধিক সৌন্দর্য্যসম্পন্না হইয়া থাকে।

ইহার মূলে কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কি না জানি না, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাই যে, কুমারীদের অপেক্ষা বালবিধবারা অধিকতর সুন্দরী। সুতরাং সমাজে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলে রূপমুগ্ধ যুবকগণ যে, সৌন্দর্য্য-সম্পন্না প্রাপ্তবয়স্কা বিধবা পাত্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুমারীবিবাহে সহজে সম্মত হইবে এরূপ বিশ্বাস আমাদের নাই। ফল কথা, যে দিক দিয়াই হউক, কুমারী-বিবাহে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইবেই হইবে।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দু এবং মুসলমান সমাজে * বহুদিন হইতেই বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, এবং তাহা সাঙ্গা বা নিকা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই সাঙ্গা বা নিকার পত্নীরা কুত্রাপি প্রকৃত ভার্য্যার সমাদর লাভ করিতে পারে না, ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্য। যথাবিধি বিবাহিতা পত্নীর সহিত স্বামীর কলহ হইলে স্ত্রী প্রায়ই বলিয়া থাকে, "আমি কি তোর সাঙ্গা করা মাগ যে, আমাকে যা মুখে আসে তাই বল্‌বি।" ইহা হইতেই নিম্ন সমাজেও বিধবাবিবাহ কিরূপ ভাবে আদরণীয় হইয়া থাকে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

আর এক কথা, এই বিধবাবিবাহের ফলে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহারা যখন জানিতে পারিবে যে, তাহাদের জননী দ্বিতীয় বার বিবাহিতা, তাহারা সেই বিবাহের ফল, তখন তাহারা কি লজ্জায় মস্তক অবনত করিবে না? তাহাদের হৃদয়ে কি এক কল্পনাতীত কষ্টের উদয় হইবেনা? মহাবীর নেপোলিয়ন বলিয়াছেন, "সুপুত্র লাভ করিতে হইলে সুমাতার আবশ্যক।" কিন্তু এই পুরুষান্তর-উপগতা সতীত্বগৌরবহীনা জননীরা কি সুমাতা পদবাচ্য হইতে পারে? জানি না এক ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ব্যতীত বিধবাবিবাহের মধ্যে সমাজের আর কি মঙ্গল বিদ্যমান আছে!

আমাদের জনৈক বন্ধু বলেন, বিধবাবিবাহটা ঠিক যেন গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা। দিন দিন সমাজে কিজন্য যে বিধবার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে, সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, দৃষ্টিটা শুধু বিধবার দিকে। এ দেশের পুরুষেরা নানাবিধ কারণে দিন দিন বিবিধ রোগগ্রস্ত এবং অল্পায়ুঃ হইয়া পড়িতেছে। তাহারই ফলে সমাজে বিধবার সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। এই বৃদ্ধির হ্রাস করিতে হইলে ইহার মূল কারণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে; কিসে পুরুষেরা সুস্থ সবল এবং দীর্ঘজীবী হয় তাহার উপায় বিধান করিতে

* উচ্চশ্রেণীর মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহ বা নিকা নিন্দিত বলিয়া গণ্য।

হইবে। নতু। বিধবাকে শতবার সধবা করিতে গেলেও সে যে বিধবা সেই বিধবাই থাকিবে, তাহাকে অধিকদিন সধবার সুখ উপভোগ করিতে হইবে না। বন্ধুবরের কথাটা সমাজহিতৈষী মহোদয়গণকে একটু ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

অধুনা এই বিধবা বিবাহের সংবাদে বিধবা-সমাজে আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু অনেক সধবার স্বামীমহল হইতে একটা আতঙ্ক ও বিষাদের করুণ রোল উত্থিত হইয়াছে। তাঁহারা সবিনয়ে সমাজসংস্কারক মহোদয়গণের নিকট নিবেদন করিতেছেন যে, যদি সমাজমধ্যে বিধবা বিবাহটা প্রচলিতই হয়, তবে সেই সঙ্গে যেন স্বামিত্যাগ (Divorce) প্রথাটাও চলিয়া যায়। নতুবা অনেককেই বিরক্তা পত্নীপ্রদত্ত দ্রব্যবিশেষ ভক্ষণে ভবলীলা শেষ করিতে হইবে। আশঙ্কাটা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

দুঃখের বিষয়, যাঁহারা ধর্ম্মের কোন ধারই ধারেন না, যাঁহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে পদে পদে সমাজকে পদদলিত করেন, তাঁহারাই ধর্ম্মাধর্ম্মের ধুয়া ধরিয়া, সমাজের মঙ্গল (!) কামনায় এই বিধবা বিবাহের সুর তুলিয়াছেন। কিন্তু সমাজহিতৈষী ধার্ম্মিক হিন্দু, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত সমাজবিপ্লবকারী ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারে না। এই সকল উচ্ছৃঙ্খল সমাজশত্রুর কথার উত্তর দিতে গিয়া আমাদিগকে মাতৃস্থানীয়া দেবীসদৃশী বিধবাগণের সম্বন্ধে কুৎসিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। এ আলোচনা যেমন লজ্জাজনক তেমনই কষ্টকর। ভগবান্ এই সকল মিত্ররূপী শত্রুর হস্ত হইতে সমাজকে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে এই কষ্টকর আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইবার অবসর প্রদান করুন।

কৃত্রিম উপায়ে রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন

ও ভারতের ভাবী উন্নতি।

——×○×——

(উদ্ধৃত)

প্রায় ১৪ বৎসর অতীত হইল, পরলোকগত প্রথিতনামা রাসায়নিক মোঁসিও বার্থেলো বলিয়াছিলেন যে, প্রায় এক শত বৎসর পরে (অর্থাৎ ২০০০ খৃষ্টাব্দে)

যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি দূরীকৃত হইয়া শান্তি যুগের অবতারণা হইবে। কোনও জাতির আর পররাজ্য-লোলুপ হইবার প্রয়োজন থাকিবে না। কেননা এক শত বৎসর পরে রসায়ন শাস্ত্রের এত উন্নতি হইবে যে, শ্রমসাধ্য উপায়ে ভূমি কর্ষণ না করিয়া রসায়নাগারে খাদ্যদ্রব্যসমূহ প্রস্তুত হইবে। অপর কাহারও মুখ হইতে এ প্রকার বাণী নিঃসৃত হইলে তাহা বাতুলের প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষা করা যাইতে পারিত। বার্থেলো কৃত্রিম প্রণালী দ্বারা ভূরি ভূরি রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করিয়া প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ রাসায়নিক জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ হইতে অসম্ভব কথা নিঃসৃত হইলেও তাহা ধীর চিত্তে সম্যক্‌রূপে বিবেচনা না করিয়া অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। বার্থেলোর কথার মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে, তাহা প্রণিধান করিতে হইলে রসায়ন শাস্ত্র দ্বারা ব্যবসাবাণিজ্যের কতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহা দেখিলেই যথেষ্ট হইবে।

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লর্ড বিকন্‌স ফিল্ড পার্লামেণ্ট মহাসভায় এক সময় বলিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডের এ বৎসর অভ্যুদয়ের সময় যাইতেছে বলা যাইতে পারে, কেননা এ বৎসর রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসায়ে বিশেষ লাভ হইয়াছে। এই কথা লইয়া অনেকে হাস্য বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ লোকে, রাজ্যলাভ বা সমরবিজয় হইলে—কোন জাতির উন্নতি হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করে। বস্তুতঃ বিকন্‌স ফিল্ডের কথাটির মূলে যে গভীর সত্য নিহিত আছে তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। রসায়ন এবং যন্ত্রবিজ্ঞান এই দু'য়ের সাহায্যে পাশ্চাত্য জগতে বাণিজ্যের অসাধারণ উন্নতি হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানবজাতির মঙ্গলের জন্য যত প্রকার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, যন্ত্র-বিজ্ঞানের উন্নতি তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক শক্তি যুগান্তর সংঘটনকারী পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। যন্ত্রকৌশলে শত সহস্র লোকের সাধ্যায়ত্ত কার্য্য দুই এক জনেই স্বল্পায়াসে সুসম্পন্ন করিতেছে। রাসায়নিকগণও বিভিন্ন গুণসম্পন্ন অসংখ্য পদার্থ উৎপাদন করিয়া মানবজাতির সুখ সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছেন।

যে সকল পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইতেছে রসায়ন শাস্ত্র তাহাদের জন্মদাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পরন্তু যে সকল পদার্থ খনি কিম্বা উদ্ভিদ বা প্রাণি-জগৎ হইতে বিনা আয়াসে প্রাপ্ত হই, তাহাদের গুণ নিরূপণে এবং শোধন ও সংস্কার দ্বারা ব্যবহারোপযোগী করিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রতি পদে আবশ্যক হয়। যে দেশে সর্ব্বপ্রকার সাধারণ ব্যবসায়ের উন্নতি হইয়াছে, সেই

দেশে রাসায়নিক দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। রাসায়নিক দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব দেখিলে দেশের সাধারণ বাণিজ্য কতদূর উন্নত তাহা অনুমান করা যায়। বহু বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মান বৈজ্ঞানিক লিবিগ্ বলিয়াছিলেন যে, কোন্ দেশে কত সল্‌ফিউরিক এসিড খরচ করে, তাহা জানিলে, আমি সেই দেশের সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারি।

ভারতবর্ষে নানা প্রকার কল কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। কিন্তু রাসায়নিক পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনে তাদৃশ যত্ন নাই দেখিয়া এই সকল ব্যবসায়ের উন্নতি ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই সন্দেহ হইতে পারে। ব্যবসায়-গুলি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে একটি অন্যের সহিত এরূপ ভাবে সম্বদ্ধ যে একটী পরিত্যাগ করিয়া অন্যটীর স্থাপনা করিলে লাভ হইবার সম্ভাবনা স্বল্প হইয়া পড়ে। যে দ্রব্যগুলিকে ব্যবসায়িগণ আবর্জ্জনা বলিয়া পরিত্যাগ করিত, সেই অব্যবহার্য্য জিনিসগুলিই বিজ্ঞানবলে লাভের প্রধান উপাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মূল উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যও তজ্জন্য অসম্ভব কমিয়া গিয়াছে। অব্যবহার্য্য আবর্জ্জনার ব্যবহার এখন ব্যবহারিক রাসায়নের প্রধান অঙ্গ হইয়াছে। একটী উদাহরণ দিলেই এই কথাটী সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হইবে। ভারতবর্ষে স্বর্ণ মাক্ষিকের (iron pyrites) ন্যায় তাম্রযুক্ত মাক্ষিক প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহাতে তাম্রের অনুপাত অপেক্ষাকৃত স্বল্প বলিয়া, শুধু তাম্র উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করিলে ইহা দ্বারা খরচা পোষায় না। ইউরোপে এই জন্য তাম্রযুক্ত মাক্ষিকগুলির গন্ধকের ভাগ সল্‌ফিউরিক এসিড প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। অন্য অনেক প্রকারের এসিড, জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবার জন্য ফস্ফেট এবং এমোনিয়া যুক্ত সার প্রস্তুত করিতে সোডা ইথার, এনিলিন হইতে উৎপন্ন বহুবিধ রং ইত্যাদি অনেক প্রকারের ব্যবসায়ে সল্‌ফিউরিক এসিড প্রধান অঙ্গ। ইহা দ্বারা বুঝা যাইবে যে, বহুবিধ ব্যবসায় পরস্পরের সহিত সংলগ্ন ভাবে স্থাপিত হইলে তবে অন্য ব্যবসায়ে উন্নতি সম্ভবপর হইবে।

আমাদের দেশে পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য মূল উপাদান সমূহের বিশেষ অভাব নাই। ভারতবর্ষ প্রকৃতি দেবীর লীলাভূমি। সকল প্রকারের কাঁচা মাল এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। * কাঁচা মাল শোধন না করিয়া

* ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর ৭ কোটী টাকার কাঁচা চামড়া ইউরোপ ও আমেরিকাতে রপ্তানী হয়।

রপ্তানী করিয়া থাকে বলিয়া আমাদের দেশ এত নির্ধন হইতেছে। আমরা নিতান্ত হতভাগ্য বলিয়া হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতেছি। ইউরোপীয় বণিকেরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আমাদের দেশ হইতে জিনিষ লইয়া গিয়া অল্প পরিবর্ত্তনের পর সেই জিনিসই আমাদের দেশে বিক্রয় করিয়া অজস্র টাকা লাভ করিতেছেন, আর আমরা নিশ্চেষ্ট ভাবে নিদ্রিত থাকিয়া "হা অন্ন হা অন্ন" করিতেছি। দুর্ভিক্ষের দারুণ কষাঘাতেও চৈতন্য হইতেছে না। বড় দুঃখে কবি বলিয়াছেন 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।' হাতের উপর গড়া জিনিস পাইলে আমরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করি। আর ইউরোপীয় বণিকেরা তন্ন তন্ন করিয়া একই বস্তু বিভিন্ন প্রকারে প্রস্তুত করিবার জন্য সচেষ্ট আছেন। শ্রী যে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের অঙ্কগতা হইয়া থাকিবেন, ইহাতে আর বিস্ময় কি? রসায়ন বিজ্ঞানে পারদর্শিতা নাই বলিয়া আমরা বাণিজ্য-সমরে কত প্রকারে পরাভূত হইতেছি, তাহার কয়েকটি উদাহরণ সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

বিহার অঞ্চলে পুরাকাল হইতে ময়লা পচিয়া সোরার স্তর উৎপন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। বারুদ প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক বলিয়া উহাকে জলে দ্রবীভূত করিয়া পরিষ্কৃত করা হয়। এক সময়ে ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে সোরা উৎপন্ন হইত না বলিয়া এই ব্যবসায়ে আমাদের একাধিপত্য ছিল। ফরাসি-বিপ্লবের সময় ইংরাজেরা ফরাসী বাণিজ্য পোতের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিল বলিয়া ফরাসী রাজ্যে সোরার আমদানী রহিত হইল। সোরা বারুদের প্রধান উপকরণ। তাহা না হইলে যুদ্ধ চলে না। অন্য জাতি হইলে বারুদের অভাবে হাত পা গুটাইয়া থাকিত। কিন্তু ফরাসীরা কার্য্যকুশল জাতি। বিপদ সম্মুখীন দেখিয়া তাহারা অন্য প্রকারে উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইল। স্বাভাবিক প্রণালীর অনুকরণ করিয়া চূণ ক্ষার অশ্বগবাদির মল মূত্র প্রভৃতি এবং পচা জিনিস মিশাইয়া ফরাসী বৈজ্ঞানিকেরা সোরার চাষ আরম্ভ করিয়া দিল। এইরূপে সোরা সর্ব্ব প্রথমে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় সোরা অপেক্ষা মূল্যে কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও যুদ্ধের সময় অন্য স্থান হইতে পাওয়া না যাইতে পারে বলিয়া ইউরোপের প্রত্যেক দেশে এইরূপ উপায়ে কিয়ৎ পরিমাণে সোরা প্রস্তুত হইত।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত চিলি প্রদেশে ইহার পর আর এক প্রকারের সোরা পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহা জল হাওয়া লাগিলে গলিয়া যাইত বলিয়া

বারুদ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত না। জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকগণ চিলি সোরাকে ভারতবর্ষীয় সোরাতে পরিণত করিবার উপায় আবিষ্কার করেন। এই হেতু ভারতবর্ষীয় সোরার আদর অনেক কমিয়া গিয়াছে। এবং রপ্তানীও প্রায় অর্দ্ধেক হইয়াছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও ইহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া এক্ষণে বৈদ্যুতিক শিখার প্রখর তাপ প্রভাবে বায়ুমণ্ডল হইতে সোরার অম্লাত্মক উপাদান প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, উহাতে সফলতা লাভ করিলে সোরার মূল্যের আরও হ্রাস হইবে। অন্য আর একটী কারণেও এখন সোরার সে পরিমাণে আদর নাই। এক শতাব্দী পূর্ব্বে এক বারুদ ব্যতীত অন্য প্রকারের বিদারক পদার্থ ছিল না, কিন্তু এক্ষণে লিডাইট, কর্ডাইট প্রভৃতি নানাবিধ শক্তি-শালী পদার্থ উৎপাদিত হওয়ায়, বারুদের আর তত প্রয়োজন নাই। জাপানীরা এ বিষয়ে ইউরোপের শিষ্য। কিন্তু সিমোজি চূর্ণ আবিষ্কার দ্বারা তাহারা গুরুকে পশ্চাতে ফেলিয়াছে।

কোরা কাপড় এবং কাগজ পরিষ্কার করিবার জন্য ব্লিচিং পাউডার নামে এক প্রকার চূর্ণ ব্যবহৃত হয়। এই চূর্ণ প্রস্তুত করিবার প্রধান উপকরণ মাঙ্গানীজ্। ইহা মধ্য প্রদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রায় ১০।১৫ বৎসর হইল ইউরোপীয় বণিকেরা ইহা আবিষ্কার করিয়া বাৎসরিক প্রায় দুই লক্ষ টন পরিমাণে ইংলণ্ড জর্ম্মণি এবং আমেরিকায় রপ্তানি করিতেছে। ব্লিচিং পাউডার প্রস্তুত ব্যতীত ইহা উৎকৃষ্ট ইস্পাত তৈয়ারি করিতে আবশ্যক হয়। বরাকর ছাড়া আমাদের দেশে বড় লোহার কারখানা নাই বলিয়া মাঙ্গানীজ্ কোন কার্য্যে আসিতেছে না। বিদেশে যেরূপ মাঙ্গানীজ বিক্রয় করিয়া যৎকিঞ্চিৎ লাভ হইতেছে, তাহার বহুগুণ মূল্যে মাঙ্গানীজ্ হইতে উৎপন্ন ইস্পাত ক্রয় করিয়া মোটের উপরে লাভের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষের পুরা লোকসান দিতে হইতেছে। ভূতত্ব বিভাগের ডিরেক্টার জেনারল মিঃ হল্যাণ্ডের মতে মাঙ্গানীজের ব্যবসায়ে ভারতবর্ষের ক্ষতি হইতেছে।

মাঙ্গানীজের মত গ্রাফাইট, অভ্র প্রভৃতির ব্যবসায়ে আমরা বরাবর ক্ষতিরই ভার বহন করিতেছি। অন্য জাতি তাহাদের স্বভাবদত্ত ধন দ্বারা ক্রোর-পতি হইয়া যাইতেছে! আর আমরা অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল আহরণ করিলাম।

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ দ্বারা খনিজ পদার্থের যে আমরা বিষম অপচয় করিতেছি তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। অন্য অনেক দেশ আছে যেখানে ভারতবর্ষের

ন্যায় খনিজ সম্পত্তি আছে ; কিন্তু স্থানীয় লোকেরা "খনিখাত খুঁড়ে" পরদেশীয় লোকদিগের হস্তে নিজের সম্বল তুলিয়া দেয় না।

জৈব জগৎ হইতে উৎপন্ন পণ্য দ্রব্যের সম্বন্ধেও এই কথা অবিকল খাটে। খনিজ পদার্থ অন্য অনেক পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে থাকিতে পারে। কিন্তু ফলে ফুলে, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ পদার্থে ভারতবর্ষ অদ্বিতীয়। ভারতে সৌন্দর্য্য বিতরণে প্রকৃতি কৃপণতা করেন নাই। এমন স্বভাবসুন্দর দেশ পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। ভারতবর্ষের বিবিধ স্বভাবজাত সৌরভ আঘ্রাণ করিলেই এই সৌন্দর্য্যের কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি হইতে পারে। উদ্ভিদ এবং প্রাণিজগৎ হইতে উৎপন্ন পদার্থসমূহের মধ্যে নানাপ্রকারের রং এবং গন্ধদ্রব্যই প্রধান পণ্য দ্রব্য। কিন্তু অবস্থার এমন বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে যে আমরা নন্দন কাননের অধিবাসী হইয়াও, যে দেশের লোকেরা সম্ভবতঃ কখনও প্রস্ফুটিত কুসুম দর্শন করেন নাই তাঁহাদেরই উপর গন্ধদ্রব্য আহরণের ভার অর্পণ করিয়াছি এবং যাঁহারা বৎসরান্তে দুই চা'র দিন মাত্র আকাশের নীল বর্ণ ও বৃক্ষের হরিৎবর্ণ দর্শন করেন, তাঁহারাই আমাদের বস্ত্র রঞ্জিত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। নীল, মঞ্জিষ্ঠ প্রভৃতি স্বভাবোৎপন্ন বিবিধ রংয়ের ব্যবসায়ে আমরা কিরূপে পরাভূত হইয়াছি তাহা অনেকেই অবগত আছেন। গন্ধদ্রব্য সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে আমরা কত পরিমাণে শিক্ষালাভ করিতে পারি, সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

জাগরণ।

——×:*:×——

তখনো আসেনি ছুটি' লইয়া প্রীতির হাস
তোমার প্রভাতী নাথ; সমীরে ফুলের বাস
ভাসেনি ধরায়;
ঘন আঁধারের মাঝে সুচারুহাসিনী তারা
এ বিশ্বের চারিভিতে চাহিয়া হয়নি সারা
দারুণ ব্যথায়।

তখনো তোমার আলো মানব-ললামকৃতা
লইয়া প্রীতির দান করুণার প্রফুল্লতা
আসেনি ছুটিয়া
সব জগতের পানে ; অনন্ত-মানব-প্রাণ
ল'য়ে আরতির ঘোর-কোমল-মালবতান
যায়নি গলিয়া।

তখনো তোমার অই বিশালকানন মাঝ
টুটি' স্বভাবের লাজ পরিয়া উজ্জ্বল সাজ,
আশীষ—কল্যাণ,
লয়নি নির্ম্মাল্যরূপে সুরভিত স্নেহ-প্রীতি,
গায়নি আপন-মুখে তোমার বন্দনা-গীতি,—
তোমারই দান।

তখনো আছিল ডুবি' বিশ্ব মহা সাধনায় ;
রজনী আবৃতা ছিল তোমারই মহিমায়—
নীরব মাধুরী ;
আমারো এ ক্ষুদ্র প্রাণ চকিতের ঔদাসীন্যে
শুনেছে তোমারি, প্রভু, মহা-গীতি পাঞ্চজন্যে
চেতনা পাসরি'।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

নিয়তি।

——+•×——

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গভীরা রজনীতে যাহারা মৃগরায় চারণী দেবীর মন্দিরমধ্যে বসিয়া পূর্ব্বোক্তা সন্ন্যাসিনী ও সূর্য্যমল্ল কথোপকথন করিতেছিলেন। যামিনী গভীরা ; ধরণী সুষুপ্তির কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে ; পশ্চিমাকাশবিলম্বী শশাঙ্কের ক্ষীণরশ্মি আসিয়া উন্নত মন্দিরচূড়া স্পর্শ করিতেছে ; অনন্ত নীলাকাশের কোলে অনন্ত নক্ষত্রমালা নীরবে ধরার পানে চাহিয়া আছে ; নীল সাগরের বুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার ন্যায় খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘমালা অনন্তগগনপথে নীরবে ভাসিয়া চলিয়াছে ; কার্য্যময়

জগৎ কিছুক্ষণের জন্য শান্তির ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। এই শান্তিময় সুপ্তিময় নীরব নিস্তব্ধ রজনীতে মন্দিরমধ্যে ক্ষীণ দীপালোক সম্মুখে বসিয়া সূর্য্যমল্ল ও সন্ন্যাসিনী কথোপকথন করিতেছিলেন।

সন্ন্যাসিনী বলিতেছিলেন,—"সূর্য্যমল্ল, আমার বাক্যে কি তোমার বিশ্বাস হয় না?"

সূর্য্যমল্ল বলিলেন,—"আপনার ন্যায় দৈবশক্তিসম্পন্না সন্ন্যাসিনীর কথায় কে অবিশ্বাস করিতে পারে?"

সন্ন্যাসিনী ঈষৎ রূঢ়স্বরে বলিলেন,—"আর কেহ না পারিলেও তুমি পার।"

সূর্য্যমল্ল মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন,—"আপনার কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, কিন্তু আমি আমার অদৃষ্টকে অবিশ্বাস করি।"

সন্ন্যাসিনী গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—"অদৃষ্ট! অদৃষ্ট কাহাকে বলে সূর্য্যমল্ল?"

সূ। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল; যাহার সহায়ে ইহজন্মের অনুষ্ঠিত কার্য্যে সফলতা লাভ করা যায়।

স। ইহজন্মের কার্য্যের নিয়ামক কে? অদৃষ্ট না পুরুষকার?

সূ। বোধ হয় অদৃষ্টই প্রধান নিয়ামক।

"ভুল, ভুল, ভুল!" গম্ভীরকণ্ঠে মন্দির প্রতিধ্বনিত করিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"ভুল, ভুল, ভুল!" রুদ্ধ মন্দিরমধ্য হইতে যেন সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠিল,—ভুল, ভুল, ভুল! স্তব্ধ রজনীর গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া কে যেন বিকট কণ্ঠে বলিল,—ভুল, ভুল, ভুল! সূর্য্যমল্লের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে সন্ন্যাসিনীর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসিনী তাঁহার মুখের উপর তীব্রদৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন,—"শুন সূর্য্যমল্ল, সংসারে যাহারা অক্ষম, যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা অলস, তাহারাই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। কিন্তু যে বীর, যাহার বাহুতে বল আছে, আত্মশক্তিতে অটুট বিশ্বাস আছে, সে এই অদৃষ্টকে তুচ্ছ পদদলিত করিয়া হাসিতে হাসিতে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিবার জন্য ধাবিত হয়। অদম্য পুরুষকারের প্রভাবে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে।"

সূ। তবে কি অদৃষ্ট কিছুই নয়?

স। অক্ষম দুর্ব্বল অলস ব্যক্তির আত্ম-সান্ত্বনা ব্যতীত উহার আর কোনই মূল্য নাই।

সূর্য্যমল্ল নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন; সন্ন্যাসিনী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার

সূর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর সূর্য্যমল্ল বলিলেন,—"কিন্তু দেবি, রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করা কি মহাপাপ নয়?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"পাপ! পাপ কাহাকে বলিতেছ সূর্য্যমল্ল? যাহাতে যাহার কোন অধিকার নাই, তাহার লাভের জন্য চেষ্টা পাপ হইতে পারে। কিন্তু চিতোর-সিংহাসনে কি তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই? তুমি কি মহারাণা কুম্ভের ঔরসজাত পুত্র নও?"

সূ। কিন্তু আমি কনিষ্ঠ; জ্যেষ্ঠই সিংহাসনের অধিকারী।

স। এ অধিকার কি বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট? মানুষ নিজের সুবিধার জন্য কি এই অধিকার অনধিকারের সৃষ্টি করে নাই? অক্ষম জ্যেষ্ঠের পরিবর্ত্তে সক্ষম কনিষ্ঠ কি সিংহাসনের অধিকারী হইতে পারে না?

সূ। কিন্তু ইহা আমাদের কুলপ্রথা নয়?

স। তবে সঙ্গসিংহ থাকিতে, পৃথ্বীরাজ থাকিতে, জয়মল্ল কিরূপে সিংহাসনের অধিকারী নির্ব্বাচিত হইল?

সূ। সঙ্গ নিরুদ্দিষ্ট, পৃথ্বীরাজ নির্ব্বাসিত।

স। কিন্তু তাহারা জীবিত। একদিন সঙ্গ ফিরিয়া আসিতে পারে? একদিন পৃথ্বীরাজ আসিয়া সিংহাসনের দাবী করিতে পারে?

সূর্য্যমল্ল নীরব। তখন সন্ন্যাসিনী গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"শুন সূর্য্যমল্ল, বসুন্ধরা বীরভোগ্যা, ইহাতে কাহারও স্থায়ী অধিকার অনধিকার নাই। তাহা যদি থাকিত, তবে আজ দিল্লীর সিংহাসনে মুসলমান সম্রাটকে বসিতে দেখিতাম না।"

সূ। কিন্তু দেবি, আমার সহায় সম্পদ কিছুই নাই।

স। কয়জন সৈন্য লইয়া পৃথ্বীরাজ, মীনরাজ্য অধিকার করিয়াছে সূর্য্যমল্ল?

সূ। একজনও না।

স। একজনও যে ছিল না এমন নয়, একজন মাত্র তার সহায় ছিল। সে কে জান? পুরুষকার, উদ্যম, সাধনায় দৃঢ়সংকল্প। যাও সূর্য্যমল্ল, এই পুরুষকারকে সহচর করিয়া, এই উদ্যমে হৃদয় বাঁধিয়া স্থিরচিত্তে সাধনার পথে অগ্রসর হও, দেখিবে সিদ্ধি আসিয়া দাসীর ন্যায় তোমার চরণে লুটাইয়া পড়িবে।

আশার উৎসাহে সূর্য্যমল্লের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি সন্ন্যাসিনীকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। সন্ন্যাসিনী একা সেই নির্জ্জন মন্দির মধ্যে বসিয়া রহিলেন।

আমি মানব-হৃদয়কে সমুদ্রের সহিত তুলনা করিতে পারি। সমুদ্র কখন শান্ত সুনির্ম্মল স্থির, আপনার গাম্ভীর্য্যে আপনি স্তব্ধ, আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি মুগ্ধ; আবার কখন বা সামান্য বায়ুর আঘাতেই চঞ্চল, তরঙ্গভঙ্গ-ভীষণ, আপনার উন্মাদ তাণ্ডবে আপনি অস্থির। মানব-হৃদয়ও কখন কখন এমনই শান্ত ধীর স্থিরভাবে থাকে; তখন তাহা বড় সুন্দর, বড় সুনির্ম্মল, বড় গম্ভীর; তখন তাহাতে একটুও তরঙ্গ নাই, একটুও আবিলতা নাই, একটুও চাঞ্চল্য নাই। কিন্তু সহসা কোথা হইতে দুরাশার একটু ঝটিকা আসিয়া তাহার স্থির বক্ষে আঘাত করিল, অমনই মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই শান্ত সুনির্ম্মল গম্ভীর সাগর ভীমনাদে গর্জ্জিয়া উঠিল; তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল; ক্রমে বায়ুর বেগ যতই বাড়িতে লাগিল, ততই তাহা উন্মাদ তাণ্ডবে দিগন্ত কম্পিত করিয়া বিশ্ব গ্রাস করিতে প্রধাবিত হইল। ঝটিকার অবসানে সমুদ্র আবার স্থির হয়, দুরাশার অবসানে মানবহৃদয়ও আবার শান্তভাব ধারণ করে। সমুদ্র অপার অসীম, মানবহৃদয়েরও কেহ কখন সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছে কি?

সূর্য্যমল্লের হৃদয়-সমুদ্রেও একটা দুরাশার ঝড় উঠিয়াছে। তিনি যাহা নকখও ভাবেন নাই, যে দুরাশাকে কল্পনা করিতেও ভীত হইতেন, সন্ন্যাসিনীর কথায় আজি সেই দুরাশা তাঁহার হৃদয়ের অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছে। অদৃষ্টের রুদ্ধ ভবিষ্যদ্বার উন্মুক্ত করিয়া সন্ন্যাসিনী আজি তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, তিনিই চিতোরের রাজা; চিতোর সিংহাসন তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। চিতোর সিংহাসন—বাপ্পা রাওএর অধিষ্ঠিত চিতোর সিংহাসন, রাজপুতের সর্ব্বস্বধন চিতোর সিংহাসন, সে সিংহাসনে সূর্য্যমল্ল বসিবে? ইহাও কি সম্ভব? কিন্তু অসম্ভবই বা কি? এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্য নিয়তি তো প্রতিপদেই তাঁহাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে আহ্বান করিতেছে, তাঁহারই গন্তব্যপথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য ভ্রাতৃদ্বয় পৃথ্বীরাজ ও সঙ্গ আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়া নিরুদ্দিষ্ট নির্ব্বাসিত হইয়াছে। আছে শুধু জয়মল—নির্ব্বোধ ভীরু জয়মল্ল; আর বৃদ্ধ রাণা রায়মল্ল। এ কণ্টকদ্বয় সহজেই উৎপাটিত হইবে। তখন—তখন চিতোর সিংহাসন সূর্য্যমল্লের, সূর্য্যমল্ল চিতোরের অধিপতি। সন্ন্যাসিনীর গণনা নিষ্ফল হইবার নহে। হায় দুরাশা!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"কি করলে ইসুফ ?"

"কিসের কি করব জনাব ?"

"তোমার উপর যে কাজের ভার দিয়েছিলাম ?"

"আমার উপর গড় রক্ষার ভার আছে। আমি প্রাণপণে সে কর্ত্তব্য পালন করছি, পরেও করব।"

"তাতো করবেই, কিন্তু ইহা ছাড়া তোমায় কি আর একটা কাজের ভার দিই নাই ?"

"হ'তে পারে ; কিন্তু গোলামের স্মরণ হচ্চে না।"

"ছি, তুমি বড় বেবুব !"

কথাটা হইতেছিল, বর্ত্তমান তোড়াটঙ্কাধিপতি পাঠানসর্দ্দার লিল্লা খাঁর সহিত তদীয় সেনাপতি ইসুফ খাঁর। প্রভুর রূঢ়বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া ইসুফ বদন বিনত করিল। লিল্লা বলিলেন,—"তোমায় না শুরতানের সেই ঘোড়ায় চড়া মেয়েটাকে হাত করবার ভার দিয়েছিলাম ?"

প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া ইসুফ বলিল,—"আপনি দিয়েছিলেন, কিন্তু গোলাম সে কাজের অযোগ্য ব'লে প্রভুর সাক্ষাতেই ভারগ্রহণে অস্বীকার করেছিল।"

বিস্ময়ের সহিত লিল্লা বলিলেন,—"তুমি অযোগ্য ?"

গম্ভীরকণ্ঠে ইসুফ বলিল,—"সম্পূর্ণ অযোগ্য ; ইসুফ খাঁ যুদ্ধস্থলে শত্রুজয়ের কৌশল জানে ; কিন্তু সে স্ত্রীলোককে হাত করবার কৌশল অবগত নয়।"

লি। চেষ্টা করিলেই অবগত হওয়া যায়।

ই। এ শিক্ষা ইসুফ খাঁ কখনও পায় নাই।

লিল্লার মুখমণ্ডল গম্ভীরভাব ধারণ করিল। তিনি তীব্র দৃষ্টিতে ইসুফের মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"তবে কি তুমি আমার আদেশ পালনে প্রস্তুত নও ?"

ইসুফ স্থিরকণ্ঠে বলিল,—"আপনার আদেশে গোলাম প্রাণ দিতে প্রস্তুত।"

লিল্লা সক্রোধে বলিলেন,—"মিথ্যা কথা।"

ই। কি মিথ্যা জনাব ?

লি। তুমি যুদ্ধজয়ী বীর, এই গর্ব্বে তুমি আমায় অবজ্ঞা কর, আমার আদেশ অমান্য কর।

ইসুফের মুখ লাল হইয়া উঠিল; সে ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "খোদা জানেন; আপনার কথা যদি সত্য হয়, তবে ইসুফ খাঁ যেন অনন্ত কালেও খোদার কোপ হ'তে নিষ্কৃতি না পায়।"

লি। তবে শুন ইসুফ, আমার হুকুম—তুমি যেরূপে পার, তারাবাইকে আমার নিকট হাজির করে দাও।

ইসুফ মুখ নামাইয়া নীরবে রহিল। লিল্লা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"শীঘ্র উত্তর দাও।"

ইসুফ উঠিয়া দাঁড়াইল; উভয় হস্তে বক্ষ চাপিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল,—"প্রভুর আদেশ পালনে গোলাম অক্ষম, জনাব তারে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করুন।"

লিল্লার নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল; গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"তোমার উপযুক্ত শাস্তি প্রাণদণ্ড।"

ইসুফ জানু পাতিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিল। স্থিরস্বরে বলিল,—"দণ্ডগ্রহণে গোলাম প্রস্তুত।"

লিল্লা বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, সে মুখে ভীতি বা অধীরতার চিহ্নমাত্র নাই, তাহা স্থির, শান্ত, দৃঢ়তাব্যঞ্জক। লিল্লা নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বলিলেন,—"ইসুফ, উঠ।"

ইসুফ উঠিয়া দাঁড়াইল। লিল্লা ধীরভাবে বলিলেন,—"ইসুফ, আমি জানি, তুমি বীর, তুমি সাহসী, তুমি প্রভুভক্ত। কিন্তু জানি না, তুমি সময়ে সময়ে কেন এরূপ অবাধ্যতা প্রকাশ কর।"

ইসুফ সবিনয়ে বলিল,—"জনাব অন্নদাতা, আশ্রয়দাতা, আমার ইহকালের ঈশ্বর; আপনার আদেশ অমান্য করা ইসুফের সাধ্যাতীত। কিন্তু গোলাম যদি কখনও সে অপরাধে অপরাধী হ'য়ে থাকে, তবে জানবেন আপনার মঙ্গল কামনাই গোলামের সে অপরাধের কারণ।"

লি। আমার মঙ্গল কামনা? তুমি জান কি, তারাবাইএর জন্য আমার কলিজার ভিতর কি আগুন জ্বলছে?

ই। জানি; আরও জানি, এ আগুন দু'দিন পরেই নিভে যাবে। কিন্তু এখন যদি এ আগুনে তারাবাইকে পোড়াবার চেষ্টা করেন, তা' হ'লে জনাব,

সমগ্র রাজস্থানের মধ্যে এমন আগুন জ্বলে উঠবে, যে আগুনে তোড়া জ্বলে যাবে, পাঠানশক্তি পুড়ে ছার খার হবে, রাজস্থান হ'তে পাঠানের নাম চিরকালের জন্য মুছে যাবে।

ঈষৎ হাসিয়া লিল্লা বলিলেন, "ইয়ুফ, তুমি শুধু বীর নও, কল্পনাতেও তুমি অদ্বিতীয়।"

ইয়ুফ বলিল,—"কল্পনা নয় জনাব, ইহা কঠোর সত্য। অত্যাচারই অত্যাচারীর পতনের কারণ।"

লি। কিন্তু তুমি অত্যাচার কোথায় দেখলে ইয়ুফ? আমি কি তারার উপর অত্যাচার করব? রসুলাল্লা! তারে প্রধান বেগম ক'রে বুকের উপর রেখে দেব।"

ই। এ হ'তে আর কি অত্যাচার হ'তে পারে জনাব? হিন্দুকে মুসলমান করবেন, সতীর সতীত্ব নষ্ট করবেন, সুরতানের মাথায়—রাজপুত জাতির মাথায় কলঙ্কের ডালি তুলে দেবেন। এর চেয়ে আর কি অত্যাচার আছে জনাব?

লিল্লা গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"অত্যাচার হয় হোক; তোড়া যায় যাক, পাঠানের অদৃষ্টে যাই থাকুক, আমি তারাবাইকে চাই। আমার বুকের ভিতর লালসার আগুন জ্বলেছে; সে আগুনে আমার কলিজা পুড়ে যাচ্চে। এমন দগ্ধ জীবন নিয়ে আমি তোড়ার আধিপত্য চাই না। শুন ইয়ুফ, আমি তোমার প্রভু, প্রভুর আদেশ পালন কর্ত্তব্য ব'লে যদি তোমার মনে হয়, তবে তারাবাইকে হস্তগত করবার চেষ্টা কর। আমি তোমার কোন কথা শুনতে ইচ্ছা করি না। আমি বেহেস্ত চাই না, তারাকে নিয়ে আমি দোজখে যেতে প্রস্তুত।"

ই। প্রভুর আদেশ পালনের জন্য গোলাম প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু প্রাণ দিলেও বোধ হয় সে সিংহিনী পিঞ্জরাবদ্ধ হবে না।

লি। হবে না? তুমি কি বলছ ইয়ুফ? দুর্দ্দম পাঠান সৈন্য, তোমার মত অজের সেনাপতি—তথাপি একটা রমণী হস্তগত হবে না? তুমি কি বলছ ইয়ুফ?"

ই। যা' দেখেছি তাই বলছি জনাব। আপনি দূর হ'তে শুধু তার রূপ দেখেছেন, কিন্তু যুদ্ধস্থলে তার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখেন নি। সে কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! আলু থালু কেশপাশ, অঙ্গে দ্বাদশ সূর্য্যের প্রচণ্ড প্রভা, নয়নে প্রলয়ের তীব্র অগ্নিশিখা, করে শত্রু-শোণিতরঞ্জিত ভীম অসি, মুখে মার্ মার্ শব্দ, সে কি

ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! সে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি যদি দেখতেন, তবে বুঝতে পারতেন জনাব, শত শত ইসুফ খাঁ, কোটি কোটি পাঠান সৈন্যও সে ভীমা মূর্ত্তির কেশাগ্রস্পর্শে অক্ষম।

ক্রুদ্ধস্বরে লিল্লা বলিলেন,—"পাঠান-হৃদয়ে এত ভীরুতা' তা' আমি জানতাম না।

ইসুফের নেত্রদ্বয় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তীব্রকণ্ঠে বলি,—"কিন্তু জনাব, এই ভীরু পাঠান সৈন্যের সহায়ে বীরপূর্ণ রাজস্থানের মধ্যে যে অধিকারটুকু স্থাপন করেছেন—আবার বলছি—স্বেচ্ছায়—একটা স্ত্রীলোকের জন্য তার মূলে কুঠারাঘাত করবেন না।"

লিল্লা কোন উত্তর করিলেন না। ইসুফ বলিল,—"এদিকে আবার শুনছি, চিতোরের রাণা রায়মল্লের পুত্র জয়মল্ল, তোড়া অধিকারের জন্য যাত্রা করেছে।"

লিল্লা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"তোড়া জাহান্নমে যাউক, আমি তারাবাইকে চাই।"

ইসুফ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। এমন সময় জনৈক প্রহরী আসিয়া জানাইল, "একজন রাজপুত, হুজুরের সাক্ষাৎপ্রার্থী।"

লিল্লা তাহাকে আনিতে আদেশ দিলেন। ইসুফ, প্রভুকে সেলাম করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া ইসুফ দেখিল, ঊর্দ্ধে দূরপ্রসারী নির্ম্মল নীলাকাশ; আকাশের কোলে চাঁদ হাসিতেছে, নক্ষত্র জ্বলিতেছে, খণ্ড খণ্ড তরল মেঘ সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল নক্ষত্রবিমণ্ডিত নীল সমুদ্রের বুকে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। নিম্নে বিশালকায়া ধরণী,—ফলকুসুমসুশোভিতা কাননকুন্তলা গিরিতটিনীপরিবৃতা ধরণীর শ্যাম অঙ্গে জ্যোৎস্নার শুভ্র শীতল আবরণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে; যেন স্বর্গের কোন্ পুণ্যতম প্রদেশ হইতে পুণ্যময়ী দেববালার শান্ত সুশীতল হাস্যরশ্মি আসিয়া ধরণীর চিরসন্তপ্ত জীবকুলকে অভয় প্রদান করিতেছে।

ইসুফ সেই চন্দ্রকরপ্লাবিত নক্ষত্রবিভূষিত অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আপন মনে বলিল,—"খোদা! তোমার সৃষ্টির সকলই সুন্দর, কিন্তু মানুষের হৃদয় এত কুৎসিৎ কেন?"

ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কর্ম্ম-সাধনা।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥"

বহুদিন পূর্ব্বে এই পুণ্যময় ভারতে ধর্ম্মের নবীনপ্রবাহ প্রবাহিত করাইবার জন্য এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি কুরুক্ষেত্র সমরপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কর্ম্মবিমুখ বীরবর অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—হে কর্ম্মবন্ধনভীতহৃদয় সখে অর্জ্জুন! তুমি দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, যাহা খাইবে, যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, যাহা দান করিবে, যে তপস্যা করিবে, তৎসমস্ত কর্ম্মেরই ফলাফল আমার হস্তে অর্পণ করিবে; অর্থাৎ কর্ম্মজনিত ফলাফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া, শুভাশুভের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, কেবল আমার প্রীতিসাধনোদ্দেশেই বিধিবিহিত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিবে। তাহা হইলেই আর তোমাকে কর্ম্মের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে না।

কি মহান্ উপদেশ! কি অপূর্ব্ব কর্ম্মপ্রেরণা! তুমি কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মী জীব, কর্ম্মের সুদৃঢ় সূত্রে তোমার হস্তপদ আবদ্ধ; সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে, কর্ম্মক্ষেত্রে বসিয়া তুমি মুহূর্ত্তের জন্যও নিষ্কর্ম্মাভাবে অবস্থান করিতে পারিবে না। এ ক্ষেত্রে যদি তুমি কর্ম্মের সুদৃঢ় গণ্ডী ভেদ করিতে ইচ্ছা কর, তবে নিজের জন্য—স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কর্ম্ম করিও না, আমার জন্য—জগতের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে, তোমার কর্ম্মানুষ্ঠান সার্থক হইবে, কর্ম্মের দুর্ভেদ্য গণ্ডী ভেদ করিয়া তুমি সংসার হইতে উচ্চে—উচ্চতর স্থানে অবস্থিতি করিবে। জানি না, এমন উপদেশ, এমন কর্ম্মপ্রেরণা আর কোন শাস্ত্রে আছে কি না।

কর্ম্ম দুই প্রকার; এক স্বার্থময় অপর নিঃস্বার্থ। যে কর্ম্ম স্বার্থময় তাহা নিজের জন্য, স্বীয় ভোগলালসা পরিতৃপ্তির জন্য অনুষ্ঠিত হয়। আমি অর্থোপার্জ্জন করি, পরিবার প্রতিপালনের এবং নিজের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য, আমি দোল-দুর্গোৎসব করি, লোকের নিকট নাম পাইবার জন্য; আমি দান করি, দাতা বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য; আমি পরোপকার করি, তোমাদের নিকট সুখ্যাতি পাইবার জন্য; আমি উপদেশ দিই, পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য; আমি

ঈশ্বরারাধনা করি, শ্রদ্ধাভক্তি কুড়াইবার জন্য। আমার এ সকল কর্ম্মই আমার নিজের জন্য, সমস্তই স্বার্থবিষে জর্জ্জরিত। এ কর্ম্মের পরিণাম উত্তরোত্তর মোহের তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে পতন। এ কর্ম্মসাধনায় আত্মার উন্নতি নাই অবনতি আছে, শান্তি নাই অশান্তি আছে, নির্ম্মল সুখ নাই, সুখকণিকামিশ্রিত বিপুল দুঃখরাশি আছে। ইহাতে মন ক্রমশঃ আত্মম্ভরি হয়, হৃদয় সঙ্কীর্ণ হইয়া আইসে, বুদ্ধিবৃত্তি মলিন হইয়া যায়।

তবে আমি কিরূপ কর্ম্ম করিব? যাহাতে আমার স্বার্থ নাই তেমন কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব? স্বার্থ ব্যতীত কি কর্ম্ম আছে? কেন থাকিবে না? স্বার্থশূন্য অসংখ্য কর্ম্ম আছে। সেরূপ কর্ম্ম তুমি করিতে পারিবে না? কেন পারিবে না? না পারিলে তুমি মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ কেন? নিকৃষ্ট জীব কাক-শূকরাদিও তো স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কর্ম্ম করে; অমেধ্য অস্পৃশ্য দ্রব্য সেবনে আত্মোদর পূর্ণ করে? তাহা হইতে উচ্চজীব তুমি—তুমিও যদি কেবল আত্মোদর পূরণার্থ স্বার্থপূর্ণ কর্ম্ম কর, তবে কাকশূকরাদি হইতে তোমার পার্থক্য কি? তাহাদের অপেক্ষা তুমি কিসে কোন্ গুণে উচ্চ?

পশ্বাদি ইতর জীবের বিবেচনা শক্তি নাই, হিতাহিত জ্ঞান নাই, শুভাশুভ বোধ নাই। কিন্তু তোমার এ সমস্তই আছে। আছে বলিয়াই তুমি মানব, পশ্বাদি জীব হইতে উচ্চ পদবীতে সমারূঢ়। এই উচ্চশ্রেণীভুক্ত হইয়াও যদি তুমি নিকৃষ্ট শ্রেণীর ন্যায় আচরণ কর, কার্য্য কর, আত্মোদর পূরণ করিয়াই যদি তুমি কৃতার্থ হও, তবে তোমার মনুষ্যত্বে ধিক্, তোমার জ্ঞানে ধিক্, তোমার মানব জন্মপরিগ্রহে ধিক্! পশু পশুর মত কার্য্য করিবে, তুমি মানুষ, মানুষের মত কাজ কর। নিজের কাজের সঙ্গে এক আধটু পরের কাজও করিয়া যাও।

আজি হয়তো তুমি অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া বলিতে পার, বৃথা কেন পরের জন্য খাটিয়া মরিব? কিন্তু একদিন তোমার এমন সময় আসিতে পারে, যখন পরের সহায়তা ভিন্ন তোমার একপদও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা থাকিবে না, পরের স্কন্ধে ভর না দিলে এক মুহূর্ত্তও তুমি দাঁড়াইতে পারিবে না। সংসারে সকলেই যদি কেবল আপনার কাজ করিয়া যায়, কেহ কাহারও মুখের দিকে না চাহে, পরের অশ্রু দেখিয়া পরে অশ্রুপাত না করে, তবে একদিনে এক মুহূর্ত্তেই সংসার-যন্ত্র অচল হইয়া পড়ে, একদিনে বিশ্ব, ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয়। সুতরাং পরের জন্য তোমাকে খাটিতেই হইবে, আপনাকে বজায় রাখিয়া

স্বীয় পিতৃনাম রক্ষার সহিত পরের 'বাপের নাম' বাঁচাইবার জন্যও তোমাকে চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টার নামই মনুষ্যত্ব, ইহাই মানবের প্রকৃত কর্ম্ম।

তুমি স্বর্গলাভের জন্য যাগ যজ্ঞ করিতেছ, কিন্তু প্রকৃত স্বর্গ কোথায় জান? পরার্থে আত্ম-সমর্পণে। তুমি মুক্তির আশায় ঈশ্বরের নিকট ভক্তি প্রার্থনা করিতেছ; কিন্তু ভক্তির মূল উৎস কোথায় জান? পর-প্রেমে। ঐ যে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী—যাঁহার একবিন্দু সলিল স্পর্শে অশেষবিধ পাপে পাপীও মুক্তিলাভ করে, তাঁহার এত পবিত্রতা কেন জান? তাঁহার সর্ব্বস্ব পরার্থে উৎসৃষ্ট। ঐ যে ভগবান্—যাঁহাকে হিন্দু কৃষ্ণ বিষ্ণু বলে, মুসলমান খোদা বলে, খৃষ্টান গড বলে, তাঁহার এত মহিমা এত শক্তি কেন জান? তাঁহার নিজের কিছুই নাই, তিনি আপনার জন্য কিছুই করেন না, যাহা কিছু করেন, সকলই পরের জন্য। যজ্ঞাদিজনিত স্বর্গভোগ পারলৌকিক, কিন্তু পরপ্রেমজনিত স্বর্গসুখ ইহলোকেই অনুভূত হইয়া থাকে।

কিন্তু বুঝিয়া দেখিতে গেলে কে তোমার পর? বহুদিনব্যাপী মোহের অধীনতায় নিরুদ্ধনেত্র হইয়া আজি তুমি যাহাকে পর বলিয়া ভাবিতেছ, বাস্তবিক সে তো তোমার আপনার—বড় আপনার, এক মায়ের পেটের ভাই। ঐ যে আসমুদ্র হিমাচলবাসী নরনারী, উহাদের মধ্যে কে তোমার পর? সকলেই এক মাতার গর্ভজাত, এক স্নেহময়ী জননীর স্তন্যপানে বর্দ্ধিত, এক মাতার স্নিগ্ধ শ্যামাঞ্চল ছায়ায় প্রতিপালিত। তবে কে তোমার পর?

বহুদিনের মোহে, বহুদিনের জড়তায় তুমি ধর্ম্ম ভুলিয়াছ, শাস্ত্র ভুলিয়াছ, আপনাকে ভুলিয়াছ; সুতরাং তোমাকে আবার নূতন করিয়া সাধনা করিতে হইবে, নূতন করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। ঐ শুন তোমার পুরাতন শাস্ত্র কি সুমহান্ ধর্ম্ম ঘোষণা করিতেছে, প্রাচীন ইতিহাস কি অপূর্ব্ব নিষ্কাম কর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে। ভীত বা বিস্মিত হইও না, সত্যই তোমাকে নূতন ভাবে কর্ম্মসাধনা করিতে হইবে। যদি তোমার নিরুদ্ধনেত্র কিছুমাত্রও উন্মীলিত হইয়া থাকে, যদি অধঃপতিত আত্মার পুনরুদ্ধার করিতে চাও, যদি মুক্তির পথ পরিষ্কার করিতে বাসনা থাকে, তবে আবার কর্ম্মী হও; পর-প্রেমের পুণ্য প্রবাহে কলুষিত স্বার্থমল ভাসাইয়া দিয়া নূতন প্রাণে নূতন সাধনায় কর্ম্মানুষ্ঠান কর, দেখিবে একদিনে তুমি মুক্তির কত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছ।

আজি তুমি যাহাকে স্বদেশহিতৈষিতা নামে অভিহিত করিতেছ তাহা আর কিছুই নয়, ঐ নিষ্কাম কর্ম্ম। বহুদিন পূর্ব্বে আর্য্যমনস্বিগণ এই মহামন্ত্রের

ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, পরের জন্য আত্মত্যাগ—স্বার্থত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, এই নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যতীত দেশের, সমাজের, মানব জাতির উন্নতি নাই, আত্মার কল্যাণ নাই। বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা ঐহিক ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া কৌপীনমাত্র সম্বল করিয়া বিশ্বের মঙ্গল-দ্বারে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তাই কর্ম্মময় মহাপুরুষ বাসুদেব রাখাল-বেশে গোচারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অর্জ্জুনের রথরজ্জু ধারণ করিয়াছিলেন, শেষে নির্ম্মম হৃদয়ে নিজবংশকেও ধ্বংসের পথে প্রেরণ করিয়া জগতে নিষ্কাম কর্ম্মের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনা করিতে হইলে এমনই করিতে হয়; স্বার্থবিজড়িত মোহ-মমতাকে পরার্থপরতার তীক্ষ্ণ অস্ত্রে এমনই করিয়া ছেদন করিতে হয়।

এখন তোমাকেও এমনই নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ঐ উচ্চ আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আবার তোমাকে সাধনার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে হইবে। ভীত হইও না, তোমাকে এ সুখের চাকরি ছাড়িয়া, পত্নীপুত্রের মমতা ত্যাগ করিয়া, সংসারের সকল ভোগসুখ বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসী সাজিতে হইবে না, কৌপীন পরিয়া, ছাই মাখিয়া, চিমটা হাতে গাঁজা টানিতে হইবে না। সংসার ছাড়িলে চলিবে না, সংসারে থাকিয়াই কর্ম্ম করিতে হইবে। ঐ দেখ, দুর্ভিক্ষের তাড়নায় লক্ষ লক্ষ নরনারী একমুষ্টি অন্নের জন্য হাহাকারে গগন বিদীর্ণ করিতেছে; যদি তোমার ঘরে অন্ন থাকে, তাহার একমুষ্টি ঐ ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর মুখে তুলিয়া দাও। ওদিকে দেখ, অত্যাচারপ্রপীড়িত শত শত ব্যথিত হৃদয় আকুল দৃষ্টিতে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, তোমার যতটুকু শক্তি আছে, তাহা দিয়া উহাদের অন্তরের ব্যথা মুছাইয়া দাও; শক্তি না থাকে দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া শক্তি ভিক্ষা কর, ভগবানের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বল, ঠাকুর, আমায় শক্তি দাও, শক্তি দাও—ক্ষুধিতের ক্ষুন্নিবারণে, ব্যথিতের ব্যথা মোচনে আমায় শক্তি দাও, সাহস দাও, প্রবৃত্তি দাও।

কিন্তু তুমি যেন ভুলিয়াও কখন প্রশ্ন করিও না যে, ইহাতে কি হইবে। কি হইবে তাহা জানিতে তোমার অধিকার নাই। যাহা হইবার তাহাই হইবে, যাহা হইবার নহে তাহা হইবে না। সে দিকে তুমি ফিরিয়া চাহিও না। তুমি কর্ম্মী জীব, কর্ম্মময় জগতে শুধু কর্ম্ম করিয়া যাও। আর মনে মনে বল,—

"প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥"

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সেই দেখা।

——×:*:×——

সেই কি প্রথম দেখা জীবনে আমার!
আকাশের দূর প্রান্তে
রাঙা রবি ডোবে শ্রান্তে,
সাদা কাল রাঙা মেঘে ঘিরি চারিধার—
সাঁজের সোণালি রবি চুমে বার বার।

পূরবে চাঁদের হাসি অধরে ফুটিল;
আঁধার নামিয়া এল,
দিনমণি চলে গেল,
বিষাদে বিধুর ধরা তিমিরে ডুবিল;
ধীরে ধীরে তারামালা গগনে উদিল।

প্রকৃতির সন্ধিস্থল বুঝি সে সময়!
লতিকার ফুল গুলি,
চাঁদ পানে মুখ তুলি,
আবেশে ঢলিয়া পড়ি জোছনার গায়—
লাজ ভয় দূরে ফেলি সুষমা বিলায়।

আজো যেন কাণে বাজে শঙ্খঘণ্টা রব!—
মঙ্গল আরতি করে,
কুলনারী ঘরে ঘরে,
এমনি সময়ে ঠিক নদীকূলে সব,
[illegible]গর আবাল বৃদ্ধ করে ক[illegible]।

সে বুঝি গো বসন্তের বাসন্তী দশমী !
পিলি পিলি পুরনারী,
গিয়াছিল সারি সারি ;
হাতে হাত ধরাধরি ধীরে সে ও আমি—
গিয়াছিনু দেখিবারে বিজয়া দশমী।

প্রতিমা ডুবিয়া গেল বিশাখার নীরে ;
হতাশে ফিরিতে ঘরে,
পিছলিয়া গেনু সরে,
লতায় চরণ বাধি পড়িলাম তীরে,—
সে মোরে ফেলিয়া গেছে, চেয়ে দেখি ফিরে।

হৃদয়ে ভাসিছে আজো তারি অবস্থায় !
থাকে থাকে জ্যোতির্ম্ময়,
আবার উদয় হয়,
আবার কাঁদায়ে মোরে দূরে ফেলে যায় ;
সবি তার আছে যেন নদী-কিনারায় !

সেই কি প্রথম দেখা সেই মধুমাস !
মধুর মধুর সব,
মধুর পাখীর রব,
মধুর সে অবয়ব মৃদুমধু হাস ;
মধু যেন ঢালে বুকে তারি মধুভাষ।

না—আর এক দিন দেখা অভাগার সনে,
পাষাণে হৃদয় বাঁধি,
সে যেন বলেছে কাঁদি,—
"ভুলে যাও—ভুলে যাও—তুলিও না মনে,
ফুটিবে না প্রেম ফুল, আর প্রেম-বনে ;

হে পুরুষ !—বালবন্ধু ভুলিওনা ধর্ম্ম।
স্বদেশ 'স্বদেশী' চায় কর মাতৃ-কর্ম্ম॥"

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

সমালোচনা।

——+•×——

মুসলমান বৈষ্ণব কবি আলিরাজা।—শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত। মূল্য ।৵০ আনা।

চৈতন্য দেবের সম সময়ে বা তাহার পরবর্ত্তী কালে যে সকল মুসলমান বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, আলিরাজা তাঁহাদেরই অন্যতম। ইঁহার প্রকৃত নাম ওয়াহেদ কানু; সাধারণতঃ ইনি কানু ফকির নামেই পরিচিত ছিলেন। ইঁহার কবিতা বা পদগুলি প্রেম ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে প্লাবিত। আমরা এস্থলে একটী মাত্র পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

আমি কালার বিরহিণী জগতের মাঝে ॥ ধু ॥
বিরহিণী প্রেম দুঃখ সহে যেই মতে।
সে দুঃখের দোষ গুণ না জানে জগতে ॥
সংসারের সুখভোগ সব করি নাশ।
কায়মনে পীরিতি সেবিতে মোর আশ ॥
আপনা বিনাশ যদি ভাবকে না করে।
প্রেমসিদ্ধি মনবাঞ্ছা ফল নাহি ধরে ॥
আলিরাজা ভণে সার সেবি প্রেমানল।
আপ্ত (আত্ম) নাশ করি পায় প্রেমসিদ্ধি ফল ॥

REPORT OF THE CHAITANYA LIBRARY For 1905, 1906, 1607. (চৈতন্য লাইব্রেরীর ইং ১৯০৫, ১৯০৬ এবং ১৯০৭ সালের বার্ষিক বিবরণী)।

এই বিবরণী পাঠে আমরা অবগত হইলাম যে, এই কয়েক বৎসরের মধ্যে চৈতন্য লাইব্রেরী সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। এক্ষণে ইহাতে ৪২৭৮ খানি বাঙ্গালা পুস্তক এবং ৩০৯০ খানি ইংরাজি পুস্তক, মোট ৭৩৬৮ খানি পুস্তক রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদপত্র (মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক প্রভৃতি) এক শতেরও অধিক আছে। এই লাইব্রেরী হইতে বর্ষে বর্ষে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধের জন্য প্রবন্ধ লেখককে পদকাদি পুরস্কারও

প্রদত্ত হইয়া থাকে। ১৮৯০ খৃঃ হইতে এ পর্য্যন্ত ৩৩ খানি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই লাইব্রেরীর উন্নতি কামনা করি।

REPORT OF HTE MAJU PUBLIC LIBRARY. From October 1905 to September 1907. (মাজু সাধারণ পাঠাগারের ১৯০৫ সালের অক্টোবর হইতে ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বার্ষিক বিবরণী)।

এই বিবরণী পাঠে আমরা অবগত হইলাম যে, স্থানীয় কয়েকজন উৎসাহী যুবকের উদ্যোগে ইং ১৯০২ সালে এই পাঠাগার স্থাপিত হয়। পরে সাধারণের উৎসাহে ও সহায়তায় ইহা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করে। অধুনা সার রাজা পিয়ারিমোহন মুখোপাধ্যায় C. S. I. শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু M. A. B. L, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ M. A. প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার পৃষ্ঠপোষক। এক্ষণে পাঠাগারে বাঙ্গালা পুস্তক ১০৪২, ইংরাজি ২২১ এবং মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্র ১৮ খানি রহিয়াছে। ইহার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থাও মন্দ নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অল্পদিনের মধ্যেই পাঠাগারটী বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে। সামান্য পল্লীগ্রামের পক্ষে ইহা যথেষ্ট প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।

পল্লীগ্রামে সাধারণ পাঠাগার স্থাপন দ্বারা প্রধানতঃ দুইটী উপকার পাওয়া যায়। (১) সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার, (২) স্থানীয় লোকদের বিবিধ কুপ্রবৃত্তির দমন। পল্লীগ্রামে এমন অনেক যুবক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা অল্প বা অধিক শিক্ষালাভ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকেন, এবং অবকাশকালে (দিবা-রাত্রির অধিকাংশ সময়ই ইঁহাদের অবকাশকাল) একটা আড্ডা জমাইয়া তামাক গাঁজা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে পঞ্চ মকারের পর্য্যন্ত উপাসক হইয়া পড়েন। তাঁহাদের এরূপ অধঃপতনের প্রধান কারণ, সময়ক্ষেপণোপযোগী বিশুদ্ধ কার্য্য বা স্থানের অভাব। সাধারণ পাঠাগার দ্বারা তাঁহাদের সে অভাব দূর হইতে পারে। তদ্ব্যতীত এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা কার্য্যান্তরের অভাবে প্রাতে ও অপরাহ্নে একস্থানে সমবেত হইয়া পরকুৎসা এবং দলাদলির আলোচনায় সময় অতিবাহিত করেন। তাঁহারা ঐ সময় এই পাঠাগারে বসিয়া সংবাদপত্রাদি পাঠ করিলে অনেক পরিমাণে গ্রাম্য দলাদলির নিবৃত্তি হইতে পারে। এই সকল কারণে আমরা দূর পল্লীগ্রামে এক একটী সাধারণ পাঠাগার স্থাপন বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি। দেশের উন্নতি করিতে হইলে অগ্রে পল্লীগ্রামের সংস্কার আবশ্যক। যাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে পাঠাগার স্থাপন পূর্ব্বক পল্লীসংস্কারে

উদ্যোগী হন, তাঁহারা যে দেশের এবং সমাজের ধন্যবাদের পাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পরিশেষে বক্তব্য যে, আমরা "মাজু সাধারণ পাঠাগারের" উন্নতি দর্শনে অতীব আনন্দিত হইয়াছি, এবং মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেছি।

জাহ্নবী।—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। পৌষ, ১৩১৪ সাল।

কবিতা, গল্প এবং অন্যান্য প্রবন্ধাদিতে ৮টী তরঙ্গ লইয়া পৌষের জাহ্নবী শেষ বসন্তে নবপল্লবিত পিককণ্ঠমুখরিত তীরতরুর মধ্য দিয়া সঙ্কুচিতশরীরে মৃদুগতিতে প্রবাহিতা হইয়াছেন। ইহার প্রথম তরঙ্গ 'কি চাই' লেখক শ্রীউমাকান্ত কাব্যতীর্থ। সংসারে আমরা চাই সুখ, এবং তাহারই জন্য নানাবিধ দুঃখ ভোগ করি। এই সুখাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিতে পারিলেই প্রকৃত সুখলাভ হয়, ইহাই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। প্রবন্ধটী মন্দ হয় নাই। দ্বিতীয় তরঙ্গ 'কর্ম্মযোগ না কর্ম্মভোগ' লেখক শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ক্ষুদ্র হইলেও পড়িয়া সুখী হইলাম। তৃতীয় তরঙ্গ 'শিবের কাণ্ড' (গল্প) লেখক শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। গল্পটী মন্দ হয় নাই। 'ভাল হইয়াছে' না বলিয়া 'মন্দ হয় নাই' বলিলাম কেন? বলিবার একটু কারণ আছে। যে সকল গুণ থাকিলে গল্পটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিত, ইহাতে তাহার কতকগুলি গুণের অভাব আছে। প্রথমতঃ ইহার একটী চরিত্রও সম্পূর্ণ নহে। দ্বিতীয়তঃ, গ্রে সাহেব বহু লাঠীয়াল সঙ্গে লইয়া দেবেন্দ্রনাথের পত্নী কমলাকে হরণ করিতে গেলেন; কিন্তু লাঠীয়ালদিগকে বাহিরে রাখিয়া তিনি একা বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন; এরূপে একটা অপরিচিত বাটীতে একা প্রবেশ করিয়া একজন কুলবধূকে হরণ করিতে যাওয়া যে বিপজ্জনক, তাহা তিনি একবারও ভাবিলেন না। তৃতীয়তঃ, কমলের হাতে রিভলবার দিবার উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিলাম না। এই রিভলবারের জন্যই প্রথমে একটী স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদের অবতারণা করিতে হইয়াছে, নতুবা সে পরিচ্ছেদের আর কোনই সার্থকতা নাই। কিন্তু এই রিভলবারের কার্য্যতো কিছুই দেখিতে পাইলাম না; কমল তো পিস্তল হাতে লইয়া 'ঠিক একটী নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির' ন্যায় দ্বারের উপর দাঁড়াইয়াই রহিল। চতুর্থতঃ, শিবে ডাকাত কিরূপে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল? বাহিরে সাহেবের লাঠীয়ালেরা ছিল, বাটী প্রবেশের সময় তাহাদের সহিত একটু সংঘর্ষ হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু লেখক তাহার কোন উল্লেখ না করিয়া দেখাইয়াছেন, শিবে

যেন শূন্যপথে অথবা ভূগর্ত্ত বিদারণ করিয়া সহসা কমল ও সাহেবের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। পঞ্চমতঃ, শিবে ডাকাত ধরা দিল কেন? সাহেবের লোকজন পলাইয়াছে, কুলবধূর ধর্ম্ম রক্ষা পাইয়াছে, তখন সে তো অনায়াসেই পলাইতে পারিত। কিন্তু সে 'নিজের দলবলকে সরাইয়া দিয়া নিজে ধরা দিল'। এ স্থলে ইচ্ছাপূর্ব্বক ফাঁসীকাঠে ঝুলিবার উদ্দেশ্য ব্যতীত তাহার তো ধরা দিবার আর কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। কিন্তু তাহার এ 'শুভ' উদ্দেশ্যের হেতু কি? অধুনা যেমন কেহ কেহ বাহাদুরি লাভের আশায় ইচ্ছাপূর্ব্বক জেলে যাইতে উদ্যত হয়, শিবেও কি সেই প্রকৃতির ছিল? থাকিলেও আমরা কিন্তু তাহার এ বাহাদুরির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। ষষ্ঠতঃ, শিবে ডাকাতের প্রহারে সাহেব অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কখন্ কিরূপে মরিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই, অথচ তাঁহাকে হত্যা করা অপরাধে শিবের ফাঁসি হইয়া গেল। যাহা হউক, লেখকের লিখিবার শক্তি আছে, লিখিবার উপযোগিনী ভাষা আছে; ভবিষ্যতে সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লিখিতে পারিলে তাঁহার আয়াস সফল হইবে। চতুর্থ তরঙ্গ 'ভারতে দানশীলতা' লেখক শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। মন্দ লাগিল না। পঞ্চম তরঙ্গ 'প্রবাস প্রসঙ্গ' লেখক শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গটী বাদ দিলেও বোধ হয় জাহ্নবীর সৌন্দর্য্যের বিশেষ হানি হইত না। ষষ্ঠ তরঙ্গ 'সাজী'; সাজির ফুলগুলি মন্দ নয়; তবে সাজির ইকারটা দীর্ঘ হইয়া পড়িল কেন, বুঝিলাম না। সপ্তম তরঙ্গ 'ত্রৈমাসিকী' লেখক শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়। ইহাকে 'সংবাদ' নামে অভিহিত করিলেই চলিত। অষ্টম তরঙ্গ 'খেয়া শেষে' (কবিতা) লেখক শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। ইহার 'ফেনিলোচ্ছ্বল রাঙা জল' দেখিয়াই আমরা সভয়ে জাহ্নবীকে নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

উদ্বোধন।

—— ×:*:× ——

আর কত কাল, ভারত সন্তান,
রহিবে ঘুমায়ে—চেতনা-হীন।
মোহনিদ্রা ত্যজি, মেলহ নয়ন,
নেহার আগত—সুখের দিন॥
ওই শুন বীণা, সুমধুর তানে,
জাগা'য়ে দিতেছে—উদ্দেশ্য প্রাণে।
কর্ত্তব্যের পথে, হও আগুয়ান,
মাতাও ভারত—জাতীয় গানে॥
ধর্ম্ম কর্ম্মহীন, পতিত সন্তান,
উৎসাহ বিহীন—হৃদয় মন।
শিখাও তা'দের, শক্তিপূজা ভবে,
মাতৃপূজা, কর—জীবন পণ॥
জয় জয় নাদে, কাঁপায়ে অম্বর,
জাগাও দেবতা—ত্রিদিব ধামে।
জবা বিল্বদলে, পূজহ মায়েরে,
উড়াও নিশান—মায়ের নামে॥
মাতৃ-আশীর্ব্বাদে, দেবের কৃপায়,
কি অভাব আছে—ভারত ভূমে।
জয় জয় বলি, প্রদান আহুতি,
পূর্ণ কর বিশ্ব যজ্ঞীয় ধূমে॥
শ্মশান ভারত, হইবে স্বরগ,
ঘুচিবে জীবের—সকল দুখ।
আনন্দ সলিলে ভাসিবে আবার,
ভারত মাতার—কমল মুখ॥

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

কৃত্রিম উপায়ে রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন
ও ভারতের ভাবী উন্নতি।

—— ×০× ——

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে গন্ধ দ্রব্যের বিশেষ আদর আছে। দেবোপাসনা ও অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ধূপ ধুনা ও চন্দন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বেশ বিন্যাসের জন্যও গন্ধ দ্রব্যের প্রচলন আছে। এতদ্ভিন্ন আজকাল লিমনেড সাবান এসেন্স প্রভৃতি সুগন্ধি ও উপাদেয় করিবার জন্য গন্ধ দ্রব্য বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। গন্ধ দ্রব্যগুলি শুধু বিলাস সাধনের সামগ্রী নহে। স্নিগ্ধকর এবং স্বাস্থ্যজনক বলিয়া ইহাদের দ্বারা বিস্তর উপকার সাধিত হয়। গোলাপ, হেনা, জুঁই, মল্লিকা, চাঁপা, খসখস, মতিয়া প্রভৃতি লতা ও ফুলের গন্ধ মোগল বাদসাহদিগের সময় হইতে প্রচলিত আছে। প্রবাদ আছে যে, নুরজাহানের বিবাহোৎসবের সময় আতর সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কৃত হয়। প্রাসাদের উদ্যানে গোলাপ জলের আধার রক্ষিত ছিল। তাহার উপরে তৈল ভাসিতেছে দেখিয়া রাজ্ঞী নুরজাহান স্বীয় প্রতিভাবলে উহা যে গন্ধদ্রব্যের আকর তাহা আবিষ্কার করিয়া পতি নামানুসারে "জাহাঙ্গিরী আতর" নাম রাখিয়াছিলেন।

এত প্রকারের মূল উপাদান প্রাপ্তির সুবিধা সত্ত্বেও আমরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে নির্য্যাস গ্রহণে অক্ষম বলিয়া বিদেশীয়দিগের নিকট প্রতিযোগিতায় পরাভূত হইতেছি। পুরাতন প্রথা অবলম্বন ব্যতীত নূতন পন্থা উদ্ভাবন বা প্রয়োগ করিতে যত্নবান নহি। বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন প্রকারের ঊর্দ্ধপাতন (distillation) পেষণ (expresion) শোষণ (absorption) প্রণালী আবিষ্কার করিয়া গন্ধদ্রব্য আহরণ সুকর করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমরা আবহমানকাল হইতে প্রচলিত তিল ও চন্দন তৈলের দ্বারা নির্য্যাস গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন প্রথা অবগত নহি। এদেশে উৎপন্ন গন্ধদ্রব্য যে উগ্রভাবাপন্ন হয়, ইহাই তাহার অন্যতম কারণ।

ভারতবর্ষ হইতে এখন প্রতি বৎসর ৭ লক্ষ টাকার গন্ধদ্রব্য ও তৈল রপ্তানি হয়। নির্য্যাস গ্রহণের প্রথা জানা না থাকাতে আমরা অনেক কাঁচা জিনিস রপ্তানি করিয়া থাকি। চন্দনকাষ্ঠ ইহাদের অন্যতম। দাক্ষিণাত্যে চন্দনবৃক্ষ

প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মহীশূর রাজ সরকার হইতে চন্দনকাষ্ঠ চালাই করিবার জন্ত ছোট ছোট যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে অধিক পরিমাণে চন্দনতৈল উৎপন্ন না হওয়ায় কাষ্ঠ জর্ম্মানিতে চালান হইতেছে। উৎকৃষ্ট যন্ত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইউরোপে প্রস্তুত চন্দন তৈল দেশী তৈল অপেক্ষা সুগন্ধ বিশিষ্ট।

ফুল প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য হইতে গন্ধ সংগ্রহ না করিয়াও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে তদ্রূপ গন্ধবিশিষ্ট কৃত্রিম সুগন্ধি প্রস্তুত হইতেছে। ভ্যানেলিন, কৌমারিণ নামক দুই প্রকার গন্ধদ্রব্য আমেরিকার কতকগুলি বৃক্ষের অংশ হইতে উৎপন্ন হইত। বৈজ্ঞানিকগণ আণবিক গঠন নিরূপণ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে এই সকল গন্ধদ্রব্য উৎপন্ন করিতেছেন। এতদ্দ্বারা স্বভাবজাত দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা ইহাদের মূল্য অল্প হইয়াছে। কর্পূর ও মৃগনাভির গন্ধ অনুকরণ করিয়া বিভিন্ন প্রকারের সুগন্ধি দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল পদার্থ, যাহা আমরা দুর্গন্ধ ও অব্যবহার্য্য বলিয়া পরিত্যাগ করি, এইরূপ জিনিস হইতে উৎপাদিত হইতে পারে। গ্যাস প্রস্তুত করিবার সময় আলকাতরার সহিত এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ উৎপন্ন হয়। পরিষ্কৃত ও শোধিত হইবার পর ইহা হইতে সুন্দর সুন্দর রং, ঔষধ ও বহুবিধ সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হয়। অশ্ব ও গোমূত্রের Hippuric acid নামক পদার্থ হইতে বাদামের তৈলের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট পদার্থ উৎপন্ন করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে গুড় প্রভৃতি হইতে যে প্রকার মদ প্রস্তুত হয়, ইউরোপে গোল আলু হইতে সেইরূপে মদ তৈয়ারি হয়। মদে "সাধারণ" Spirit অপেক্ষা গুরুভার বিশিষ্ট fusel oil নামক পদার্থ থাকে। ইহা দুর্গন্ধ বিশিষ্ট এবং স্বাস্থ্যের অপকারী বলিয়া মদ্য হইতে পৃথক করা হয়। কিন্তু এই fusel oil এর প্রধান উপকরণ amyl alcohol হইতে পেয়ারা আনারস প্রভৃতির ন্যায় সুগন্ধ বিশিষ্ট গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়। পরিত্যক্ত ও অব্যবহার্য্য জিনিস হইতে ইউরোপে এই প্রকারে মহামূল্য পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হয়। বাস্তবিক বৈজ্ঞানিকেরা যাদুকরের জাতি। ইঁহারা ধূলিমুষ্টিকে স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত করিতে পারেন। আমাদের দেশে সম্প্রতি যে এবিষয়ে চেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছে ইহা অতি আনন্দের বিষয়। বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস এর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম, এ এবং চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী মহাশয়গণের দৃঢ় অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক চেষ্টায় কৃত্রিম প্রণালী দ্বারা ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য উৎপাদিত হইয়াছে। আশা করা যায় এতদ্দ্বারা একটী নূতন ব্যবসায়ের সূত্রপাত হইল।

এখন আমাদের জাতীয় জীবনে বাণিজ্য সংগ্রামে জয়লাভের স্পৃহা বলবতী হইয়াছে। কিন্তু এই সময় জীবন মরণের সন্ধিস্থল বলিয়া আমাদের সাবধানে চলিতে হইবে। দেখিতে হইবে যেন আমরা বিপথে না যাই। রসায়নী বিদ্যার চর্চ্চা ও রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন সকল ব্যবসায়েরই মূল। বৃক্ষের মূলচ্ছেদ করিয়া শাখা প্রশাখায় জল সেচনে যেন ব্যর্থশ্রম না করি, ইহা সকলেরই দেখা উচিত। এ কার্য্য শুধু বৈজ্ঞানিকদিগের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না, দেশস্থ লোকদিগের সমবেত চেষ্টায় সুফল ফলিতে পারে। জীবন সংগ্রামে আমরা যে কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি না কেন, এই মহৎ কার্য্যে উদাসীন হইলে আমরা সমসাময়িক ও ভবিষ্যৎ বংশীয় ভারতবাসীর নিকট বিশ্বাসঘাতক হইব।

আমাদের বর্ত্তমান অবনতি পর্য্যালোচনা করিয়া অনেকে নৈরাশ্য সাগরে নিমগ্ন হন। কিন্তু একেবারে হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।" অধ্যবসায়শীল হইলে আমরা সাগরপার হইতে লক্ষ্মী দেবীকে আনয়ন করিয়া গৃহে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণির বর্ত্তমান অভ্যুদয় স্বল্প প্রারম্ভ হইতে সূচিত হইয়াছিল। এক শতাব্দী পূর্ব্বে জার্ম্মাণির অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে জেনার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নেপোলিয়ন প্রসিয়াকে পদদলিত করেন। যে দুইজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক (Wohler and Liebig) জার্ম্মাণীতে রসায়ন চর্চ্চার পথ পরিষ্কার করিয় জার্ম্মাণির ভাবী উন্নতির পথ প্রশস্ত করেন, তখন তাঁহারা শৈশব অবস্থায়। জার্ম্মাণী তখন শিক্ষা বিষয়ে এত পশ্চাৎপদ যে, রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষা করিবার সুযোগ আদৌ ছিল না। ফোয়েলার (Wohler) ১৮২৩ খৃঃ অব্দে সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহলম নগরে প্রসিদ্ধ রাসায়নিক বার্জেলিয়সের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং প্রায় সেই সময়েই লিবিগ্ প্যারিস নগরে গে লুসাকের (Gay lussac) নিকট শিক্ষার্থী হইয়া গমন করিলেন। ইহাঁরা স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা জগৎকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। তন্মধ্যে ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে Wohler কর্ত্তৃক wrea নামক নরমূত্রস্থিত পদার্থের কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা, এই ঘটনা দ্বারা রসায়নাগারে স্বাভাবিক দ্রব্য উৎপাদনের প্রথম সূত্রপাত হয়। এই সময় হইতেই জার্ম্মাণী উন্নতির সোপানে আরোহণ করে। ইংলণ্ডে, জার্ম্মাণীর অনুকরণ করিয়া ইহার ১০।২০ বৎসর পরে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রচলিত হয়। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে

লিবিগ্ ইংলণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া বার্জেলিয়সকে ইংরাজ বৈজ্ঞানিকদিগের সম্বন্ধে তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত মত জানাইয়াছিলেন,—

England is not the land of Seience, Chemists, there, are ashamed to call themselves chemists because the apothecaries had appropriated the name.

আজকাল আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার ইচ্ছা যেরূপ বলবতী হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় শীঘ্রই নবযুগের অবতারণা হইবে। তবে এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে ছাত্রদিগের অভিভাবকগণই ছাত্রদিগের ভাবী উন্নতির পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়ান। ইউরোপে প্রকৃত বিদ্যালাভ করিবার ইচ্ছা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিলাভের পর প্রকৃতপক্ষে বিদ্যা চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। যে বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের ইচ্ছা থাকে, তাহারই চর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে উপাধি লাভের পূর্ব্ব হইতেই অভিভাবকেরা ছাত্রদিগকে অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। তজ্জন্য তাহাদের প্রকৃত শিক্ষালাভের অবসর দেওয়া হয় না। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে গুরুগৃহে অবস্থানকালীন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া যেরূপ শিক্ষালাভের প্রথা ছিল, তাহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইলে সকল দিকেই মঙ্গল হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

জ্যোতিষ রহস্য।

(একাদশ প্রস্তাব।)

গ্রহগণ সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়।

গ্রহগণের বয়ঃ অবস্থা। রবিগ্রহ বৃদ্ধ; চন্দ্রগ্রহ মধ্য বয়স্ক; মঙ্গল গ্রহ যুবা, বুধগ্রহ শিশু; বৃহস্পতি গ্রহ বৃদ্ধ; শুক্রগ্রহ মধ্য বয়স্ক; শনি ও রাহু গ্রহ বৃদ্ধ বলিয়া পারিজাত গ্রন্থে লিখিত আছে। কিন্তু দৈবজ্ঞ-বল্লভা গ্রন্থের মতে অন্যরূপ যথা—সূর্য্যের বৃদ্ধাবস্থা, চন্দ্রের স্তন্যপানাবস্থা, মঙ্গলের বাল্যাবস্থা,

বুধের কুমারাবস্থা, বৃহস্পতির মধ্যাবস্থা, শুক্রের যৌবনাবস্থা এবং শনি গ্রহের অতি বৃদ্ধাবস্থা। গ্রহগণের বয়ঃ পরিমাণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়।

অয়নাদির অধিপতি। রবিগ্রহ এক অয়নের অধিপতি, চন্দ্রগ্রহ এক ক্ষণের অধিপতি, মঙ্গলগ্রহ এক দিনের অধিপতি, বুধগ্রহ এক ঋতুর অধিপতি, বৃহস্পতি গ্রহ এক মাসের অধিপতি, শুক্রগ্রহ এক পক্ষের অধিপতি এবং শনিগ্রহ এক বৎসরের অধিপতি বলিয়া সর্ব্বার্থচিন্তামণি গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

তাম্রাদি ধাতুর অধিপতি। রবিগ্রহ তাম্র ধাতুর অধিপতি, চন্দ্রগ্রহ মণির (কোন কোন মতে রৌপ্যের) অধিপতি; মঙ্গলগ্রহ সুবর্ণের অধিপতি, বুধগ্রহ কাঁসার অধিপতি, বৃহস্পতি গ্রহ রৌপ্যের অধিপতি, (নিজ গৃহস্থিত বৃহস্পতি সুবর্ণের অধিপতি), শুক্রগ্রহ মুক্তার অধিপতি, শনিগ্রহ লৌহের (মতান্তরে সীসকের) অধিপতি, রাহু সীসকের অধিপতি এবং কেতু নীলার অধিপতি।

মাণিক্যাদির অধিপতি। রবিগ্রহ মাণিক্যের অধিপতি; চন্দ্রগ্রহ মুক্তার অধিপতি; মঙ্গলগ্রহ প্রবালের; বুধগ্রহ মরকত মণির; বৃহস্পতি গ্রহ পুষ্পরাগ মণির, শুক্রগ্রহ হীরকের; শনিগ্রহ উৎকৃষ্ট নীলার (নীলমণির), রাহু গোমেদ মণির এবং কেতু বৈদূর্য্য মণির—অর্থাৎ কৃষ্ণপীতবর্ণবিশিষ্ট নীলকান্ত মণির অধিপতি বলিয়া পারিজাত গ্রন্থে লিখিত আছে।

গ্রহদোষ শান্তি। রবিগ্রহের দোষ শান্তির নিমিত্ত মাণিক্য; চন্দ্রের দোষ শান্তির নিমিত্ত বৈদূর্য্যমণি; মঙ্গলের দোষ শান্তির নিমিত্ত প্রবাল; বুধের দোষ শান্তির নিমিত্ত পুষ্পরাগ মণি; বৃহস্পতির দোষ শান্তির নিমিত্ত মুক্তা, শুক্রের দোষ শান্তির নিমিত্ত হীরক; শনির দোষ শান্তির জন্য নীলা, রাহুর দোষ শান্তির নিমিত্ত গোমেদ মণি, এবং কেতুর দোষ শান্তির নিমিত্ত মরকত (পান্না) ধারণ করিতে হয় বলিয়া জাতকচন্দ্রিকা গ্রন্থে বর্ণিত আছে। কিন্তু অন্য গ্রন্থের মতে ইহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়।

স্বর্ণাদি ধাতু ধারণ। রবির দোষ শান্তির জন্য স্বর্ণ ও তাম্র, চন্দ্রের রৌপ্য, মঙ্গলের তাম্র ও তীক্ষ্ণ লৌহ, বুধের কাংস্য, বৃহস্পতির দস্তা, শুক্রের রজ, শনির সীসক, রাহু ও কেতুর দোষ শান্তির নিমিত্ত লৌহ ধারণ করিতে হয়। সংস্কৃত্যমুক্তাবলী গ্রন্থে ইহার অন্যরূপ বিধি পরিদৃষ্ট হয়।

মূলাদি ধারণ। রবিগ্রহ দোষ শান্তির জন্য বিল্বমূল; চন্দ্রগ্রহের দোষ শান্তির জন্য ক্ষীরুইয়ের মূল; বুধের জন্য বীজ তাড়কের মূল, বৃহস্পতির জন্য বামনহাটীর মূল, শুক্রের জন্য রামবাকসের মূল, শনির জন্য শ্বেতবেড়েলার মূল,

রাহুর জন্য চন্দনের মূল এবং কেতুর দোষ শান্তির নিমিত্ত অশ্বগন্ধার মূল ধারণ করিতে হয়।*

গ্রহদোষ শান্তির জন্য বিপ্রাদি ভোজন। রবিগ্রহ বিরুদ্ধ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। চন্দ্রগ্রহ বিরুদ্ধ হইলে কাপালিক, মঙ্গল গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে ভিক্ষুক, বুধগ্রহ বিরুদ্ধ হইলে শিশু, বৃহস্পতি বিরুদ্ধ হইলে জ্যোতির্ব্বিৎ, শুক্র বিরুদ্ধ হইলে শৈব, শনিগ্রহ বিরুদ্ধ হইলে উলঙ্গ সন্ন্যাসী এবং রাহু কেতু বিরুদ্ধ হইলে রাত্রিকালেই হউক বা দিবাভাগেই হউক যত্ন পূর্ব্বক চণ্ডাল ভোজন করাইতে হয়। দক্ষিণা দিবার বিষয় উল্লেখ নাই।

স্থূলাদি বস্ত্রের অধিপতি গ্রহ। রবিগ্রহ স্থূল তন্তুনির্ম্মিত বস্ত্রের অধিপতি। চন্দ্রগ্রহ নূতন অথচ সুদৃশ্য বস্ত্রের অধিপতি। মঙ্গল গ্রহ একদেশ অগ্নিদগ্ধ বস্ত্রের অধিপতি। বুধগ্রহ আর্দ্র বস্ত্রের, বৃহস্পতি গ্রহ অল্পদিবস ব্যবহৃত বস্ত্রের, শুক্রগ্রহ দৃঢ় অর্থাৎ দীর্ঘকাল স্থায়ী বস্ত্রের, শনিগ্রহ জীর্ণবস্ত্রের, রাহুগ্রহ, বিচিত্র কন্থার এবং কেতু জীর্ণ কন্থার অধিপতি হইয়া থাকেন। পারিজাত গ্রন্থে ইহার এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়।

গ্রহগণের পরিধেয় বস্ত্র। রবিগ্রহের রক্তবর্ণ মখমল বস্ত্র। চন্দ্রগ্রহের শুক্লবর্ণ পট্টবস্ত্র; মঙ্গল গ্রহের রক্ত অথচ বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট পট্টবস্ত্র; বুধগ্রহের শ্যামবর্ণের পট্টবস্ত্র; বৃহস্পতি গ্রহের পীতবর্ণবিশিষ্ট পট্টবস্ত্র; শুক্রগ্রহের শুক্লবর্ণের পট্টবস্ত্র; রাহু ও কেতুর জীর্ণ ও বিচিত্র নীলবর্ণের পট্টবস্ত্র নির্দ্ধারিত আছে। "সর্ব্বার্থ চিন্তামণি" গ্রন্থে ইহার সবিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বলবান গ্রহের দশা-ভোগকালে এই সকল বস্ত্রাদির প্রাপ্তি কল্পনা করিবে।

বৃক্ষাদির অধিপতি গ্রহ।—রবিগ্রহ অন্তঃসার বিশিষ্ট বৃক্ষের (সারবান বৃক্ষের) অধিপতি; চন্দ্র ইক্ষু প্রভৃতি অধিক রসযুক্ত বৃক্ষের অধিপতি; মঙ্গল গ্রহ খদির প্রভৃতি কণ্টক সংযুক্ত বৃক্ষের অধিপতি; বুধগ্রহ ফলবিহীন বৃক্ষের অধিপতি; বৃহস্পতি আম্র প্রভৃতি ফলযুক্ত বৃক্ষের অধিপতি, শুক্র পুষ্প বৃক্ষের অধিপতি; শনিগ্রহ কুৎসিত অর্থাৎ কুবৃক্ষের অধিপতি বলিয়া কথিত আছে।

গ্রহগণের দ্বিপদাদি শ্রেণী বিভাগ। রবিগ্রহ দ্বিপদ—বিহগ স্বরূপ; চন্দ্রগ্রহ সরীসৃপ স্বরূপ বহু পদবিশিষ্ট; মঙ্গল গ্রহ চতুষ্পাদ স্বরূপ;

---

* এ সকল বিষয় পূর্ব্বে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে। তথাপি শিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য প্রসঙ্গক্রমে এস্থলেও সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা হইল।

বুধগ্রহ বিহগ স্বরূপ (দ্বিপদ); বৃহস্পতি গ্রহ দ্বিপদ স্বরূপ; শুক্রগ্রহও দ্বিপদ স্বরূপ; শনিগ্রহ চতুষ্পদ স্বরূপ জানা যায়।

গ্রহগণের দৃষ্টি। রবিগ্রহের ঊর্দ্ধ দৃষ্টি; চন্দ্রগ্রহের সমদৃষ্টি; মঙ্গল গ্রহের ঊর্দ্ধ দৃষ্টি; বুধগ্রহের কটাক্ষ মাত্রে দৃষ্টি, বৃহস্পতি গ্রহের সমদৃষ্টি; শুক্রগ্রহের কটাক্ষ মাত্রে দৃষ্টি; শনিগ্রহের অধোদৃষ্টি এবং রাহুর শনির ন্যায় অধোদৃষ্টি। বলবান গ্রহ দ্বারা জাতকের দৃষ্টি ভেদ কল্পনা করা হইয়া থাকে। যে গ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, জাতকের দৃষ্টি সেই গ্রহের দৃষ্টির অনুরূপ হইয়া থাকে। কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তার মতে রবি ও মঙ্গলের সরল দৃষ্টি এবং চন্দ্র ও শুক্রগ্রহের বক্রদৃষ্টি বলিয়া জানা যায়।

স্থূলাদি দ্রব্যের অধিপতি গ্রহ। রবিগ্রহ চতুষ্কোণ দ্রব্যের অধিপতি; চন্দ্রগ্রহ স্থূল দ্রব্যের অধিপতি; মঙ্গল গ্রহ চতুষ্কোণ দ্রব্যের অধিপতি; বুধগ্রহ বর্ত্তুলাকার দ্রব্যের অধিপতি; বৃহস্পতি গ্রহও বর্ত্তুলাকার দ্রব্যের অধিপতি; শুক্রগ্রহ সূক্ষ্ম দ্রব্যের অধিপতি; শনি ও রাহু দীর্ঘাকার দ্রব্যের অধিপতি। স্বরোদয় গ্রন্থের মতে—রবিগ্রহ বর্ত্তুলাকার দ্রব্যের; চন্দ্র সূক্ষ্ম দ্রব্যের; মঙ্গল চতুষ্কোণ দ্রব্যের, বুধ স্থূল দ্রব্যের, বৃহস্পতি বর্ত্তুলাকার দ্রব্যের, শুক্র চতুষ্কোণ দ্রব্যের, এবং শনি ও রাহু দীর্ঘাকার দ্রব্যের অধিপতি। কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের মুখে শুনা যায় যে, এ সম্বন্ধে স্বরোদয় গ্রন্থের মতই প্রশস্ত।

সামাদি নীতির অধিপতি গ্রহ। রবিগ্রহ দণ্ড নীতির, চন্দ্রগ্রহ দান নীতির, মঙ্গল গ্রহ দণ্ড নীতির, বুধগ্রহ ভেদ নীতির, বৃহস্পতি গ্রহ সাম নীতির, শুক্রগ্রহ সামনীতির, শনি, রাহু ও কেতু ভেদ নীতির অধিপতি। জাতকের জন্ম লগ্ন এবং জন্ম লগ্ন হইতে ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ১০ম, ১১শ ইহার অন্যতম স্থানস্থিত বলবান গ্রহ দ্বারা জাতকের ঐ সকল নীতি গুণাধিক্য বিচার করা যায়।

স্বর্গাদি লোকের অধিপতি গ্রহ। রবিগ্রহ পিতৃ লোকের অধিপতি; চন্দ্রগ্রহ মনুষ্য লোকের অধিপতি, মঙ্গল গ্রহ পিতৃ লোকের অধিপতি; বুধগ্রহ তির্য্যক্ লোকের অধিপতি; বৃহস্পতি দেবলোকের অধিপতি, শুক্রগ্রহ মনুষ্য লোকের অধিপতি, শনিগ্রহ তির্য্যক্ লোকের অধিপতি। জ্যোতির্নিবন্ধ গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে দেখা যায়। কিন্তু বরাহ মিহির মতে—রবিগ্রহ তির্য্যক্ লোকের, চন্দ্র পিতৃলোকের, মঙ্গল তির্য্যক্ লোকের, বুধ নরক লোকের,

বৃহস্পতি দেবলোকের, শুক্র পিতৃ লোকের, এবং শনি নরক লোকের অধিপতি। এই সকল গ্রহের বল ও স্থান বিচার করিয়া, জাতক কোন্ লোক হইতে আসিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার বিচার হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে দেখা যায় যে, কেহ বা স্বর্গলোক হইতে আসিয়াও অনেক দুষ্কর্ম্মরত রহিয়াছে, এবং কেহ বা নরকলোক হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও সর্ব্বদা পুণ্যকার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে। ইহার প্রকৃত কারণ পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল বা সংস্কার ভিন্ন আর কি হইতে পারে।

পৃষ্ঠোদয়াদি গ্রহ। রবি, মঙ্গল, রাহু ও শনি এই চারিটী গ্রহ পৃষ্ঠদ্বারা উদিত হয় বলিয়া ইহারা পৃষ্ঠোদয় সংজ্ঞক। চন্দ্র, বুধ ও শুক্র এই তিনটী গ্রহ মস্তক দ্বারা উদিত হয় বলিয়া ইহারা শীর্ষোদয় সংজ্ঞক। বৃহস্পতি পৃষ্ঠ ও শীর্ষ এতদুভয়ের দ্বারা উদিত হয় বলিয়া ইহা উভয়োদয় সংজ্ঞক। পৃষ্ঠোদয় গ্রহ, কার্য্য নাশের, শীর্ষোদয় গ্রহ কার্য্যসিদ্ধির এবং উভয়োদয় গ্রহ মিশ্রফলের সূচক হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, জ্যোতিঃশেখর।

চলিত ভাষা।

—০:*:০—

(২য় খণ্ড ২৮৪ পৃষ্ঠার পর)

(H = হিন্দি, S = সংস্কৃত, P = পারস্য, A — আরব্য, E = ইংরাজি।)

ব্যাসম—H. বেসন—S. পেষণ।
ছানা—H. ছিনা।
আমানি—H. আঁওনা—S. অম্ল।
সিকা—P. সির্কা—E. ভিনিগার।
জুঠো—S. জুষ্ট—H. জুঠা।
নেতুড়—H. লতাড়—S. লক্ত।
সিন্নি—P. ষিরণী।
মৌতাৎ—A. মৌতাদ্।

শিক্—S. শলাকা—P. শিখ্।
ভাপ্—S. বাষ্প।
পাঁশ—S. পাংশু।
আঙ্‌রা—S. অঙ্গার।
আঁচ—S. অর্চ্চিঃ।
ধুধুকার—S. ধূমাকার—H. ধুঁধুঁকার।
ভূষো—S. ভস্ম।
(ভাত) বাড়া—S. বণ্টন।

পরিবেশন—H. পরোষণা।
উপোষ—S. উপবাস।
জলখাবার—H. জল খাই।
নেমতন্ন—H. নেওতা, S. নিমন্ত্রণ।
উপে যাওয়া—উক্ হওয়া (disappear)
একাল ষেঁড়ে—H. অকল খুরা।
দা—S. দাত্র।
টাঙ্গি—S. টঙ্ক।
গুপ্তী—S. গুপ।
কাটারি—S. কর্ত্তরী।
কোদাল—S. কুদ্দালিকা।
কুড়ুল—S. কুঠার—H. কড়্হারি।
সাবল—H. সাওল, S. সর্ব্বলা।
খোন্তা—S. খনিত্র।
বঁটী—S. বণ্ট।
জাঁতি—S. যন্ত্রী।
কাঁচি—S. কর্ত্তরী।
হাতুড়ি—H. হাতৌড়ি।
করাৎ—S. করপত্র।
সাঁড়াশি—S. সন্দংশিনী।
ছেনী—S. ছিদনী।
রেঁদা—P. রন্দা।
খিল—S. কীল।
প্যাচ—P. পেচ।
বাটখারা—S. বট।
খাড়া—S. খট।
জোখা—S. জুষ।
কুলুপ—A. কুলুব (pincers) কিম্বা A. কফ্‌ল (lock)।

ছররা—P. ররহ।
বারুদ—P. বারুৎ।
কামান—E. cannon (ক্যানন)।
পল্টন—E. bathalion (ব্যাটেলিয়ন)।
বারিক—E. Barrack (ব্যারেক)।
পশুরী—H. পনশেরী (পঞ্চ + সের)।
পোয়া—S. পাদ।
পোনে—S. পাদ + উন।
সাড়ে—S. সার্দ্ধ।

রাশি—S. রশ্মি।
দড়ি—S. দৃঢ়।
ডোর—S. দোরক।
তার—S. তন্ত্র।

আলপনা—S. আলেপন।
নিকানো—H. নিপনা—S. লেপন।
বাতি—S. বর্ত্তি—E. উইক্।
চেরাক—P. চিরাগ।
লণ্ঠন—E. ল্যান্টার্ণ।
পলতে—H. ফতিগা—P. পলিতাই।
হুঁকা—P. হুক্কা।
নলচে—S. নল—P. নৈচা।
ছিলিম—P. A. চিলম।
তাওয়া—S. তপ—A. তাওয়া।
শিশি—P. শিষা।
বোতল—E. বটল।
কাক—E. কর্ক।
ছিপি—H. চৈপী।

ক্রমশঃ।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ফটিক জল।

—— ০:*:০ ——

'কে বাপু তুমি, এই নিদাঘের প্রখর মধ্যাহ্নে রৌদ্রদীপ্ত নীলাকাশতলে নবপল্লবিত অশ্বত্থশিরে বসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতেছ, ফটিক জল! শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই, বিরক্তি নাই, শুষ্ক মধ্যাহ্ন প্রকৃতির গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, সৌরকরপ্রদীপ্ত দিগন্তে প্রতিধ্বনির উচ্চ নিনাদ তুলিয়া, একই সুরে একই ভাবে অবিরাম ডাকিতেছ, ফটিক জল, ফটিক জল! মার্ত্তণ্ডকিরণোজ্জ্বল নির্ম্মেঘ আকাশপ্রান্ত লক্ষ্য করিয়া, আকাশিক জলদজালের আবির্ভাব আশায় মুগ্ধ হইয়া কোন্ অদৃশ্য অনুদ্দিষ্ট মেঘের নিকট আকুলকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছ, ফটিক জল, ফটিক জল, ফটিক জল!

কেন বাপু, দেশে কি জল নাই? গঙ্গা যমুনা সরস্বতী পরিবেষ্টিতা সাগর-মেখলা বাঙ্গালা কি তোমার মত ক্ষুদ্রপক্ষীর তৃষ্ণা নিবারণে অসমর্থ? পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর সুপবিত্র বারি অপেক্ষা ঐ মেঘনিঃসৃত একবিন্দু বারি কি এতই সুমিষ্ট, এতই সুশীতল? জননীর সাদরপ্রদত্ত স্নেহনীর হইতে ভিক্ষালব্ধ সলিলবিন্দু কি এতই উপাদেয়, এতই প্রার্থনীয়? তাই এই নিদাঘের তপ্ত মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণতলে বসিয়া তৃষ্ণাপীড়িত হৃদয়ের গভীর বেদনা ব্যক্ত করিতে করিতে আকুল কণ্ঠে ঐ বহুযোজন দূরবর্ত্তী জলদখণ্ডের নিকট প্রার্থনা করিতেছ, ফটিক জল, ফটিক জল!

বুঝিয়াছি বাপু, গঙ্গা যমুনার অনন্ত সলিলরাশি তোমার তৃষ্ণা নিবারণে অক্ষম না হইলেও তুমি সে সলিল পানে তৃষ্ণা দূর করিতে ইচ্ছা কর না। কেন না তোমার নাম মেঘজীবন, মেঘের নিকট প্রার্থনা করাই তোমার স্বভাব। সুতরাং আমি তোমার এই স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যে বাধা দিতে চাহি না, আমি কেবল জানিতে চাহি কতদিন হইতে তুমি এ স্বভাবটী পাইয়াছ? যখন—যে অতীত যুগে, স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভগীরথের কঠোর তপস্যায় সুদূর ব্রহ্মলোক হইতে ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহ আসিয়া ধরণীকে পবিত্র করিত; যখন প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্রাহ্মণ-কুমারের তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাতে ক্ষত্রিয়শোণিতে ধরণীর বক্ষঃ রঞ্জিত হইত, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণের ধনুষ্টঙ্কারে গগন বিদীর্ণ হইয়া যাইত, ত্রিলোকবিজয়ী গাণ্ডীবীর তীক্ষ্ণ

শরাঘাতে ভূগর্ভ বিদীর্ণ করিয়া ভাগীরথীর পবিত্র উৎস তৃষ্ণাতুর বীরের অন্তিম-তৃষ্ণা নিবারণ করিত; যখন মহারাজ অশোকের সুশীতল রাজচ্ছত্রতলে উপবিষ্ট ধর্ম্মপ্রাণ শ্রমণবৃন্দের মুখনিঃসৃত নবীন ধর্ম্মপ্রবাহ ভারত সাগর অতিক্রম পূর্ব্বক দিক্‌দিগন্ত প্লাবিত করিত, তখনও কি তোমার এই স্বভাবটী ছিল? যখন পুণ্য-তোয়া দৃষদ্বতীতীরে বিদেশীয়ের পদতলে ভারতের সৌভাগ্য-মুকুট বিচূর্ণিত হয় নাই; যখন বাঙ্গালার উজ্জ্বল ললাটে সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক কলঙ্কের মসীময় তিলক প্রদত্ত হয় নাই; যখন বাঙ্গালী বাঙ্গালীত্ব বিসর্জ্জন দিয়া গোলামী করিতে শিখে নাই, বিশালোদরা দুর্ভিক্ষরাক্ষসীর করালকবলে নীরবে আত্মসমর্পণে অভ্যস্ত হয় নাই; ভারতের—বাঙ্গালার সেই গৌরবোজ্জ্বল জ্ঞানধর্ম্মপ্রদীপ্ত অতীত যুগেও কি তুমি এমনই করিয়া ডাকিতে? এমনই বাঙ্গালার গগন বিদীর্ণ করিয়া আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করিতে—ফটিক জল, ফটিক জল!

তা' বাপু, তখন ডাকিয়া থাক ডাকিয়াছ, ডাকিয়া হয় তো ফটিক জল পাইয়াছ, কিন্তু এখন আর ডাকিও না। এখন আর ভারতে ফটিক জল নাই; ভারতের মেঘ আর ফটিকজল বর্ষণ করে না, নদ নদী জলাশয় আর ফটিক জল দান করিয়া তোমারই মত কণ্ঠাগতপ্রাণ তৃষ্ণাতুর ভারতবাসীর তৃষ্ণা নিবারণ করে না। বাপু হে, তুমি সে কালের পাখী, একালের ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পার না, পারিবেও না। যদি বুঝিতে চাও, তবে তোমার সুদৃঢ় পক্ষদ্বয়ে ভর করিয়া নীলাম্বরপথে ভারত সাগর অতিক্রম পূর্ব্বক ঐ পার্লিয়ামেণ্ট নামক মহামন্দিরের—যেখান হইতে ভারতের জন্য ফটিকজলের ব্যবস্থা হয় তাহার—প্রাচীরশিরে বসিয়া কিছুদিন ফটিক জল ফটিক জল কর; তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে ভারতে এখন ফটিক জল কত দুর্ম্মূল্য।

কথাটা কি জান বাপু, ভারত এখন সভ্য হইয়াছে; সুতরাং মনীষিগণের সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতে এখন আর ফটিক জলের ততটা আবশ্যক নাই। এখন আর বৈশাখে জলসত্র বসাইয়া বর্ব্বরোচিত প্রথায় তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা দূর করিতে হয় না, জলকর নামক বৈজ্ঞানিক প্রথা দ্বারাই শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত সকল কালেই সে কার্য্য অতি সহজে সুনিষ্পন্ন হয়। এখন আর দুর্ভিক্ষে অন্নসত্র স্থাপন দ্বারা ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুন্নিবারণ প্রয়োজন হয় না, রিপোর্ট নামক অদ্ভুত যন্ত্রই এখন সে কার্য্য সাধনে সমর্থ। এখন আর লাঠী সড়কী প্রভৃতি লইয়া ভারতবাসীকে অসভ্যের ন্যায় আত্মরক্ষা করিতে হয় না, ট্যাক্স নামক ভীষণ অস্ত্র দ্বারাই আত্মরক্ষা ও সম্মানরক্ষা হইয়া থাকে। এখন ভারতবাসী দেখে আইন, খায়

কলের গুঁতা, মরে দুর্ভিক্ষের অন্তরটিপুনীতে। কথাগুলা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। কিন্তু কি করিব বাপু, ভারতে যে এখন উন্নতির যুগ।

এখন যে দিকে চাই সেই দিকেই উন্নতি। শিক্ষায় উন্নতি, দীক্ষায় উন্নতি, জ্ঞানে উন্নতি, বিজ্ঞানে উন্নতি, জীবনে উন্নতি, মরণে উন্নতি। উন্নতিটা এখন ভারতের অস্থিমজ্জাগত। ভারতে এখন ধর্ম্মের উন্নতি হইয়াছে, কেন না ভারতবাসী নিজধর্ম্মে ইস্তফা দিয়া পরধর্ম্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছে; বিদ্যার উন্নতি হইয়াছে, কেননা তাহারা নিজের বিদ্যাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে, কেননা এখন ভারতবাসীর অহং জ্ঞান অর্থাৎ আমার দেশ, আমার ঘর, আমার সম্পত্তি ইত্যাদি জ্ঞান বিদূরিত হইয়া সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়াছে। আর্থিক উন্নতি হইয়াছে, কেননা নিত্য দুর্ভিক্ষ তাহাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সাহসের উন্নতি হইয়াছে, কেননা ভারতবাসী আর মরিতে ভয় করে না। তাই বলিতেছি ভারতে এখন উন্নতির যুগ। অতএব হে চাতক! হে ভিক্ষাম্বুজীবিন্! এ হেন উন্নতির যুগে তুমি আর ফটিক জল, ফটিক জল বলিয়া চীৎকার করিও না।

বাপু হে, আমরাও অনেকদিন হইতে চাতকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম; তোমারই মত এমনই শূন্য নীলাম্বরের পানে চাহিয়া আশালুব্ধ প্রাণে ফটিক জল ফটিক জল বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলাম। জানি না, নিবিড় নীরদমালার অভ্যন্তর হইতে একবিন্দু সুশীতল বারি কখনও তোমার শুষ্ককণ্ঠে পতিত হইয়াছে কি না, কিন্তু আমাদিগকে তো নবোদিত-জলদজাল-নিঃসৃত বজ্রের নিদারুণ আঘাত বুকে চাপিয়াই ফিরিতে হইয়াছে। শেষে বিরহবিধুরা ব্রজাঙ্গনার ন্যায় হতাশ হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে আকুলকণ্ঠে গাহিতে হইয়াছে—'পিয়াস লাগিয়া জলদে সেবিনু বজর পড়িয়া গেল।' তাই বলিতেছি বাপু, নিরস্ত হও, নতুবা শেষে তোমাকেও কেন আমাদের হতাশ সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি তুলিতে হইবে।

বাপু হে, জান তো, "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ"। মনে করিও না এখানে দুইবার নিষেধ দ্বারা আদেশ সূচিত হইয়াছে। তা' যদি হইত তবে দেখিতে, আজি ভারতে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। তুমি বৎসরের মধ্যে কয়টা দিন ফটিক জল ফটিক জল কর, কিন্তু আমরা বারমাস—৩৬৫ দিন ত্রিশকোটি কণ্ঠে ফটিক জল ফটিক জল বলিয়া চীৎকার করিয়াছি; কৈ বজ্রের কঠোর আলিঙ্গন ব্যতীত ফটিক জলের কোমল স্পর্শসুখ একদিনও তো ভোগ করি নাই? তুমি

ভুলিয়া গিয়াছ—কেবল তুমি কেন আমরাও ভুলিয়া গিয়াছিলাম, ইহা শিবিরাজার বা দানবীর কর্ণের আমল নহে। সে অসভ্যতার যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন সভ্যতার আলোকময় নবযুগ; এ যুগে একমুষ্টি অন্নের জন্য হাত পাতিলে একমাসের জন্য চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় অন্নের ব্যবস্থা হইয়া যায়। দুঃখের বিষয়, সেখানে অহিফনের কোন বন্দোবস্ত নাই, নতুবা অভিরাম শর্ম্মা মাসান্তে একবার করিয়া হাত পাতিত।

ও কি বাপু, হাসিয়া উঠিয়া উঠিলে যে? 'তা' কি করিব বল, তোমাকে ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগের উপদেশ দিতে দিতে নিজেই যে সে বৃত্তি অবলম্বনে উদ্যত হইয়াছি সেটা স্বভাবের দোষ, বহুদিনের অভ্যস্ত বিদ্যা ছাড়িয়াও ছাড়া যায় না। বৃত্তিটা যে আমাদের অস্থিমজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে! তাই এখনও আমরা মাঝে মাঝে বৈশাখের শেষ বেলায় একটু কালমেঘের আবির্ভাব দেখিলেই ফটিক জল ফটিক জল বলিয়া চীৎকার করিতে উদ্যত হই। পশ্চিমের ঝড়ে মেঘ উড়িয়া যায়, তখন আবার আমরা হতাশ দৃষ্টিতে সেই ঝটিকাচ্ছিন্ন খণ্ডীভূত মেঘের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আপন মনে বলি—পিয়াস লাগিয়া ইত্যাদি।

তবে হে নির্ব্বোধ বিহঙ্গম! আর কেন বৃথা চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিয়া স্তব্ধ শান্ত পল্লীর গভীর নীরবতা ভঙ্গ কর। যুগ যুগ প্রতারিত হইয়া আসিতেছ, নবীন মেঘের আবির্ভাব দেখিলেই চীৎকার করিয়া আপনার কণ্ঠ আপনি ফাটাইতেছ, নিদাঘের প্রচণ্ড আতপতলে বসিয়া তৃষ্ণাপীড়িত বুকে নিরাশার আগুন জ্বালাইতেছ, তবু কি চৈতন্য হয় না? তবু কি আশার পিপাসা মিটে না? যদি না মিটে তবে আমার নিকট আইস, আমি কিঞ্চিৎ অহিফেন দিয়া তোমার আতিথ্য সৎকার করিব।

শ্রীঅভিরাম শর্ম্মা।

শিখগুরু।

—•*•—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অর্জ্জুন মল।

পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন মল স্বীয় প্রতিভাবলে শিখ সমাজকে নূতন আকার দেন। পিতা রামদাস যে কার্য্যের আভাস মাত্র দিয়াছিলেন, এখন তিনি তাহা ফুটাইয়া

তুলিলেন। তাঁহারই আমলে শিখেরা একীভূত হইতে শিখিল, গুরুকে কেবল পরকালের উপায় স্বরূপ না ভাবিয়া ইহকালের নেতা বলিয়াও ভাবিতে শিখিল। গুরু স্বীয় কার্য্য দ্বারা তাহাদিগকে পার্থিবের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিলেন।

১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে রামদাস দেহত্যাগ করিলে অর্জ্জুন গুরু হন। তিনি গুরুপদ পাইয়া শিখদের জন্য প্রাণ মন সমর্পণ করিলেন। পিতা অমৃতসরের কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। অর্জ্জুন তাহা শেষ করিলেন। এতদ্ব্যতীত অর্জ্জুন আরও দুইটি দীর্ঘিকা খনন করান। তন্মধ্যে একটি অমৃতসর সহরেই, তাহার নাম কুলসর। অপরটি অমৃতসর হইতে সার্দ্ধ তিন ক্রোশ দূরে; সে দীর্ঘিকাটির নাম তুরণ-তারণ। এই দীর্ঘিকা হইতে, সে স্থান তুরণ-তারণ নামে সাধারণ্যে পরিচিত।

অর্জ্জুন দেখিলেন যে, পূর্ব্বতন গুরুরা শিখদের মঙ্গলের জন্য যে সকল গাথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা একত্রিত না থাকায় নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এখন হইতে সাবধান না হইলে পরে সে গুলির রক্ষা বড়ই দুষ্কর হইয়া উঠিবে। তাই তিনি তাঁহাদের গাথাগুলি একত্রিত করিয়া একটি প্রকাণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিলেন। সে পুস্তক "গ্রন্থসাহেব" নামে পরিচিত হইল। পরে দশমগুরু গোবিন্দ সিংহ শিখদের জন্য অন্য আর একটি গ্রন্থ লিখিলে, উভয় গ্রন্থের পার্থক্য রক্ষার জন্য এই গ্রন্থের নাম বদলাইয়া দেওয়া হয়, তখন হইতে লোকে ইহাকে আদিগ্রন্থ বলিতে আরম্ভ করিল। অর্জ্জুন এই আদিগ্রন্থের সংকলয়িতা। শুনা যায়, (১) অর্জ্জুন এই পুস্তকের শেষ ভাগে অনেকগুলি পাতা খালি রাখিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী গুরুদের গাথা পরে তাহাতে অন্তর্নিবিষ্ট হইবে, এই চিন্তাই বোধ হয় এরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল। সংকলন কার্য্য সমাপ্ত হইলে অর্জ্জুন গ্রন্থ সাহেবকে হরমন্দিরে স্থাপন করেন।

অর্জ্জুন এই সংকলন কার্য্য অতি দক্ষতার সহিতই সম্পাদন করেন। (২) যাহাতে এক গুরুর লেখা অপরের বলিয়া সন্দেহ না হইতে পারে, এজন্য তিনি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি প্রতি গুরুর গাথাগুলিকে মহলানুসারে বিভক্ত করেন। মহলার সংখ্যা দেখিয়া কোন্ গুরুর লেখা জানা যায়। নানকের গাথাগুলি 'মহলা পহিলা', অঙ্গদের গাথাগুলি 'মহলা দুসরা' অমরের গুলি 'মহলা তীসরা', রামদাসের গাথাগুলি 'মহলা চৌথা' নামে পরিচিত হইল।

---

(১) Adi Granth, translated by E. Triumpp.

(২) ভাই গুরুদাস নামক এক ব্যক্তি সংকলন কার্য্যে গুরুকে সাহায্য করেন।

চতুর্থ গুরুর আমল পর্য্যন্ত শিখদের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না, তাহাতে সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য হইবার সুবিধাও ছিল না। অর্জ্জুন স্বীয় দূরদর্শিতা বলে দেখিলেন যে, শিষ্যসংখ্যা ক্রমশঃ যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম না করিলে উচ্ছৃঙ্খলতায় এ নবীন সমাজ শীঘ্রই বিলয় প্রাপ্ত হইবে, অথবা আদর্শচ্যুত হইয়া পড়িবে। অর্জ্জুন শিখ সমাজকে ভাবী ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি নিয়ম প্রণালী প্রস্তুত করিলেন। শিখেরা সেগুলি সম্মানের সহিত গ্রহণ করিল।

শিখধর্ম্ম গৃহীদের উপযোগী করিবার জন্য অনেকদিন হইতে প্রয়াস চলিতেছিল। গুরু অর্জ্জুন নানা সংস্কার দ্বারা শিখধর্ম্ম গৃহীদেরও উপযোগী করিয়া তুলিলেন। মাতামহ অমরদাস উদাসী সম্প্রদায়কে শিখসমাজ হইতে পৃথক্ করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। উদাসী সম্প্রদায় সম্পূর্ণ উদাসী,—তাহারা সংসারী নহে। এখনও উদাসী সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে। তাহারা আপনাদিগকে শিখ সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করে ও আদি গ্রন্থকে বড়ই শ্রদ্ধা করে। এই উদাসী সম্প্রদায় নানকের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচাঁদের অনুবর্ত্তী, তাহা পূর্ব্বে অন্যত্র (১) বলা হইয়াছে।

অর্জ্জুন শিষ্যদিগকে এক করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে চেষ্টা সফলও হইয়াছিল। তিনি অমৃতসরকে সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান করিয়া তুলেন। শিখেরা প্রতিনিয়ত এখানে যাতায়াত করিতে লাগিল। ক্রমে এ স্থানের মাহাত্ম্য এমনই বাড়িয়া উঠিল যে, বাহিরে যাহার যতই শত্রুতা থাকুক না, এ সহরে অবস্থানকালে কেহই কাহারও প্রতি শত্রুভাব পোষণ করিতে পারিত না। শিখেরা আজও এইরূপ নিয়ম পালন করিয়া থাকে। মধ্যযুগের কথা আলোচনার সময় আমরা দেখিতে পাইব, সময় সময় প্রতি মিশলেই মনোবিবাদ থাকিলেও যখন সর্দ্দারেরা অমৃতসরে একত্র হইতেন, তখন আর তাঁহাদের সে বৈরিভাব থাকিত না; সকলে পরস্পরকে 'ভাই' বলিয়া আলিঙ্গন করিতেন।

অর্জ্জুনের পূর্ব্ব গুরুগণ সকলেই গুরুপদ গ্রহণান্তে ফকিরের ন্যায় বাস করিতেন; কিন্তু অর্জ্জুন সে নিয়মের অন্যথা করেন। তিনি পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া রাজার ন্যায় জাঁকজমকের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বশালায় অনেকগুলি অশ্ব ও হস্তিশালায় বহুসংখ্যক হস্তী থাকিত।

---

(১) এই খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 'স্বদেশী' পৌষ, ১৩১৪।

অর্জ্জুন বুঝিয়াছিলেন যে, শিখদিগকে এক করিতে হইলে, তাহাদের জন্য যেমন নির্দ্দিষ্ট বিধি থাকা দরকার, তেমনই গুরুর কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবার জন্য কিছু গুরুদক্ষিণার প্রবর্ত্তন করাও উচিত। তদ্ব্যতীত অমৃ সর ক্রমশঃ সহর হইয়া উঠিতেছে। ইহাকে সুসংস্কৃত রাখিবার জন্য, গুরুসেবার জন্য, নানাস্থানে সাধারণের উপকারার্থে ধর্ম্মশালাদি নির্ম্মাণের জন্য ও অন্যান্য ব্যয় সংকুলানের জন্য একটা উপায় থাকা চাই। এতাবৎ কাল গুরুরা শিষ্যদের নিকট কথন হাত পাতেন নাই, শিষ্যেরা স্বেচ্ছামত যাহা দিয়াছে, গুরুরা তাহাই লইয়াছেন, ও সাধারণের উপকারার্থে তাহা ব্যয় করিয়াছেন। অর্জ্জুন এখন শিষ্যদের নিকট হইতে নিয়মমত দক্ষিণা আদায়ের প্রথা প্রবর্ত্তন করিলেন। এখন হইতে সকল শিষ্যকেই সাধ্যমত কিছু না কিছু গুরুকে দিতে হইত। গুরু সে অর্থ সাধারণেরই উপকারের জন্য ব্যয় করিতেন।

সকল শিষ্যই ত' আর অমৃতসরে আসে না, আসিতে পারে না। অমৃতসরে বসিয়া দক্ষিণা আদায়ের বন্দোবস্ত করিলে, কতকগুলিকে দক্ষিণা দিতে হইবে, অপরগুলিকে দিতে হইবে না। এ বড় অন্যায় হইবে। তাই গুরু, দক্ষিণা আদায়ের জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ করিলেন। তাহারা বৎসরে একবার গ্রামে গ্রামে যাইয়া দক্ষিণা আদায় করিত। এই কর্ম্মচারীরা মসন্দ নামে সাধারণ্যে পরিচিত।

এই কার্য্যটী করিবার জন্য গুরুকে অনেক হিসাব পত্র রাখিতে হইত। ইহা কার্য্যতঃ একটি রাজস্ব আদায়ের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। এই দক্ষিণা কার্য্যতঃ গুরুকর। এই কর আদায় করিতে যইয়া গুরু একটি ক্ষুদ্র রাজ্য তৈয়ারি করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তখন সেটা বড়ই অস্পষ্ট। তবে গুরুর এইরূপ আচরণ দ্বারা শিখেরা কিরূপে রাজকার্য্য করিতে হয়, তাহার আভাস পাইল। এই আভাস প্রাপ্তিই পরে শিখদিগকে রাজত্ব বিস্তারের জন্য প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিব।

গুরু কেবল কর আদায় করিয়াই অর্থসঞ্চয় করেন নাই; তিনি নিজে ব্যবসায়ও করিতেন। আজ যেমন আমরা শিল্পকার্য্য শিখিবার জন্য বিদেশে ছাত্র পাঠাইতেছি, মহামতি অর্জ্জুনও সেইরূপ স্বীয় শিষ্যদিগকে বাণিজ্য শক্তিতে প্রবল করিবার জন্য বিদেশে পাঠাইতেন। কারণ, তিনি জানিতেন, বাণিজ্যই অর্থ সঞ্চয়ের প্রধান উপায়।

অর্জ্জুন বড়ই দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। প্রতি কার্য্যেই তিনি তাহার পরিচয়

দিয়াছেন। তাঁহার সংস্কার গুণে শিখসংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। পঞ্জাবের অনেক স্থল শিখপূর্ণ হইয়া উঠে।

অর্জ্জুন যেরূপ নিস্পৃহ ভাবে কার্য্য করিতেন, তাহাতে আমরা তাঁহাতে একাধারে ত্যাগী ও সংসারীর আদর্শ দেখিতে পাই। তিনি স্বীয় কার্য্যপ্রণালী দ্বারা শিখদিগকে পার্থিবের প্রতি যে একেবারে সংশ্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন, পূর্ব্বে আমরা তাহা দেখিয়াছি। তিনি স্বীয় জীবনের পবিত্রাচরণ দ্বারা তাহাদিগের সেই পুরাতন ধর্ম্মভাবও বলবৎ রাখেন। অর্জ্জুন শিখদের জন্য অনেক কাজ করেন। শিখদের জন্য তিনি জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, শিখদের সেবা করিতে করিতেই তিনি ইহলীলা সাঙ্গ করেন। তিনি আদিগ্রন্থের পঞ্চম লেখক। তিনি অনেকগুলি গাথা লিখিয়াছেন। সে গুলি আদিগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেগুলি 'মহলা পাঁচবা' নামে পরিচিত।

অধিক বয়স পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের কোন সন্তানাদি হয় নাই। পরে এক ফকিরের বরে (১) ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে হরগোবিন্দ নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। হর পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন, তাহা আমরা পরে দেখিব। হর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গুরু তাঁহার বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নানাস্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। এক ঘটক লাহোরের মোগল সরকারের রাজস্বসচিব চাঁন্দুশাহের কন্যার সম্বন্ধ লইয়া গুরুর দ্বারস্থ হইল। গুরু তাহাতে সম্মতি দিলেন।

এদিকে চাঁন্দুশাহ যখন শুনিলেন যে, তাঁহার ভাবী জামাতা এক ফকিরের পুত্র, তখন দম্ভে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। ধনীর কন্যার সহিত ফকিরের পুত্রের সম্বন্ধ! চাঁন্দুর অত্যন্ত রাগ হইল। তিনি ঘটককে বাটী হইতে দূর করিয়া দিলেন।

যথাসময়ে এই সংবাদ গুরুর কর্ণে উঠিল, গুরু সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলেন। পরে অনুসন্ধান করিয়া চাঁন্দু যখন গুরুর যথার্থ পরিচয় পাইলেন, তখন অনুতাপে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। তিনি ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া গুরুর নিকট গেলেন। কিন্তু গুরু তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। চাঁন্দু কন্যার সহিত এক লক্ষ মুদ্রা যৌতুক দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, তবু গুরু অটল। তিনি বলিলেন—"একবার যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না। তোমার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ হইতে পারে না।" লজ্জায় চাঁন্দু মরমে মরিয়া

(১) M. Gregar's History of the Shikhs.

গেলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, গুরুর দম্ভ ভাঙ্গিতেই হইবে। যে কোন প্রকারেই হউক, তিনি গুরুকে জব্দ করিবেন। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া চাঁদু ফিরিয়া গেলেন। অল্পকাল মধ্যে তাঁহার সে সুযোগ হইল। তখন গুরুকে জব্দ করিতে চাঁদু কিছুমাত্র ক্রটী করেন নাই, তাহা আমরা পরে দেখিব।

ক্রমে অর্জ্জুনের অন্তিম কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সে জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। এ ঘটনা শিখ ইতিহাস হইতে কখন মুছিবে না। ভারতের ইতিহাসেও ইহার মূল্য সামান্য নহে। আমরা তাহা বর্ণন করিতেছি।

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে মোগল-গৌরব আকবর শাহ ইহলীলা সাঙ্গ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম শাহ জাহাঙ্গীর (জগজ্জয়ী) নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথমাংশ বড়ই নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খস্রুকে সকলেই ভালবাসিত। সেলিম মদ্যপায়ী অনাচারী হওয়ায় সকলেই তাঁহার প্রতি আন্তরিক ক্রুদ্ধ হন এবং ওমরাহগণ আকবরের পরে খস্রুকে সম্রাট করিবার অভিলাষ করেন। তাঁহাদের মনোভিলাষ চতুর আকবরের নিকট অগোচর ছিল না। তাই আকবর মৃত্যুকালে তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, সেলিমই যেন সম্রাট হন। আকবরের অনুরোধে অনেকেই নিরস্ত হন; কিন্তু কেহ কেহ সেলিমকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। যথাসময়ে সেলিম সম্রাট হইলে এই সব অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা খস্রুকে লইয়া রাজদ্রোহিতার পরামর্শ আঁটিতে লাগিলেন। ফলে অভিষেকের পর ছয় মাস অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই খস্রু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পতাকা তুলিলেন। খস্রু অচিরাৎ পঞ্জাব অধিকার করিলেন, লাহোর সহর ভস্মীভূত করিতে অভিলাষী হইয়া লাহোরের একটি ফটকে আগুন দিলেন। খস্রুর অধীনে তখন দশসহস্র সৈন্য ছিল। *

খস্রু কর্ত্তৃক লাহোরের অবরোধ সংবাদ পাইবামাত্র সৈয়দ খাঁ ফিরিলেন। তিনি কাশ্মীর যাইতেছিলেন। এদিকে সম্রাটও সসৈন্যে লাহোরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অচিরাৎ উভয় দলে প্রবল সংঘর্ষ হইল। খস্রু পরাজিত হইয়া কাবুলাভিমুখে পলাইয়া যান; কিন্তু চন্দ্রভাগা নদী পার হইবার সময় তাঁহার নৌকা দৈবক্রমে বালীতে আটকাইয়া গেল। পঞ্জাবের জমিদারের সাহায্যে জাহাঙ্গীর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধৃত করিলেন। এইবার অত্যাচারের পালা। জাহাঙ্গীর খস্রুর অনুচরদিগকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দেন। তাহাদের প্রধান

প্রধান ব্যক্তিদের গর্দ্দভ ও গরুর চামড়া দ্বারা মুড়িয়া গর্দ্দভের উপর বসাইয়া নগর পরিভ্রমণ করান। ইহাতে অনেকেই দেহত্যাগ করে। অপর সকলকে সম্রাট জীবন্ত শূলে চড়াইয়া হত্যা করেন। প্রায় সাত শত ব্যক্তি এইরূপে সম্রাটের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া হত হইল। খস্রুকে এই সময় বধ্য ভূমিতে আনান হইল। তাঁহার সম্মুখে এই হত্যাকাণ্ড চলিল। এদিকে খস্রুর জননী পুত্রের ভীষণ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিলেন। দিলবার খাঁর বিশেষ সতর্কতায় খস্রুকে লাহোর দুর্গে বহুকাল অবরুদ্ধ রাখা হয়। তাঁহার মৃত্যু বড়ই রহস্যময়।

পুত্রের প্রতি সেলিমের এরূপ নৃশংস ব্যবহার উচিত হইয়াছিল কি না, তাহার বিচার করিব না, তবে একথা ঠিক যে, যখন তিনি নিজে পিতৃদ্রোহী ও রাজদ্রোহী হইয়াছিলেন, তখন কিন্তু পিতা আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন। আজ রাজপদের গৌরবে বিভূষিত হইয়া জাহাঙ্গীর পিতার সেই দয়ার্দ্র ব্যবহার ভুলিয়া গেলেন। হায়, ঐশ্বর্য্যমত্ততা!

যাহা হউক, খস্রু পঞ্জাব দখল করিলে শিখগুরু অর্জ্জুন তাঁহাকে রাজার ন্যায় সম্মান করেন ও রাজকর পাঠাইয়া দেন। কার্য্যতঃ তিনিও রাজদ্রোহী হন। চাঁদুশাহ এখন গুরুকে হাতে পাইলেন। খস্রুর পতন হইলে তিনি সম্রাটের নিকট গুরুর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করিলেন। ফলে রাজধানীতে গুরুর ডাক পড়িল। গুরু তথায় গমন করিলে তাঁহার জরিমানা ও কারাবাস হয়। (১) কারাগার হইতে উদ্ধার পাইবার অল্পদিন পরেই গুরু নদী-জলে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু দেবীস্থান প্রণেতা বলেন, গুরুকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর ভীষণ অত্যাচার করা হয়। লাহোরের বালুকাময় প্রদেশে তিনি কারারুদ্ধ থাকেন। সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

যে বর্ষে অর্জ্জুন দেহত্যাগ করেন, সে বর্ষ বাঙ্গালীরও স্মরণযোগ্য। সেই বৎসর বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা প্রতাপাদিত্য যশোহর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী

(১) ম্যালকম সাহেব এ ঘটনাকে অন্যরূপে সাজাইয়াছেন। তিনি বলেন, দনীচাঁদ নামক জনৈক ক্ষত্রিয়ের লেখা আদিগ্রন্থে সন্নিবেশিত না হওয়ায় সে ব্যক্তি গুরুর উপর ক্রুদ্ধ হয় ও মোগলদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে ঐরূপ বিপদে ফেলে। আমরা কিন্তু এ কথার কোন মূল খুঁজিয়া পাই না। আদি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদক ট্রিম্প সাহেবও বলেন, তিনিও ইহার মূল খুজিয়া পান নাই।

হন ও লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন। তিনি পথে পুণ্যধাম ৺কাশীতে নরদেহ ত্যাগ করিয়া মোগলের হস্ত হইতে মুক্ত হন।

চব্বিশ বৎসর নয় মাস একদিন কাল গুরুপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্জ্জুন, মোগল অত্যাচারে দগ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করিলেন।

অর্জ্জুন আজ বিধির বিপাকে যে অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ইহলীলা সাঙ্গ করিলেন, সেই অত্যাচার শিখদিগকে সাময়িক কর্ত্তব্যসাধনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এই অত্যাচারই শিখদিগের প্রতি প্রথম অত্যাচার। এখন হইতে শিখেরা মোগলরাজের কুটিল কটাক্ষের পথিক হইল।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইছামতী তীরে।

—+•×—

তখনো আঁধার বুঝি অশ্বথের মূলে
লুকোচুরি খেলিতেছে উষার আহ্বানে ;
পশ্চিমের নদীকূলে উলু বাঁশ বন,
সোণালী মাখিয়া অঙ্গে উঁকি মারে ঢলি,
খরস্রোতা তটিনীর নীল স্বচ্ছ নীরে।
সাগর উদ্দেশে কক্ষচ্যুতা তারাসম
হু হু করি ছুটিয়াছে ইছামতী নদী ;
পূর্ব্ব পারে ফল ফুল ভরা তরুলতা ;
ফুল্ল ফুলমাঝে—মঞ্জু গুঞ্জে শিলীমুখ।
প্রস্ফুটিত বাতাবির ধবল কুসুম
ছড়ায় সুরভি, স্নিগ্ধ মারুত-হিল্লোলে।
ঝুনু ঝুনু রুনু রুনু মঞ্জুল শিঞ্জনে
আসিল অঙ্গনাকুল ভরিতে ডাগরী ;
উছলিছে পূর্ণকুম্ভ নিতম্ব-কম্পনে,
ফিরিল সঙ্গিনী সহ রঙ্গরস করি'।
কারো হাতে মধুভরা বাতাবির ফুল,
চঞ্চল চাহনি কারো ভূতলে অতুল।

পিছনে রহিল এক বিষাদ-প্রতিমা—
আলুথালু রুক্ষ কেশ, অবশ চরণ,
পূর্ণ-কুম্ভ কক্ষে, দেহ সুঠাম সুন্দর,
বিধবা যুবতী, হায় ফুলল প্রভাতে।
ভৃঙ্গ-মুখরিত স্নিগ্ধ রসালের তলে,
ক্ষণিক দাঁড়াল ফিরে ইছামতী পানে ;
স্মরি অতীতের কথা কি জানি কি মনে।
বামজঙ্ঘা সিক্ত তার ডাগরীর জলে ;
ভ্রান্ত অলি পুষ্পভ্রমে অধর-পল্লব
চুমিতেছে বার বার, তাই বুঝি ক্রোধে
মাঝে মাঝে তাড়াতেছে অঞ্চল তাড়নে!
সম্মুখে বর্দ্ধিত করি বামপদ খানি,
স্থির নেত্রে গণে বালা তরী পিছু ঢেউ ;—
বুঝি কোন অতীতের দিনে ক্ষুদ্র এক
তরী, কাঁপাইয়া নদী-বক্ষ এইরূপে,
ভাসাইয়ে লয়ে গেছে পরিচিত জন।
কতদূরে ধীরে ধীরে ভেসে গেল তরী,—
ফেনরেখা পিছু তার হইল নির্ম্মূল।
চমক ভাঙ্গিল, দ্রুত দুই পদ সরি,
ঝুঁকে পড়ি নদীকূলে জলভরা চোখে,
বারেক চাহিল বামা,—নির্জ্জন তটিনী।
তরী বুঝি মিশে গেছে আকাশের গায়!
স্পন্দিল কোমল বক্ষ—স্মৃতির তাড়নে।
ঊর্দ্ধে চাহি প্রণমিয়া গৃহদেবতায়
অলস উদাস নেত্রে, ফেলি দীর্ঘশ্বাস,—
ফিরিল বিধবা বালা আপন আবাস।

* * * *

বেনা ঝোপ, উলুভরা ইছামতী-তীরে,—
অই সে বিধবা দেখ রহিয়াছে ফিরে।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

স্বদেশী, বৈশাখ, ১৩১৪।

ইছামতী তীরে।

মহাজন পদাবলী।

——×:*:×——

বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে এক্ষণে অনেক চিন্তাশীল লব্ধপ্রতিষ্ঠ মার্জ্জিতরুচি সুকবি আছেন, এবং আধুনিক সময়ে সাহিত্যসেবায় অনেক বিদুষী সুলেখিকাও সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন। ইঁহাদের মনোহারিণী সরস মধুর প্রাঞ্জল কবিতাগুলি যে সুরুচিসঙ্গত সুমার্জ্জিত ও সুখপাঠ্য তাহার আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমাদের প্রাচীন কবিদিগের প্রাচীন কাব্য বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাসের পদাবলীর ন্যায় এমন সরল ভাষায় সহজ কথায় এমন মাধুর্য্যময় রসবৈচিত্র্যপূর্ণ সরস কবিতা কাব্যজগতে অল্পই দেখা যায়। বর্ত্তমান কবিদিগের কবিত্বে এ ভাবটি বড় বিরল। মহাজন পদাবলীতে যে সকল রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত বর্ণিত আছে, তাহার অধিকাংশই ভগবৎপ্রেমলীলার মধুর ছবি। এই প্রেম-ভক্তিমিশ্রিত কবিতাগুলি বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে সকলের দৃষ্টিতে মার্জ্জিতরুচি না হইলেও ইহা অতি হৃদয়গ্রাহী সরস ও মধুর। এই প্রেমভক্তি মাখা কবিতা-গুলি যেন বীণাতন্ত্রীর মধুর স্বরের ন্যায়, বাঁশরীর কোমল করুণ গীতের ন্যায়, সঙ্গীত-সুধার সুতারের ন্যায়; শারদজ্যোৎস্নাস্নাতা ফুলবালার ন্যায়, প্রেমের মদিরাময় আবেশের ন্যায়, কবিত্বের মধুর ঝঙ্কার যেন হৃদয়ে নবভাব ঢালিয়া দেয়, ভাবের মর্ম্মগুলি মজ্জায় সহিত জড়িত হইয়া যায়। ইহার বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে পরতে পরতে মধুর রসের সমাবেশ হইয়াছে।

প্রাচীন কাব্য মহাজন পদাবলী যে সাহিত্য-সংসারে একটি অপূর্ব্ব ও অমূল্য বস্তু তাহা সাহিত্যসেবী সুলেখক মাত্রেই স্বীকার করেন। পূর্ব্বে প্রাচীন কাব্যে গীতি কবিতায় সুরুচি যে তত পরিমার্জ্জিত ছিল না, তাহা পাঠ করিলে স্থানে স্থানে অনুভব করা যায়। কিন্তু প্রাচীন গীতিকাব্য মার্জ্জিতরুচি না হইলেও প্রাচীন কাব্যকারদিগের কবিত্বে যেরূপ উচ্চ অঙ্গের উচ্চভাব লক্ষিত হইয়া থাকে এরূপ উচ্চ অঙ্গের কবিতা আধুনিক সাহিত্যে অল্পই দেখা যায়। বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের পদাবলীর ন্যায় সরল মধুর মর্ম্মস্পর্শী কবিতা প্রায় দুর্লভ।

ইহার শ্লোকার্থগুলি দ্বিভাবপূর্ণ। ইহার আধ্যাত্মিক ভাবার্থ অতি মনোহর। সাধারণ অনভিজ্ঞ লোকে এই রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার রসমাধুর্য্য ও তাৎপর্য্য গ্রহণে অক্ষম হইয়া, ভগবৎ প্রেমের আস্বাদ না বুঝিয়া ইহাকে ভোগ-আসঙ্গ লিপ্ত মনে

করে। কিন্তু এই ভগবৎপ্রেম যে স্বর্গীয়, ভোগবাসনাহীন, অনেকেই তাহা ধারণা করিতে পারে না। কাব্যকারগণ কেবল চিত্রের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিবার জন্যই এইরূপ কৃষ্ণপ্রেম মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকা তাঁহার হ্লাদিনীশক্তি। প্রাচীন গীতিকারগণ এই গীতি কবিতায় শান্ত দাস্য সৌখ্য মাধুর্য্য বাৎসল্যাদি পঞ্চরস বা ষড়রস বৈষ্ণবগ্রন্থে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক্ষণে প্রাচীন কাব্যের সরস মধুর কবিতার মধুর ভাব, মহাজন পদাবলীর দুই এক স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

ত্রিভুবননায়ক রসিকশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমতীর প্রথম দর্শনেই প্রেমবিহ্বল হইয়া বলিতেছেন,—

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সনে তড়িত লতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল॥

এই কবিতার দুই চরণেই যেন হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে প্রেম উথলিয়া পড়িতেছে। এ প্রেমের নিকট বিশ্বসংসার ঢাকা পড়িয়াছে। এ স্থানে নায়কের অতৃপ্ত দর্শনাশা যেন প্রেমের ঝঙ্কারে করুণ দীর্ঘশ্বাসে ভাষায় ভাবে আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীমতীকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের অতৃপ্ত নয়ন যেন পরিতৃপ্ত হয় নাই। তাই সখির নিকট সখেদে বলিতেছেন, ভাল করিয়া দেখা হইল না; মেঘমালা মধ্যে তড়িৎলতা সদৃশী বালার ক্ষণমাত্র দর্শনে হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল মাত্র।

আবার বিদ্যাপতি শ্রীমতীর বয়ঃসন্ধি নিরূপণ করিতে গিয়া আত্মহারা হইয়া বলিতেছেন,—

শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল।
দুঁহু দরশনে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥

কবি এই স্থানে বয়ঃসন্ধি নির্ণয় করিতে গিয়া শৈশব ও যৌবন দুইজনের নিকটই গোলে পড়িলেন। অর্থাৎ শ্রীমতীর দেহ শৈশবের সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। তদবস্থায় শরীর শৈশবের আয়ত্তাধীন কি যৌবনের আয়ত্তাধীন তাহাই বিচার্য্য। ইহাই কবির কবিতায় অভিব্যক্ত হইতেছে।

এই বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কবিতা শুধু সাহিত্যের উপাদানে সৌন্দর্য্যের সমষ্টিতে গঠিত নহে। ইহার মধ্যে অনেক গূঢ়তত্ত্ব ও নিগূঢ় ভাবার্থ নিহিত রহিয়াছে। পদাবলীর কবিতা শুধু সৌন্দর্য্য ও শোভার ভাণ্ডার নহে। ইহার মধ্যে অনেক সারবান ও অমূল্য বস্তু আছে। যে সকল রাগাত্মিকা পদগুলি ভক্তি সহ অবিমিশ্রিত ভাবে লিখিত হইয়াছে

তাহা অতি মধুর। প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস, শ্রীমতীর কৃষ্ণপ্রেমানুরাগ কিরূপ গভীর, দৃঢ়বদ্ধমূল তাহাই দেখাইতেছেন। যে প্রেমে শ্রীমতী তন্ময় হইয়া, আত্মহারা হইয়া, আপনা ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া, জগৎ ভুলিয়া প্রেমময়ের প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, যে প্রেমে রৈবতকের শৈলজা আত্মহারা হইয়া অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

তুমি পিতা তুমি ভ্রাতা তুমি প্রাণেশ্বর।
তুমি শৈলজার এক অনন্ত ঈশ্বর॥

এ সেই প্রেম। এ প্রেমের ভাব মহান্ উচ্চ। ইহার লক্ষ্য—ইহার গতি অনন্তের দিকে। এ প্রেম স্বামিত্ব ভ্রাতৃত্ব ঈশ্বরত্ব তিনে মিশ্রিত হইয়া স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। শ্রীমতীর কৃষ্ণপ্রেমানুরাগ অস্থিমজ্জার সহ জড়িত। কৃষ্ণপ্রেমাতিশয্যে উন্মাদিনী রাধিকা জগতই কৃষ্ণময় দেখিতেছেন। তাই বলিতেছেন—

সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু আছে শ্যাম নামে গো
বদনে কহিতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ হইল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

এ প্রেম শুধু প্রেম নহে। ইহা প্রেম ভক্তির পূর্ণ বিকাশ। ইহার বর্ণে বর্ণে প্রেমের মোহিনী মন্ত্র কর্ণে ঢালিতেছে। এই মনোমুগ্ধকর গীতি কবিতাগুলি যতবার পাঠ করা যায় পাঠেচ্ছা ততই বলবতী হয়। এ কবিতা চিরদিনই নবীন ভাবে জাগ্রত। এই চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস এবং বিদ্যাপতির গীতি কবিতা লইয়াই আমাদের দেশের কীর্ত্তন সম্প্রদায়েরা কীর্ত্তন গান করিয়া থাকে। ইহার মধুর মর্ম্মস্পর্শী প্রাণের করুণ গীতি যেন নিশীথের বীণার অস্ফুট ঝঙ্কারের মত, সুন্দরীর নূপুর নিক্কনের মত, হৃদয়ে অমৃত-মদিরা বর্ষণ করে। প্রেমের সুখময় উচ্ছ্বাস দুঃখের দীর্ঘশ্বাসের সহিত বিজড়িত। তাই কৃষ্ণবিরহ-সন্তপ্তা শ্রীমতী, সখিকে কাতরভাবে জানাইতেছেন—

সখি, সুখের লাগিয়ে পিরীতি করনু শ্যাম বঁধুয়ার সনে।
এত সুখে এত দুঃখ হবে বলে কোন্ অভাগিনী জানে॥

প্রীতির সত, ভালবাসার সহ দুঃখ যে চিরজড়িত নিত্য জাগ্রত, তাহা সকলেই জানেন, ভালবাসিয়া না কাঁদিয়াছে এমন লোকই নাই। তাই প্রবীণ কবি বলিতেছেন—

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখ দুঃখ দুটী ভাই,
ওগো সুখের লাগিয়ে যে করে পীরিতি
দুঃখ যায় তার ঠাঁই।

প্রেমের অতৃপ্ত পিপাসায় আকুল হইয়াই কবি এই আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন।

আবার কোন স্থানে শ্রীমতী বিবশা প্রেম-উদ্ভ্রান্ত-চিত্তা হইয়া পড়িয়াছেন; প্রেমময়ের অদর্শনে সেই বিরহোৎকণ্ঠিতা কাঁদিয়া বলিতেছেন,

সখিরে বরষ বহিয়া গেল, বসন্ত আইল ফুটল মাধবীলতা।
কুহু কুহু করি গাইছে কোকিল গুঞ্জরি ভ্রমরী যথা॥

ভালবাসার সুখস্মৃতি—অতীতের বিরহ বেদনা জাগাইতে এমন গীতি আর কোথায় আছে? আবার কোন স্থানে শ্রীমতী বিবশা বালিকার ন্যায় ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বলিতেছেন,—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে প্রাণনাথ হয়ো তুমি॥

এ প্রেমের ভাব কি পবিত্র কি স্বর্গীয়! এ ভক্তিময়ী কবিতাগুলি পড়িলে প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। তাই পদাবলীর সমালোচনায় মাননীয় রবিবাবু বলিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি, বিদ্যাপতি জানেন মিলনে সুখ বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডীদাসের হৃদয় আরও গভীর। রবিবাবু বলেন, প্রেম কঠোর সাধনা; দুঃখের তপস্যায় প্রেমের স্বর্গীয় ভাব প্রস্ফুটিত হয়। এ প্রেম জগতের নহে, এ পার্থিব সংসারের নহে। এ প্রেমে কাব্যকারগণ নিজেই বিভোর। কৃষ্ণময়-জীবিতা কৃষ্ণগতপ্রাণা উন্মেষিতযৌবনা রাধিকার কৃষ্ণময়তা দেখুন,

বঁধু যবে তুয়া পড়ে মনে চাহি বৃন্দাবন পানে
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালায় যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।

মণি নও মাণিক নও আঁচলে বাঁধিয়া রও
ফুল নও যে কেশে করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।
অগুরু চন্দন হতাম তুয়া অঙ্গে মিশাইতাম,
ঘামিয়ে পড়িতাম তুয়া পায়।

শ্রীমতী কৃষ্ণপদপল্লবে জাতি কুলশীল জীবন যৌবন ধন মান সকলি সমর্পণ করিয়াছিলেন। কায় দ্বারা মন দ্বারা তাঁহার পূজা করিতেন, সুখ দুঃখ সুনাম দুর্নাম ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই প্রেমময়ের চরণে ঢালিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। এমন নিষ্কাম প্রেমের জাজ্বল্য মূর্ত্তি আর কোথায় আছে!

যত সুখের, যত শান্তির, যত ভালবাসার, যত ভক্তির, যত প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রাচীন কাব্যকারগণ দেখাইয়াছেন এমন আর কেহই দেখাইতে পারেন নাই।

প্রাচীন কাব্য একদিকে মিলনের প্রীতির উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে বিরহের করুণ রোদন, একদিকে প্রীতির নির্ঝরিণী অন্যদিকে ভক্তির সাগর। প্রাচীন কাব্যের গীতি কবিতার মধুর ঝঙ্কারে দিক্ মুখরিত। এ কবিদিগের কাব্য-উদ্যান চির কুসুমিত, চিরফুল্ল, চির সৌরভময়, চির জ্যোৎস্নামণ্ডিত। চির বাঞ্ছিতের অদর্শনে শ্রীমতীর মর্ম্মস্থান নিপীড়িত করিয়া দুঃখোদ্বেলিত হৃদয়ের যে করুণ গান গীত হইয়াছে, সে গান এ সংসারে দুর্লভ হইতেও দুর্লভতর। প্রাচীন কাব্য খাঁটী সোণা, ইহা গিল্টি করা নহে।

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী।

নিয়তি।

——•:*:•——

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ইয়ুফ চলিয়া আসিবার অল্পক্ষণ পরেই প্রহরী এক রাজপুতকে লইয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। লিল্লার ইঙ্গিতে প্রহরী বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। লিল্লা তখন রাজপুতকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। রাজপুত সম্মুখস্থ আসনে উপবেশন করিয়া বলিল,—"আপনার সহিত আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে।"

শিল্লা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?"

রাজপুত বলিল,—"আমি একজন রাজপুত।"

শি। রাজপুত তা' তো বুঝিয়াছি, নাম কি?

রা। নাম আপাততঃ অপ্রকাশ থাকিবে।

শি। যে নিজের নাম প্রকাশ করিতে ভীত তা'র সঙ্গে কোন কথাই হ'তে পারে না।

রা। সে আপনার ইচ্ছা। আমার কথা শুনতে না চান, আমি অন্য উপায়ে নিজের কার্য্য সিদ্ধির চেষ্টা দেখবো। কিন্তু আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'লে আপনাদেরই লাভের সম্ভাবনা বেশী।

শি। আমাদের বেশী লাভ?

রা। হাঁ, লাভের অধিকাংশই আপনারা পাবেন, আমি সামান্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করব।

শি। কিন্তু নাম প্রকাশে তোমার আপত্তি কি?

রা। এখন অনেক আপত্তি আছে। কিন্তু যখন আমাদের উভয়ের মত এক হ'য়ে যাবে, তখন বোধ হয় আর আপত্তি থাকবে না।

শিল্লা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"মতামতের কথা পরে, এখন তোমার কথাটা কি বলিতে পার।"

রাজপুত বলিল,—"আপনারা অনেকবারই বেদনোর অধিকারের চেষ্টা করেছেন।"

শি। করেছি।

রা। কিন্তু আপনাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

শি। সকল চেষ্টা সব সময়ে সফল হয় না।

রা। কিন্তু এ সময়ে একবার চেষ্টা করলে বোধ হয় সফল হ'তে পারে।

শি। কিরূপে হ'বে?

রা। আপনার সৈন্যবলের সহিত রাজপুতের গৃহভেদী কৌশল সম্মিলিত হ'লে বেদনোর কতক্ষণ আপনার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবে?

শি। সে কৌশলী রাজপুত কে?

রা। আমিই।

শি। তুমি আমাদের বেদনোর জয়ে সাহায্য করবে?

রা। হাঁ আমিই কৌশলে বেদনোরকে মুসলমানের হাতে তুলে দেব।

লি। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে, রাজপুত রাজপুতের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে।

রা। এ অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। জয়চাঁদের সাহায্য না পেলে ভারতে মুসলমান-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতো না।

লিল্লা বলিলেন,—"জয়চাঁদ প্রতিহিংসার বশে এ কাজ করেছিল।"

রাজপুত বলিল,—"জয়চাঁদের অপেক্ষা আমার প্রতিহিংসা কোন অংশেই ন্যূন নয়।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লিল্লা বলিলেন,—"তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, জানিতে চাই।"

রা। আমার প্রস্তাবিত কার্য্যে দুইটী লাভ আছে; এক বেদনোরের অধিকার, অপর বেদনোর অধিপতির কন্যা তারাবাই। বেদনোরের অধিকার আপনাদের, তারাবাই আমার।

বিস্ময়ের সহিত লিল্লা বলিলেন,—"তারাবাই!"

রাজপুত বলিল,—"হাঁ তারাবাই, এই তারার জন্যই আমি আজি দেশ-দ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী।"

লিল্লা নীরবে বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মুখমণ্ডল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিলেন,—"আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কিন্তু তুমি কি কৌশল অবলম্বন করিবে?"

রাজপুত বলিলেন, "তাহা যথাসময়ে জানাইব।"

লি। তোমার নাম কি?

রা। অনঙ্গসিংহ।

অনঙ্গ সিংহ লিল্লার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। সে চলিয়া গেলে লিল্লা আপন মনে বলিলেন,—"আগে বেদনোর অধিকার করি, তার পর তারাবাইএর কথা। আমি দুনিয়ার অধিকার ছাড়তে পারি, কিন্তু তারাবাইকে ছাড়তে পারব না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্ণকালে আজমীরের পার্ব্বত্য পথে দুইজন অশ্বারোহী ধীরে ধীরে যাইতেছিল। ধীরে—কেননা অসমতল পার্ব্বত্যপথে অশ্ব দ্রুত চলিতে পারিতে-

ছিল না। পথের চারিদিকেই তুঙ্গশৃঙ্গ পর্ব্বতমালা। অপরাহ্ণকালীন সূর্য্যের সুবর্ণ রশ্মি পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে নৃত্য করিতেছে; শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তর অবলম্বন করিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে; কখনও বা উন্নত শৃঙ্গের অন্তরালে গিয়া সন্ধ্যার কপট অভিনয় করিতেছে; আবার পরক্ষণেই অন্তরাল ত্যাগ করিয়া দিব্যালোকে চারিদিক উদ্ভাসিত করিতেছে। পাহাড়ের উপর মেষপাল মহিষপাল চরিয়া বেড়াইতেছে; ভীল বালকেরা পুষ্পিত পার্ব্বত্য তরুর শীতল ছায়ায় বসিয়া সুমধুর বংশীধ্বনিতে পার্ব্বত্য প্রদেশ কম্পিত করিতেছে; পর্ব্বতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। অশ্বারোহিদ্বয় এই সকল মনোরম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতেছিল। তাহাদের একজন কিশোরবয়স্ক, অপর যুবা। উভয়েরই যোদ্ধ্‌বেশ।

যে যুবা সে বলিল,—"আনন্দলাল, এ দেশের পাহাড় কেমন সুন্দর দেখ দেখি।"

আনন্দলাল বলিল,—"অতি সুন্দর। কিন্তু—"

যুবক বলিল,—"কিন্তু কি?"

আ। আমার বোধ হয় তুমি পথ ভুলেছ।

যু। কিসে তোমার এ বোধ হ'ল?

আ। গদবারে কি এমন সুন্দর সুন্দর পাহাড় আছে?

যুবক হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। বলিল, "এই কথা; গদবারের ভিতর যে এ হ'তেও সুন্দর সুন্দর পাহাড় আছে।"

আনন্দলাল নীরব হইল। যুবক বলিল,—"কিন্তু তুমি কি জন্য গদবারে যাচ্চ, তাতো এখনও বল্‌লে না?"

আ। আমার একজন আত্মীয় সেখানে পালিয়ে গিয়েছে।

যু। কিরূপ আত্মীয়?

আ। সম্পর্কে ভাই—একি, এদিকে যে পথ বন্ধ।

সম্মুখে পাহাড়ের একটা ক্ষুদ্র শাখা পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান। তাহাতে উঠিবার একটী পথ আছে, কিন্তু তাহা যেমন সঙ্কীর্ণ তেমনই পিচ্ছিল; সে পথে অশ্বারোহণে যাওয়া দুঃসাধ্য ও বিপজ্জনক; পদে পদে অশ্বের পদস্খলনের সম্ভাবনা। সুতরাং উভয়ে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল, এবং অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া সেই সঙ্কীর্ণ পিচ্ছিল পথে অতি সন্তর্পণে চলিল। তাহারা প্রায় অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়াছে, এমন সময় সহসা সূর্য্যদেব একটা উচ্চ শিখরান্তরালে মুখ

লুকাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘোর অন্ধকার আসিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ আচ্ছন্ন করিল। সহসা যেন এক কৃষ্ণকায়া রাক্ষসী আসিয়া বিশ্বের সমস্ত আলোক এক মুহূর্ত্তে গ্রাস করিয়া ফেলিল। আনন্দলাল ও যুবক উভয়েই দাঁড়াইয়া পড়িল। আর একপদ অগ্রসর হইবার বা পশ্চাতে ফিরিবার উপায় নাই।

সহসা কিসের একটা আঘাত পাইয়া আনন্দলালের অশ্ব চমকিয়া উঠিল, এবং লম্ফ দিয়া নীচে পড়িল। আনন্দলাল তাহার রজ্জু ছাড়িয়া দিল বটে, কিন্তু বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আর্ত্ত চীৎকারে অন্ধকারাচ্ছন্ন পার্ব্বত্যপ্রদেশ কাঁপিয়া উঠিল। রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে যুবক, অশ্বসহ অন্ধকার মধ্যে অন্তর্হিত হইল। পরক্ষণেই এক রাখালবেশী রাজপুত আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইল।

দেখিতে দেখিতে আবার সূর্য্যোদয় হইল, অন্ধকার সরিয়া গেল। রাজপুত দেখিল, সম্মুখে এক পরম সুন্দর বালক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। বালকের স্কন্ধদেশে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। ক্ষতস্থান হইতে প্রবল ধারায় রক্ত ছুটিতেছে। রাজপুত আরও নিকটে আসিয়া ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিল। দেখিল, আঘাত তত সাংঘাতিক নহে, কিন্তু এরূপে অধিকক্ষণ রক্তস্রাব হইলে প্রাণহানির সম্ভাবনা।

রাজপুত তখন বালকের রক্তাপ্লুত অঙ্গাবরণ উন্মোচন করিতে গেল। সহসা শিহরিয়া সে একপদ পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত দৃষ্টিতে বালকের দিকে চাহিল। তারপর সে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রের কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া ক্ষতস্থানে জড়াইয়া দিল। তাহাতে রক্তস্রাব কিছু কমিল। তখন রাজপুত, সেই অচৈতন্য রক্তাক্ত দেহ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্য হইলে আনন্দলাল দেখিল, সে এক ক্ষুদ্র কুটীরে মলিন শয্যায় শায়িত। উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু স্কন্ধদেশে ভয়ানক বেদনা। তখন সে চঞ্চল দৃষ্টিতে কুটীরের চারিদিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল,—"আমি কোথায়?"

অদূরে পূর্ব্বোক্ত রাজপুত বসিয়াছিল। সে উত্তর করিল,—"ভয় নাই, তুমি নিরাপদ।"

আনন্দ। তুমি কে?

রাজ। আমি একজন রাজপুত।

আনন্দ। এটা কোন্ জায়গা?

রাজ। আজমীরের একটী পল্লী।

আনন্দলাল নীরবে ভাবিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল,—"আমাকে এখানে কে আনিল?"

রাজপুত বলিল,—"আমি এনেছি।"

আনন্দ। কেন আনিলে?

রাজ। তুমি দস্যুহস্তে আহত হয়েছিলে।

আ। দস্যু—দস্যু কোথায়?

রা। আমি সন্ধ্যার সময় ছাগপাল নিয়ে ফিরে আসছিলাম, এমন সময় একটা চীৎকার শুনে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি তুমি আহত হ'য়ে পড়ে আছ।

আ। আমার সঙ্গী কোথায় গেল?

রা। আর কারেও সেখানে দেখি নাই।

আ। এখান হ'তে গদবার কত দূর?

রা। অনেক দূর।

আ। রঘুনাথ নিশ্চয়ই পথ ভুলেছিল।

রা। রঘুনাথ কে?

আ। আমার সঙ্গী।

রা। পরিচিত?

আ। পথেই পরিচয় হ'য়েছিল।

রা। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?

আ। গদবার।

রা। কেন?

আ। একখান পত্র নিয়ে।

রা। কার কাছে?

আ। একটী লোকের কাছে।

রা। কে সে লোক?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া আনন্দলাল বলিল,—"আমার একজন আত্মীয়।"

রা। কে পত্র দিয়েছে?

আ। তা' আমি বল্‌তে পারব না।

রা। কেন?

আ। নিষেধ আছে।

রা। তুমি কোথা হ'তে আসছ?

আ। তোড়া হ'তে।

রা। পত্রখানা কি জরুরী?

আ। বিশেষ জরুরী, শীঘ্রই পৌছান দরকার।

রা। কিন্তু তুমি তো এক পক্ষের কম সুস্থ হতে পারবে না?

আনন্দলাল একটু ভাবিয়া বলিল,—"তবে কি হবে?"

রাজপুত বলিল,—"যদি আমাকে বিশ্বাস কর, আমি পত্রখানা যথাস্থানে পৌছাইয়া দিতে পারি।"

আনন্দলাল বলিল,—"বড় গোপনীয় পত্র।"

ঈষৎ হাসিয়া রাজপুত বলিল,—"রাজপুত বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে জানে না।"

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আনন্দলাল পত্রখানা রাজপুতের হাতে দিল। রাজপুত জিজ্ঞাসা করিল,—"পত্র গদবারের কোন্ জায়গায় যাবে?"

আ। নদালয় নগরে।

রা। পত্রের মালিকের নাম কি?

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া আনন্দলাল বলিল,—"পৃথ্বীরাজ।"

চমকিত হইয়া রাজপুত বলিল,—"পৃথ্বীরাজ! রাণা রায়মল্লের পুত্র পৃথ্বীরাজ!"

আনন্দলাল বলিল,—"হাঁ।"

রাজপুত আর কোন কথা না বলিয়া জনৈক ভীলের দ্বারা যথাস্থানে পত্র প্রেরণ করিল।

তারপর রাজপুত, আনন্দলালের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বলিল,—"তুমি কোথা হ'তে আসছিলে বললে?"

আনন্দলাল বলিল,—"তোড়াটঙ্ক হ'তে।"

রা। এদিকে এলে কেন?

আ। রঘুনাথের কথায়; সে বলেছিল গদবারের এই পথ।

রা। অপরিচিতের কথায় তুমি কিরূপে বিশ্বাস করলে?

আ। সে বলেছিল, আমি গদবারে চাকরী করি।

রা। সে তোমায় প্রতারণা করেছিল।

আ। তাতে তার স্বার্থ কি ?

রা। মানুষের অনেক রকম স্বার্থ থাক্‌তে পারে। পথভ্রষ্ট করার কার্য্য নষ্ট করা বা তোমার প্রাণবিনাশ করাও তার অন্যতম স্বার্থ হওয়া অসম্ভব নয়।

আনন্দলাল সবিস্ময়ে বলিল,—"তবে কি সেই আমাকে আঘাত করেছে ?"

রাজপুত বলিল,—"তাহাই সম্ভব। নতুবা পথ ভুলিয়ে তোমাকে এতদূরে আন্‌বার তার উদ্দেশ্য কি ? আর সে গেলই বা কোথায় ?"

আ। কিন্তু আরও পূর্ব্বে তো সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারতো ?

রা। বোধ হয় তেমন সুযোগ পায় নাই। কিন্তু এ সকলই অনুমান মাত্র।

আনন্দলাল নীরবে পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। রাজপুত বলিল,—"তোমার নাম কি ?"

আ। আনন্দলাল।

রা। মিথ্যা কথা, আনন্দলাল, নয় আনন্দী বাই।

আনন্দলাল সবিস্ময়ে রাজপুতের মুখের দিকে চাহিল। রাজপুত বলিল,—"তুমি ছদ্মবেশধারিণী।"

আনন্দলাল লজ্জায় বদন বিনত করিয়া নীরবে রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিল,—"তুমি কে ?"

রা। আমি একজন রাজপুত।

আ। নাম ?

রা। আমার নাম জানিয়া তোমার কোন ফল নাই।

আ। জীবনদাতার নাম জানিয়া রাখা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

রাজপুত নীরবে রহিল। আনন্দলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"রাজপুত কি একজন রমণীর নিকটেও নাম প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত ?"

রাজপুত ধীরে ধীরে বলিল,—"আমার নাম—সঙ্গসিংহ।"

বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে আনন্দলাল বলিয়া উঠিল,—"সঙ্গসিংহ ! চিতোরের ভাবী রাণা মহাবীর সঙ্গসিংহ ?"

রাজপুত—সঙ্গসিংহ নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আনন্দলাল সঙ্কুচিত ভাবে বলিল,—"আমি না জানিয়া আপনার প্রতি রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করেছি ; স্ত্রীলোকের এ অপরাধ—এ প্রগল্‌ভতা কি মার্জ্জনা করিবেন না ?"

সহাস্যে সঙ্গসিংহ বলিলেন,—"মার্জ্জনা করিতে পারি, যদি তুমি তোমার প্রকৃত নাম গোপন না কর।"

আনন্দলাল লজ্জিতভাবে মৃদুস্বরে বলিল,—"আমার—আমার নাম যমুনা।"

স। বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

আ। কেন?

হাসিতে হাসিতে সঙ্গসিংহ বলিলেন,—"যমুনা কৃষ্ণাঙ্গী, কিন্তু তুমি যে গৌরবরণা জাহ্নবী।"

যমুনার মুখ লাল হইয়া উঠিল; সে লজ্জায় উপাধানে মুখ লুকাইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নূতন বৎসর।

——+•×——

১৩১৪ সাল চলিয়া গেল। চলিয়া গেল, কিন্তু বাঙ্গালার বক্ষে যে অনন্তকালস্থায়িনী স্মৃতি রাখিয়া গেল, তাহা বাঙ্গালীর হৃদয় হইতে কখনও মুছিবে না। বাঙ্গালী সব ভুলিবে, কিন্তু জামালপুরের পৈশাচিক কাহিনী কখনও ভুলিবে না। বঙ্গব্যবচ্ছেদের গভীর ক্ষতও হয়তো একদিন তাহার হৃদয় হইতে মিলাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভগ্ন বাসন্তী প্রতিমার ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবে না, সাধ্বী কুললক্ষ্মীগণের করুণ চীৎকার অনন্তকাল তাহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। তাই বলিতেছি, ১৩১৪ সালের স্মৃতি বাঙ্গালার বক্ষ হইতে কখনও মুছিবে না।

তারপর ভূপেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, লিয়াকৎ প্রভৃতি স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের লাঞ্ছনা, কারাবাস, কলিকাতায় অরাজকতা, প্রকাশ্য দিবালোকে সহস্র লুণ্ঠন প্রভৃতি কত ঘটনাই বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া রহিল। এই সকল অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব বিচিত্র অভিনয় প্রদর্শন করিয়া ১৩১৪ সাল চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। ১৩১৫ সাল আসিয়া তাহার স্থানে বসিল।

১৩১৫ সাল আসিল, হিন্দুর সেই পুণ্যপ্রদ বৈশাখ মাস আসিল, সেই দিগ্দহনকারিণী প্রচণ্ডকিরণমালা লইয়া সূর্য্যদেব আসিলেন, অসহ্য তৃষ্ণার জ্বালা লইয়া গ্রীষ্ম ঋতু সদলে আবির্ভূত হইল। সকলই আসিল, আসিল না কেবল বাঙ্গালার সুখের দিন, দেখিলাম না শুধু বাঙ্গালার সেই অতীত চিত্র। বাস্তবিক

তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সহরের গলিতে গলিতে বরফের দোকান বসিল, গাড়ী গাড়ী চা, সোডা, লেমনেড, সিরাপ প্রভৃতির আমদানি হইল, কিন্তু বাঙ্গালার জনশূন্য মাঠের মাঝে পথের ধারে তো আর তেমন জলসত্র বসিল না? তৃষ্ণায় কণ্ঠাগতপ্রাণ পথিকের শুষ্ককণ্ঠে একবিন্দু বারি দিবার কোন উদ্যোগই তো হইল না? বৈশাখ আসিল, কিন্তু পুণ্যমাস বৈশাখে বাঙ্গালীর জলদানের পুণ্য প্রবৃত্তি তো আসিল না? আর কখনও আসিবে কি?

শুনিতে পাই এ দেশটার উন্নতি হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু যে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক একবিন্দু জলের জন্য হাহাকার করে, শুষ্কপ্রায় জলাশয়ের কর্দ্দমাক্ত সলিল পান করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, সে দেশের যদি উন্নতি হইয়া থাকে, তবে অবনতি কোন্ দেশের হইয়াছে? আমরা তো এই উন্নতির জটিল রহস্যজাল ভেদ করিতে অক্ষম।

আমরা চীৎকার করিয়া বলিতেছি, ভাই সব, উঠ, জাগ। কিন্তু ওদিকে যে ভাইগুলি একে একে চিরনিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে, তাহার কোন উপায় করিয়াছি কি? করি নাই। কেন করি নাই? করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝি নাই। আমরা বুঝি, রাজা কর গ্রহণ করেন, তিনিই ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমাদিগের সর্ব্ববিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপায় বিধান করিতে বাধ্য। রাজার কাজ আমরা করিতে যাইব কেন?

'কেন' এ কথার উত্তর নাই। তবে একটা কথা জিজ্ঞাস্য করি, এদেশে যখন হিন্দু রাজা ছিলেন, তখন তাঁহারাও প্রজার নিকট কর গ্রহণ করিতেন, মুসলমান রাজাও কর লইতেন। তথাপি সে সময়ে অশিক্ষিত কৃষক দাশুমণ্ডল আপনার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া পুকুর কাটাইয়া দিত কেন? অনাথা বিধবা রামীর মা আপনার পৈতাকাটা পয়সা দ্বারা জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিত কেন? দেশের ধনীরা অগাধ অর্থ ঢালিয়া গ্রামের আশে পাশে, মাঠের মাঝে বড় বড় দীর্ঘিকা খনন করাইত কেন? গল্প নয়, ঠাকুরমার উপকথা নয়, এখনও জীর্ণ পল্লীর আশে পাশে সেই সকল জলাশয়, সেই সকল দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে, তবে তাহা এখন সংস্কারাভাবে শুষ্ক। সেকালের সপত্নীদ্বয় পরস্পর প্রতিযোগিতায় জয়ী হইবার জন্য পাশাপাশি দুইটা বড় পুকুর কাটাইয়া দিয়াছিল। সে 'দুই সতীনের পুকুর' এখনও বিদ্যমান। কিন্তু এখন আর তেমন পুকুর একটাও হয় না কেন?

না হইবার কারণ আছে। তখন জলদান একটা মহা পুণ্যকার্য্য বলিয়া

লোকের ধারণা ছিল। তাই সেকালের অসভ্য নির্বোধ লোকগুলা 'স্বর্গভূমির' জন্য জলাশয় উৎসর্গ করিয়া আপনাদের কষ্টসঞ্চিত অর্থগুলা অপব্যয় করিয়া যাইত। কিন্তু এখনকার লোক সভ্য হইয়াছে, কাজেই চতুর হইয়াছে। সুতরাং তাহারা এখন আর এরূপে অর্থের অপব্যবহার করিতে চায় না। ইহলোকে জলদান করিলে যে পরলোকে স্বর্গনামক কোন কল্পিত স্থানে বসিয়া প্রচুর জল উপভোগ করিতে পাওয়া যাইবে :এ অন্ধ বিশ্বাস আর তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। এখন এ বিশ্বাস আছে কেবল অশিক্ষিতা হিন্দুরমণীর হৃদয়ে; তাই তাহারা জলসংক্রান্তির ব্রত করিয়া এক এক কলসী জলদান করে।

পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আমি নিন্দা করিতেছি না, কেন না ইহা হইতে আমরা অনেক উপকার পাইয়াছি। কিন্তু এই শিক্ষার দুইটা ফল আছে,—এক, ইহা মানুষকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়, দ্বিতীয়, ইহা লোককে বাচাল করিয়া তুলে। ইউরোপ প্রভৃতি দেশ ইহার প্রথম ফলটি পাইয়াছে, আর আমরা ইহার দ্বিতীয় ফলটি লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছি। সুতরাং যে শিক্ষা একজনকে উন্নত করিতেছে, সেই শিক্ষাই আবার আর একজনকে অবনত করিতেছে। "বিষমপ্যমৃতং কচিদ্ভবেৎ অমৃতং বিষমীশ্বরেচ্ছয়া।"

এখন আমরা অর্থ চিনিয়াছি, অর্থের মহিমা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছি; সুতরাং দেশের দরিদ্র-সম্প্রদায়ের লোলুপ দৃষ্টি হইতে, ক্ষুধার্ত্তের তীব্র জঠরানল হইতে, তৃষ্ণার্ত্তের কর্ণভেদী হাহাকার হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছি, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া লোহার সিন্দুকে চাবির উপর চাবি লাগাইতেছি। কিন্তু এদিকে যে বৈদেশিক বণিক্‌বৃন্দ আসিয়া সিন্দুকটাকে গজভুক্তকপিত্থবৎ করিতেছে, সে দিকে বড় একটা লক্ষ্য নাই।

দেশের লোক দেশের অভাব মোচনে যত্ন না করিলে কেবল রাজার চেষ্টায় কোনদিনই দেশের অভাব মোচন হয় না, হইবেও না। তা' ত্রেতাযুগের রাম রাজত্বই হউক বা এই ঘোর কলির রুশিয়ার অধিকারই হউক। বাণিজ্যে বল, অর্থে বল, ধর্ম্মে বল, যে দেশ যখন উন্নতি লাভ করিয়াছে, দেশের লোকের সমবেত চেষ্টাই তাহার মূল, একা রাজার চেষ্টায় তাহা হয় নাই, হইতে পারে না। তবে তাহাতে আংশিকভাবে রাজার সাহায্য যে প্রয়োজনীয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে, কিন্তু দেশের লোকের চেষ্টা ও সাহায্যই অগ্রে প্রয়োজন। ইহার উপর যেখানে রাজা বৈদেশিক, সেখানের তো কথাই নাই।

কিন্তু আমরা এত গোলের ভিতর যাইতে চাহি না; রাজাকে কর দিব, তিনি যাহা ইচ্ছা হয় করুন। এই জন্যই আজ নূতন কিছু হওয়া দূরের কথা, পুরাতন যাহা ছিল তাহাও একে একে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। পুষ্করিণী শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে, দীর্ঘিকা গোচারণ ভূমি হইয়া যাইতেছে, নন্দনকানন শ্মশানের আকার ধারণ করিতেছে, সুজলা পল্লীতে নির্জ্জলা মরুভূমির বিকট দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতেছে। তথাপি আমরা কেবল রাজার উপর ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত। জানি না আমাদের এ পরনির্ভরতা কবে আত্মনির্ভরতায় পরিণত হইবে।

নূতন বৎসরের নূতন কথা বলিতে গিয়া অনেক পুরাতন কথা আসিয়া পড়িল। যাক, নববর্ষের শুভদিনে এ সকল অপ্রিয় আলোচনায় কাজ নাই। দেশের ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে। এখন এস, আমরা নববর্ষকে সাদরে বরণ করিয়া লই।

তবে এস নববর্ষ! এস ১৩১৫ সাল! এস মহাকালের অংশ! আশা আনন্দ উৎসাহ, প্রীতি প্রফুল্লতা সুখ লইয়া আমাদের সম্মুখে আইস; আমরা আশান্বিত হৃদয়ে তোমাকে সাদরে বরণ করি। ১৩১৪ সাল অনেক নূতন দৃশ্য দেখাইয়া গিয়াছে; যাহা কখনও স্বপ্নে ভাবি নাই, যাহাকে কল্পনার অতীত বলিয়া মনে করিতাম এমন অদ্ভুত দৃশ্যও প্রদর্শন করিয়াছে। জানি না, তুমি আবার কি নূতন দৃশ্যপট উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে স্তম্ভিত করিবে। কিন্তু সে ভবিষ্যতের আলোচনায় এখন কাজ নাই। এখন নূতন বৎসরের প্রারম্ভে নূতন তুমি—তোমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

নূতন।

——×:*:×——

নূতন বরষ ঐ এসেছে আবার!

* * * *

নবীন উষার ছটা অঙ্গেতে মাখিয়া,
আশার মোহন চিত্র ধরিয়া সম্মুখে,
অতীতের সুখদুঃখ পশ্চাতে রাখিয়া,
নূতন বরষ ঐ আসে হাসিমুখে!

অতীতের যত জ্বালা ভুল একবার;
নূতন বরষ যে গো এসেছে আবার।

ফেলে দাও অতীতের জীর্ণ পুরাতন,
দেখাও নূতনে, নব কি আছে তোমার—
কি শিখেছ অতীতে কি পেয়েছ নূতন,
কি নব সাধনা এবে জীবনের সার।

দেখিতে নূতন দৃশ্য ভারত মাঝার,
নূতন বরষ ঐ এসেছে আবার।

কত বর্ষ আসিয়াছে গিয়াছে চলিয়া,
দেখিয়াছে পুরাতন—শুধু পুরাতন;
চলে গেছে তা'রা কত হাসিয়া হাসিয়া,
দেখে তব পুরাতন করুণ ক্রন্দন।

ছাড়ি' সে ক্রন্দন আজি হাস একবার;
নূতন বরষ ঐ সম্মুখে তোমার।

দেখাও মানব তুমি, ঘৃণ্য কীট নও;
দেখাও কাঁদিতে তব হয়নি জনম;
দেখাও নূতনে, যদি পদপিষ্ট হও,
আছে তব শক্তি, ফিরে করিতে দংশন।

দেখিতে ভারতে নবযুগের সঞ্চার,
নূতন বরষ ঐ এসেছে আবার।

সমালোচনা।

নীরদা। উপন্যাস। শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।০।

নীরদার লেখক বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন পরিচিত, স্বদেশীয় পাঠকগণের

[illegible] সেইরূপ পরিচিত। কেবল গ্রন্থকার নহেন, নীরদাও স্বদেশীর পাঠক-[illegible] নিকট অপরিচিত নহে। পূর্ব্বে স্বদেশীতে 'ভিখারিণী' নামে যে উপন্যাস-খানি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া 'নীরদা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এ গ্রন্থের অধিক পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু সমালোচনা করিতে বসিয়া ভাল মন্দ দুই একটা কথা না বলিলে চলে না। এ গ্রন্থের নায়ক রমণীমোহনের চরিত্র, প্রকৃত আর্য্যসন্তানের চরিত্র। এ চরিত্র যেমন পরিস্ফুট তেমনই সুন্দর। রমণীমোহনের একদিকে সুখ অন্যদিকে কঠোর কর্ত্তব্য, একদিকে জীবন অন্যদিকে জননী, একদিকে প্রেম অন্যদিকে ভক্তি; এই মহাসন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া রমণীমোহন কি করিলেন? হিন্দু সন্তানের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিলেন; মাতার তৃপ্তির জন্য মাতৃভক্ত পুত্র আত্মহৃদয় বলি দিতে প্রস্তুত হইলেন। তাই অমর বাবুর কথার উত্তরে তিনি বলিতেছেন, "সহস্র রমণীমোহনের সুখদুঃখ অপেক্ষা মায়ের চোখের জল বড়।" ইহাই তো আর্য্যসন্তানের উক্তি। এই একটী মাত্র উক্তিতেই রমণীমোহন হিন্দুসন্তানের সমক্ষে বরণীয় এবং আদর্শ-চরিত্র হইয়াছেন। গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্রও পরিস্ফুট হইয়াছে। ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে গ্রন্থকার যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ভূতের খেলা। শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২নং মিত্রের লেন হইতে শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা।

ইহা একখানি ক্ষুদ্র নাটক। বর্ত্তমান সমাজের কয়েকটী চিত্র লইয়া ভূতের খেলা অঙ্কিত হইয়াছে। নাটকীয় হিসাবে ইহা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন না হইলেও ইহাতে চিত্রিত কয়েকটী চরিত্র বেশ স্পষ্ট হইয়াছে। বাচস্পতির মত পণ্ডিত, বাঞ্ছারামের মত সুদখোর মহাজন, হেনা রায়ের ন্যায় শিক্ষয়িত্রী বর্ত্তমান সমাজে দুর্লভ নহে। অধুনা সমাজমধ্যে হেমন্তকুমারের ন্যায় স্বদেশপ্রাণ যুবকেরও আবির্ভাব দেখা যাইতেছে। গ্রন্থের সকল চরিত্রই বেশ হইয়াছে। তবে কিন্তু পাগলার মুখে 'তন্বী শ্যামা শিখরদশনা' প্রভৃতি ভাল লাগিল না। পাগলের মুখে পাগলামীই ভাল শুনায়, মেঘদূতের বিশুদ্ধ আবৃত্তি [illegible] বলিয়াই বোধ হয়। ভূতের খেলায় ভূতের উপদ্রব কিছু নিবারিত হইলেই [illegible]।

আহ্বান।

ত্যজিয়া সুখের নিদ্রা—মোহের স্বপন,
একবার দেখ্ তোরা নয়ন মেলিয়া;
সপ্তকোটি কণ্ঠস্বরে বিদারি' গগন,
একবার ডাক্ তোরা জননী বলিয়া।

অন্নবস্ত্রহীন গৃহ, কণ্ঠাগত প্রাণ,
পরপদাঙ্কিত বক্ষঃ জীর্ণ নিরাশায়;
ধর্ম্মহীন কর্ম্মহীন ব্যর্থ এ পরাণ,
নাহি জানি বহিতেছ আজো কি আশায়।

ছিঁড়িয়া এ আশা-সূত্র আয় ফিরে আয়,—
আয় ফিরে জীর্ণগৃহে জননীর কোলে;
এখনো সময় আছে রয়েছে উপায়,
এ সময়ে একবার ডাক্ মা মা ব'লে।

একবার দেখা তোরা আর্য্যের সন্তান,
শিরায় শিরায় আজো আর্য্যরক্ত খেলে;
দেখা আজো রাখিবারে জননীর মান,
দিতে পারে আর্য্যসুত বক্ষরক্ত ঢেলে।

বল্ তবে কোটিকণ্ঠে তুলে প্রতিধ্বনি,
"স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা জন্মভূমি।"

বিধবা।

—— ×:*:× ——

ছোট্ট মেয়েটী—ফুলের মত সুন্দর, চাঁদের মত উজ্জ্বল, তটিনীর ন্যায় অধীর, নয় বৎসরের ছোট্ট মেয়েটী। সোণার মত রঙ, মাথায় কাল মেঘের মত এক-রাশ চুল, চুলের পাশে প্রভাতের পদ্মটীর মত ঢলঢলে মুখখানি, মুখের উপর একটু টানা একটু ভাসা ভাসা চোক দু'টী, হাসিমাখা রাঙা রাঙা ঠোঁট দু'খানি; যেন বিধাতার স্বহস্তনির্ম্মিত একটী রূপের জীবন্ত প্রতিমা। মেয়েটীর নাম চারু।

চারু বড় লোকের মেয়ে, বড় লোকের বউ। পিতা ত্রিলোচন রায় মস্ত জমিদার; যেমন ঐশ্বর্য্য তেমনই প্রতাপ। শ্বশুরও ধনে মানে পিতা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহেন। সুতরাং চারু যেমন বড় লোকের মেয়ে, তেমনই বড় লোকের বউ। কিন্তু যম তো আর ছোট বড় মানে না, সুন্দর কুৎসিৎ বিচার করে না, তাই বিবাহের পর ছয়টী মাস না যাইতেই—উৎসবের মঙ্গল শঙ্খ না থামিতেই চারু বিধবা হইল। কবে যে বিবাহ হইল, আর কবেই বা সে বিধবা হইল, তাহা চারু ভাল বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সে ছাড়া আর সকলেই তাহা বুঝিল। বুঝিল বলিয়াই তাহারা তাহার সিঁথার সিন্দূর মুছিয়া দিল, হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, গায়ের গহনা খুলিয়া লইল, এক সন্ধ্যা হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা করিল। সকলই লইল, রাখিল শুধু পেড়ে কাপড়টী; এত ছোট থান কাপড় বাজারে বুঝি পাওয়া যায় না।

ত্রিলোচন বাবু গোঁড়া হিন্দু। বালিকা কন্যার বৈধব্য দর্শনে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু উপায় কি? অদৃষ্টের উপর হাত নাই; বিধাতার কলমের উপর তো মানুষের কারসাজি চলে না?

ফুল অনেক ফুটে, কিন্তু তাহার কয়টী সম্পূর্ণ ফুটিতে পায় বল দেখি? কেহ বা ফুটিয়া, সৌরভে দিক্ মাতাইয়া, আপনার ফুলজন্ম সার্থক করে, কেহ বা আধফুটন্ত হইয়াই শুকাইয়া যায়, আবার কেহ বা ফুটিবার আগেই ঝরিয়া পড়ে। কেন এমন হয়? সংসারের নিকট জিজ্ঞাসা কর—'কেন এমন হয়?' সংসার কোটিকণ্ঠে জীমূতমন্দ্র স্বরে উত্তর করিবে—অদৃষ্ট, অদৃষ্ট। এই অদৃষ্টের বশেই চারু—সংসার-উদ্যানের অফুটন্ত কুসুম নয় বৎসরের কচি মেয়ে চারু বিধবা হইল। চারুর জন্য তোমাদের দুঃখ হয় কি?

(২)

চারিটী বৎসর—চারিটী যুগের মত সুদীর্ঘ চারিটী বৎসর কাটিয়া গেল। চারু বালিকা ছিল, কিশোরী হইল, তাহার সৌন্দর্য্যের যেখানে যাহা অসম্পূর্ণ ছিল, যৌবনের অগ্রদূত কৈশোর আসিয়া তাহা একে একে পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, একসন্ধ্যা হবিষ্যান্ন আহার, একাদশীর কঠোর উপবাস, এ সকলও চারুর সৌন্দর্য্যের কোন হানি করিতে পারিল না, চন্দ্রকরোচ্ছ্বসিত সিন্ধুর ন্যায় তাহা যৌবনের স্নিগ্ধ করস্পর্শে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কন্যার মুখের দিকে চাহিলেই ত্রিলোচন বাবু শিহরিয়া উঠিতেন, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে ভগবানকে ডাকিতেন। চারুর মাতা ছিল না, সুতরাং মাতা পিতা উভয়ের কষ্টটাই তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল।

পুত্র অন্নদাচরণ উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত; সুতরাং তাহার হৃদয়টা কিছু কোমল। সে পিতার নিকট দুই একবার বিধবাবিবাহের কথা পাড়িয়াছিল, পরাশরের মত, বিদ্যাসাগরের যুক্তি, শুনাইতে গিয়াছিল, কিন্তু ত্রিলোচন বাবু তাহাতে বড় একটা কাণ দেন নাই। কাণ দিতে গেলেই সেই প্রস্তাবের পাশে যেন সমাজের উদ্যত বেত্রদণ্ড দেখিতে পাইতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ত্রিলোচন বাবু প্রবল প্রতাপশালী জমিদার, পার্শ্ববর্ত্তী দশ বার খানা গ্রামে তাঁহার অক্ষুণ্ণ আধিপত্য; তাঁহার নামে সকলেই ভয়ে তটস্থ। কিন্তু এ হেন প্রতাপান্বিত ত্রিলোচন বাবুকেও সমাজের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইল। সমাজ লোকটা কি এতই বলবান্ গা?

পিতার নিকট নিরাশ হইয়া অন্নদাচরণ ভগিনীকে বিধবাবিবাহের উপকারিতা বুঝাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু চারু সে সকল কথার কিছুই বুঝিতে পারিত না। সে কেবল বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। অগত্যা অন্নদাচরণকে নিরস্ত হইতে হইত। দুই চারিবার চেষ্টার পর শেষে অন্নদাচরণ হতাশহৃদয়ে হাল ছাড়িয়া দিল।

(৩)

চারুর মা ছিল না, সুতরাং ভ্রাতৃজায়া—অন্নদাচরণের স্ত্রী দামিনীই সংসারের কর্ত্রী। দামিনীর সহিত চারুর মনের মিল বড় একটা ছিল না। দামিনী দেখিতে শুনিতে কাজে কর্ম্মে সকল দিকেই ভাল, তবে তাহার স্বভাবটা কিছু রুক্ষ, অহঙ্কারটা যেন একটু বেশী। একটু এদিক ওদিক হইলেই সে চারুকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিত। চারু তাহা নীরবে সহ্য করিত, নিতান্ত অসহ্য

হইলে দুই একটা উত্তর দিত। তখন একটা ছোট খাট ঝগড়া বাধিয়া উঠিত, সে ঝগড়ায় শেষে দামিনীই জয়লাভ করিত; কথায় না পারিলে কাঁদিয়া জিতিত।

এই ঝগড়ার কথা মাঝে মাঝে ত্রিলোচন বাবুর কাণেও উঠিত। কিন্তু তিনি কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেন না; কেবল আপনিই অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতেন, আর নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ভগবানের নিকট মৃত্যুকামনা করিতেন। কিন্তু এক দিনের একটা ঘটনায় তাঁহার এই অদৃষ্টপরতার মূল একটু শিথিল হইয়া আসিল।

অন্নদাচরণের পুত্রের অন্নপ্রাশন। বাড়ীতে মহা ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে। দামিনী সোণার কাজকরা বেণারসী শাড়ী পরিয়া বরণ ডালা সাজাইতেছিল। কোলে বসিয়া খোকা একটা খেলানা চুষিতেছিল। এমন সময় চারু তথায় উপস্থিত হইল। সে খোকার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে একটা হাততালি দিল। অমনই খোকা দন্তহীন মুখে একগাল হাসি হাসিয়া পিসিমার কোলে উঠিবার জন্য হাত বাড়াইল, চারু ছুটিয়া তাহাকে কোলে তুলিতে গেল। দামিনী শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল,—"হুঁ হুঁ হুঁ, কর কি, আমি বরণডালা সাজাচ্চি, আর তুমি আমাকে ছুঁতে এসেছ? তোমার কি একটুও আক্কেল নাই?"

চারু মরমে মরিয়া গেল; সে শুষ্কমুখে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। দামিনী ভর্ৎসনা করিয়া বলিল,—"দেখ দেখি, কি করেছিলে; এখনি সব ফেলা যেত। তা' আমায় ছোঁওনি তো?"

নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় জড়িতকণ্ঠে চারু বলিল,—"না বউদিদি।"

দামিনী বলিল,—"আর-না? বল্‌লে রাগ করবে ভাই, কিন্তু না বলেও থাক্‌তে পারি না, যাদের কপাল মন্দ, তাদের এ সব শুভ কাজের কাছে আসা কেন? অমঙ্গলের বাতাস গায়ে লাগলেও——"

শ্বশুরের পদশব্দ শুনিয়া দামিনী চুপ করিল। ত্রিলোচন বাবু আপনার ঘরে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ সকল কথাই শুনিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বাহিরে গিয়া ত্রিলোচন বাবু ডাকিলেন,—"অন্নদা!"

অন্নদা পিতার নিকট আসিল। ত্রিলোচন বাবু বলিলেন,—"সত্যই কি শাস্ত্রে বিধবাবিবাহের কথা আছে?"

অন্নদাচরণ একবার বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিল। তার-

পর সে ব্যস্তভাবে আলমারি খুলিয়া পরাশর সংহিতা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তকরাশি বাহির করিল, এবং সে সকল পড়িয়া পিতাকে শুনাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ শুনিয়া ত্রিলোচন বাবু বিরক্ত ভাবে বলিলেন, —"থাক্।"

অন্নদাচরণ ক্ষুন্নমনে পুস্তকগুলিকে আলমারিতে তুলিল।

(৪)

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে একদিন চারুর জ্বর হইয়াছিল। সে দিন একাদশী। চারু জ্বরের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—"বউদিদি, একটু জল, বুক ফেটে গেল—একটু জল।"

দামিনী রুক্ষ কণ্ঠে বলিল,—"আজ একাদশী।"

কথাটা ত্রিলোচন বাবুর কাণে গেল। তিনি চক্ষু মুছিয়া অন্নদাচরণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের কি মত, তা' আমি জান্‌তে চাই।"

অন্নদাচরণ সাগ্রহে পণ্ডিতমণ্ডলীর মত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। চারিদিক হইতে নিমন্ত্রিত পণ্ডিতগণ আসিয়া ত্রিলোচন বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অন্নদাচরণ তাঁহাদের ভোজন এবং দক্ষিণার রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া দিল। তারপর সভা বসিল, বিচার আরম্ভ হইল; শেষে দুই একজন ব্যতীত সকল পণ্ডিতই বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া ব্যবস্থা দিলেন। যাঁহারা ব্যবস্থা দিলেন না, তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইল। ত্রিলোচন বাবু অধিকাংশের মতকেই সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

তারপর সীতানাথের উপর পাত্রসংগ্রহের ভার পড়িল। কিন্তু পাত্র বড় সহজে মিলিল না। মুখে অনেকে বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী হইলেও কার্য্যতঃ কেহ সমাজের সঙ্কীর্ণ (?) গণ্ডী অতিক্রম করিতে সাহসী হইল না। অনেক চেষ্টার পর একটী পাত্র মিলিল। পাত্রটী শিক্ষিত বটে, কিন্তু অবস্থাটা বড় ভাল নয়। তবে সেজন্য বড় একটা আটকাইল না; ত্রিলোচন বাবু কন্যা জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ একখানা গ্রাম লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। সুতরাং আর কোন গোল রহিল না, বিবাহের দিনস্থির হইয়া গেল। ভৈরবপুর এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী কয়েক খানা গ্রামে কয়েকদিনের জন্য একটা তুমুল আন্দোলন চলিল। অনেক সপ্ততিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ ঘোর কলির আবির্ভাব আশ-ঙ্কায় কাশীবাসের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইল।

চারুও সকল শুনিল। সে পিতার নিকট গিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, বিধবার কি আবার বিয়ে হয়?"

ত্রিলোচন বাবু কন্যার মুখের দিকে না চাহিয়াই উত্তর করিলেন,—"শাস্ত্রে বলে হয়।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট লগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহকালে কে কন্যা সম্প্রদান করিবে ইহা লইয়া একটু গোল উঠিয়াছিল; ত্রিলোচন বাবু কন্যাকে একবার দান করিয়াছেন, এখন আবার দান করিতে গিয়া তিনি দত্তাপহারী হইতে পারেন না; সুতরাং অন্নদাচরণই দানে কার্য্যটা শেষ করিল।

বিবাহ হইয়া গেল, কিন্তু বিবাহের সে আনন্দ, সে উৎসব কোথায়? সকলই যেন নীরব; সর্ব্বত্রই যেন একটা অজ্ঞাত ভীতির ছায়া; সকল কার্য্যই যেন কাহাকে লুকাইয়া চুপে চুপে সম্পন্ন হইয়া গেল। শুভ দৃষ্টির সময় চারু নূতন স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে গেল, কিন্তু মধ্যস্থলে একটা ছায়া মূর্ত্তি দেখিয়া, শিহরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

(৫)

বিবাহের পর চারু, স্বামীর সহিত শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল। কিন্তু সেখানে গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িল, কেবল আশ্চর্য্য নয়, একটু যেন ভয়ও পাইল। আর একবার—সে কথা আজও বেশ মনে পড়ে—সে এমনই করিয়া যখন প্রথম স্বামিগৃহে পদার্পণ করে, তখন সেখানে কত উৎসব, কত আনন্দকোলাহল, কত বধূদর্শনার্থিনী প্রতি-বাসিনীগণের সাগ্রহ দৃষ্টি। কিন্তু এখানে তো তাহার কিছুই নাই? সে উৎসব নাই, সে আনন্দকল্লোল নাই, প্রতিবাসিনীগণের সে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিও নাই। সকলই নীরব, সমস্তই যেন বিষাদের গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ। চারু দেখিল, সেই বিষাদপূর্ণ নীরব নিস্তব্ধ স্বামিগৃহের দ্বারদেশে বিধবা ননাদনী মঙ্গল ঘট পাতিয়া একা নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। এ দৃশ্য দেখিয়া চারুর বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল; সে ভাবিল, এ আবার কি রকম বিবাহ!

বরের নাম রাধানাথ। এক বিধবা ভগ্নী ছাড়া সংসারে রাধানাথের আর কেহ ছিল না। ভগ্নীর নাম বিনোদিনী। বিনোদিনী একাই ভ্রাতৃবধূকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিল। বরণের সময় চারু যেন ননদিনীর একটা দীর্ঘনিশ্বাসের উষ্ণস্পর্শ অনুভব করিল।

সন্ধ্যার পর দুই একজন প্রতিবাসিনী লুকাইয়া বউ দেখিতে আসিল। বউ

দেখিয়া তাহারা বধূর রূপের যথেষ্ট প্রশংসা করিল, তারপর তাহার অদৃষ্টের একটু তীব্র সমালোচনা করিয়া চলিয়া গেল। চারু ভাবিল, এ সময়ে আবার সে পুরাতন কথা কেন? গভীর নীরবতার মধ্যে একা বসিয়া চারু কত কি ভাবিতে লাগিল।

(৬)

পর দিন পাকস্পর্শ এবং ফুলশয্যা। রাধানাথ গ্রামের ইতর ভদ্র অনেককেই মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। নিমন্ত্রিতের মধ্যে যাঁহাদের একটু চক্ষুলজ্জা আছে, তাঁহারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, আর যাঁহারা স্পষ্টবাদিতার জন্য গ্রামের মধ্যে বিখ্যাত, তাঁহারা মুখের উপর চোটপাট জবাব দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বড় বেশী নয়। সুতরাং রাধানাথ সেজন্য বড় একটা ভীত বা চিন্তিত হইলেন না। তিনি বাড়ীতে আসিয়া ভগ্নীকে সকল কথা বলিয়া নিমন্ত্রণ-গ্রহীতাগণের ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে রায়েদের চণ্ডী-মণ্ডপে সমাজপতিগণের একটা বিরাট সভা বসিয়া গেল।

ভোজনের সময় উপস্থিত হইলে দুই একজন অতি নিকট আত্মীয় ছাড়া গ্রামের আর কেহই আসিল না। রাধানাথ নিমন্ত্রিতদিগকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। সে লোক, কাহারও পেট বেদনা করিতেছে, কাহারও মাথা ধরিয়াছে, কাহারও জ্বর হইয়াছে, কেহ বা বাড়ীতে নাই, ইত্যাদি সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল। তখন রাধানাথ চিন্তিত মনে বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট গমন করিলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন, সমাজে তাঁহার আর স্থান নাই; বিধবা বিবাহ করায় সমাজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। রাধানাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"কেন, বিধবা বিবাহ তো অশাস্ত্রীয় নয়; দেশের যাবতীয় পণ্ডিতই তো বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত ব'লে ব্যবস্থা দিয়েছেন? আপনিও কি এ ব্যবস্থা দেন নাই?"

এক টীপ্ নস্য গ্রহণ করিয়া বিদ্যানিধি বলিলেন,—"হাঁ আমিও মত দিয়েছি, এবং এখনও বলছি বিধবাবিবাহের কথা শাস্ত্রে আছে। তবে কি জান বাপু, শাস্ত্রে থাকলেও ব্যবহার নাই, সুতরাং সমাজ এ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে রাজি নয়।"

রাধানাথ বলিলেন,—"সমাজ শাস্ত্রের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করতে চায়?"

বিদ্যানিধি বলিলেন,—"কি জান বাপু, মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য এবং তার শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশে মনীষিগণ যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করেছেন তাহাই শাস্ত্র। কিন্তু দেশ কাল পাত্র অনুসারে তাঁরাই আবার সেই সকল নিয়মের

কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করে গেছেন। সুতরাং বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত হলেও বর্ত্তমান যুগে আমাদের সমাজের উপযোগী নয় বলেই সমাজে তার প্রচলন হ'তে পারে না।"

রা। শাস্ত্রের বিধি প্রচলন হইতে পারে না এ এক অদ্ভুত যুক্তি!

বি। বাপু, সহমরণটাও তো শাস্ত্রের আদেশ, কিন্তু সেটাকে তুলে দিলে কেন?

রা। সেটা ভয়ানক নিষ্ঠুরতা।

বি। আর দেশ হ'তে সতীত্ব ধর্ম্মটাকে লোপ করাই বুঝি ভয়ানক সহৃদয়তা?

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাধানাথ বলিলেন,—"কিন্তু আগে তো অনেকেই সম্মতি দিয়েছিলেন?"

বিদ্যানিধি বলিলেন,—"সেটা মৌখিক। কিন্তু এখন তাঁরা বলছেন কি জান, পাঁচজনের যা মত আমারও তাই; আমি তো আর পাঁচজনকে ছাড়তে পারি না।"

হতাশভাবে রাধানাথ বলিলেন,—"কিন্তু এখন উপায়?"

বিদ্যানিধি বলিলেন,—"এক কাজ কর, যা হবার হ'য়ে গেছে, এখন ও মেয়েটাকে ত্যাগ ক'রে একটা প্রায়শ্চিত্ত করে ফেল। তা হলেই আমরা আবার তোমায় সমাজভুক্ত করে নেব। তুমি তো আমাদের পর নও।"

উত্তেজিত কণ্ঠে রাধানাথ বলিলেন,—"তা' আমি কখনই পারব না।"

দৃঢ়স্বরে বিদ্যানিধি বলিলেন,—"তবে সমাজের আশা ছেড়ে দিয়ে একা থাক।"

ভগ্নহৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া রাধানাথ ভগ্নীকে সমস্ত কথা বলিলেন। শুনিয়া বিনোদিনী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"ওরে কি সর্ব্বনাশ কল্লি রে, বাপ পিতামোর নাম ডুবালি রে, আমি তখনই বলেছিলাম এমন কাজ করিস না রে, ওরে বিধবার কি আবার বিয়ে হয় রে!"

সহসা বাণবিদ্ধ হইলে হরিণী যেমন চমকিয়া উঠে, চারু তেমনই চমকিয়া উঠিল; বিনোদিনীর ক্রন্দনশব্দ তাহার বুকে যেন শেলের মত বিঁধিল। সে তখন শুনিতে পাইল, কেবল বিনোদিনী নয়, সমগ্র বিশ্ব যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'ওরে বিধবার কি আবার বিয়ে হয় রে!' গগন বিদীর্ণ করিয়া বজ্রনিনাদে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতেছে, 'বিধবার কি আবার বিয়ে হয় রে!' তাহার নিজের বুকের ভিতর বসিয়া কে যেন আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিতেছে,

'ওরে বিধবার কি আবার বিয়ে হয় রে!' চারু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল; রুদ্ধকণ্ঠে আপন মনে বলিয়া উঠিল, "ওরে বিধবার কি আবার বিয়ে হয় রে!"

গ্রামের আর কেহ যখন আসিল না, তখন যে দুই একজন আত্মীয় আসিয়াছিলেন তাঁহারাও একে একে সরিয়া পড়িলেন। রাধানাথ বৈঠকখানায় একা বসিয়া নীরবে ভাবিতে লাগিলেন। বিনোদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন সমূহ পুষ্করিণীর জলে ঢালিয়া দিয়া আসিল। উৎসবগৃহ বিষাদের গভীর নীরবতায় আচ্ছন্ন হইল।

(৭)

বিষাদগম্ভীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাধানাথ ডাকিলেন,—"চারু!"

তখন রাত্রি অনেক। গৃহে আলোক জ্বলিতেছিল, কিন্তু তাহা যেন বিষাদের ছায়ায় মলিন। সেই বিষাদবিমলিন গৃহমধ্যে শয্যার উপর চারু পড়িয়াছিল; লজ্জায় ঘৃণায় অনুতাপে তাহার মর্ম্মস্থলটা যেন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল। আর দিগন্ত হইতে কে যেন ভৈরব কণ্ঠে ডাকিয়া বলিতেছিল, "ওরে বিধবার কি আবার বিয়ে হয় রে!" এমন সময়ে রাধানাথ ডাকিলেন,—"চারু!"

চমকিত হইয়া চারু ফিরিয়া চাহিল। রাধানাথ বলিলেন,—"চারু, শুনেছ?"

চারু কোন উত্তর করিল না। রাধানাথ বলিলেন,—"শুনেছ, নিষ্ঠুর সমাজ তোমায় ত্যাগ করিতে বলে।"

চারু নীরব; তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, দৃষ্টি উদাস। রাধানাথ বলিলেন,—"কিন্তু চারু, সমাজের জন্য আমি তোমায় ছাড়তে পারব না।"

চারু উঠিয়া বসিল; নীরস কণ্ঠে বলিল,—"কেন পারবে না?"

রাধানাথ বলিলেন,—"কেন পারব না? তুমি যে আমার স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী।"

চারু বলিল,—"ভুল, ভুল, আমি যে বিধবা।"

রাধানাথ শয্যার উপর উঠিলেন; বলিলেন,—"ওকি কথা চারু, তুমি কি বল্‌ছ?"

চারু উঠিয়া দাঁড়াইল। উদাস কণ্ঠে বলিল,—"আমি বিধবা, আমি বিধবা।"

রাধানাথ মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তারপর কোমল স্বরে বলিলেন,—"সে কথা ভুলে যাও চারু, এখন তুমি সধবা—আমার স্ত্রী।"

রাধানাথ অগ্রসর হইয়া চারুর হাত ধরিতে গেলেন। চারু একপদ পিছা-

ইয়া দাঁড়াইল; আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল,—“না না, বিধবার কি আবার বিয়ে হয়? তুমি আমায় ছুঁয়োনা, আমি বিধবা, ওগো আমি বিধবা।”

রাধানাথ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—“চারু, চারু, তুমি কি বলছ?”

চারু লাফাইয়া শয্যা হইতে নীচে পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—“আমি বিধবা, ওগো আমি বিধবা।”

ঘরের দ্বার খুলিয়া চীৎকার করিতে করিতে চারু বাহিরে আসিল। তাহার চীৎকার শুনিয়া বিনোদিনী উঠিল, রাধানাথ ছুটিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন। চারু তখন বাটীর বহির্দ্বার খুলিয়া পথে গিয়া দাঁড়াইয়াছে; করুণ চীৎকারে নৈশ গগন বিদীর্ণ করিয়া বলিতেছে,—“আমি বিধবা, ওগো আমি বিধবা!” নৈশ বায়ুপ্রবাহ তাহার শেষ প্রতিধ্বনি তুলিয়া ছুটিতেছে,—হা হা হা হা।

চীৎকার করিয়া রাধানাথ ডাকিলেন,—“চারু! চারু!”

চারু তখন নিঃশ্বাস রোধ করিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রাম্যপথে ছুটিয়াছে, আর আকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—“আমি বিধবা, ওগো আমি বিধবা।”

স্বর লক্ষ্য করিয়া রাধানাথ উন্মাদের মত ছুটিলেন। ছুটিতে ছুটিতে আর একবার ডাকিলেন,—“চারু! চারু!”

কিন্তু কোথায় চারু? শুধু উত্তর আসিল,—“আমি বিধবা, ওগো আমি বিধবা।”

পরদিন তালপুকুরের জলে একটা মৃতদেহ ভাসিতে দেখা গেল। সকলেই চিনিল, সে দেহ চারুর।

সমাপ্ত।

ভারতের রাজভক্তি

——×:*:×

কিছু দিন হইতে একটা কথা উঠিয়াছে, অধুনা ভারতে রাজভক্তির অভাব হইয়াছে; রাজপুরুষেরা বা রাজার জাতিরা ভারতবাসীর হৃদয়ে আর রাজভক্তি দেখিতে পান না। অবশ্য এটা তাঁহাদের দৃষ্টির দোষ কি ভারতবাসীর হৃদয়ের দোষ, তাহার বিচার করিয়া তাঁহারা অমূল্য সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু এই সুরটী তুলিয়া তাঁহারা মাঝে মাঝে হতভাগ্য ভারতবাসিগণকে বেশ

ও' কথা শুনাইয়া দেন। শুনাইবার অধিকার যে তাঁহাদের নাই এমন কথা বলি না, তবে তাঁহাদের একটা কথা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, পাগল পাগল শুনিতে শুনিতে সহজ মানুষও পাগল হইয়া যায়।

ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্বাধীন দেশের রাজভক্তির সহিত ভারতের রাজভক্তির একটু তারতম্য আছে। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে রাজাকে যে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা বিশেষ কিছু উচ্চাসন দেওয়া হয়, এমন বোধ হয় না, তাহারা আপনাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উদ্দেশেই রাজাকে একটা কাষ্ঠ-পুত্তলিকারূপে খাড়া করিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু ভারতবাসীর প্রকৃতি ঠিক এরূপ নয়; তাহারা রাজাকে দেবাংশসম্ভূত সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া মনে করে; এবং দেবতার প্রাপ্য ভক্তিই রাজার চরণে ঢালিয়া দেয়। ইহাতে তাহাদিগকে নির্ব্বোধ ভীরু প্রভৃতি যাহা বলিতে হয় বল, কিন্তু তাহাদের স্বভাবই এই। তাহারা রাম রাজত্বের প্রজা; রাজা রামচন্দ্রের প্রজারঞ্জন কাহিনী এখনও তাহাদের অন্তরে জাগরূক। সে কাহিনী বিস্মৃত হইয়া তাহারা কখনও রাজাকে ভক্তি করিতে ভুলিবে না।

এক রাজা লইয়াই প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে যখন এতটা প্রভেদ, তখন উভয়ের রাজভক্তিও যে ভিন্নভাবাপন্ন হইবে তাহার আর সন্দেহ কি? পাশ্চাত্যগণ রাজভক্তি বলিতে রাজ-নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর অধীনতা স্বীকার করা বুঝে, আর ভারতবাসী বুঝে, দেবতা বলিয়া অন্তরের সহিত রাজাকে পূজা করাই রাজভক্তি। সুতরাং বিভিন্ন ধারণার বশবর্ত্তী ইয়ুরোপীয়গণ কখনই ভারতবাসীর রাজভক্তির অনুমানও করিতে পারিবেন না। তা' পারুন বা নাই পারুন, তাঁহারা এখন পদে পদে ভারতে রাজভক্তির অভাব অনুভব করিতেছেন; কেবল অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এই অভাবটুকু পূরণের জন্য যথেষ্ট আয়োজনও করিয়াছেন। পিউনিটিভ পুলিস, রেগুলেসন লাঠী, সভা বন্ধের আইন, স্বদেশী প্রচারক এবং সংবাদপত্র সম্পাদকগণের জন্য কারাবাসের ব্যবস্থা, ইত্যাদি ইত্যাদি নূতন নূতন যন্ত্রের সহায়ে ভারতবাসীর হৃদয়নামক পদার্থটাকে নিষ্পেষণ পূর্ব্বক এই দুর্লভ ভক্তিটুকু লাভ করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে যে এই দুর্লভ পদার্থটুকু ক্রমেই দুর্লভতর ও তম হইয়া দাঁড়াইতেছে, সে দিকে বড় একটা লক্ষ্য করিতেছেন না।

ভারতবাসীর অপরাধ, তাহারা স্বদেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য স্বদেশজাত দ্রব্যের ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এতদিন বৈদেশিকগণ যে উপায়ে

ভারতের রক্ত শোষণ করিয়া আপনাদের ক্ষীণোদর স্থূলতর করিতেছিলেন, তাহাতে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, দুর্ভিক্ষের করালকবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য স্বদেশী মহামন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহা হইতে আর কি গুরুতর অপরাধ থাকিতে পারে? তাহাদের এই বিষম ধৃষ্টতার ফলে শ্বেতাঙ্গ বণিক্ সম্প্রদায়কে কিঞ্চিৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। সুতরাং ভারতবাসীর আর রাজভক্তি কোথায়? যাহারা আত্মরক্ষার জন্য রাজার জাতিভাই বণিক্‌দলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে, তাহাদিগকে রাজদ্রোহী না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? ভারতের মনে রাখা উচিত যে, ইহা 'কোম্পানী'র রাজত্ব।

কিন্তু ভারতবাসীরা এইখানেই একটা মস্ত ভুল করিয়াছিল। তাহারা যে দিন স্বর্গগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শান্তিময় শাসনছায়াতলে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, যে দিন তাঁহার অমৃতময়ী আদেশবাণী শুনিয়া আশায় হৃদয় বাঁধিয়াছিল, সেই দিন হইতেই তাহাদের এই ভুলের আরম্ভ। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, তাহারা আর কোম্পানী নামধেয় শোষণবৃত্তি বণিক্‌কুলের অধীন নহে, প্রবল প্রতাপশালী সুশাসক ব্রিটিশরাজের ভক্ত প্রজা। ইহা বুঝিয়াছিল বলিয়াই তাহারা বণিক্‌বৃন্দের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছিল। কিন্তু এখন তাহাদের সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে। হে ইংরাজ! ভ্রান্ত ভারতবাসীকে এজন্য ক্ষমা করিবে কি?

ক্ষমা কর বা না কর, কিন্তু একটা কথার উত্তর দিবে কি? এই দেশটা ভারত না হইয়া যদি ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা জর্ম্মণি হইত, অথবা সে দেশবাসীরা ভারতবাসীর ন্যায় অবস্থাপন্ন হইত, তাহা হইলে সেখানে রাজভক্তির স্রোতটা কিরূপ ভাবে প্রবাহিত হইত বল দেখি? একবার কল্পনা করিয়া দেখ দেখি, সে দেশের অধিবাসীরা ভারতবাসীর মত এমনই নীরবে মৃত্যুর ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইত কি না? নিরীহ ভারতবাসী যাহা মাথা পাতিয়া লইতেছে, তাহার জন্য কত রক্তের স্রোত বহিয়া যাইত?

ঐ দেখ, ভারতের আজি কি অবস্থা। স্বর্ণভূমি ভারত আজি মরুভূমির আকার ধারণ করিয়াছে; সেই ভীষণ মরুভূমির মধ্যে একদিকে মহামারীর পৈশাচিক তাণ্ডব, অপর দিকে দুর্ভিক্ষরাক্ষসীর বিকট হুঙ্কার। ঐ দেখ ভারতের শস্যশ্যামলা শান্তিময়ী পল্লী শ্মশান, লোকালয় হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যপ্রায়, স্বর্ণগ্রাহ ভারতের অধিবাসী অন্নাভাবে কঙ্কালসার, ঐ শুন তাহাদের আর্ত্ত চীৎকারে গগন ফাটিয়া যাইতেছে। আর কি দেখিতে চাও? ধনধান্য পরি-

পূরিত স্বর্ণপ্রসূ ভারতের আর কি দুর্গতি দেখিতে চাও? আর যাহা দেখিতে চাও, তাহা যদি নিজের চক্ষু থাকে, হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র মনুষ্যত্ব থাকে, তবে নিজেই দেখিয়া লও, আমরা তাহা দেখাইতে অক্ষম; আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ।

কিন্তু এত কষ্টেও সহিষ্ণু ভারতবাসী ধৈর্য্যচ্যুত হয় নাই, এত দুঃখেও তাহার হৃদয় হইতে রাজভক্তি অপসৃত হয় নাই। এখনও সে তোমার একটা মুখের কথায় মুগ্ধ হইয়া যায়, রাজপুরুষের একটু আশ্বাসে আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে; মৃত্যুর মুক্তদ্বার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াও সে আপনার হৃদয়ের ভক্তি—কৃতজ্ঞতা রাজার পায়ে, ইংরাজের পায়ে, রাজপুরুষের পায়ে ঢালিয়া দেয়। এমন শান্তসহিষ্ণু জাতিকে রাজভক্তিহীন বলিয়া হে ইংরাজ! সত্যের অপলাপ করিও না। ভারতবাসী তো মরিতেই বসিয়াছে; মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা দিও না।

তোমাদের অনুমান সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, তোমরা একবার বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, ভারতবাসীর সহিষ্ণুতা কত গভীর। আমার ক্ষেত্রে যদি ফসল না জন্মে, আমার ঘরে যদি অর্থের অভাব হয়, আমার যদি অর্থোপার্জ্জনের শক্তিও না থাকে, তবে অগত্যা আমাকে উপবাসে দিন কাটাইতে হইবে, সে অবস্থায় আমি এক অদৃষ্ট ভিন্ন আর কাহারও দোষ দিতে পারি না। কিন্তু আমি যদি দেখি, আমার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শস্য জন্মিল, কিন্তু তাহা আমার ভোগে আসিল না; তুমি বাণিজ্যের ছলে আসিয়া অর্থনীতির কূট বিচারে আমাকে ভুলাইয়া সেগুলি আত্মসাৎ করিলে, আমার ক্ষুধার্ত্ত পত্নীপুত্র তোমার মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তারপর আমি গাধার মত খাটিয়া, গায়ের রক্ত জল করিয়া যে দুইটী পয়সা আনিলাম, পঞ্চায়েত মহাশয় আসিয়া চৌকিদার প্রতিপালনের জন্য তাহা কাড়িয়া লইলেন; ঘরে যে দুই একটা ঘটী বাটী ছিল, ম্যালেরিয়া আসিয়া তাহা গ্রাস করিল; উপায় নাহি দেখিয়া রাজার নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িলাম; উত্তর পাইলাম, 'কি করিব বাপু, তোমার ক্ষেতের শস্য তোমার ঘরে থাকিতে দিয়া আমি তো আর অবাধ বাণিজ্যের মূলে আঘাত করিতে পারি না? তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চৌকীদার, তাহার ব্যয় তোমরা দিবে না তো আর কে দিবে? আর তোমরাই দূষিত জল ব্যবহার করিয়া, মশকাদি পূর্ণ অপরিস্কৃত স্থানে থাকিয়া ম্যালেরিয়া ডাকিয়া আনিতেছ, সুতরাং আমি তাহার কি করিতে পারি!'

ব্যস্ সাফ্ জবাব, এ জবাবের আর প্রতিজবাব নাই। কিন্তু এই সাফ জবাব যে শুনে, তাহার প্রাণটার ভিতর কি রকম হয় বল দেখি? বল দেখি

সে এখন কোথায় দাঁড়ায় ? তুমি বণিক্ —বাণিজ্যের দোহাই দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলে ; রাজা—প্রজার সুখ দুঃখ যাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে—তিনি নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন ; আর আমি—অদৃষ্টের দোহাই দিয়া, চুপে চুপে মৃত্যুর হস্তে আত্ম সমর্পণ ব্যতীত আমার আর উপায় কি ? কিন্তু এই রূপে মরণের দ্বারে দাঁড়াইয়াও যদি একটা অন্তিম দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করি,তোমরা অমনই সেই নিশ্বাসের মধ্যে বিদ্রোহের ঝটিকা দর্শন করিয়া শিহরিয়া উঠিবে, একবার প্রাণের শেষ কথা মর্ম্মের ব্যথা প্রকাশ করিতে গেলে কণ্ঠ চাপিয়া ধরিবে, আর তারস্বরে ঘোষণা করিবে, ভারতবাসী রাজভক্তিহীন। তাই আবার বলিতেছি, আমরা মরিতেই বসিয়াছি, কিন্তু তোমরা আর এমন করিয়া মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিও না। আমাদের ধর্ম্ম অর্থ কাম সকলই গিয়াছে, আছে শুধু সহিষ্ণুতা, ভরসা শুধু মৃত্যু ; সে সহিষ্ণুতার উপর আর আঘাত করিও না, মৃত্যুর শান্তিময় পথে আর মিথ্যা-কলঙ্কের কণ্টক ছড়াইয়া দিও না। আমাদিগকে একটু শান্তিতে মরিতে দাও।

শুনিতে পাই, তোমরা সাম্যবাদী মহাত্মা যিশুখৃষ্টের শিষ্য ; জগতে সাম্যনীতির প্রচারই তোমাদের মূল মন্ত্র। কিন্তু ইহাই কি তোমাদের সেই সাম্যনীতির পরিচয় ? কেহ ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে গেলে তোমরা তাহার গলা টিপিয়া ধরিবে, তৃষ্ণায় কণ্ঠাগত-প্রাণ হইয়া 'একটু জল দাও' বলিলে তাহাকে বৈতরণীর উষ্ণ সলিল পানের উপদেশ দিবে, দুর্ভিক্ষের তাড়নায় কাতর হইয়া কেহ যদি বলে, 'ওগো আমার কষ্টসঞ্চিত অর্থের একটী মাত্র কপর্দ্দক আমাকে ভোগ করিতে দাও," অমনই তাহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিবে। ইহারই নাম কি সেই আত্মত্যাগী মহাপুরুষের প্রচারিত সাম্যনীতি ?

তোমরা রাজার জাতি—রাজা, আমরা তোমাদের অধীন প্রজা ; তোমরা শক্তিমান, যথেচ্ছভাবে শক্তির লীলা প্রদর্শন করিতে পার, আমরা দুর্ব্বল, সেই শক্তির পদে বিলুণ্ঠিত হই ; তোমরা প্রভু, প্রভুত্বগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আমাদিগকে যেমন ইচ্ছা চালাইতে পার, আমরা গোলাম, তোমাদের পদলেহন করিয়া কৃতার্থ হই। কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা আমাদের মস্তকে রাজভক্তি-হীনতার অমূলক অপবাদ চাপাইয়া দিও না, রজ্জুতে সর্পভ্রম করিয়া সহজ মানুষকে পাগল করিও না। ভারতবাসী এখনও রাজভক্তিহীন হয় নাই, কখনও হইবে বলিয়াও বিশ্বাস হয় না। কিন্তু যদি কখনও হয়, তবে হে ইংরাজ ! নিশ্চয় জানিও তোমাদের এই অলীক অপবাদই তাহার মূল কারণ ; তোমা-

দের বলিবার অধিকার আছে বলিয়াই নির্দ্দোষীকে দোষী বলিয়া জগদীশ্বরের নিকট দোষী হইও না। তোমরা বলবান্, তাই বলিয়া দুর্ব্বল ভারতকে এমনই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিও না। কোটি কোটি জড় পরমাণুর সমষ্টি হইতে একটী সজীব মনুষ্যের উদ্ভব অসম্ভব নহে।

ব্যবসায়-বাণিজ্য।

(১৮৫৮—১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।)

লর্ড ক্যানিং ভারতীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের শুল্কের গুরুতর পরিবর্ত্তন সংসাধন করেন। ভারতে পদার্পণের একবৎসর পর ১৮৫৭ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি বৃটিশ ও অপরাপর দেশের কাঁচা ও প্রস্তুত সমস্ত দ্রব্যের শুল্কের হার সমান করিবার প্রস্তাব করিয়া কোর্ট অব্ ডিরেক্টরকে পত্র লিখেন। বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য সমূহ—যাহা হইতে অতি অল্পই শুল্ক সংগৃহীত হইত, তাহা শুল্ক-মুক্ত করিবার প্রস্তাব এবং রপ্তানী শুল্ক রহিত ও আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু এই সময়ে সিপাহী বিদ্রোহ সমুপস্থিত হওয়ায় এ বিষয়ে কোন মীমাংসা হইতে পারে না, এবং পরবৎসর—১৮৫৮ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

সম্রাটের অধীনে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম ষ্টেট্ সেক্রেটারী লর্ড ষ্টান্‌লি ১৮৫৯ অব্দের এপ্রিল মাসে লর্ড ক্যানিংএর প্রস্তাবের উত্তর দেন। মিউটিনী সংঘটিত হওয়ায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দায়িত্ব প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় এবং তদ্ধেতু আর্থিক কৃচ্ছ্রতাও বাড়িয়া যায়। তজ্জন্য লর্ড ষ্টান্‌লি বেশী রাজস্ব সংগ্রহের অভিপ্রায়ে লর্ড ক্যানিংএর প্রস্তাব সমূহের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া মীমাংসা করেন যে, বৃটিশ ও অন্য অন্য বৈদেশিক শিল্প দ্রব্যাদি সমান ভাবে দেখিতে হইবে এবং শেষোক্ত দেশীয় দ্রব্য সমূহের শুল্কের হারের অনুরূপ শুল্ক বৃটিশ শিল্প দ্রব্যের উপরও বসাইতে হইবে। অর্থাৎ এতদুভয় দেশের শুল্কের হারের কোন পার্থক্য থাকিবে না। ছোট ছোট দ্রব্যের শুল্ক রহিত

হইবে না; রপ্তানী শুল্কও উঠিয়া যাইবে না, কেবল আমদানী শুল্কের হার বৃদ্ধি হইবে।

এই আদেশ প্রাপ্তির পূর্ব্বেই ভারত-সরকার ১৮৫৯ সালের ৭ আইন প্রচার দ্বারা বৃটিশ ও অপর বৈদেশিক শিল্পের শুল্কের হার সমান করিয়া দেন এবং বর্ত্তমান চুক্তি থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্যের ক্ষমতাপন্ন হন। এক্ষণে ষ্টেট্ সেক্রেটারীর পূর্ব্বোক্ত আদেশ প্রাপ্তে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান যে, আপনার উপদেশের অনুরূপই এখানে সম্প্রতি এক আইন জারি হইয়াছে।

কিন্তু এই আইন প্রচার হেতু ভারতবর্ষের বিলাতী সওদাগরদের মধ্যে মহা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়; তৎপরে যখন ভারতের প্রথম Finance Minister জেমস্ উইলসন্ ভারতবর্ষে গমন করেন, তখন তাঁহাকে এই অসন্তোষ নিরাকরণ করিতে চেষ্টিত হইবার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়। তদনুসারে ১৮৬০ অব্দে তিনি ভারতীয় কাঁচা মাল রপ্তানীর উপরের শুল্ক রহিত এবং আমদানী শিল্প শুল্ক প্রভুত পরিমাণে হ্রাস করেন। ইহাতে বিলাতী সওদাগরগণ শান্ত হন বটে কিন্তু ভারতবর্ষ তাহার এই গুরুতর অভাবের সময় প্রচুর রাজস্ব ক্ষতি স্বীকার করে।

ঐ বৎসরেই ভারতীয়, বাণিজ্য শুল্ক বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত এক কমিটী নিযুক্ত হয়। কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের দুইজন বিলাতী বণিক, কমিটীর সভ্য পদে মনোনীত এবং আস্‌লে ইডেন (পরে বঙ্গের ছোট লাট) তাহার সভাপতি হন। ১৮৬০ অব্দে কমিটী যে রিপোর্ট প্রেরণ করে, তাহাতে শুল্ক হার সমান করিবার ও অন্যান্য কতিপয় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের নিমিত্ত পরামর্শ দেয়। ১৮৬৭ অব্দে দ্বিতীয় কমিটী এবং ১৮৬৯ অব্দে তৃতীয় কমিটী নিযুক্ত হয়। এবং পরবর্ত্তী বৎসরে লর্ড মেয়োর শাসন কালে ১৮৭০ সালের ১৭ আইন প্রচারিত হয়। এই আইনে আমদানী শুল্ক সাধারণত প্রস্তুত দ্রব্য এবং কাঁচা উপাদানের উপর শতকরা ৭॥০ টাকা, সূতার মোড়ের শতকরা ৭॥০ টাকা, বস্ত্রাদির ৫৲ টাকা, লৌহের ১৲ টাকা এবং তামাকের শতকরা দশটাকা হারে শুল্ক ধার্য্য হয়। প্রধান রপ্তানী শুল্কের মধ্যে নীলের মণ প্রতি ছয় পেন্স, শস্যের মণ প্রতি (৮২ পাউণ্ড) তিন পেন্স, লাহার শতকরা ৪৲ টাকা এবং তৈল, বীজ, কার্পাস দ্রব্য, চামড়া, স্পিরিট প্রভৃতি শতকরা ৩৲ টাকা হারে শুল্ক ধার্য্য হয়।

১৮৭১ সালের ১৩ আইন (Act. X111) দ্বারা পরবর্ত্তী সনে আরও কতিপয়

বিধান হয়। এই আইন দ্বারা যে আমদানী রপ্তানী শুল্ক ধার্য্য হয় তাহার প্রধান প্রধান কতিপয় দ্রব্যের বিষয় নিম্নে বিবৃত হইল।

আমদানী শুল্ক।

পোষাক পরিচ্ছদ, মোমবাতি, গাড়ী, ঘড়ি, কার্পাস,
অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি—শতকরা ৭৷৷৹
কার্পাস মোড় (Twist) ৩৷৷৹
বস্ত্র খণ্ড ... ... ৫৲
ঔষধাদি ৭৷৷৹
রংএর উপাদান ৭৷৷৹
ফল মূল, কাচ, চামড়া, জহরত, গজদন্ত এবং পরিষ্কৃত চামড়া ... ৭৷৷৹
বিয়ার মদ্য ... . প্রতি গ্যালন ১৷৷ পেন্স.
স্পিরিট ... ... ৬ পেন্স
মদ্য ... ... ৩ „
লৌহ ... ... শতকরা ১ „
অন্যান্য ধাতু ... ... ৭৷৷৹ „
নৌ-যানের সাজ সরঞ্জাম, তৈল, রং, সুগন্ধি দ্রব্য, পোর্‌স্লেন্ প্রভৃতি ৭৷৷৹ „
রেশম ... ... ৭৷৷৹ „
শর্করা ... ... ৭৷৷৹ „
তামাক ... ... ১০ „
পশমী বস্ত্র সমূহ ... ... ৫৲ „

রপ্তানী শুল্ক।

কার্পাস দ্রব্য ... ... ৩ „
সর্ব্ব প্রকার শস্য (প্রতি মণ) ... ... ৪৷৷৹ „
চর্ম্ম ... ... ৩৲ শতকরা
নীল ... ... (প্রতি মণ) ৬ শিলিং
লাক্ষা রং প্রভৃতি ... ... ৪৲ শতকরা
তৈল ... ... ৩৲ „
বীজ (Seeds ও spices) ... ... ৩৲ „

ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রাগুক্ত প্রকার শুল্ক নির্দ্ধারণে কমন্‌স্ সভায় সিলেক্ট

কমিটীতে নানারূপ বাদানুবাদ উত্থিত হয়। আসলে ইডেন সাহেবের ১৮৬০ অব্দের টারিফ কমিটীর সভ্য ও কলিকাতার একতম প্রসিদ্ধ বণিক জন নাট্‌বুলেন সাহেব প্রতিমণ শস্যের উপর সাড়ে চার পেন্স হিসাবে শুল্ক নির্দ্ধারণে আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ইহা বস্তুতঃ ধান্য আবাদকারীদের স্কন্ধেই চাপিবে এবং তাহাদের ভূমিকরের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। কার্পাস বস্ত্রের শতকরা পাঁচ টাকা আমদানী শুল্ক তাঁহার মতে অনাপত্তিকর এবং গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। (১) তৎকালে কলিকাতায় দু'টী তিনটী কার্পাস-সূত্র তৈয়ারীর মিল ছিল।

বিলাতী দ্রব্যের কাটতি বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে কার্পাস-বস্ত্র সমূহের আমদানী শুল্কের হার কম করার অবশ্যম্ভাবী ফল সম্বন্ধে Sir Bartle Fere অতি ধীরতার সহিত বলেন,—"ইহাই এখানকার কঠিন সমস্যা; এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের স্বার্থ বিভিন্নতর প্রতীয়মান হয়। বস্ত্রসমূহ ও সূত্রের উপর বর্দ্ধিতহারে আমদানী শুল্ক স্থাপন করিলে নিঃসন্দেহ রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু তাঁহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইবে যে, স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের হার ও দেশে তাহার কাট্‌তির পরিমাণ কমিয়া আসিবে।" (২)

পক্ষান্তরে বোম্বাই বণিক ও বোম্বাই কৌন্সিলের সভ্য ওয়ালটার ক্যাসেল বলেন যে, কার্পাস বস্ত্র সমূহের এই যে সামান্য পাঁচটাকা আমদানী-শুল্ক উহা রক্ষাশুল্ক স্বরূপেই কার্য্য করিবে। বোম্বায়ে তান্তব ব্যবসায়ের ও কার্পাস-সূত্র ব্যবসায়ের উন্নতি দেখিয়া সাক্ষী মহোদয়ের গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছিল; তাই তিনি ঈর্ষাকুলিত হৃদয়ে বলেন,—"আমার মতে উহা রক্ষা-শুল্কই (Protective duties)। একমাত্র এই কারণেই আমি ঐ শুল্কের বিলোপ সাধনের বিরোধী। আমি ঠিক বলিতে পারিনা—আপনারা অবগত আছেন কিনা, যে বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে দ্বাদশটী কটন-মিলে ৩১৯১৯৪টী চরকা, ৪১৯৯ তাঁত এবং ৪১৭০ হস্ত (অবশ্য ইহার কিয়দংশ ম্যাঞ্চেষ্টারের জন্য) নিয়োজিত রহিয়াছে এবং তদ্দ্বারা আমার বোধ হয়, বৎসরে ৪০০ পাউণ্ড ওজনের ৬২০০০ বেল কার্পাস খরচ হয় (বা কাজে লাগে)।" (৩)

---

(১) Select committee's Report, 1871.

(২) Ibid.

(৩) Ibid.

ভারতবর্ষের ভাগ্যনিয়ন্তা বৃটিশ শাসনকর্ত্তৃগণ ঈর্ষার পরিবর্ত্তে সন্তোষের নেত্রেই বোম্বাই প্রদেশের শিশু কার্পাস ব্যবসায়ের উন্নতির গতি নিরীক্ষণ করিতেন; কিন্তু ভারত শাসন ব্যাপারে তাঁহারা বৃটিশবণিক ও বৃটিশ ভোটদাতা-গণেরই ভৃত্যস্বরূপ ছিলেন। সেই সুপ্রসিদ্ধ স্যর চার্লস্ ট্রিভেলিয়ান, যিনি পূর্ব্বতন শাসকদিগের অধীনে অতি দক্ষতা ও প্রশংসার সহিত ভারতবর্ষে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং যিনি জীবনের শেষাংশে মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা ও ভারতের রাজস্ব-সচিব নিয়োজিত হন, তিনি বিলাতীশিল্পীদিগের আদেশে ভারতের ন্যায়-সঙ্গত রাজস্বের অবনতি সংঘটনে কতকটা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া-ছিলেন,—"এই দশ বৎসরে ভারতবর্ষের ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তৃত হইলেও,—৬০,০০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ১০৬,০০০,০০০ পাউণ্ড মুদ্রার ব্যবসা হইলেও শুল্কের পরিমাণ ১,০১৭,৫০০ পাউণ্ড কম হইয়াছে। এই শুল্ক (custom duties) যদি রাজস্ব বৃদ্ধির প্রধান ও ন্যায়সঙ্গত উপায় হয়, তবে সমগ্র ভারতের ২৪০০,০০০ পাউণ্ড মাত্র শুল্ক আয় নিতান্তই বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হইয়া থাকে।"

লর্ড লরেন্সও এ বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং ভারতের এবম্প্রকার বাণিজ্যিক অবস্থার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রধান রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পাট ও অপরাপর ভারতীয় উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানী শুল্ক কিছু বাড়াইয়া এ দেশের ঋণভার লাঘব ও রাজস্বের কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু বৃটিশদিগের স্বার্থ ইহার ঘোর প্রতিকূল হওয়ায় তাৎকালিন ভারতের ষ্টেট্ সেক্রেটারী মহোদয় তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। আট বৎসর পরে যখন তিনি মিঃ ফসেট কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হন, তখন তিনি সরলভাবে তাঁহার নিজের অভিমত এবং ভারতের অর্থনৈতিক প্রস্তাবের উপর বৃটিশ পণ্যের কি গুরুতর কষ্টপ্রদ প্রভাব বিদ্যমান আছে তাহা সাক্ষীস্বরূপে ব্যক্ত করেন।

হেন্‌রি ফসেট প্রশ্ন করেন;—রপ্তানী শুল্ক সম্বন্ধে বলিতেছি; যদি রপ্তানী শুল্ক বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা যায়—দৃষ্টান্ত স্বরূপ তুলা বা পাটের শুল্ক বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে ভারতীয় ব্যবসায় মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে—অপ্রীতি-কর অবস্থায় দাঁড়াইবে এবং ইংলণ্ডের শক্তিশালী বণিকসম্প্রদায় ভারত সরকারের উপর চাপ দিতে থাকিবে; ইহা সত্য কি না?

লর্ড লরেন্স উত্তর করেন,—সম্পূর্ণ সত্য।

ফসেট,—পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ভারতবর্ষের কোনই প্রতিনিধি নাই, পক্ষান্তরে

ইংলণ্ডের বণিকসম্প্রদায়ের বহুতর প্রতিনিধি বর্ত্তমান আছে। এমতাবস্থায় কোনও গবর্ণমেণ্ট মুহূর্ত্তের জন্যও এইরূপ রপ্তানী শুল্ক বৃদ্ধির নিমিত্ত ভোট প্রদানে সক্ষম পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক উত্থিত প্রতিবাদ দমন করিতে সক্ষম হয় কি ?

লর্ড লরেন্স ;—আমার তাহা বোধ হয় না।

ফসেট্ ;—এখন মনে করুন, ভারতবর্ষ কিভাবে শাসিত হয়। ভারতবর্ষ কমন্স সভা কর্ত্তৃক পরিচালিত, ভারতবর্ষ সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট কর্ত্তৃক শাসিত হয়। এই সেক্রেটারী আবার ক্যাবিনেটের সভ্য, তাঁহার স্থায়িত্ব কমন্স সভার ভোটের উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে আপনি ভারতের রাজস্ব বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে রপ্তানী শুল্ক প্রবর্ত্তিত বা বর্দ্ধিত করিতে সাহস করিতে পারেন কি ?

লরেন্স ;—আমি ভীত হইতেছি, তাহা আমি পারি না। (১)

বিলাতের বাণিজ্যিক স্বার্থ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার বিধান করিতে ষ্টেট্ সেক্রেটারী এবং তাঁহার মন্ত্রিসভা কতদূর ক্ষমতাপন্ন তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা লর্ড লরেন্সের সাক্ষ্য হইতে আর একটু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার সহিত এমন একটী শোচনীয় সত্য জড়িত আছে যে, তাহা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও যেমন প্রাসঙ্গিক ছিল আজিও তদ্রূপ প্রাসঙ্গিক রহিয়াছে।

ফসেট ,—সেক্রেটারী অব ষ্টেট্ ও তাহার মন্ত্রিসভার পারস্পরিক সম্বন্ধ—আমি আপনার পূর্ব্বের জোবানবন্দী হইতে বুঝিতে পারিয়াছি। দৃষ্টান্ত দ্বারা একটা কথা বলি ; ইণ্ডো-ইয়ুরোপীয়ান টেলিগ্রাফের ব্যয়ভার আংশিক ভাবেও ইংলণ্ডের ঘাড়ে না চাপাইয়া সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষের নিকট হইতে আদায় করিবার প্রস্তাব যখন হয়, তখন ষ্টেট্ সেক্রেটারীর কাউন্সিলের কোনও আপত্তিই কার্য্যকারী হয় নাই, কারণ উহার রাজনৈতিক প্রভাব কিছুই নাই ; এবং বহির্দ্দেশ হইতে ষ্টেট্ সেক্রেটারীর উপর যে চাপ আসিয়া পতিত হয় তাহার গতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাউন্সিলের নাই ?

লর্ড লরেন্স ;—হাঁ, আমি বলিয়াছি—এই রকম ফলই হইয়া থাকে। আমার মনে হয়, কাউন্সিল অনেক সময়—ভারতের স্কন্ধে ব্যয়ভার চাপাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গের এবং ষ্টেট্ সেক্রেটারীর মধ্যের ধাক্কানিবারক যন্ত্র (buffer)

(১) Select committee's Report, 1873.

স্বরূপ কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু অতি গুরুতর ব্যাপারে যখন ইংলণ্ডের বণিকবৃন্দের স্বার্থও চিন্তাজড়িত হয়, তখন কাউন্সিল ঐরূপ প্রতিবন্ধকতা করিয়াও কোনও সুফল প্রাপ্ত হয় না।

ফসেট,—কাউন্সিলের সভ্যবৃন্দ কি কেবল ঐরূপ প্রতিবন্ধকতা করার জন্যই নিযুক্ত হন নাই এবং তাঁহার ব্যয়ভার কি ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে নির্ব্বাহ হয় না? তাঁহাদের নিয়োগের আর কি গুরুতর উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? যদি উহাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য না হয়, তবে তাঁহারা যে কার্য্য করিতেছেন, তাহা অপরাপর সরকারী বিভাগের ন্যায় স্থায়ী কর্ম্মচারী আণ্ডার সেক্রেটারী প্রভৃতির দ্বারাই তো নির্ব্বাহ হইতে পারে। তবে যদি তাঁহারা বুঝিতে পারেন এইরূপ ব্যয়বাহুল্য অসঙ্গত, তাহা হইলে কেন তাঁহারা বলিবেন না,—"আমরা ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে বেতন প্রাপ্ত হইতেছি, সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের উপর যেরূপ রাজনৈতিক চাপই কেন পড়ুক না, আমরা তাহা গ্রাহ্য করি না; পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নাই যাহার প্রভাবে আমাদের দ্বারা অন্যায় ব্যয়ভার—যে পর্য্যন্ত ভারতের স্বার্থ জড়িত থাকে—মঞ্জুর করাইতে পারে।"

লর্ড লরেন্স;—আমার মনে হয়, যদি আপনার কাউন্সিল না থাকিত, তাহা হইলে কার্য্য নির্ব্বাহ পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা উপস্থিত হইত। কাউন্সিল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যন্ত্র না হইতে পারে, বা উহা ভারতের স্কন্ধে অসঙ্গত ব্যয়বাহুল্য অর্পণেচ্ছুকদিগের ও ষ্টেট্ সেক্রেটারীর মধ্যের পূর্ণ প্রতিবন্ধক না হইতে পারে, কিন্তু এতদ্বিষয়ে উহা বহুতর কার্য্য করিয়া থাকে। আমি কাউন্সিলে যে পাঁচ বৎসর ছিলাম, তাহার অভিজ্ঞতা হইতে আমার ধারণা হইয়াছে যে,—কাউন্সিল আদৌ না থাকিলে এমন কতিপয় বিষয় ভারতবর্ষের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইত—যাহা কেবল কাউন্সিলের প্রতিবাদেই ঘটিতে পারে নাই।

ফসেট,—তত্রাচ, কাউন্সিল ভাল কার্য্য করিতেছে কি না বা তাহা একবারেই তুলিয়া দেওয়া উচিত কি না, তৎপ্রসঙ্গে এক্ষণে আলোচনা করিতে চাই না। আমি জানিতে চাই,—ভারতবর্ষের স্বার্থের খাতিরে আপনার পূর্ব্ববর্ণিত সেই 'রাজনৈতিক চাপের' (Political pressure) প্রতিবন্ধকতা করা তাহাদের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য কি না? নতুবা কেমন করিয়া বলা যায় যে, তাহারা তাহাদের উপর সংন্যস্ত এই গুরুতর বিশ্বাসের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি

তেছে না? কেন তাহারা বলেনা,—পৃথিবীতে এরূপ কোন ক্ষমতা নাই, যাহা দ্বারা তাহাদের বিবেচনায় ভারতবর্ষের প্রজার পক্ষে অহিতকর ব্যয় সমর্থন করায়? এই অভিপ্রায় ব্যতীত আর কি উদ্দেশ্যে তাহারা মাস মাহিনা গুণিতেছে?

লর্ড লরেন্স,—এই রূপ ভাবে কার্য্য করা মনে করিতে বড়ই সহজ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আমার বিবেচনায় প্রকৃত পক্ষে ইহা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। আমার আরও মনে হয় যে, কাউন্সিল যদি ঐ ভাবে কার্য্য করিত তাহা হইলে কখনই সফলকাম হইত না। কতক কার্য্য পার্লিয়ামেন্টে বা অন্যত্র হইয়া থাকে; এতদ্দ্বারা হয় তাহারা একবারেই ভাসিয়া যাইত, না হয় তাহাদের ক্ষমতা এতই সঙ্কুচিত হইত যে, প্রকৃত পক্ষে এ যাবৎ কাল তাহারা যে সমুদয় কার্য্য করিয়াছে—তাহাও করিবার ক্ষমতা তাহাদের থাকিত না। (১)

গত ১৮৫৯ হইতে ১৮৭৭ অব্দের—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রথম উনিশ বৎসরে ভারতবর্ষের ব্যবসায়ের আমদানী রপ্তানীর এক তালিকা নিম্নে প্রদান করিলাম;—(২)

অন্যান্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের ব্যবসায়।

সন	পণ্য-দ্রব্যের আমদানী। পাউণ্ড।	Treasure আমদানী। পাউণ্ড।	মোট আমদানী। পাউণ্ড।	মোট রপ্তানী। পাউণ্ড।
১৮৫৯	২১৭২৮৫৭৯	১২৮১৭০৭১	৩৪৩৪৫৬৫০	৩০৫৩২২৯৮
১৮৬০	২৪২০৫১৪০	১৬৩৫৬৯৬৩	৪০৬২২১০৩	২৮৮৮৯২১০
১৮৬১	২৩৪৯৩৭১৬	১০৬৭৭০৭৭	৩৪১৭০৭৯৩	৩৪০৯০১৫৪
১৮৬২	২২৬২০৪৩২	১২৯৫১৯৮৫	৩৭২৭২৪১৭	৩৭০০০৩৯৭
১৮৬৩	২২৬৩২৩৮৪	২০৫০৮৯৬৭	৪৩১৪১৩৫১	৪৮৯৭০৭৮৫
১৮৬৪	২৭১৪৫৫৯০	২২৯৬২৫৮১	৫০১০৮১৭১	৬৬৮৯৫৮৮৪
১৮৬৫	২৮১৪০৯২৩	২১৩৬৩৩৫২	৪৯৫১৪২৭৫	৬৯৪৭১৭৯১
১৮৬৬	২৯৫৯৯২২৮	২৬৫৫৭৩১০	৫৬১৫৬৫২৯	৬৭৬৫৬৪৭৫

---

(১) Select committee's Report. 1873.

(২) "Statistical Abstracts relating to British India" Annually published and presented to Parliament.

সন।	পাউণ্ড।	পাউণ্ড।	পাউণ্ড	পাউণ্ড।
১৮৬৭	২৯০৩৮৭১৫	১৩২৩৬৯০৪	৪২২৭৫৬১৯	৪৪২৯১৪৯৭
১৮৬৮	৩৪৭০৫৭৮১	১১৭৭৫৩৭৪	৮৭০৮১১৫৭	৫২৪ ৬০০২
১৮৬৯	৩৫৯৯০১৪২	[illegible]৫১৫৫৯২৪	৫১১৭৬০৯৬	৫৪৪৫৭৭৪৫
১৮৭০	৩২৯২৭৫২০	১৩৯৫৪৮০৭	৪৬৮৮২৩২৭	৫৩৫১৩৭২৯
১৮৭১	৩০৪৬৯১১৯	৫৪৪৪৮[illegible]৩	৩৯৯১৩৯৪২	৫৭৪৫৬৯৫১
১৮৭২	৩২০৯১৮৫০	১[illegible]৫৭৩৮১৩	৫৩৬৬৫৬৬৩	৬৪৬৮৫৩৭৬
১৮৭৩	৩১৮৭৪৬[illegible]৫	৪৫৫৬০৮৫	৩৬৪৩১২১০	৫৬৫৪৮৮৪২
১৮৭৪	৩৩৮১৯৮২৮	৫৭৯২৫৩৪	৫৯৬[illegible]২৩৬২	৫৬ ১০০৮১
১৮৭৫	৩৬২২২১১৩	৮১৪১০৪৭	৪৪৩৬৩১৬০	৫৭৯৮৪৫৪৯
১৮৭৬	৩৮৮৯১৬৪৬	৫৩০০৭২২	৪৪১৯২৩৭৮	৬০২৯১৭৩১
১৮৭৭	৩৭৪৪০৬৩১	১১৪৩৬১২০	৪৮৮৭৬৭৫১	৬৫০৪৩৭৮৯

ক্রমশঃ।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল

বঙ্গে অন্নকষ্ট।

বাঙ্গালা দেশটার এখন যেন শনির দশা পড়িয়াছে। কেবল শনির দশা নয়, বৎসরটাও যেন ত্রিপাপীর। এক বৎসরের মধ্যে তিনটী পাপগ্রহের যোগ হইলেই তাহাকে ত্রিপাপীর বৎসর বলে; বাঙ্গালার ভাগ্যেও এ বৎসর অন্নকষ্ট, জলকষ্ট এবং মহামারী, এই তিনটী পাপগ্রহ সম্মিলিত হইয়াছে। ত্রিপাপীর বৎসরের ফল—মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ। বাঙ্গালারও আর মরিতে বাকী কি আছে? যে টুকু বাকী আছে, ভরসা করি অতঃপর আর তাহা থাকিবে না।

এখন জলকষ্ট ও মহামারীকে ছাড়িয়া দিয়া দেখা যাউক অন্নকষ্টের কারণ কি? যে দেশকে একদিন কবি 'সুজলা' 'সুফলা' 'স্বর্ণপ্রসবিনী' প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন, সে দেশের লোক আজি একমুষ্টি অন্নের অভাবে হাহাকার করে কেন? সেই বাঙ্গালা রহিয়াছে, সেই শস্যক্ষেত্র রহিয়াছে, সেই কৃষক আছে, তথাপি বাঙ্গালার লোক খাইতে পায় না কেন?

অনেকে বলেন, পাটের চাষই বাঙ্গালার অন্নকষ্টের কারণ। নির্ব্বোধ কৃষক ধানের চাষ না করিয়া অতিরিক্ত ভাবে পাটের চাষ করে, এবং পাট বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা পায়, তাহা বিলাসিতায় উড়াইয়া দেয়। কথাটা ঠিক বুঝা যায় না। যখন দেখা যাইতেছে যে, ধানের চাষ অপেক্ষা পাটের চাষে লাভ বেশী, তখন তাহাতে কৃষকের আর্থিক উন্নতি হওয়াই সম্ভব। আর কৃষক যে নগদ টাকা হাতে পাইয়া তাহা বিলাসিতায় ব্যয় করে, ইহা যিনি স্বচক্ষে কৃষকদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তিনি কখনই স্বীকার করিবেন না। কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এমন বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই, যাহাতে তাহারা আপনাদের কষ্টসঞ্চিত অর্থগুলির অপব্যয় করিতে পারে। সুতরাং ধানের চাষ না করিলেও পাটের চাষে কৃষক যে টাকা পায় তাহাতেই তো সে ধান্য কিনিয়া খাইতে পারে। এ স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সকলেই যদি ধানের চাষ ছাড়িয়া কেবল পাটের চাষ করে, তবে ধান আসিবে কোথা হইতে? কিন্তু সকলেই যে পাটের চাষ করে তাহা নহে, করিলেও অধিকাংশ জমিতে পাট দিয়া অল্প জমিতেও ধানের চাষ করে। ইহাতে অবশ্য ধান্য শস্য কিছু কম জন্মে, এবং সে জন্য তাহার মূল্যও কিছু বাড়িয়া যায়। কিন্তু পাটের চাষে যখন বেশী লাভ আছে, তখন বেশী দাম দিয়াও তো ধান্য ক্রয় করা যাইতে পারে? একটার লাভে কি আর একটার ক্ষতি পূরণ হয় না?

আর এক কথা, পাটের চাষ পূর্ব্ববঙ্গে যত বেশী, পশ্চিম বঙ্গে তাহার কিছুই নাই বলিলেই হয়। হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় অতি অল্প পরিমাণেই পাট উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ সকল জেলায় এত অন্নকষ্ট কেন? পাটপ্রধান পূর্ব্ববঙ্গ হয়তো কোনরূপে একমুঠা খাইতে পাইতেছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের লোক অনাহারে মরিতেছে কেন? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাটের চাষই অন্নকষ্টের মূল কারণ নয়।

আবার কেহ কেহ বলেন, ধান্যশস্যের বিদেশে রপ্তানিই অন্নকষ্টের কারণ। আগেকার মত এ কথাটাও ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। অর্থনীতির হিসাবে রপ্তানিই দেশের উন্নতির বা ধনবৃদ্ধির কারণ। যে দেশে আমদানির অপেক্ষা রপ্তানির আধিক্য হইয়াছে, সেই দেশই উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করিয়াছে। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, মার্কিন প্রভৃতি দেশ তাহার উদাহরণ স্থল। সুতরাং এই ধনবৃদ্ধিকর রপ্তানীর ফলে দেশের উন্নতি না হইয়া অবনতি হইবে কেন?

যদি বলা যায় যে, দেশের সমস্ত শস্যই যদি ধনবৃদ্ধির জন্য বিদেশে চলিয়া

গেল, তবে দেশের লোক আর শস্য পাইবে কোথায়? টাকা খাইয়া তো মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না? কথাটার ভিতর একটু গোল আছে। এ পর্য্যন্ত দেশে এমন দৃশ্য দেখা যায় নাই যে, লোকে টাকা দিয়াও ধান পাইল না; দেশে ধান আছে, কিন্তু কিনিবার পয়সা নাই। রপ্তানির যদি আধিক্য হইত, তবে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ধনবৃদ্ধিও দেখা যাইত। কিন্তু তাহা কোথায়? শস্যের অভাব বর্ত্তমান অন্নকষ্টের কারণ নহে, তাহার দুর্ম্মূল্যতা এবং সেই দুর্ম্মূল্য শস্য কিনিবার পয়সার অভাবই ইহার কারণ। তাই বলিতেছিলাম, কথাটার ভিতর একটু গোল আছে। স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, দেশে যথেষ্ট রপ্তানী নাই। থাকিলে দেশে শস্য না থাকিলেও টাকা তোথাকিত। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে, শস্য থাকিতেও টাকার অভাবে লোক খাইতে পাইতেছে না, তখন রপ্তানিকেই অন্নকষ্টের মূল কারণ বলা যায় না। তথাপি যাঁহারা বলেন, রপ্তানিতে দেশের সমস্ত শস্য বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, তাঁহাদিগকে একবার গ্রাম্য মহাজনদের গোলা অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন, দেশের শস্য যায় কোথায়।

উপরে যে দুইটি কারণের উল্লেখ করা গেল, তাহাদিগকে প্রকৃত পক্ষে অন্নকষ্টের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। তবে অন্নকষ্টের প্রকৃত কারণ কি? প্রকৃত কারণ অজন্মা। দেশে আর পূর্ব্বের মত শস্য জন্মে না, যে যৎকিঞ্চিৎ জন্মে তাহা জমিদারের খাজানা দিতে এবং মহাজনের দেনা শোধ করিতেই ফুরাইয়া যায়। সুতরাং কৃষকের ঘরে সে হাহাকার সেই হাহাকার। কিন্তু এই অজন্মার কারণ কি? কারণ—অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এস্থলে গত বর্ষের মেদিনীপুর জেলার এবং হুগলী জেলার জাহানাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের উল্লেখ করিতে পারি। গত বৎসর প্রথমে এই দুই স্থানে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছিল। কিন্তু শেষে দামোদর, কংসাবতী, এবং শিলাবতী প্রভৃতির প্রবল বন্যায় সে সমস্তই পচিয়া গেল। যাহা অবশিষ্ট রহিল, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টির অভাবে শুকাইয়া নষ্ট হইল। সারা বৎসর খাটিয়া কৃষক এক মুষ্টি ধান্যও ঘরে আনিতে পারিল না। এদিকে কিন্তু জমিদার মহাশয় খাজানার একটি পয়সাও ছাড়িলেন না। অগত্যা কৃষক হাল গরু, ঘটী বাটী বেচিয়া জমিদারের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। তার পর পৌষ মাস হইতেই তাহারা হা অন্ন হা অন্ন করিয়া বেড়াইতেছে; এবং ক্রমে অর্দ্ধাশনে

অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া দেশের ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নিবারণ করিতেছে।

তারপর বর্ত্তমান বর্ষেও যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে এ বৎসরও শস্যের বড় একটা আশা নাই। বীজবপনের সময় বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু বৃষ্টির অভাবে জমি এখনও অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহার পর যখন বৃষ্টি হইবে, তখন কৃষক তাড়াতাড়ি যেমন তেমন বীজ লইয়া কোনরূপে আবাদ শেষ করিবে। তারপর শ্রাবণ ভাদ্রে দামোদর কংসাবতী প্রভৃতি আছে. শেষে আশ্বিন কার্ত্তিকে অনাবৃষ্টি রহিয়াছে। কেবল এক বৎসর বলিয়া নয়, বৎসরের পর বৎসর এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে, আর দরিদ্র কৃষককুল একে একে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। এদিকে আমরা পাটের চাষ এবং রপ্তানির রিপোর্ট সংগ্রহ করিয়া তাহারই গভীর গবেষণায় ব্যস্ত আছি। জমিদার মহাশয়েরাও এখন বৈদ্যুতিক পাখার নীচে শুইয়া দিব্য নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছেন; পৌষের কিস্তীর সময়ে জাগিয়া উঠিয়া, তাঁহারা প্রজার চালের খড় ধরিয়া টানাটানি করিবেন।

এই অন্নকষ্টের প্রতিবিধান করিতে হইলে গ্রামে গ্রামে মাঠের উপর খাল কাটাইয়া দেওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। অতিবৃষ্টি বা বন্যার জল এই খালপথে নিকাশ হইবে, আর অনাবৃষ্টির সময়ে ইহার জলে শস্যরক্ষা করা যাইবে। তারপর যে সকল নদীর বাঁধ প্রায়ই বর্ষাকালে ভাঙ্গিয়া যায়, সেগুলিকে উত্তম রূপে বাঁধিতে হইবে। কিন্তু এত কাজ করিবে কে? এইখানে আমরা গবর্ণমেণ্টকে দায়ী করিয়াই অনেকটা নিশ্চিন্ত হই। গবর্ণমেণ্ট খাল কাটাইয়া দিউন, বাঁধ বাঁধিয়া দিউন, রিলিফ্ খুলিয়া প্রজাদিগকে দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করুন। আর জমিদারেরা? লক্ষ্মীর বরপুত্র জমিদারেরা কি এত কষ্ট সহিতে পারেন? তাঁহারা কেবল প্রজার নিকট খাজানা আদায় করিবেন; আর সেই টাকা লইয়া কলিকাতায় জুড়ি গাড়ী চালাইবেন, সিমলা শৈলে বা দার্জ্জিলিঙ্ পাহাড়ে সুখের গ্রীষ্মাবাস নির্ম্মাণ করাইবেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বৎসরে দশবার ভেট দিয়া রায় বাহাদুর বা রাজা মহারাজা হইবার চেষ্টা দেখিবেন। প্রজার সুখে দুঃখে তাঁহাদের কি আসে যায়?*

---

* জমিদার মাত্রই যে এই শ্রেণীর তাহা নহে, প্রজারঞ্জক জমিদারও অনেক আছেন। তবে তাঁহাদের সংখ্যা অল্প বলিয়াই সাধারণ ভাবে কথাটা বলা হইয়াছে।—লেখক।

অন্নকষ্টের দ্বিতীয় কারণ, কৃষকের দারিদ্র্য। বাঙ্গালার কৃষকসম্প্রদায় এতদূর দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের আর একমুষ্টি ধান্যও ঘরে রাখিবার ক্ষমতা নাই। অজন্মায় অজন্মায় তাহারা ঋণজালে একেবারে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। যদি কোন বৎসর যৎকিঞ্চিৎ ফসল পায়, তবে তাহা মহাজনের সুদ বা বাড়ি * এবং জমিদারের খাজানা শোধ করিতেই নিঃশেষ হইয়া যায়। তারপর তিনগুণ চারিগুণ দরে সেই ধান্য আবার মহাজনের ঘর হইতে আনিয়া খাইতে হয়। মহাজনও ভাবী শস্যের অবস্থা এবং কৃষকের অবস্থা দেখিয়া দর চড়াইয়া ধান ছাড়ে। মহাজন যদি দেখে, কৃষকের ঋণ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, তাহা আদায় হওয়া অসম্ভব তাহা হইলে সে আর ধার দেয় না। মহাজনের কৃপা ব্যতীত কৃষকেরও আর কোথা হইতে এক পয়সা পাইবার উপায় নাই। সুতরাং কৃষককে তখন সপরিবারে অনাহারে শুকাইয়া মরিতে হয়। তারপর মহাজন ইচ্ছামত শস্যের দর বাড়াইতে থাকে। ইহাই অন্নকষ্টের প্রকৃত কারণ। কিন্তু এই ধান্য যদি কৃষকের হাতে থাকে, তবে দিন দিন দর চড়ে না। কৃষক নিজের প্রয়োজন মত ধান ছাড়িতে পারিলে সে সামান্য লাভেই তাহা ছাড়ে।

কিন্তু কৃষকের নিজের হাতে ধান্য রাখিবার উপায় নাই। অজন্মার বৎসরে মহাজনই তাহার সংসার চালাইয়া দেয়, জমিদারের খাজানা শোধ করে। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে মহাজনের হাতে যাইতে হয়। আর, একবার ঋণ করিলে দরিদ্র কৃষক সহজে তাহা পরিশোধ করিতে পারে না; বৎসরের পর বৎসর সুদ আসলে পরিণত হইয়া ঋণগ্রস্ত কৃষককে সর্ব্বস্বান্ত করে। দুই এক বৎসর নহে, উপর্য্যুপরি যদি ১০।১২ বৎসর সম্পূর্ণ ফসল জন্মে, তাহা হইলেও কৃষক তাহার মহাজনের ঋণের জের মিটাইতে পারে কি না সন্দেহ। কিন্তু যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে এক বৎসরও সে সম্পূর্ণ ফসল পায় না।

এ দেশটা দেবমাতৃক দেশ †। দেবতার কৃপায় যদি সুবৃষ্টি হয় তাহা হইলেই শস্য জন্মে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে আর শস্য জন্মে না। কিন্তু সুবৃষ্টি এখন আর নাই বলিলেই চলে, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টিই এখন অপ্রতিহত ভাবে রাজত্ব

---

* আষাঢ় শ্রাবণ মাসে এক মণ ধান লইলে পৌষ মাসে দেড়মণ (আসল ১ মণ এবং সুদ আধ মণ) ধান দিতে হইবে, ইহারই নাম বৃদ্ধি বা বাড়ি। কোথাও কোথাও সুদের পরিমাণ অর্দ্ধেকেরও অধিক।

† কেবল বৃষ্টির জলের সাহায্যে উৎপন্ন শস্যে যে দেশ প্রতিপালিত হয় তাহাকেই দেবমাতৃক দেশ বলে।

করিতেছে। সুতরাং দেশে এখন বার মাসই অন্নকষ্ট। এই অন্নকষ্টের প্রতিরোধ করিতে হইলে দেশকে নদীমাতৃক * করিতে হইবে, খাল কাটাইয়া বাঁধ বাঁধিয়া অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির হাত হইকে শস্য রক্ষা করিতে হইবে। কৃষকেরা যাহাতে ঋণমুক্ত হয়, যাহাতে তাহারা অল্প সুদে ঋণ পায় তাহারও উপায় করিতে হইবে। নতুবা পাটের চাষ একবারে উঠিয়া গেলেও এবং রপ্তানির সম্যক্ প্রতিরোধ করিলেও দেশের অন্নকষ্ট দূর হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

কিন্তু এই সকল কাজ করিবে কে? স্থানীয় জমিদারগণ অগ্রসর না হইলে ইহাতে সফলতা লাভের সম্ভাবনা নাই। জমিদারেরা এই কার্য্যে অগ্রসর হইলে গবর্ণমেণ্টও যে নিশ্চিন্ত থাকিবেন এমন বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেও অনেক সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। আর জমিদারদিগকে যে এই টাকাটা নিঃস্বার্থ ভাবে দান করিতে হইবে, তাহাও নহে। প্রথমতঃ টাকাটা ঘর হইতে বাহির করিতে হইলেও পরে তাঁহারা জলকর রূপে প্রজার নিকট হইতে ক্রমে টাকাটা মায়সুদ তুলিয়া লইতে পারিবেন। ইহাতে তাঁহাদের টাকাও আদায় হইয়া আসিবে, জমিদারীরও উন্নতি হইবে। প্রজার উন্নতিতেই জমিদারের উন্নতি। প্রজার ঘরে অন্ন সংস্থান হইলে জমিদারকে আর বাকী খাজানা আদায়ের জন্য প্রজার শোণিতসম অর্থে আদালতের উদর পূর্ত্তি করিতে হইবে না। অথবা নিরন্ন প্রজার ঘটীবাটী টানাটানি করিয়া নিষ্ঠুরতার জলন্ত অভিনয়ও দেখাইতে হইবে না।

প্রথমেই বলিয়াছি, বাঙ্গালার এখন ত্রিপাপীর বৎসর। এই ত্রিপাপীর বৎসরে দেশের গৌরব জমিদারগণই একমাত্র ভরসা। তাঁহারা ঔদাসীন্য এবং আলস্য ত্যাগ করিয়া অগ্রসর না হইলে বাঙ্গালার আর রক্ষা নাই। যতই দিন যাইতেছে, দেশের অবস্থা ততই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। দুর্ভিক্ষরাক্ষসীর করাল বদন দিন দিন চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। অন্নকষ্টটা যেন দেশে চিরস্থায়ী অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। দেশের এই দুঃসময়ে বঙ্গের সহৃদয় জমিদারবৃন্দ এই সুমহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়া দেশের—ভগবানের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন না কি?

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

* নদীজলের দ্বারা যে দেশের কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহাকে নদীমাতৃক দেশ বলা যায়।

ভাঙ্‌লে কেন চুড়ি ?

—•:×:•—

(১)

হাজার তুমি বক ঝক
ওসব কথা শুন্‌বো নাক,
তোমার মন মজান মানভাঙ্গান খালি আকার ছাই ;
বল্‌লে কিছু অমনি ধমক,
চলেন পথে তাতেও ঠমক,
আমার অমন নষ্ট দুষ্ট চলন টলন নাই ।
খিলটী দিয়ে মান বাড়িয়ে আমায় বলেন বুড়ি,
কেন তুমি ভাঙ্‌লে আমার দেশী কাচের চুড়ি ?

(২)

কচি কচি রাঙা ঠোঁটে—
কথায় যেন আগুন ছোটে,
চক্ষে সদা পিরীত লোটে ফাজিল চূড়ামণি ;
রাগের কথা বল্লে পরে—
অম্‌নি চোখে অশ্রু ঝরে,
থাকেন থাকেন রাগেন, যেন চক্রধর ফণী ।
কিলটী দিয়ে বিষটী ভেঙ্গে রাখবো ঝাঁপিভরে ;
দেশীচুড়ি ভাঙ্‌লে কেন অমন সোহাগ ক'রে ?

(৩)

পুরুষ মানুষ মেয়ে সাজি,
নাচ্‌তে বল তাতেও রাজি,
গাইতে বল গাবেন তখন নিধু বাবুর গান ;
হাস্‌তে বল নানান হাসি,—
হেসে দেবেন রাশি রাশি,
কাঁদ্‌তে বল কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দেবেন প্রাণ ।
সকল গুণের আধার ইনি বুড়ায় সাজেন ছেলে ;
চাপন দিয়ে কেন গা হাতের চুড়িটী ভেঙে দিলে ?

(৪)

থাক্‌লে খাঁটি স্বদেশসেবা—
দেশের জিনিষ ভাঙ্গে কেবা,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ প্রেমিক কবি, ধন্য ভালবাসা!
প্রেমটী তোমার পাখার মত—
উড়্‌ছে যত, পড়্‌ছে তত ;—
নদীর বুকের ঢেউয়ের মত—খালি ভাসা ভাসা।
আমিতো ছার, দেবতা বুঝি বুঝতে নারে লীলে!
মটাস্ করে কেন গা হাতের চুড়িটী ভেঙে দিলে?

(৫)

দুষ্টু তুমি হাড়ে হাড়ে,
বক্‌লে আবার হাসি বাড়ে,
চোখ্‌টী রাখি আড়ে আড়ে কপোলে দিয়ে চুম—
ম'য়ার মদের নেশার মত
বক্ষে চাপি অবিরত,—
চুপি চুপি কেমন যাদু পাড়াও আমায় ঘুম!
তোমার সমান দুষ্টু মানুষ দেখিনিক হেন;
আমার অল্প দামের দেশী চুড়ি ভাঙ্‌লে বল কেন?
ফুল বাগানে একা একা—
মনের সাধে পদ্য লেখা,
বেল বাগানে বকুল বনে দিনটী কর গত ;
সন্ধ্যা সকাল নদীর পারে—
যখন দেখি ভাবছ কারে,
জানি না ছাই কার যে কথা ভাবনা তোমার এত!
খুষ্টিনাষ্টি, নষ্ট ষষ্ঠী, দুষ্ট বৃহস্পতি,
ঝুটা তোমার স্বদেশ সেবা, গলাবাজি অতি।
শুনবো না চাঁদ স্বদেশ সেবক, কথার হুড়াহুড়ি—
দামটী রাখ ভালয় ভালয়, ভাঙ্‌লে কেন চুড়ি?

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

নিয়তি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—o:×:o—

শূরতান আশা করিয়াছিলেন, জয়মল্লের প্রভাবের নিকট পাঠানশক্তি নিশ্চয়ই পর্য্যুদস্ত হইবে। জয়মল্লও আশা করিয়াছিলেন, পাঠানদিগকে তোড়া হইতে বিতাড়িত করিয়া ভুবন-মোহিনী তারাকে অঙ্কশায়িনী করিবেন। কিন্তু নিয়তির বিধান অন্যরূপ। সুতরাং কাহারও আশাই পূর্ণ হইল না। পাঠানযুদ্ধে জয়মল্ল পরাজিত হইলেন; অর্দ্ধাধিক রাজপুত সৈন্যকে রণসমুদ্রে বিসর্জ্জন দিয়া তিনি যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, পাঠানের জয়োল্লাসে আরাবল্লীশিখর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। শূরতান নিরাশার গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও জয়মল্ল আশা ত্যাগ করিতে পারিলেন না; যুদ্ধজয়ের আশা ত্যাগ করিলেন, কিন্তু যে আশায় এই সমরায়োজন, সে আশা ছাড়িলেন না বা ছাড়িতে পারিলেন না। তাই তিনি চিতোরে প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া বেদনোর দুর্গের অদূরে শিবির সংস্থাপন করিলেন।

গভীরা রজনী। শিবিরের সৈন্যগণ সকলেই নিদ্রিত, কেবল কয়েকজন প্রহরী শিবির বাহিরে প্রহরায় নিযুক্ত। শিবিরের মধ্যস্থলে একটী সুসজ্জিত বস্ত্রাবাস; সেই বস্ত্রাবাসের মধ্যে রাজকুমার জয়মল্ল একা বিনিদ্রনয়নে বসিয়াছিলেন। কক্ষমধ্যস্থ দীপ্ত আলোকরশ্মি আসিয়া তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের উপর পড়িয়াছিল। শুভ্র সুকোমল শয্যার উপর বসিয়া জয়মল্ল গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন।

এতটা যে হইবে তাহা জয়মল্ল ভাবেন নাই। তুচ্ছ পাঠানশক্তি রাজপুতের অজেয় পরাক্রমকে যে এমনই করিয়া উপহাস করিতে পারে, যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয়ই যে ঘটিতে পারে, দর্পান্ধ জয়মল্ল পূর্ব্বে এতটা ভাবিয়া দেখেন নাই। যে রমণীরত্ন লাভের জন্য তাঁহার এতটা প্রয়াস—এত উদ্যম, যাহার সৌন্দর্য্যালোকে সমগ্র রাজপুতানা আলোকিত, তাহার আশা বিসর্জ্জন দিয়া, পরাজয়ের নিদারুণ কলঙ্ক মাথায় লইয়া যে তাঁহাকে চিতোরে ফিরিতে হইবে তাহার কল্পনাও করেন নাই। একদিন যাহাকে হস্তগতপ্রায় ভাবিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন, আজি

তাহা কতদূরে সরিয়া গিয়াছে! জয়মল্ল বুঝিলেন, আশারও বুঝি একটা সীমা আছে।

কিন্তু জয়মল্ল ইহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না; যুদ্ধজয়ের আশা ছাড়িয়াও তারার আশা ছাড়িতে পারিলেন না। পারিলেন না বলিয়াই এত চিন্তা। কিন্তু এ চিন্তার কূল কোথায়? অনেক অনুসন্ধানেও জয়মল্ল কূল খুঁজিয়া পাইলেন না। তবে কি জয়াশার ন্যায় তারার আশাও ত্যাগ করিতে হইবে? কখনই না,—জয়মল্ল ভাবিলেন, কখনই না; জয় পরাজয়, সুনাম দুর্ণাম সব অতলে যাউক, কিন্তু তারার আশা ছাড়িতে পারিব না। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ন্যায় অন্যায়, স্বর্গ নরক, সব পদতলে দলিত করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি যেরূপে পারি, তারাকে হস্তগত করিব। কিন্তু উপায় কি? জয়মল্ল অস্থির পদে কক্ষমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

আশা তাঁহাকে চিন্তার সাগরে ভাসাইয়া দিয়াছিল, নিয়তি আসিয়া তাহার কূল দেখাইয়া দিল। তাহা দেখিয়া জয়মল্লের মুখে পৈশাচিক হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি সাগ্রহে নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট কুটিল পন্থা অবলম্বন করিলেন। বিবেক আসিয়া একবার বাধা দিল, কিন্তু লালসা হাসিয়া বলিল,—"চিন্তা কি, বলপূর্ব্বক বিবাহ ক্ষত্রিয়ের রীতি, বীরের ধর্ম্ম।" জয়মল্ল এই বীরধর্ম্মের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। নির্লজ্জ বিবেক আবার একবার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,—"বলে হৃদয় পাওয়া যায় না, ভালবাসা পাওয়া যায় না।" মোহ আসিয়া বলিল,—"ভালবাসার মস্তকে পদাঘাত করি।" মোহের ছলনায় জয়মল্ল বিবেকের কথা কাণে তুলিলেন না। নিয়তি আসিয়া তাঁহাকে দুরাশার পথে টানিয়া লইয়া চলিল। পরাজয়ে তাঁহার সুনাম গিয়াছিল, মোহ তাঁহার মনুষ্যত্বের উপর চিরকলঙ্ক অর্পণ করিল।

মোহের ছলনায়, নিয়তির আকর্ষণে জয়মল্ল স্থির করিলেন, যেরূপে পারি—বলে, ছলে, কৌশলে তারাকে বিবাহ করিব। কিন্তু একবারে বল প্রকাশ না করিয়া, প্রথমে শূরতানের নিকট বিবাহের প্রস্তাব তুলিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করিলেন।

পরদিন এই প্রস্তাব লইয়া জনৈক দূত শূরতানের নিকট উপস্থিত হইল। এ প্রস্তাব শুনিয়া শূরতান মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি বলিয়া দিলেন,—"আমি স্বয়ং যুবরাজের শিবিরে গিয়া এ সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া আসিব।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ে শূরতান যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত হইয়া একা জয়মল্লের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। জয়মল্ল সানন্দে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আসন গ্রহণ

না করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"যুবরাজ! দূতমুখে যাহা শুনিলাম, তাহা কি সত্য?"

জয়মল্ল উত্তর করিলেন,—"দূতমুখে কি শুনিলেন?"

শূর। আপনি রাজপুত হইয়া রাজপুতের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

জয়। প্রতিজ্ঞা? কার প্রতিজ্ঞা? কিসের প্রতিজ্ঞা?

শূর। আপনি বোধ হয় জানেন, আমি ভগবান্ একলিঙ্গ দেবকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে রাজপুত বীর আমার তোড়াকে পাঠান-হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই আমি কন্যা সম্প্রদান করিব।

জয়মল্ল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"হাঁ, হাঁ, শুনেছিলাম বটে, কিন্তু সে জন্য আপনার চিন্তা কি? আপনি তারাকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন, তারপর আমি চিতোর হইতে সমস্ত সৈন্য আনয়ন করিয়া তোড়া উদ্ধার করিয়া দিব।"

শূর। অগ্রে তোড়া উদ্ধার করিয়া পরে তারাকে গ্রহণ করুন না?

জয়। চিতোরের যুবরাজ আপনার আজ্ঞাবহ দাস নয়।

ক্রোধে ঘৃণায় শূরতানের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"যুবরাজ! ভাবিয়াছিলাম, ভাবী চিতোরাধিপতির দ্বারা আমার আশা পূর্ণ হইবে। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহাই স্থির করিয়া আসিয়াছি। আপনি জানেন, ক্ষত্রিয় বীর জীবন দিতে পারে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারে না। অতএব আমি জীবিত থাকিতে আপনার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আমি আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। যুদ্ধে আমি মরিলে আপনি অনায়াসেই আমার কন্যার সহিত এ রাজ্যও হস্তগত করিতে পারিবেন। আর আপনি হত হইলে অন্য কোন রাজপুত বীর আমার আশা পূর্ণ করিবেন।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শূরতান স্বীয় অসি কোষমুক্ত করিলেন। তাঁহার তেজোগর্ভ বাক্য শুনিয়া জয়মল্লের হৃদয় চঞ্চল হইল। কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলে তাহাতে পরাঙ্মুখ হওয়া ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একান্ত লজ্জাকর। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও জয়মল্লকে শূরতানের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে হইল। তিনি যোদ্ধৃবেশ ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

তখন শিবির বাহিরে উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় বীরের কোষ-মুক্ত

অসিফলক সূর্য্যালোকে ঝলসিয়া উঠিল। উভয়েই উভয়কে আক্রমণ করিয়া আঘাতের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। উভয় অসির পরস্পর আঘাতে মুহুর্মুহুঃ বহ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল।

প্রায় চারিদণ্ড কাল যুদ্ধ চলিল। উভয়ের আঘাতে উভয়েই অল্পাধিক আহত হইলেন; উভয়েরই গাত্রবসন সিক্ত করিয়া শোণিতধারা ছুটিল। তথাপি ক্লান্তি নাই, নিবৃত্তি নাই; উভয়ের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া উভয়ে প্রাণপণে অসি-চালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জয়মল্ল আর বুঝি পারেন না, তাঁহার সর্ব্ব শরীর ক্রমেই অবশ হইয়া পড়িতে লাগিল, অসিমুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল। সুরতান তখনও সিংহবিক্রমে যুঝিতেছেন। সহসা সুরতান একবার চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"যুবরাজ, আত্মরক্ষা কর।" কিন্তু জয়মল্লের তখন আত্মরক্ষার শক্তিও বুঝি নাই; বিশ্বের সমস্ত আলোক তখন অল্পে অল্পে তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া যাইতেছে, মৃত্যুর করাল ছায়া আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতেছে; নিয়তির ভীষণ চক্রনির্ঘোষ শ্রুতিমূলে আসিয়া আহত হইতেছে। এমন সময় সুরতানের চীৎকার, নিয়তির তীব্র উপহাসের মত তাঁহার কাণে আসিয়া বাজিল, "যুবরাজ, আত্মরক্ষা কর।" জয়মল্ল আর একবার প্রাণপণে অসিমুষ্টি চাপিয়া ধরিলেন, অন্তিমের সকল শক্তি প্রয়োগে আত্মরক্ষার্থ অসি উদ্যত করিতে গেলেন। কিন্তু অসি আর উঠিল না, সুরতানের শাণিত তরবারি সবেগে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে পতিত হইল। সৈন্যগণ হাহাকার করিয়া উঠিল, ছিন্নমূল পাদপবৎ জয়মল্ল ধরাতলে পতিত হইলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে একবার শেষ উচ্চারিত হইল,—"প্রায়শ্চিত্ত—বীদার হত্যার—"

কথা শেষ না হইতেই তাঁহার প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিল; অনন্ত আশা অনন্ত আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লইয়া লালসার দাস জয়মল্ল নিয়তির আহ্বানে অনন্তের পথে যাত্রা করিলেন। হায় নিয়তি!

নবম পরিচ্ছেদ।

জয়মল্লের নিধনবার্ত্তা ক্রমে চিতোরে পৌছিল। বৃদ্ধরাণা রায়মল্ল এ সংবাদ শ্রবণে বজ্রাহতের ন্যায় হইলেন; শোকে নয়, ক্ষোভে ঘৃণায় তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার পুত্র—বাপ্পা রাওএর বংশধর, তাহার এই নীচ প্রবৃত্তি! সিংহশাবকের শৃগালসম আচরণ! এক দিকে নিদারুণ পুত্রশোক; অন্য-দিকে পুত্রের কাপুরুষোচিত ব্যবহার। বৃদ্ধ রাণা এই উভয় বজ্রের সমকালীন

আঘাতে স্তম্ভিতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। সভাসদগণ দেখিল, রাণার নয়নে জল নাই, মুখে কথা নাই। তাহারা বিস্মিত স্তম্ভিত দৃষ্টিতে এই অগ্নিগর্ভ ভূধরের দিকে চাহিয়া রহিল। সকলেই নীরব; বিষাদের গভীর নীরবতায় সভাস্থল সমাচ্ছন্ন।

সেই গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রাণা গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন,—"সূর্য্যমল্ল!"

সূর্য্যমল্ল পার্শ্বেই ছিলেন; উত্তর করিলেন,—"মহারাজ!"

রাণা বলিলেন,—"এক্ষণে কর্ত্তব্য কি নির্দ্ধারণ কর।"

সূর্য্যমল্ল সবিনয়ে বলিলেন,—"কর্ত্তব্য—আপনার পুত্রহন্তার—"

বাধা দিয়া রাণা বলিলেন,—"হাঁ, জয়মল্লের হত্যাকারীর কিরূপ শাস্তি বিধেয়?"

মুহূর্ত্তের জন্য সভাস্থল আবার নীরব হইল। সকলেই সুরতানের ভীষণ ভবিষ্যৎ কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিল।

সূর্য্যমল্ল বলিলেন,—"মহারাণাই তাহার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।"

রাণা বলিলেন,—"তাহার পূর্ব্বে আমি সভাসদগণের অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করি।"

সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল। প্রধান মন্ত্রী উঠিয়া করযোড়ে নিবেদন করিল,—"প্রভো! সুরতানের অপরাধ অতি গুরুতর।"

রাণা বলিলেন,—"তাহা আমি বুঝিয়াছি।"

ম। এরূপ গুরুতর অপরাধীর গুরুতর শাস্তিই বাঞ্ছনীয়।

রা। সভাস্থ সকলেরই কি এই মত?

সভাসদগণ সকলেই প্রধান মন্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মতি দিল। রাণা বলিলেন,—"তবে তাহাই হউক।"

তখন সকলেই উৎসুক চিত্তে সুরতানের দণ্ডাদেশ শুনিবার জন্য নীরবে রাণার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রাণা নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—"সকলে শ্রবণ কর, আমি আমার পুত্রহন্তাকে বেদনোর প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিলাম।"

সভাস্থ সকলেই বিস্মিত, স্তম্ভিত। পুত্রহন্তাকে জায়গীর দান! একি অপূর্ব্ব রহস্য? কিন্তু রাণা স্বয়ং এ রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। তিনি স্থির শান্ত কণ্ঠে বলিলেন,—"সুরতান যে কার্য্য করিয়াছে, যে সত্যনিষ্ঠার, যে বীরত্বের, যে

ক্ষত্রিয়ত্বের মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়াছে, তাহাতে এই জায়গীর দান তুচ্ছ, আমার ইচ্ছা হয়, এই পক্বকেশ মস্তক সেই ক্ষত্রিয় বীরের চরণে বিলুণ্ঠিত করিয়া আপনাকে পবিত্র, ধন্য, কৃতার্থ করি।"

অপূর্ব্ব ন্যায়নিষ্ঠা, অলৌকিক মহত্ত্ব সন্দর্শনে সভাসদগণ সমস্বরে মহারাণার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মস্তক নত করিয়া সূর্য্যমল্ল মনে মনে বলিলেন,—"তুচ্ছ সিংহাসন! এরূপ উদারতা—এরূপ মনুষ্যত্ব না থাকিলে রাজ্য, সিংহাসন, সকলই বৃথা।"

আর এস, আমরা এই মহাপুরুষের চরণোদ্দেশে মস্তক ভূলুণ্ঠিত করিয়া ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে বলি,—"হায় মা! এমন রত্ন কি আর প্রসব করিবে না?"

ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রামায়ণ তত্ত্ব

-০ঃ×ঃ০-

রচনাকাল। বহুদিন হইতে রামায়ণের রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা চলিতেছে। অনেক পণ্ডিত বহুচেষ্টার পর Wrapped in obscurity বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক রামায়ণ গ্রন্থ রচিত হইবার পর ভারতের ভাগ্যচক্র এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এত প্রলয়ঝটিকা তাহার মাথার উপর প্রবাহিত হইয়াছে যে, তাহার রচনা কাল নির্দ্দেশের প্রধান উপাদানগুলি একে একে অন্তর্হিত হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে এক একটা সময় স্থির করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই অপরের সহিত একমত হইতে পারেন নাই।

বিভিন্ন মত। সার উইলিয়ম্‌স্ জোন্সের মতে রামায়ণের রচনা কাল ২০২৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ। মহাত্মা টড্ এবং বেণ্টলি সাহেব যথাক্রমে ১১০০ এবং ৯৫০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের উল্লেখ করেন।

কহ্লন পণ্ডিত প্রণীত কাশ্মীরের ইতিহাস "রাজতরঙ্গিণীর" ঘটনাবলী হিসাব করিয়া গ্যারিসিও সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উক্ত গ্রন্থ রচিত হয়। কিন্তু কহ্লন পণ্ডিতের উক্তিতে স্বয়ং বিশ্বাসস্থাপন করিতে না পারিয়া বলিতেছেনঃ—"I have endeavoured to establish with all the certainly that the subject admitted—that the original

composition of the Ramayana to be assigned about the twelfth century B. C."

মার্শম্যান সাহেব বলেন, "He (Valmeeki) is supposed to have flourished in the second century before our era."

ওয়েবার সাহেবেরও অনেকটা সেই মত। তিনি বলেন, রামায়ণের অনেক স্থলে 'রাশিচক্র' (Zodiacal signs) নাম পরিদৃষ্ট হয়। আকাশস্থ সূর্য্য-মার্গকে মেষ, বৃষ, মিথুন প্রভৃতি দ্বাদশ অংশে বিভক্ত করিয়া কাল্ডীয়গণ প্রথমে 'রাশিচক্র' নির্দ্দেশ করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে গ্রীকগণ তাঁহাদের নিকট জ্যোতিষ শাস্ত্রের ঐ অংশ শিক্ষা করেন, পরে হিন্দুগণ আবার গ্রীকগণের নিকট হইতে উক্ত বিদ্যা গ্রহণ করেন। অতএব ওয়েবার সাহেবের মতে এই বোধ হয় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা খৃষ্টীয় অব্দের প্রারম্ভে উক্ত গ্রন্থের জন্ম হয়।

গ্যারিসিও 'রাজতরঙ্গিণী' অনুসারে যে কাল স্থির করিয়াছেন, তাহার সহিত নিজের মতের পার্থক্য এক শতাব্দী মাত্র। মার্শম্যান ও প্রফেসর ওয়েবারের মতের পার্থক্যও তদ্রূপ। কিন্তু অপর পণ্ডিতগণের মতভেদ বাস্তবিক বিস্ময়-জনক।

সিংহল। ভারতে শাক্যসিংহের মহাধর্ম্ম যখন অবনতির পথে ধাবিত, তাহার প্রবল পরাক্রম যখন ধীরে ধীরে হ্রাস হইয়া আসিতেছে, সেই সময়ে বঙ্গদেশস্থ সিংহবাহু নামক জনৈক রাজার পুত্র, বিজয়সিংহ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া সানুচর সিংহলদ্বীপে প্রেরিত হন। বিজয়সিংহ অনুচরগণের সাহায্যে তত্রত্য অধিবাসি-গণকে পরাভূত করিয়া তথায় আধিপত্য বিস্তার করেন। অনেকে অনুমান করেন যে, বুদ্ধদেব যে বৎসর মানবলীলা সংবরণ করেন (৫৪৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ) সেই বৎসরই সিংহলে বিজয়সিংহের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারই নাম-অনুসারে দ্বীপের নাম সিংহল হয়।

লঙ্কা। রামায়ণে সর্ব্বত্রই রামরাজ্য লঙ্কা নামে অভিহিত হইয়াছে। উক্ত দ্বীপের দ্বিতীয় নাম আজ পর্য্যন্ত গ্রন্থমধ্যে কোথাও পাওয়া যায় নাই। অবশ্য তখন লঙ্কার অন্য নাম ছিল না। নতুবা কোন স্থানে না কোন স্থানে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইত। তাহা হইলে সিংহল নাম যে লঙ্কা নামের পরবর্ত্তী এ সম্বন্ধে অবিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, রামায়ণের রচনাকাল ৫৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের

(বিজয়সিংহের রাজ্য প্রতিষ্ঠার) পূর্ব্ববর্ত্তী। গ্রীকগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া লঙ্কাকে তাম্রপর্ণী ও সিংহল নামে সর্ব্বত্র পরিচিত করে। এই কারণে বোধ হয় রামায়ণ রচনাকালে ভারতে গ্রীকগণের আগমন ঘটে নাই।*

রামায়ণের সময় আর্য্যগণের অবস্থা। রামায়ণ মহাকাব্যের ঘটনাবলী সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিলে গ্রন্থরচনা কালের একটি প্রস্ফুটিত প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। দেখিতে পাওয়া যায়, আর্য্যগণ সিন্ধুতীর ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ গঙ্গাতীর ও অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। উত্তর ভারতে আর্য্যগণের মধ্যে সভ্যতার আলোক প্রবেশ করিয়াছে।

আশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ব্রাহ্মণগণই একমাত্র পূজনীয় ও সমাজের নেতা হইয়াছিলেন, এক্ষণে ক্ষত্রিয়গণ ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতে শিখিয়াছেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের তেজ ও ক্ষত্রিয়কুলোত্তম বিশ্বামিত্রের অদম্য অধ্যবসায়ে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। অবশেষে ক্ষত্রিয়গণই জয়লাভ করিতেছেন। মিথিলাধিপতি জনক ব্রাহ্মণ-নিরপেক্ষ হইয়া যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদনে নিরত হইয়াছেন। অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান তাঁহাদের শিষ্যস্থান অধিকার করিয়াছেন। বেদ-অন্তর্গত ব্রাহ্মণের কর্ম্মকাণ্ডের পার্শ্বে ক্ষত্রিয়ের উপনিষদ্ মস্তকোত্তোলন করিয়া উঠিতেছে।

অনার্য্যগণও এই সময়ে নিদ্রিত ছিল না। আর্য্যগণের অনুকরণে তাহারাও উন্নতিশীল হইবার জন্য সচেষ্ট ছিল। ক্ষত্রিয়গণের ঈদৃশ অধ্যবসায় দেখিয়া তাহারাও সাহস সঞ্চয় করিতে লাগিল। সীতা-অন্বেষণরত হনুমানকে উপলক্ষ্য করিয়া রামায়ণের কবি রাবণগৃহের যেরূপ উজ্জ্বলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় অনার্য্যগণ তখন রাজনীতি, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল।

সূক্ষ্ম হিসাবে রামায়ণের কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতবৈষম্য দেখা

---

* In the Ramayana ceylone is never called Tamraporni or Sinhala (by which name alone it was known to the Greeks) but always Lanka. *Indian Wisdom.*

মহাকবি কালিদাসের সময় তাম্রপর্ণী নামের বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় ;—

"তাম্রপর্ণীসমেতস্য মুক্তাসারং মহোদধেঃ।
তে নিপত্য দদুস্তস্মৈ যশঃ স্বমিব সঞ্চিতম্॥"

রঘুবংশ, চতুর্থসর্গ ৫০ শ্লোক।

যায় বটে, কিন্তু আর্য্যগণের এতাদৃশ উন্নত অবস্থার সময়েই যে উক্ত গ্রন্থের জন্ম হয় মোটা হিসাবে তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। খৃষ্ট জন্মের কয় শত বৎসর পূর্ব্বে যে আর্য্যগণের এইরূপ উন্নতি সংঘটিত হয় তাহাই জানিতে পারিলে রামায়ণের কাল নির্ণয় সহজ হইয়া আসিবে।

রামায়ণ ও মহাভারত

বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিরচিত মহাভারতের পৌর্ব্বাপর্য্য লইয়া অনেক মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। মার্শম্যান সাহেব বিবেচনা করেন উভয় গ্রন্থকারই সমকালবর্ত্তী। তাঁহার মতে মহাভারতোক্ত 'যবন' শব্দে গ্রীকগণকে বুঝাইতেছে। সুতরাং সেকন্দর শাহের ভারত-আক্রমণের পর মহাভারত বিরচিত হয়। গ্যারিসিওর উক্তিতে পূর্ব্বোক্ত মত বিশেষরূপে সমর্থিত হইতেছে। তিনি বলিতেছেন—"The name 'Yavan' may have been anciently used by the Indians to denote the nations situated to the west of India ; more recently, that is after the time of Alexender it was applied principally to the Greeks."

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, রামায়ণ রচনাকালে ভারতে গ্রীকগণের প্রবেশ লাভ ঘটে নাই। মহাভারতোক্ত 'যবন' শব্দে যদি প্রকৃতই গ্রীকগণকে বুঝায় তাহা হইলে উভয় গ্রন্থকে কোন প্রকারেই সমসাময়িক বলা যাইতে পারে না। রামায়ণ অবশ্য পূর্ব্বকাল অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু মনিয়র্ উইলিয়ম্‌স্, গ্যারিসিও প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মহাভারতকে আবার রামায়ণের পূর্ব্বকালবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* এই উক্তি সমর্থন করিবার জন্য মনিয়র উইলিয়ম্‌স্ বলিতেছেন যে, মহাভারতে যে রামোপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে বাল্মীকি অথবা রামায়ণ গ্রন্থের কোন উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং মহাভারতের সময় রামায়ণের কোন অস্তিত্ব ছিল একথা বিশ্বাস করা যায় না। ওয়েবার সাহেবের অনুমান পূর্ব্বমতানুযায়ী হইলেও তিনি বলিতেছেন যে, সম্ভবতঃ, মহাভারতোক্ত রামোপাখ্যান এবং রামায়ণ একই ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নানা উপাখ্যানের মধ্যে সংক্ষেপে রামোপা-

* The original story of Mahavarata is possibly more ancient than that of Ramayana. *Monier Williams.*

I do not hesitate to declare it (Mahavarata) less ancient than the Ramayana *Garresio.*

খ্যান বর্ণিত করিয়াছেন, কিন্তু বাল্মীকি একমাত্র সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া সমগ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ওয়েবার সাহেবের এই মতানুসারে উভয় গ্রন্থের সমসাময়িকত্বের নিশ্চয়তা প্রমাণিত হয় না এবং তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্যেরও কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সেই কারণে তিনি পুনরায় বলিতেছেন যে, রামায়ণে দাক্ষিণাত্যের যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উক্ত স্থানের অনার্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যগণের অপেক্ষা সভ্যতা বিষয়ে তখনও অনেক ন্যূন। রামায়ণের সময়ে দাক্ষিণাত্য প্রদেশ ভারতের অন্যান্য অংশের সহিত নিতান্ত সম্বন্ধবিহীন। সীতা-অন্বেষণে প্রেরিত বানরগণের দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা ইহার বিশেষ পরিচায়ক। কিন্তু মহাভারতের সময় আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের মিলন বন্ধন অধিকতর দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। রামায়ণের সময়ে আর্য্যগণ পূর্ব্বে বিদেহ (মিথিলা) এবং অঙ্গ, দক্ষিণ পশ্চিমে সুরসত্র এবং দক্ষিণে দণ্ডকারণ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু মহাভারতের সময়ে "কান্যকুব্জে দ্রুপদবংশীয়গণ, বিহারে জরাসন্ধ, মথুরার পশ্চিমে বর্ত্তমান জয়পুরের উত্তরে বিরাট, ভাগলপুরে কর্ণ, অগ্রে মথুরায় পরে দ্বারকায় যদুবংশীয়গণ এবং পূর্ব্বপঞ্জাবে মদ্র প্রভৃতি মহারথ আর্য্যগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।" *

ক্রমশঃ।

শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী।

---

* এই সময়ে ভারতে অল্পমাত্রায় অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য প্রচলিত হওয়ায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মিলন সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের স্থানে স্থানে যে সকল মিলন দ্রব্য প্রস্তুত হইত তাহার তালিকা দিলেই সেই সকল স্থানের সভ্যতা ও অন্যান্য প্রদেশের সহিত সংস্পর্শের বিষয় জানিতে পারা যাইবে।

"হিন্দুকুশের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে স্বর্ণখচিত শাল ও বন্য বিড়াল প্রভৃতির কোমল চর্ম্ম, গুজরাটে কম্বল, কর্ণাট ও মহীশূরে মস্‌লীন, বাঙ্গালায় হাতীর গদির চাদর প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। এতদ্ব্যতীত চীন প্রভৃতি দেশ হইতে পশমী ও রেশমী কাপড় আসিত। রাজসূয় যজ্ঞে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিবার জন্য এই সকল দেশের রাজারা আপন আপন দেশের দ্রব্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন।" রজনী কান্ত গুপ্ত।
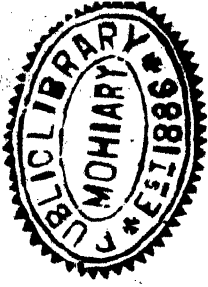
সফল স্বপ্ন।

—:*:—

'স্বপ্ন' বলে এত দিন ছিল যাহা মনে,
বিশ্বনাথ! অন্তরের একান্ত গোপনে,
বীজ-মন্ত্র সম শুধু নিত্য করি ধ্যান
চেয়েছি জাগাতে বিশ্বে ত্রিংশ কোটি প্রাণ,
একই মহান্ লক্ষ্যে—উদগ্র সাধনে,—
হে শঙ্কর! কে জানিত আজি শুভক্ষণে,
মোর হৃদয়ের সেই সুপ্ত স্বপ্নখানি,
জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ সম বক্ষে লবে টানি'—
তুচ্ছ করি পার্থিবের ব্যথা মৃত্যু ভয়,
দুঃখিনী মায়ের মোর সহস্র তনয়।
যুগপৎ অকস্মাৎ বিস্ময়ে পুলকে,
আজি ভাবিতেছি তাই মৃত মর্ত্ত্যলোকে,
মঙ্গল ইঙ্গিত তব এসেছে কি নামি'
সার্থক করিতে মোর মহাস্বপ্ন খানি!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

পাত ও পলু।

—•:•:•—

সে আজ দুই বৎসরের কথা, সেবার মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলাম। ৮ উপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে কেবল পলু বা রেশম পোকা সম্বন্ধে কএকটী প্রবন্ধ সন্ধ্যায় লিখিতে হইয়াছিল। এক্ষণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নূতন কথা জানিতে পারিয়াছি, কাজে কাজেই পাত ও পলু সম্বন্ধে নূতন নূতন অনেক কথা বলিতে হইতেছে। নদীয়া, যশোহর, খুলনা, চব্বিশ পরগণা, ঢাকা, ময়মনসিং প্রভৃতি অঞ্চলে বর্ত্তমানে পাট যেমন প্রজাদিগের একটী আয়কর আবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু বিদেশী বণিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও কূট চক্রে পুনরায় তাহা নষ্ট হইবার উপক্রম হইতেছে, সেই রূপ মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ, রাজসাহী প্রভৃতি জেলা —যাহা এ যাবৎ কাল রেশমের আদি স্থান ছিল, যে পাত ও পলুর চাষ করিয়া এ অঞ্চলের সদ্‌গোপ চাষী গর্ব্বে স্ফীত হইয়া থাকিত, এমন কি ধানের আবাদেও তাহারা পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইত না, সেই সোণার পাত ও পলুর চাষের উপর আবার বিদেশী বণিক শনৈঃ শনৈঃ চক্রজাল বিস্তার করিয়া, রেশম চাষীর সঙ্গে নিজেরাও চাষী সাজিয়া এ অঞ্চলের রেশম আবাদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিতেছেন। সাহেব লোক যখন রেশমের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছেন না; তাঁহারা নিজে রেশম পোকা পুষিবার জন্য মহকুমার স্থানে স্থানে পলু পোষার আড্ডা গাড়িতেছেন, তখন রেশমের ব্যবসার ন্যায় রেশম পোকা (গুটী) পোষার ব্যবসাটীও যে একচেটিয়া না করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন এরূপ ত বিশ্বাস হয় না। আবার রেশম উৎপন্ন করিতে গেলে রেশম পোকার একমাত্র আহার পাত নিতান্ত আবশ্যক। তখন যে পাতের জমিগুলি এবং পাতের আবাদটী পাকে প্রকারে সাহেব লোকের একচেটিয়া হইয়া পড়িবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে। যাহারা একদিন নীলের প্রলোভনে বঙ্গদেশের চাষীবৃন্দকে টাকা গছাইয়া জবরদস্তি করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিল, মাথায় পাঁক পর্য্যন্ত বসাইয়া নীলের চারা উৎপন্ন করাইয়াছিল, তাহারা যে এককালে পলুর চাষীদিগকে সেই রূপ জঘন্য প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নিপীড়ন করিবে না তাহাই বা কে বিশ্বাস করিতে পারে। হয়ত একদিন পাতের জমিগুলি সমস্ত খাস হইয়া রেশম কুঠীর সাহেবদিগের নিজ আবাদে উঠিবে। আবার যে কৃষাণ একদিন

পাতের জমিতে বিঘা প্রতি ২০০। ২২০ টাকা লাভ পাইত, সে-ই হয়ত সাহেবের কুঠিতে ২৲ টাকা মাহিয়ানার চাকুরী পাইয়া স্ফীত বক্ষে বিপুল বীর্য্যে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ঘরের মেয়ে ছেলের উপর লায়েকি ফলাইবে, সাহেবের চাকুরী করে বলিয়া অহঙ্কারে চন্দ্রবদন তুলিয়া পাড়ার লোকেদের সঙ্গে কথা কহিবে না, আর সাহেবের গোয়েন্দা সাজিয়া গ্রামের ভিতর যার যে টুকু পাতের জমি আছে সমস্তটা সাহেবের হস্তে তুলিয়া দিয়া নিজেকে মনে মনে বঙ্গকুলতিলক এবং বঙ্গবাসীর মধ্যে সুকৃতিবান্ পুরুষ বলিয়া মনে করিবে।

আমি দেখিতেছি নিম্ন বঙ্গে যেমন মৎস্যলোলুপ মার্জ্জারসদৃশ রেলী ব্রাদার্স প্রভৃতি কোম্পানী আড়ত বিস্তার করিয়া পাটের চাষার ক্ষেত্ররূপ রান্নাঘরের দুয়ারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন, এদেশে রেশমী কুঠেল সাহেবেরাও সেই রূপ রেশম ব্যবসার ছুতা ধরিয়া স্থানে স্থানে পাতের জমির নিকট পলু পুষিবারও আড্ডা ফেলিয়া বসিতেছেন। যাক্ এক কথায় আর এক কথা আসিয়া পড়িতেছে।

এক্ষণে পাত ও পলুর কথা কিছু বলি। পাতের অপর নাম তুঁত। তুঁতের পাতা অবিকল রক্ত জবাফুলের ন্যায়। তুঁত বিভিন্ন জাতীয় আছে, এক প্রকার তুঁতগাছ খুব দীর্ঘ হইতে দেখা যায় তাহা পলুর খাদ্যে ব্যবহৃত হয় না। তুঁত বা পাতের ইংরাজি নাম Mulberry Plant। ছোট জাতের তুঁতই পলু পোকার এক মাত্র খাদ্য। যেমন জলের সঙ্গে মেঘের সম্বন্ধ, সেই রূপ পাতের সঙ্গেও পলু পোকার সম্বন্ধ। যেমন জল উপরে না উঠিলে মেঘ হয় না, আবার মেঘ না উঠিলেও বিনা মেঘে জলের উৎপত্তি হয় না, তেমনি তুঁত না খাইলে রেশম পোকা এক তিলও বাঁচে না, আবার রেশম পোকা না জন্মাইলে তুতের জমিরও কোন আবশ্যক করে না। এককালে এ দেশের লোক ধানের আবাদ ভাল বুঝিত না, কেবল একমাত্র Mulberry field আবাদ দ্বারাই তাহাদের স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। বর্ত্তমানে বিদেশী ব্যবসায়ীর চক্রে রেশমের ব্যবসা একচেটীয়া হইয়া পড়ায় পলুর দর কম হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং অনেকে তুতের ভুঁই ভাঙ্গিয়া ধানের ভুঁই করিতেছে।

অতিরিক্ত পরিমাণে গোবর সার দিয়া বার মাসই তুতের জমির তদবির করিতে হয়। বৎসরের মধ্যে যে চারি পাঁচ বার রেশম পোকা (পলু) ডিম্ব প্রসব করে, সেই কয়বারই পাতের জমি হইতে পোকার আহারের জন্য তুতের পাতা কাটিয়া লওয়া হইয়া থাকে। আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র অগ্রহায়ণ ও চৈত্র

মাসে তুঁতের পাতা কাটা হইয়া থাকে। পাতা কাটিবার প্রত্যেক মাসকে এ দেশের লোকে বন্দ কহে। তুত পাঁচ বন্দে কাটা হয়। ইহার মধ্যে এক অগ্রাণ বন্দেই কৃষাণ বিঘাপ্রতি প্রায় একশত টাকার পাত বিক্রয় করিয়া থাকে। অপর ৪ বন্দেও প্রায় ১০০ শত টাকার অধিক পাত বিক্রয় হয়। মোটের উপর এক বিঘা তুত বা পাতের জমিতে উত্তম করিয়া সার মাটি দিয়া আবাদ করিতে পারিলে প্রায় ২০০ শত টাকারও অধিক আয় হইয়া থাকে। খরচ খরচা বাবদ বিঘা প্রতি যদি ৫০৲ টাকাও বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও কৃষাণ বাৎসরিক ১৫০৲ শত টাকা লাভ করিতে পারে। মুর্শিদাবাদ ও রাঢ় অঞ্চলে ডাঙ্গার জমিতে তুত, ইক্ষু, ধান, গম, খোরো, বেগুন, আলু প্রভৃতির চাষ করিতে গেলে প্রায়ই ছিঁচের দরকার হয়। দোনা বা ডোঙ্গা কলে এ দেশের চাষীরা রীতিমত জল তুলিয়া উক্ত ফসল সমূহের আবাদ করিয়া থাকে। পশ্চিমেও ছিঁচ ভিন্ন কোন ফসলই উৎপন্ন করিতে পারা যায় না। কিন্তু আমাদের সুজলা সুফলা নিম্ন বঙ্গের কৃষাণগণ এই ছিঁচের কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না।

তুঁতের জমিতে সুবিধা এই যে, সকল সময়েই জমি পাট করা চলে। যে চাষার হালের বলদ নাই সেও পাতের জমি আবাদ করিতে পারে। পাতের জমিতে বৎসরের মধ্যে বৈশাখ মাসে একবার ও কার্ত্তিক মাসে দুইবার ছিঁচ দিয়া প্রত্যেক ছিঁচের পর একবার করিয়া লাঙ্গল দিতে হয় মাত্র। পাতের জমিতে কৃষাণকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। তুতে কোদালীর কাজই অধিক পরিমাণে দরকার হয়। ভাদ্র ও অগ্রাণ মাসে কাটা পাতের ডাঁটা নূতন জমিতে বসাইয়া দিলে পাত লাগিয়া যায়, ইহাকে পাতের মুড়া বসান কহে। একবার জমিতে পাত বসাইতে পারিলে কৃষাণের সাতপুরুষ পর্য্যন্ত তাহা ভোগ করিতে পারে।

তুঁত গবাদির ভারি পুষ্টিকর খাদ্য। দুগ্ধবতী গাভীকে কিছুদিন তুতের পাতা খাইতে দিলে দুগ্ধ সুস্বাদ ও অতিরিক্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তুত বলদকে খাইতে দিলেও বলদ সত্বর বলিষ্ঠ ও সুশ্রী হইয়া দাঁড়ায়। এদেশে চাষাদের কিছু তুঁতের জমি থাকিলে তাহারা রেশম পোকা পুষিয়া থাকে।

রেশম পোকার অপর নাম পলু। ইংরাজিতে পলুকে Silk Worm বলিয়া থাকে। রেশম চাষের ইংরাজি নাম Seri cultive। এক্ষণে রেশম কুঠির সাহেবগণ প্রায়ই এই আয়কর ব্যবসাটী একচেটিয়া করিয়া তুলিয়াছেন।

সময় সময় তাঁহাদের চক্রে চাষার ঘরে অনেক পলুব কোয়া (গুটী) নষ্ট হইয়া থাকে। রীতিমত দর না পাওয়ায় তাহাদের একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। তাই বর্ত্তমানে এদেশে পলু সম্বন্ধে একটী প্রচলিত ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়—

তখন রাজা ছিলরে পাতের চাষা,
এখন পেট চলে না তুঁতে;
ওরে, নষ্ট কল্লে পলুর আবাদ—
সাগরপারের ভূতে।

কি প্রকারে চাষারা কার্য্যতঃ পলু উৎপন্ন করিয়া থাকে এবং পাতের সঙ্গে পলুর কিরূপ সম্বন্ধ, অতঃপর তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

রামায়ণ তত্ত্ব।

—০:+:০—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আর্য্য ও অনার্য্যের মিলন।

রামায়ণের সময়ে আর্য্য ও অনার্য্যগণের মধ্যে কেবল সদ্ভাবের সূত্রপাত হয়। হৃতভার্য্যা রামচন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যাবাসী অনার্য্যগণকে মিত্রতাসূত্রে বন্ধন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। গুহকও রামচন্দ্রের সহিত বন্ধুতা স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু মহাভারতের সময়ে এই ভাব আরও দৃঢ়তর হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি উভয় জাতির মধ্যে তখন বিবাহ প্রথা পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে। স্বয়ং মহাভারত-প্রণেতা বেদব্যাস অনার্য্যকন্যা সত্যবতীর সন্তান। পরম ধার্ম্মিক বিদুর দাসী-গর্ভসম্ভূত বলিয়া পরিগণিত। ভীম হিড়িম্বার, ও ইন্দ্রসুত অর্জ্জুন উলুপীর পাণিগ্রহণে জন-সমাজে নিন্দনীয় হন নাই। কিন্তু রামায়ণে কুত্রাপি এ সকল দৃষ্ট হয় না।

অসবর্ণ বিবাহ।

রামায়ণের সময়ে অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মহাভারতের সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র কন্যা বিবাহে, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য ও শূদ্র কন্যা বিবাহে এবং বৈশ্যের শূদ্রকন্যা বিবাহে

কোন সঙ্কোচ নাই। তবেই দেখা যায় রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের সময়ে আর্য্যগণের অন্তঃকরণ উদারতর হইয়া উঠিয়াছে। আচার ব্যবহার ক্রমশঃ মার্জ্জিত হইয়া আসিতেছে।

এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও মহাভারতকে রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

ছন্দ। মনিয়র উইলিয়মস্ সাহেব রামায়ণের ছন্দ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে বাল্মীকির স্থান মহাভারতের বহু পূর্ব্বে বলিয়াই বিবেচিত হয়। তিনি বলিতেছেন "The invention oi the sloka is attributed to Valmiki—the reputed author of the Ramayana—with the object doubtless by establishing his claims to be regarded as one of the earliest and most ancient oi Indian poets. The metre however is found in the Veda." কিন্তু গ্যারিসিও বলিতেছেন যে, বেদের যে সকল স্তোত্র অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত তাহা রামায়ণের পরবর্ত্তী। বাহুল্য বোধে এখানে আর অন্য প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল না। পূর্ব্বে যে সকল কথা বলা হইল, তাহাতে উভয় গ্রন্থকে কখন সমসাময়িক বা মহাভারতকে রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যাইতে পারে না।

বাল্মিকী ও হোমর। বাল্মীকি ও হোমর সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলেই অনেক ইংরেজ পণ্ডিত নিরপেক্ষ বিচার করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। বিশেষ প্রমাণ না থাকিলে তাঁহাদের এ মত খণ্ডন করা দুরূহ। ওয়েবার সাহেব স্থির করেন যে, বোধ হয় কোন বৌদ্ধগল্প হোমরের ছাঁচে ঢালিয়া বাল্মীকি এই মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। মনিয়র উইলিয়মস্ সাহেব তাঁহার প্রণীত Indian Wisdom নামক গ্রন্থে ১৩৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বলিতেছেন যে, তিনি ওয়েবার সাহেব কথিত বৌদ্ধগল্প সম্বন্ধীয় কোন কথা বিশ্বাস করিতে পারেন না। কিন্তু রামায়ণ যে ইলিয়ডের অনুকরণ তৎসম্বন্ধে তাঁহারও মতভেদ নাই। Dion Chrysostomos পূর্ণসাহসে বলিতেছেন যে, রামায়ণ একেবারে ইলিয়ডের অনুবাদ (Copied and translated from Homer)। বাল্মীকি যে হোমরের ছায়া অবলম্বন করিয়াছেন, কেবল এইমাত্র বলিয়া তাঁহার তৃপ্তিলাভ হয় নাই। তাঁহার মত এত সাহসে কেহই বাল্মীকির পরমুখাপেক্ষিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। লেসেন্ ও ওয়েবার সাহেবের সহিত মনিয়র উইলিয়মসের মতের কোন বিভিন্নতা নাই। বাল্মীকি কোন্ সূত্রে হোমরের অনুসন্ধান

পাইয়াছিলেন, তিনি তাহাও নির্দ্দেশ করিতে ভুলেন নাই। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, সেলিউকস্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগাস্থিনিস্ নামক যে গ্রীকদূতকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি বোধ হয় প্রসঙ্গক্রমে হোমরের লিখিত বিষয়ের বর্ণনা করিয়া থাকিবেন এবং বাল্মীকি তদবলম্বনে রামায়ণের ন্যায় একখানি সুললিত গবেষণা-পূর্ণ মহাকাব্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা হইলেও তাঁহার গৌরব কোন অংশে ম্লান হইবার যোগ্য নহে। কারণ একজন বিদেশীয় ব্যক্তির মৌখিক বর্ণনা আশ্রয় করিয়া যিনি এরূপ মহাকাব্যের সৃষ্টি করিতে পারেন তাঁহার কল্পনাশক্তি অসীম—দূরদৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর। মনিয়র সাহেব লেসেন্ সাহেবের পূর্ব্বোক্ত মতের বিরুদ্ধবাদী। তাঁহার মতে রামায়ণ ও ইলিয়ডের নায়ক নায়িকা এবং ঘটনাবলীর মধ্যে যতই সাদৃশ্য * থাকুক উভয় গ্রন্থকারের গ্রন্থমধ্যে এরূপ অনেক সামগ্রীর অনুসন্ধান পাওয়া যায় যে, তাহাতে তাঁহাদের স্বাধীন-চিত্ততার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাল্মীকির ক্ষমতা সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দিহান সেই ব্যক্তিগণের মত সমূহ উদ্ধৃত করা গিয়াছে, এইবারে যে সকল মহাত্মা তাঁহার অনুকূলে মত প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা দেখান যাউক। ভট্ট মোক্ষমূলর বলিতেছেন যে, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে গ্রীককাব্যের যে কোন ছায়া পড়িয়াছে, আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। রামায়ণের ফরাসী অনুবাদকালে Hippolyte Tranchet তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় বলিতেছেন যে, রামায়ণ হোমরের কালের (Homeric Age) পূর্ব্বে রচিত হয় এবং হোমরই উক্ত গ্রন্থ হইতে নিজের ভাব সঙ্কলন করিয়াছেন।

কেবল এইরূপ মতবৈষম্য ব্যতীত প্রকৃত প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না।

* Rama corresponds to Manelans, Sita to Selen, Sparta to Ajodhya, Lanka to Troy. It may even be true that some sort of analogy may be traced between parts played by Agememnon and Sugriva, Patroclans and Lakshman, Neotor and Jambubat again Ulysis in one respect may be compared to Hanumat and Hector as the bravest warior on the Trogan side may in some points be likened to Indrajit in other to the indignant Bibhisan. *Indian Epic poetry.*

যতদূর দেখা যায় তাহাতে রামায়ণ ভারতে গ্রীক আগমনের পূর্ব্বে রচিত হয়; সুতরাং রামায়ণে গ্রীক কাব্যের প্রতিবিম্ব পতিত হওয়া অসম্ভব। রামায়ণ রচনার একটী সর্ব্ববাদি-সম্মত কাল নির্ণীত না হইলে এ ব্যাপারের মীমাংসা হওয়া সুদূর পরাহত।

রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ।

রামায়ণ এবং মহাভারতের সমস্ত অংশ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত মহাকাব্যদ্বয়ের সমগ্র ভাগ এককালে বিরচিত হয় নাই। নানা সময়ে নানা অংশ সংযুক্ত হওয়ায় সেই বিভিন্ন সময়ের সমাজচিত্র, আচার ব্যবহার প্রভৃতি কাব্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সেই কারণে উহাদের জন্মকাল নির্দ্দেশ করা এত দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে।

রামায়ণের বালকাণ্ডের অন্তর্গত প্রথমসর্গে নারদ যে রামবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, অনেকে অনুমান করেন ঐ অংশ পরে সংযোজিত হয়।

বাল্মীকি গ্রন্থের নায়ক রামচন্দ্রকে কখনও অপার্থিব ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। তিনি যেরূপে তাঁহার গ্রন্থের নায়ক নায়িকার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় তিনি রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে বিষ্ণু-অংশ-সম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তবে গ্রন্থ মধ্যে যে সকল স্থলে তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর অংশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই সকল স্থলকে প্রক্ষিপ্ত অংশ ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না।

বালকাণ্ডান্তর্গত তৃতীয় সর্গে যে রামোপাখ্যানের পুনরবতারণা দেখা যায়, তন্মধ্যে যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহাতে উত্তর কাণ্ডের ঘটনাবলীর কোন উল্লেখ নাই। নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা সর্গ সমাপ্ত হইয়াছে;—

"স্বরাষ্ট্ররঞ্জনঞ্চৈব বৈদেহ্যাশ্চ বিসর্জ্জনম্।
অনাগতঞ্চ যৎ কিঞ্চিদ্রামস্য বসুধাতলে।
তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ॥"

রামায়ণ, বালকাণ্ড, তৃতীয়সর্গ, ৩৯ শ্লোক।

রামায়ণোক্ত সমগ্র ঘটনার উল্লেখ উল্লিখিত সর্গে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সীতা বিসর্জ্জন ব্যতীত উত্তর কাণ্ডের কোন ঘটনাই ইহাতে বিবৃত হয় নাই। উদ্ধৃত শ্লোকে বলা হইল যে, রাম সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিতে বাকী রহিল তাহা উত্তর কাণ্ডে বলা যাইবে। কিন্তু উত্তর কাণ্ডের কোন অংশের সহিত মূল গ্রন্থের সামঞ্জস্য নাই।

রামায়ণের আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করিয়া বাল্মীকি তাহার শ্লোক সংখ্যা নির্ণয় করিতে বসিয়া বলিতেছেন ;—

"চতুর্ব্বিংশৎসহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষিঃ।
তথা সর্গশতান্ পঞ্চ ষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরম্॥
কৃত্বা তু তন্মহাপ্রাজ্ঞঃ সভবিষ্যং সহোত্তরম্।
চিন্তয়ামাস কো ন্বেতৎ প্রযুঞ্জীয়াদিতি প্রভুঃ॥"

রামায়ণ, বালকাণ্ড, চতুর্থ সর্গ, ২। ৩ শ্লোক।

রামানুজ প্রথম শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন ;—"তত্র পঞ্চশতরূপসর্গসংখ্যা ষট্‌কাণ্ডানামেব শ্লোকসংখ্যাতু সোত্তরাণামিতি আহুঃ। কতককৃতস্তু উক্ত সংখ্যাপেক্ষয়া ষট্‌ত্রিংশৎ সর্গসংখ্যাধিক্যদর্শনাৎ চতুর্ব্বিংশৎসহস্রাপেক্ষয়া শ্লোক-সংখ্যায়া অপি আধিক্যদর্শনাচ্চ উত্তরকাণ্ডীয় সর্গসংখ্যানুক্তেশ্চ প্রক্ষিপ্তোঽয়ং শ্লোকঃ নত্বার্ষ ইতি আহুঃ।"

এই শ্লোকের সহিত গ্রন্থের সর্গ ও শ্লোক সংখ্যার কোন সামঞ্জস্য না থাকায় উক্ত শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলা হইয়াছে। যদি গ্রন্থরচনার পর নানাস্থানে নানা শ্লোক সংযোজিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত শ্লোকোক্ত সর্গ ও শ্লোক সংখ্যার সহিত গ্রন্থের সর্গ ও শ্লোক সংখ্যার সাদৃশ্য না থাকাই সম্ভব। এই শ্লোক নিজে প্রক্ষিপ্ত প্রমাণিত হয় ভালই, নতুবা ইহা দ্বারা গ্রন্থের অন্যান্য প্রক্ষিপ্ত অংশের বেশ প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় শ্লোকে কবি বলিয়াছেন যে, সপ্তম কাণ্ডে ভবিষ্যৎ বিষয় সকল সন্নিবেশিত হওয়ায় উহাকে উত্তর কাণ্ড বলা যাইবে। এই দুই শ্লোকে গ্রন্থের শেষকাণ্ড সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে উত্তর কাণ্ডকে যেন কাব্যের সহিত সম্বন্ধহীন বলিয়া বোধ হয়। রামায়ণ সপ্তকাণ্ডের পরিবর্ত্তে যদি ছয় কাণ্ডেই সমাপ্ত হইত তাহা হইলে বোধ হয় কোন অভাবই বোধ হইত না। রামের রাজ্যাভিষেকের পরই গ্রন্থকারের বক্তব্য শেষ হইল। পাঠক-গণও তৃপ্তিলাভ করিল। রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কোন্ কোন্ কর্ম্ম করিলেন তাহা শুনিতে বোধ হয় আর কাহারও আকাঙ্ক্ষা থাকে না। আমা-দের বেশ মনে হয় যেন উত্তরকাণ্ড গ্রন্থশেষে সংযোজিত হইয়া মহাকবির মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এই সকল কারণে অনেকে বিশ্বাস করেন যে, উত্তরকাণ্ড রামায়ণের কবির রচিত নহে। ঐ অংশের লেখক সম্ভবতঃ মূলগ্রন্থের সহিত উহার সম্বন্ধ রক্ষা করিবার জন্য দুই একটী শ্লোক

মধ্যে মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় তাহারই প্রমাণ। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রণেতা মহাশয় রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ সম্বন্ধে কতকগুলি অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে এখানে আর তাহা প্রদত্ত হইল না।

রামায়ণ কি রূপক? অনেকের মতে রামায়ণ হইতে কোন ঐতিহাসিক সত্য বাহির করা যাইতে পারে না। কবি কল্পনাবলে কেবল তখনকার একখানি নিখুঁত সমাজচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ঘটনা সত্য কি মিথ্যা সে সম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা বড় সহজ নহে। অনেক ইংরাজ পণ্ডিত কিন্তু বিশ্বাস করেন যে, গ্রন্থের অধিকাংশ অংশ অতিরঞ্জিত হইলেও মূল ঘটনায় কতকটা সত্য নিহিত থাকিতে পারে। মনিয়র উইলিয়ম্‌স্ সাহেব পূর্ব্বমতের পক্ষপাতী *। Talboys Wheeler বলেন, লঙ্কার ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের শত্রুভাব অবলম্বন করিয়া উক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এইরূপে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার একটা যথার্থ বিচার হওয়া আবশ্যক।

আমরা রামায়ণের ঐতিহাসিক তত্ত্ব বাহির করিতে না পারিলেও তাহা হইতে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট বলিতে হইবে। আমরা অপর জাতির দৃষ্টিতে এখন বিশেষ হেয় বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের চরিত্রবলের প্রতি একবার স্থির লক্ষ্য করিলে মনে স্বতঃই একটা অভিমানের সঞ্চার হয়। আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, আধুনিক হিন্দুগণ যাঁহাদের বংশধর, তাঁহারা এককালে গুণবলে জগতে অজেয় ও অমর ছিলেন। রামায়ণ ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিয়া এখনও আমাদিগকে সকল বিষয় চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে। আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পূর্ণরূপে এই সকল গ্রন্থের সুশিক্ষার উপর নির্ভর করে।

শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী।

---

* মনিয়র উইলিয়ম্‌স্ সাহেব আরও বলেন :—"In the conflict there appears to lie a typical representation of the great mystery of the struggle ever going on between good and evil with regard however to any other allegorical and figurative ideas involved, as for oxample that Rama is a mere impersonation of Solar energy; Sita of agriculture or of civilisation introduced into the south of India by enemigrants from the north."

নিয়তি

—— :•: ——

দশম পরিচ্ছেদ।

"সাহু, আমায় ক্ষমা কর।"

মাথার উপর ভীম নির্ঘোষে প্রচণ্ড ঝটিকা গর্জ্জন করিতেছিল, ঘনকৃষ্ণ জলদ-জাল আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ছুটিতেছিল; পদতলে বেগবতী পার্ব্বতীয়া তটিনী শিলাখণ্ড হইতে শিলাখণ্ডে আছাড়িয়া পড়িয়া ভীমনাদে গর্জ্জিতেছিল, নাচিতেছিল, ছুটিতেছিল; অন্ধকার-বসনে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া উন্মাদিনী প্রকৃতি হো হো শব্দে প্রলয়ের অট্টহাসি হাসিতেছিল; ভৈরব নিনাদে দিগন্ত কম্পিত করিয়া পার্ব্বত্য তরুশিরে ঘন ঘন বিদ্যুতাগ্নি পতিত হইতেছিল। এমন সময় ক্ষুদ্র শৈলের পাদদেশে এক শিলাখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া স্থির দৃষ্টিতে কৃষ্ণজলদজাল-সমাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়াছিল, পার্শ্বে অপর শিলাখণ্ডে বসিয়া, শীলা বজ্রাগ্নিতে বৃক্ষদেহ কিরূপে ভস্মীভূত হয়, তাহাই দেখিতেছিল। উভয়কে বেষ্টন করিয়া সংহার-মূর্ত্তি প্রকৃতি উন্মাদতাণ্ডবে বিশ্ব চমকিত করিতেছিল।

শীলা বলিল,—"সাহু, আমায় ক্ষমা কর।"

গম্ভীর কণ্ঠে সাহু বলিল,—"কিন্তু তোর দশা কি হবে শীলা?"

শীলা বলিল,—"আমার—আমার জন্য ভেব না সাহু।"

সাহুর কণ্ঠ কাঁপিল; ঈষৎ ভগ্ন স্বরে বলিল,—"তোর জন্য ভাব্‌ব না? তবে কার মুখ চেয়ে সে দিন আততায়ী দস্যুকে ক্ষমা করলাম? কার জন্য হাতের বর্শা ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মত ছুটে পালালাম?"

শী। তুমি শপথ করেছিলে।

সা। শপথ? হায় শীলা, এমন কোন্ শপথ আছে, যার নিকট দেশের শত্রু ক্ষমা পায়? এমন কোন্ নরক আছে, যার ভয়ে দেশবৈরী বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করতে সাহস হয় না? হায় শীলা, কেন তুই তারে ভালবেসেছিলি?

শী। তাতে কি হয়েছে সাহু?

উত্তেজিত কণ্ঠে সাহু বলিল,—"কি হয়েছে? মীনের সিংহাসনে রাজপুত

বসেছে; সভ্য গৌরবরণ রাজপুত অসভ্য কৃষ্ণকায় মীনদের রাজা হয়েছে। সভ্যজাতির পদাঘাতে অসভ্য মীনের বুক চুরমার হয়ে যাচ্চে; অত্যাচারে অবিচারে দেশময় হাহাকার উঠেছে। আর তোর ভালবাসা দুর্ব্বেদ্য কবচের মত তাকে অসভ্যের তীরের আঘাত হ'তে রক্ষা করছে। তা' না হলে শীলা, সে দিন এই বর্শার আঘাতে তার রাজ্যের আশা, সভ্যতার অভিমান সব শেষ হয়ে যেত।"

সাহুর নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল; দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত হইতে লাগিল; আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। কম্পিত কণ্ঠে শীলা বলিল,—"সাহু, সাহু, আমায় ক্ষমা কর, আমি মহাপাপিনী।"

স্থির দৃষ্টিতে ঝটিকাচ্ছিন্ন মেঘের দিকে চাহিয়া সাহু বলিল,—"তুই নয় শীলা, আমিই মহাপাপী। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করব।"

শী। কি প্রায়শ্চিত্ত?

সা। প্রতিশোধ।

শীলার বুক কাঁপিয়া উঠিল। বলিল,—"হত্যা?"

সা। তা' এখন ঠিক বল্‌তে পারি না। কিন্তু শীলা, আবার বলছি তারে ভুলে যা'।

শী। কেন সাহু?

সা। কেন? সে দিন একটা ভীল যে তার কাছে এসেছিল, তা কি শুনিস্ নাই?

শী। শুনেছি।

সা। সে এখন দেশে যাবে। কেন জান? কোথাকার একটা রাজার মেয়েকে—

কড়্ কড়্ শব্দে গর্জ্জন করিয়া একটা বাজ সম্মুখস্থ বৃক্ষশিরে পড়িল; গাছ জ্বলিয়া উঠিল। সেই বজ্রাগ্নিদগ্ধ বৃক্ষের দিকে চাহিয়া শীলা বলিল,—"তাতে আমার কি সাহু? সে ইচ্ছা করলে একটা কেন একশো'টা রাজার মেয়ে বিয়ে করতে পারে; আমার তাতে ক্ষতি কি?"

সা। শীলা, ভালবাসারও একটা সীমা আছে।

শী। না সাহু, ভালবাসা অসীম।

উভয় হস্তে বক্ষ চাপিয়া সাহু নীরবে মেঘের বুকে বিদ্যুতের চঞ্চল নৃত্য দেখিতে লাগিল। শীলা বলিল,—"দেশে এত লোক থাকতে তোমার একার তার উপর এত আক্রোশ কেন?"

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সাহু বলিল,—"কেন, তুই তার কি বুঝবি শীলা? যে দিন হ'তে সে তোর বুকে আগুণ জ্বালিয়েছে, সেই দিন হ'তে কেন জানি না তারে আমার শত্রু বলে মনে হয়েছে। তারপর যে দিন সে আমারই সামনে দেশের বুকে আগুন জ্বালিয়েছে, এইখানে—ঠিক এইখানে অসহায় নিরস্ত্র মীনরাজের বুকে ছু'র মেরেছে, সেই দিন হ'তে সে আমার মহাশত্রু হ'য়েছে। সেই দিন হ'তে তার বুকের রক্তের জন্য আমার প্রাণ ছট্‌ফট করছে। শুধু আমার নয় শীলা, আমার মত অনেকেরই বুকে এই রক্তের পিপাসা জেগে উঠেছে; কিন্তু হায়, রাজা দেবতা, হতভাগ্য মীন অত্যাচারের সামনে বুক পেতে দিবে, তবু রাজার বিরুদ্ধে একটী কথা বলতে পারবে না।"

শী। কিন্তু সে তো এবার চলে যাবে?

সা। চলে যাবে, কিন্তু যা' নিয়েছে, তাতো আর ফিরিয়ে দিয়ে যাবে না?

শী। সে কি?

সা। স্বাধীনতা—অসভ্য কৃষ্ণকায় মীনজাতির সর্ব্বস্ব স্বাধীনতা।

শীলা নীরব, সাহুও নীরব। উভয়েই নীরবে বিভীষিকাময়ী প্রকৃতির ভৈরব গর্জ্জন শুনিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শীলা ধীরে মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"সাহু, সে কি কিছুতেই ক্ষমার যোগ্য হ'তে পারে না?"

"কিছুতেই না" গর্জ্জন করিয়া সাহু বলিল,—"কিছুতেই না। তোরে মিনতি করছি শীলা, আর আমায় কোন অনুরোধ করিস্ না। একবার তোরই অনুরোধে যে পাপ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতে দে। শীলা, শীলা, আবার বলছি, তারে ভুলে যা।"

"কিছুতেই না" ক্রুদ্ধা সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া শীলা বলিল,—"শুন সাহু, আমার জন্য যদি দেশের সর্ব্বনাশ হয়ে থাকে, আমি জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করব, কিন্তু তার পায়ে কাঁটাটি ফুটতে দিব না। সত্যই সাহু, আমার ভালবাসা দুর্ভেদ্য কবচের মত হয়ে মীনের ক্রোধ হ'তে—সাহুর প্রতিহিংসা হ'তে তারে রক্ষা করবে। পার—সাহস থাকে, হাতের বর্শা আমার বুকে বিঁধে দাও, না পার, প্রতিহিংসার আগুনে আপনিই পুড়ে মর।"

শীলা আর সেখানে দাঁড়াইল না, সগর্ব্ব পদক্ষেপে অন্ধকারবক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। সাহু একা নীরবে প্রস্তরখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। সংহারময়ী প্রকৃতি তাহাকে বেড়িয়া অট্ট অট্ট হাসিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মীনরাজ্য হস্তগত করিয়া পৃথ্বীরাজ যে তথায় ইচ্ছাপূর্ব্বক অত্যাচার বা কুশাসনের প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, তৎপরিবর্ত্তে বরং যাহাতে সর্ব্বত্র সুশাসন এবং সুবিচার প্রবর্ত্তিত হয়, অসভ্য মীনগণ কালে যাহাতে সভ্যগণের সমক্ষে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইতে পারে, এইরূপ চেষ্টাই করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থান, কাল এবং পাত্র ভেদে সুচেষ্টার ফলও অনেক স্থলে বিপরীত ভাব ধারণ করে, সদিচ্ছাও অসদিচ্ছা নামে অভিহিত হয়। পৃথ্বীরাজের চেষ্টার ফলও অনেকটা সেইরূপ হইল। সভ্য ও অসভ্যের ধর্ম্ম কর্ম্ম, যুক্তি, আচার ব্যবহার প্রভৃতি কখনই এক হইতে পারে না। সভ্য তুমি, যাহাকে সুন্দর বল, অসভ্য আমি—আমার দৃষ্টিতে সে কুৎসিৎ; তুমি যাহাতে সুখ ও শান্তি ভোগ কর, আমি তাহার মধ্যে কেবল দুঃখ ও অশান্তি দেখিতে পাই; তুমি যাহাকে ন্যায় বা ধর্ম্ম বল, আমি তাহাকে অন্যায় বা অধর্ম্ম বলি; তুমি যাহাকে সুশাসন মনে কর,আমি দেখি তাহা অত্যাচার বা অবিচারেরই নামান্তর। সুসভ্য শ্বেতদ্বীপবাসী লম্বগ্রীবা তাম্রকেশী বিড়ালাক্ষীকে সুন্দরী বলে, কিন্তু অসভ্য কৃষ্ণকায় ভারতবাসী কম্বুকণ্ঠা কৃষ্ণকুন্তলা পদ্মপলাশলোচনা ব্যতীত আর সকলকেই কুৎসিতা বলিয়া থাকে; সভ্য ইয়ুরোপ ঐহিক উন্নতিকেই সুখশান্তির নিকেতন গণ্য করে, অসভ্য ভারত পারলৌকিক উন্নতিকেই সুখশান্তির চরম জ্ঞান করিয়া থাকে; সভ্য শ্বেতাঙ্গপুঙ্গব কৃষ্ণাঙ্গের প্লীহা-বিদারণ ন্যায় বা ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া জানে, অসভ্য কৃষ্ণাঙ্গ এরূপ কার্য্যকে অন্যায় বা অধর্ম্ম বলিয়া চীৎকার করে। ইত্যাদি ইত্যাদি। জানি না কোন যুগে সভ্য ও অসভ্যের এই মতবৈষম্য বিচারবৈষম্য জ্ঞানবৈষম্য তিরোহিত হইবে কি না।

ঠিক এতটা মতবৈষম্য না থাকিলেও এই কারণেই কিন্তু পৃথ্বীরাজের সুশাসন প্রণালীকে অসভ্য মীনগণ সর্ব্বত্র সুশাসন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। সুতরাং শাসক ও শাসিতের মধ্যে, বিজেতা ও বিজিতের অন্তরে একটা বিরুদ্ধ-ভাবের আন্দোলন চলিতে লাগিল। স্বাধীন-প্রকৃতি মীনগণ সামান্য সামান্য কারণেই পরাধীনতার কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকিল, চিরাভ্যস্ত সংস্কারে একটু মাত্র বাধা পাইলেই কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু শান্ত সহিষ্ণু মীনজাতি আপনাদের সে কাতরতা প্রকাশ করিতে জানিত না, বা দেবাংশ-স্বরূপ রাজার বিরুদ্ধে একটী কথা বলিতেও সাহসী হইত না। পৃথ্বীরাজও

তাহাদের মর্ম্মব্যথা বুঝিতে পারিতেন না। সুতরাং রাজ্যমধ্যে অশান্তির একটা নীরব ছায়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও তাহার প্রতীকার হইত না। এই রূপেই পৃথ্বীরাজের শাসনকার্য্য চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এ ভাবে অধিক দিন আর চলিল না। নিয়তি তাঁহাকে অন্য কার্য্যের জন্য আর এক দিকে আহ্বান করিল।

সঙ্গসিংহ জনৈক ভীলের দ্বারা পৃথ্বীরাজের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা পৃথ্বীরাজের হস্তগত হইল। পত্রপাঠ করিয়া পৃথ্বীরাজ একটু চিন্তিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অল্প, তাহাতে মীন সৈন্যগণ সেরূপ সুশিক্ষিতও নহে; এই অশিক্ষিত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া শক্তিশালী পাঠানদিগকে জয় করা অসম্ভব। এ দিকে সুন্দরী তারার সাদর নিমন্ত্রণ—গৌরবের উচ্চ আহ্বান; তারা লিখিয়াছে—"দেব-কণ্ঠালিঙ্গনেচ্ছু কুসুমহার যদি দানব-কণ্ঠে বিলম্বিত হয়, তবে তাহাতে হারের বিশেষ অগৌরব নাই—দেবতারই কলঙ্ক।" কি মর্ম্মস্পর্শিনী উত্তেজনা! পৃথ্বীরাজ ভাবিলেন, যেমন করিয়াই হউক পাঠান-বিজয় করিতেই হইবে, এ অমূল্য বৈজয়ন্তীমালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইতেই হইবে।

উদ্যোগী পৃথ্বীরাজ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, তিনি পাঠান-বিজয়ের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ রাজ্যরক্ষার্থ রাখিলেন, অপর ভাগকে সঙ্গে লইতে মনস্থ করিলেন। তারপর রাজ্যের ব্যবস্থা। অনেক চিন্তার পর পৃথ্বীরাজ, মীনরাজবংশীয় এক ব্যক্তিকেই রাজপদে স্থাপন করিলেন। অবশ্য তিনি করদ রাজা হইলেন। জহ্নু প্রভৃতি অনুচরগণ রাজার পারিষদ শ্রেণীভুক্ত হইয়া রহিল। এই সকল ব্যবস্থা শেষ করিয়া পৃথ্বীরাজ সৈন্যগণের শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। অত্যল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু শিক্ষা সম্ভব, দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া পৃথ্বীরাজ সৈন্যদিগকে সেইরূপে শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। আহার নিদ্রা বিশ্রাম প্রভৃতি সমস্ত পরিহার করিয়া যাহাতে এই অল্প সংখ্যক সৈন্য দুর্দ্ধর্ষ পাঠানশক্তির সম্মুখীন হইতে পারে, তাহারই জন্য প্রাণপণ করিতে লাগিলেন। সৈন্যাবাসেই তাঁহার দিবারাত্রির অধিক সময় অতিবাহিত হইতে থাকিল। সর্ব্বদা সৈন্যগণের মধ্যে অবস্থান, তাহাদের ক্লেশ মোচনের এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের চেষ্টা, সকলের সহিত সমান প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার প্রভৃতি দ্বারা সৈন্যগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণে চেষ্টিত হইলেন। তাঁহার এ চেষ্টা বিফল হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই সৈন্যগণ

তাঁহার এতদূর অনুরক্ত হইয়া পড়িল যে, তাহারা তাঁহার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নহে। পৃথ্বীরাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তিনি বুঝিলেন, এই ভক্ত ও বিশ্বাসী মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া পাঠান কি ছার, সমগ্র রাজপুতানা জয় করাও অসম্ভব নহে। ভক্তি ও বিশ্বাসের এমনই মহিমা!

একদা সন্ধ্যাকালে পৃথ্বীরাজ সৈন্যাবাস হইতে রাজপুরীতে ফিরিতেছিলেন। সহসা পথিমধ্যে একস্থানে জনতা এবং জনসঙ্ঘের আর্ত্ত কোলাহল শুনিয়া ব্যাপার কি জানিতে উৎসুক হইলেন। চীৎকার করিতে করিতে পলায়মান এক ব্যক্তিকে সম্মুখে দেখিয়া তাহাকে ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সে কোন উত্তর করিল না, কেবল পশ্চাতে একবার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। পৃথ্বীরাজ বিস্মিত দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, এক বৃহৎকায় বন্য মহিষ জনসঙ্ঘকে পদদলিত করিতে করিতে তীরবেগে সেই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। পথিকেরা যে যেদিকে পারিতেছে, ছুটিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতেছে। যে ছুটিতে পারিতেছে না, সে দুরন্ত ক্ষিপ্ত মহিষের পদতলে বিমর্দ্দিত হইতেছে। চারিদিকে লোকেরা কোলাহল করিতেছে, কিন্তু ক্ষিপ্ত মহিষ তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া উন্মত্ত দানবের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। কেহই তাহার গতিরোধ করিতে সাহসী হইতেছে না।

পৃথ্বীরাজ দাঁড়াইয়া পড়িলেন, কিরূপে এই দুর্দ্দান্ত জন্তুকে নিবৃত্ত অথবা নিহত করা যায়, তাহা চিন্তা করিলেন। কিন্তু চিন্তার আর সময় হইল না; মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই দুরন্ত পশু তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তখন অসমসাহসী পৃথ্বীরাজ মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া রিক্তহস্তেই ভীমবিক্রমে সেই সাক্ষাৎ কৃতান্তরূপী মহিষের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলেন, এবং উভয়হস্তে তাহার বক্র শৃঙ্গদ্বয় চাপিয়া ধরিলেন। সমবেত জনমণ্ডলী ভয়ে বিস্ময়ে মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। এরূপে আকস্মিক বাধা প্রাপ্ত হইয়া উন্মত্ত মহিষও একবার স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে, ভীমগর্জ্জনে দিগন্ত কম্পিত করিয়া পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিল। সকলেই প্রমাদ গণিল; কিন্তু কেহই দুর্দ্দান্ত মহিষের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইল না। পৃথ্বীরাজও আপনার বিপদের গুরুত্ব অনুভব করিলেন; তথাপি শৃঙ্গদ্বয় ছাড়িলেন না, প্রাণপণ শক্তিতে তাহা ধরিয়া রহিলেন। কিন্তু এরূপে এই বলবান্ জন্তুকে কতক্ষণ রাখা যায়? আর এক মুহূর্ত্ত—এক মুহূর্ত্ত পরেই এই দুর্দ্দান্ত কৃতান্তবাহনের বজ্রসম শৃঙ্গাঘাতে পৃথ্বী-

রাজের দেহ বুঝি খণ্ড খণ্ড হইবে। কিন্তু তাহা হইল না; সহসা পশ্চাৎ হইতে একটা তীর সুকৌশলে সবেগে আসিয়া মহিষের ললাটে বিদ্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা, আবার একটা। তীরত্রয়ের ভীষণ আঘাতে দুরন্ত যম-কিঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে ভূশায়ী হইল। জনমণ্ডলী আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। পৃথ্বীরাজ দেখিলেন, কি অদ্ভুত শিক্ষা! কি আশ্চর্য্য শরচালনা-নৈপুণ্য! তাঁহাকে অক্ষত রাখিয়া এরূপ সুকৌশলে মহিষ-ললাট বিদ্ধ করিতে পারে, এমন সুকৌশলী ধানুষ্ক কে?

পৃথ্বীরাজ পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন; দেখিলেন, পশ্চাতে অদূরে এক মীন বালক তীরধনু হস্তে দণ্ডায়মান। পৃথ্বীরাজ তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। বালক আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"বালক, তোমার অপূর্ব্ব শিক্ষা দর্শনে আনন্দিত হইলাম। তোমা হইতে আজি আমার জীবন রক্ষা হইল। তুমি পুরস্কার প্রার্থনা কর।"

বালক সসম্ভ্রমে পুনরায় অভিবাদন করিয়া বিনীত স্বরে বলিল,—"প্রভুর জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছি ইহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।"

বালকের সরলতা ও মহত্ত্ব সন্দর্শনে পৃথ্বীরাজ মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন,—"না না, রাজপুত অকৃতজ্ঞ নয়, তোমার যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর।"

বালক একবার কাতর দৃষ্টিতে পৃথ্বীরাজের মুখের দিকে চাহিল। তারপর মুখ নত করিয়া বলিল,—"প্রভুর সেবায় জীবন পাত করি ইহাই আমার একান্ত বাসনা।"

পৃথ্বীরাজ দেখিলেন, বালকের ক্ষুদ্র মুখখানিতে কি সরলতা, কি সৌন্দর্য্য! কি মধুর দৃষ্টি, তাহা হইতে যেন ভক্তি ও প্রীতি উছলিয়া পড়িতেছে। বালকের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া পৃথ্বীরাজ তাহাকে স্বীয় পরিচারক-পদে নিযুক্ত করিলেন।

ইহার কয়েক দিন পরে পৃথ্বীরাজ সৈন্য সমভিব্যাহারে তোড়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে একবার শীলার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা হইল। রাজসিংহাসনে বসিয়া অবধি তিনি শীলার বড় একটা সংবাদ রাখেন নাই। এক্ষণে মীনরাজ্য ত্যাগ করিবার সময় তাহাকে দেখিতে, তাহার নিকট বিদায় লইতে ইচ্ছা হইল। কে জানে, আর এ জীবনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি না। কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও পৃথ্বীরাজ আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না। শুনিলেন সে পাগল হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহার উদ্দেশে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া পৃথ্বীরাজ চিরদিনের জন্য মীনরাজ্য ত্যাগ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"কি করলে সূর্য্যমল্ল?"

"সমস্তই প্রস্তুত।"

"সর্দ্দারেরা মত দিয়েছে?"

"সকলে নয়।"

"সৈন্য?"

"অধিকাংশই বশীভূত হয়েছে।"

"অর্থ?"

"তারও অভাব হবে না।"

"শুনে সন্তুষ্ট হ'লাম। এখন কি রূপে কার্য্য আরম্ভ করবে স্থির করেছ?"

"কিছুই স্থির করি নাই।"

"কেন?"

"বোধ হয় বিনা আয়াসেই কাজ সিদ্ধ হবে।"

"কিসে বুঝলে?"

"দেখ্‌ছি ঘটনা আমার অনুকূল।"

ঈষৎ হাসিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"কিন্তু আমি দেখছি, ঘটনা তোমার সম্পূর্ণ প্রতিকূল।"

বিস্মিত ভাবে সূর্য্যমল্ল বলিলেন,—"কিসে প্রতিকূল দেখ্‌লে?"

স। তুমি কিসে অনুকূল বুঝলে তাই আগে বল।

সূ। জয়মল্ল নিহত।

স। তারপর?

সূ। মহারাণা সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত।

স। আর?

সূ। আর কি? মহারাণার অবর্ত্তমানে আমিই একমাত্র সিংহাসনের অধিকারী।

স। পৃথ্বীরাজ থাকিতেও?

সূ। পৃথ্বীরাজ? পৃথ্বীরাজ কোথায়? সে তো নির্ব্বাসিত?

স। যে নির্ব্বাসিত, সে কি আর ফিরে আসতে পারে না?

সূ। মহারাণার আদেশ ব্যতীত আসতে পারে না।

স। মহারাণা যদি সে আদেশ দিয়ে থাকেন?

সূ। আদেশ দিয়েছেন? কৈ আমি তো কিছুই শুনি নাই?

স। তুমি শুন নাই বটে, কিন্তু আমি জানি, মহারাণা পৃথ্বীরাজের নিকট দূত প্রেরণ করেছেন।

সূ। দূত প্রেরণ করেছেন? তাকে আন্‌বার জন্য দূত প্রেরণ করেছেন?

স। তা' ছাড়া দূত পাঠাবার আর কি উদ্দেশ্য থাক্‌তে পারে।

সূর্য্যমল্লের মাথায় যেন সহসা আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাঁহার প্রফুল্ল মুখমণ্ডল বিষাদের ছায়ায় আবৃত হইল। তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিনী বলিলেন, —"কি ভাবছ সূর্য্যমল্ল?"

সূ। ভাবছি—সহসা মহারাণা কেন এরূপ করলেন।

স। হয় তো তিনি তোমার মনোভাব বুঝতে পেরেছেন।

সূ। আমার মনোভাব? আমার মনোভাব কিরূপে বুঝবেন?

স। হয়তো কেউ বুঝিয়ে দিয়েছে।

সূ। বুঝিয়ে দিয়েছে? এমন বিশ্বাসঘাতকতা কে করবে?

স। মনে কর, যদি আমিই করে থাকি?

বিস্মিত কণ্ঠে সূর্য্যমল্ল বলিলেন,—"তুমি? অসম্ভব।"

স্থিরস্বরে সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"কিছুই অসম্ভব নয় সূর্য্যমল্ল, সংসারে কিছুই অসম্ভব নয়।"

বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে সন্ন্যাসিনীর মুখের দিকে চাহিয়া সূর্য্যমল্ল বলিলেন,—"কি বলছ সন্ন্যাসিনি! তুমিই না আমায় এই ভীষণ ব্রতে দীক্ষিত করেছ?"

গম্ভীর কণ্ঠে সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"হাঁ, যেমন তোমায় এই কঠোর ব্রতে দীক্ষিত করেছি, তেমনই যাতে ভয়ে বা অন্য কোন কারণে তুমি ব্রতভঙ্গে সাহসী না হও, তারও উপায় করে রেখেছি।"

সূর্য্যমল্ল নীরব। সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"শুন সূর্য্যমল্ল, এখন তোমার সম্মুখে দুইটী মাত্র পথ। হয় বীরের ন্যায় অসি হস্তে পথের কণ্টক দূর ক'রে গৌরবের উচ্চ সিংহাসনে সমারূঢ় হও, নতুবা ভীরু জম্বুকের ন্যায় জন্মের মত চিতোর ত্যাগ করে, স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে অরণ্যবাসে পশু-জীবন যাপন কর। ইহা ভিন্ন তোমার আর অন্য পথ নাই।"

গর্জ্জন করিয়া সূর্য্যমল্ল বলিলেন,—"সন্ন্যাসিনি, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করলে।"

তীব্রস্বরে সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"তোমার ন্যায় নির্ব্বোধের নিকট ইহার অধিক আর কি প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করতে পারি।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সূর্য্যমল্ল বলিলেন,—"সত্যই আমি নির্ব্বোধ, নতুবা তোমার মত মায়াবিনীর মোহে মুগ্ধ হ'ব কেন? তুমি কখনই সন্ন্যাসিনী নও—মায়াবিনী।"

গম্ভীর স্বরে সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"না সূর্য্যমল্ল, আমি রমণী।"

সূ। রমণী কখনও এমন কাজ করতে পারে না।

স। প্রতিহিংসা-পরায়ণা রমণীর কোন কার্য্যই অসাধ্য নহে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সহসা যেন সন্ন্যাসিনীর নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল, ললাটের শিরা স্ফীত, করদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হইল। সূর্য্যমল্ল সবিস্ময়ে বলিলেন,—"সন্ন্যাসিনি! মায়াবিনি! তুমি কে?"

মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হইয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"আজ নয় সূর্য্যমল্ল, আর এক দিন বলব আমি কে, কোন্ মহাব্রত উদ্যাপনের জন্য আমি সন্ন্যাসিনী।"

ধীর-গম্ভীর পদবিক্ষেপে সন্ন্যাসিনী চলিয়া গেলেন। সূর্য্যমল্ল একা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সন্ন্যাসিনীর উক্তি যথার্থ, তাঁহার সম্মুখে এখন সত্যই দুইটী মাত্র পথ। যদি মহারাণা তাঁহার গুপ্ত ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই দুইটী ভিন্ন আর পথ নাই। সে দুইটী পথ—হয় বীরের ন্যায় অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হওয়া, অথবা কাপুরুষের মত চিতোর—কেবল চিতোর কেন, রাজস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন। দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়স্কর? দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধে মৃত্যুকে আলিঙ্গন, অথবা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা, উভয়ের মধ্যে কোন্ পথ প্রশস্ত? পলায়ন? ছি ছি, ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, বাপ্পারাওএর বংশধর হইয়া পলায়ন?—মৃত্যুর ভয়ে পলায়ন? কখনই না, এরূপে জীবন রক্ষা করা অপেক্ষা সম্মুখ সমরে জীবনদান অতি শ্রেয়ঃ। কিন্তু যদি মহারাণার নিকট এখনও ক্ষমা ভিক্ষা করি? না না—সেখানে প্রাণভয়ে ভীত সূর্য্যমল্লের ক্ষমা নাই। যিনি বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ পুত্রহন্তাকে জায়গীর দান করিতে পারেন, তিনি প্রাণভয়ে ক্ষমাপ্রার্থী সহোদরকে ক্ষমার পরিবর্ত্তে যে পদাঘাত করিবেন না তার নিশ্চয়তা কি? তবে মৃত্যু—মৃত্যুর হস্তে আত্মসমর্পণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। কিন্তু এত আশা এক আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া মৃত্যু—হায় মায়ারূপিণী সন্ন্যাসিনি, আমার সর্ব্বনাশ সাধনই কি তোমার ব্রত?

আশা ও নিরাশার যুগপৎ ঘাতপ্রতিঘাতে সূর্য্যমল্লের হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িল। তিনি গোধূলির ললাটে তিলকস্বরূপ পশ্চিমাকাশপটে প্রথমোদিত

নক্ষত্রটীর উপর স্থিরদৃষ্টি স্থাপন করিয়া নীরবে ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে ক্রমেই যেন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া আসিতে থাকিল; সেই উজ্জ্বল গোধূলির তারকাটী যেন আশার মোহনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিতে লাগিল। সূর্য্যমল্ল শুনিলেন, আশা যেন তাঁহার কাণে কাণে বলিতেছে, "চিন্তা কি? পৃথ্বীরাজের বাহু যে শোণিতের প্রভাবে প্রভাবশালী, সূর্য্যমল্লের বাহুতেও সেই বাপ্পারাওএর শোণিত-প্রবাহ বহমান; যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথ্বীরাজ বাহুবলে বলীয়ান্, সূর্য্যমল্লও সেই বীরকুলের সন্তান; তবে চিন্তা কি?" আশার সুরে সুর মিলাইয়া সূর্য্যমল্লও আপন মনে বলিয়া উঠিলেন,—"সত্যই তো, চিন্তা কি?"

ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

একটী চিত্র।

—•:+:•—

চাষার ছেলে হানিফ আলি—পুর গাঁয়ে বাস।
সুখে দুখে চল্‌তো সংসার দশ বিঘে ভুঁই চাষ।
দুই বছরের একটী ছেলে, পাঁচ বছরের মেয়ে,
যুবতী স্ত্রী—তিনটী প্রাণী ছিল তার মুখ চেয়ে।
হাল ছিল তার বলদ ছিল, সাহস ছিল বুকে,
সুখ ছিল তার শান্তি ছিল, হাসি ছিল মুখে।
খাট্‌তে তার ভর ছিল না, খাট্‌তো দিন রাত,
রোদ বৃষ্টি শীত গ্রীষ্মে ছিল না দৃক্‌পাত।
সারাদিন খেটে সাঁঝে আস্‌তো যখন ঘরে,
ভুলে যেত সকল কষ্ট খোকার মুখটী হেরে।
আধ আধ স্বরে খোকা ডাক্‌তো বাবা ব'লে;
ভাব্‌তো হানিফ, স্বরগ কোথা—স্বরগ তো তার কোলে।

পৌষ মাসে উঠ্‌তো যখন গোলাভরা ধান,
বল্‌তো হানিফ আমার মত কেবা ভাগ্যবান্‌!

দুইটী বছর হাজা শুকা উঠ্‌লো হাহাকার;
একে একে দেশের লোক সব যাচ্চে যমের দ্বার।
অর্দ্ধাশনে কাটায় দিন, তাও শেষে না পায়,
অনশন ব্রত করি' মুক্তি-পথে ধায়।
ঋণের দায়ে ঘটি বাটী হাল,গরু সব গেছে,
এক মুঠা চাল নাইক ঘরে কি খেয়ে প্রাণ বাঁচে?
মহাজন দেয় না ধার আর, ভিক্ষা নাহি মিলে।
ভাবে হানিফ—হায় খোদা একি কষ্ট দিলে?
জমিদারের খাজনা বাকী, নায়েব জুলুম করে,
পঞ্চায়েত চালের খড় টানে ট্যাক্সের তরে।
জ্বরবিকারে শুষ্‌ছে মেয়ে ঘরের মাঝে পড়ে;
পত্নী তার পাশে ব'সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।
দুধের ছেলে খোকা আমার, মুখের পানে চায়,
হায় গো খোদা, এতদিনে ফেল্‌লে একি দায়?

ছুটে এসে খোকা বলে বাপের গলা ধরি'—
'খেতে দাও বাবাগো পেটের জ্বালায় মরি।'
একটী থালা একটী ঘটী শেষের সম্বল আছে;
তাই নিয়ে ছুট্‌ল হানিফ মহাজনের কাছে।
চারটী আনা পেয়ে ফেরে উলসভরা বুকে,
তবু কিছু দিতে পারবে খোকার বাসি মুখে।
কিন্তু হায় গরীব যে তার কোথায় সুখ আছে?
জমিদারের পাইক এসে ধর্‌লে পথের মাঝে।
দু' বছরের খাজনা বাকী, অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে,
হুকুম দিলেন নায়েব—সিধে কর পয়জার দিয়ে।
ছেড়ে দিলে প্রহার দিয়ে, পয়সা নিয়ে কেড়ে;
পথে এসে হানিফ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে।

তখনো তার কাণের কাছে বাজ্‌ছে হা হা করি,—
'খেতে দাও বাবাগো পেটের জ্বালায় মরি!'
দুপুর রোদে উদাস বায়ু হু হু ছুটে যায়।
ছুটলো হানিফ দিশে হারা পাগলের প্রায়।

যাচ্ছিল এক 'স্বদেশ-সেবক' চাল পয়সা নিয়ে,
আছাড় খেয়ে পায়ে তার পড়্‌লো হানিফ গিয়ে।
স্বদেশ-সেবক যুবা তার দুঃখের কথা শুনে,
দুই সের চাল আটি পয়সা দিল তারে গুণে।
চাল পয়সা নিয়ে হানিফ ফিরলো যখন ঘরে,
সুয্যিমামা ডুবু ডুবু মাঠের পর পারে।
ছুটে এল খোকা অম্‌নি বাবা বাবা ব'লে,
শুক্‌না চালই এক মুঠা দিতে গেল গালে।
এমন সময় যমদুতের মত কোথা হ'তে,
উপস্থিত পঞ্চায়েত, চৌকিদার সাথে।
দেখে তাদের হানিফের উড়ে গেল প্রাণ;
কাপড়ের চাল ধরে চৌকিদার দিল টান।
খোকার হাতের চালগুলিও দিল না সে ছেড়ে,
পঞ্চায়েত তার পয়সা ক'টী নিল জোরে কেড়ে।
পায়ে প'ড়ে বলে হানিফ, ওগো ফিরে চাও,
এক মুঠা চাল দিয়ে আমার খোকার প্রাণ বাঁচাও।
সে কথায় কি গলে সভ্য পঞ্চায়েতের প্রাণ?
চাল পয়সা নিয়ে হেসে করিল প্রস্থান।
ভাবে হানিফ, হায় খোদা, এরা কি মানুষ নয়?
এমনি ক'রে মুখের গরাস কেড়ে নিতে হয়?
হায় হানিফ! কি বুঝবে তুমি সভ্যতার লীলা?
মানুষ যে হয়, সভ্য সে নয়, এ এক নূতন খেলা।

তার পর কি হ'লো আর শুন্‌তে যদি চাও,
সভ্য যদি না হও, আগে কাণে আঙুল দাও।

সকাল বেলা উঠে দেখে যত প্রতিবাসী,
গাছের ডালে ঝুল্‌ছে হানিফ গলায় দিয়ে ফাঁসি।
মুণ্ডুকাটা খোকা ঐ উঠানে আছে প'ড়ে ;
স্ত্রী কাঁদ্‌ছে মেয়ের মরা দেহ কোলে করে।
পুলিস এল, ছুট্‌লো রিপোর্ট হাকিমের সদরে,
সব গোলমাল চুকে গেল তিন দিনের ভিতরে।

* * * *

এম্‌নি ধারা কত হানিফ বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে,
গাছের ডালে নিত্য ঝুলে, কে তার খোঁজ করে ?

শ্রীমতী লবঙ্গলতা দেবী।

জ্যোতিষ রহস্য।

(ত্রয়োদশ প্রস্তাব।)

প্রকাশাদি পঞ্চ প্রকার গ্রহ—রবি ও চন্দ্র প্রকাশ গ্রহ। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র ইহারা শুভ গ্রহ। ক্ষীণচন্দ্র (কৃষ্ণাষ্টমীর শেষার্দ্ধ হইতে শুক্লাষ্টমীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত সময়ের যে চন্দ্র তাহাকে ক্ষীণচন্দ্র কহে), শনি, রবি, মঙ্গল, রাহু ও কেতু এবং এই সকল গ্রহের অন্যতম গ্রহযুক্ত বুধ অশুভ বা পাপ গ্রহ। কথিত শুভ গ্রহের মধ্যে বৃহস্পতি ও শুক্র অতিশয় শুভ গ্রহ। আর পাপ গ্রহের মধ্যে শনি এবং মঙ্গল অতিশয় অশুভ গ্রহ বলিয়া নির্ণীত আছে।

চন্দ্র সম্বন্ধে বিশেষ কথা—শুক্লা প্রতিপদ্‌ তিথি হইতে দশমী তিথি পর্য্যন্ত চন্দ্রগ্রহ মধ্য বলী সু রাং মধ্যম ফলদাতা। শুক্লপক্ষের একাদশী তিথি হইতে কৃষ্ণ পক্ষের পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত চন্দ্র পূর্ণ বলী ও শুভফলদাতা। কৃষ্ণ পক্ষের ষষ্ঠী তিথি হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত চন্দ্রগ্রহ হীনবলী ও অশুভ ফলপ্রদ। শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, চন্দ্র সর্ব্বদাই শুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। বুধগ্রহ ক্ষীণ চন্দ্রের সহিত যুক্ত হইলে পাপ-সংজ্ঞায় অভিহিত হয় না।

শুষ্কাদি গ্রহ—রবি, মঙ্গল এবং শনি এই তিনটী গ্রহ শুষ্ক গ্রহ বলিয়া কথিত। চন্দ্র ও শুক্র এই দুইটী গ্রহ সজল গ্রহ বলিয়া খ্যাত। বুধ ও বৃহস্পতি

এই দুই গ্রহ জলরাশি গত হইলে সজল গ্রহ হয়। শুষ্ক গ্রহের দশায় শরীর শুষ্ক এবং সজল গ্রহের দশা ভোগকালে মানবের দেহ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

কাল পুরুষের আত্মাদি নির্ণয়—রবি গ্রহ কাল পুরুষের আত্মা; চন্দ্র—মনঃ; মঙ্গল—শক্তি; বুধ—বাক্য; বৃহস্পতি—জ্ঞান ও সুখ; শুক্র কাম; এবং শনি গ্রহ দুঃখ বলিয়া কথিত আছে। রাহু কাল পুরুষের ঐশ্বর্য্য এবং মুখ, নাভি ও পদতল বলিয়া পরাশর সংহিতায় লিখিত আছে।

গ্রহগণের নৃপাদি সংজ্ঞা—রবি ও চন্দ্র কাল পুরুষ-রাজ্যের রাজা; মঙ্গল গ্রহ কাল পুরুষ-রাজ্যের সেনাপতি; বুধ যুবরাজ; বৃহস্পতি ও শুক্র, এই দুই গ্রহ, অমাত্য; শনি গ্রহ ভৃত্য। রাহু ও কেতু সেনাপতি বলিয়া পরাশর সংহিতায় উক্ত হইয়াছে। মানবগণের ফলাফল বিচারে এই সকল বিষয়ের আবশ্যক হইয়া থাকে। জন্মকালে যে গ্রহ বলবান ও অনুকূল থাকে, জাতক সেই রূপ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। লগ্নাদি দ্বাদশ ভাবের মধ্যে চন্দ্র যে ভাবে থাকে ও যে ভাবকে দেখে, জাতকের মনে সেই সেই ভাবফলের চিন্তা উদিত হইয়া থাকে।

বিনষ্টাদি গ্রহ—ক্রুর-দৃষ্ট, ক্রূরযুক্ত বা ক্রূরাক্রান্ত অথবা বিরশ্মিক প্রপন্ন যে গ্রহ, তাহাকে বিনষ্ট গ্রহ কহে। রবি ও চন্দ্র এই দুই গ্রহ রাহুক্রান্ত হইলে বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং ক্রূর গ্রহ-যুদ্ধে জিত গ্রহকেও বিনষ্ট গ্রহ কহে। ক্রূরদৃষ্ট হইয়া যে গ্রহ পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহাকে ক্রূরদৃষ্ট গ্রহ কহে। পাপগ্রহের সহিত এক রাশিতে যুক্ত গ্রহকে ক্রূরযুক্ত গ্রহ কহে। এক রাশি অথচ একাংশে পাপ গ্রহের সহিত যুক্ত গ্রহকে ক্রূরাক্রান্ত গ্রহ বলে। রবি গ্রহের মধ্যগত যে গ্রহ, সেই গ্রহকে বিরশ্মিক প্রপন্ন অর্থাৎ অস্তগত গ্রহ কহে। বিনষ্ট গ্রহগণ সর্ব্বদাই অশুভ ফলের সূচক, ইহা "চণ্ডেশ্বরঃ" গ্রন্থে লিখিত আছে।

অঙ্গাধিকার—জাতকের মস্তক ও মুখে রবিগ্রহের অধিকার, এই নিমিত্ত প্রতিকূল রবির দশায় ঐ সকল স্থানে পীড়াদি হইয়া থাকে। বক্ষঃ ও কণ্ঠে চন্দ্রের অধিকার বলিয়া প্রতিকূল চন্দ্রের দশায় উক্ত অঙ্গে পীড়াদি হইয়া থাকে। পৃষ্ঠ ও উদরে মঙ্গলের অধিকার, হস্ত ও পদে বুধের অধিকার; কটি ও জঘন দেশে বৃহস্পতির অধিকার; কোষ ও গুহ্যে শুক্রের অধিকার; জানু ও উরুদেশে শনির অধিকার। যে যে গ্রহ যে যে অঙ্গের অধিপতি, সেই সেই গ্রহ প্রতিকূল হইলে, তাহাদের দশা ভোগকালে জাতকের সেই সেই অঙ্গে পীড়াদি হইয়া থাকে।

রোগের সূচক—রবি প্রভৃতি গ্রহগণ স্বীয় স্বীয় দশা এবং অন্তর্দ্দশায় যে যে রোগের সূচক হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে লিখিত হইল। পাঠকগণ ফল মিলাইয়া লইবেন। রবি গ্রহের ব্যাধিঃ—শিরঃপীড়া, বিষজরোগ, মেহ, দাহকজ্বর, হৃৎকম্প, অস্থিগতরোগ বা অস্থিভঙ্গ, রক্তদূষিতরোগ, সন্দিগরমী, মরক, ক্ষত, বিসূচিকা। চন্দ্রের ব্যাধিঃ—পাক্ষিকজ্বর, কোষবৃদ্ধি, কাস, গণ্ডমালা গলগণ্ড, সর্দ্দি, হাঁপানি, রক্তদূষিত, হৃদ্‌রোগ, জলোদরী, ক্ষয়কাশ, শূল, কণ্ডুরোগ, গোদ, উদরাময়, মূত্রাশয়ের পীড়া, ক্ষয়রোগ। মঙ্গলের ব্যাধিঃ—রক্ত পিত্তাদি, মেহ, অস্থিভঙ্গ, রক্তদূষিত, গুল্ম, হাম, বসন্ত, ক্ষতব্রণ, অর্শ, ভগন্দর, দদ্রু, মজ্জাদূষিত, রক্তামাশয়, রক্তস্রাব, দন্তশূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, পিত্ত বিকৃতি, অস্ত্রাঘাত, দহন ও দাহক জ্বর। বুধের ব্যাধিঃ—অজীর্ণ, মৃগি, জিহ্বারোগ, ত্বক্‌দূষিত, ক্ষিপ্ততা, ঘূর্ণরোগ, বাক্যরোধ, স্মরণশক্তির হীনতা, বমন রোগ। বৃহস্পতির ব্যাধিঃ—শ্বাসকাস, তালুরোগ, চর্ম্মদূষিত, যকৃত, সন্ন্যাস, বমন, উদরাময়, সর্দ্দি, কণ্ঠস্বরবেদনা। শুক্রের ব্যাধিঃ—মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র, মেহ, বীর্য্যহীনতা, উপদংশ, সকলপ্রকার কুৎসিতব্যাধি, অণ্ডকোষ বৃদ্ধি, অন্তর্বৃদ্ধি, গর্ভাশয়ের রোগ। শনির ব্যাধি যথাঃ—বাতোদরী, যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত, হস্তপদাদি কম্পন, দেহকম্পন, বায়ুরোগ, কৃমিরোগ, স্নায়ুরোগ, বধিরতা, প্লীহা, শ্বাসযন্ত্রের রোগ, বাতগুল্ম, হিক্কা ইত্যাদি। রাহু ও কেতু এই দুইটী গ্রহ যে যে গ্রহ-দৃষ্ট হয় বা যুক্ত হয়, অথবা যে গ্রহের ক্ষেত্রস্থ হয়, সেই গ্রহের রোগ ও বাত, বাতগুল্মাদি, উদরাময় এবং কৃমিরোগপ্রদ হইয়া থাকে।

গ্রহগণের উচ্চ রাশি—মেষ রাশি রবিগ্রহের উচ্চ স্থান বা রাশি। এই রাশির এক হইতে ১০ দশ পর্য্যন্ত রবির উচ্চ বা তুঙ্গ স্থান। ঐ দশ অংশের শেষ দশমাংশকে রবির সূচ্চ বা সুতুঙ্গ কহে। বৃষ রাশি চন্দ্রের উচ্চ স্থান বা রাশি। বৃষের তিন অংশ পর্য্যন্ত চন্দ্রের উচ্চ এবং শেষ তৃতীয়াংশ সূচ্চ। মকর রাশি মঙ্গলের উচ্চ রাশি। ঐ রাশির শেষ অষ্টাবিংশতি অংশই মেষের সূচ্চ। কন্যা রাশি বুধের উচ্চ স্থান। ঐ রাশির ১৫ অংশ পর্য্যন্ত বুধের উচ্চ স্থান। উহার শেষ পঞ্চদশ অংশই বুধ গ্রহের সূচ্চ। কর্কট রাশি বৃহস্পতির উচ্চ রাশি। ঐ রাশির পাঁচ অংশ পর্য্যন্ত বৃহস্পতির উচ্চ স্থান। তন্মধ্যে শেষ পঞ্চমাংশই বৃহস্পতির সূচ্চ বা সুতুঙ্গ। মীনরাশি শুক্রের তুঙ্গস্থান। মীনের ২৭ অংশ পর্য্যন্ত শুক্রের উচ্চস্থান। মীনের শেষ সপ্তবিংশতি অংশই সূচ্চ স্থান। তুলা রাশি শনির উচ্চ রাশি। ঐ রাশির ২০ অংশ পর্য্যন্ত শনির তুঙ্গ। তন্মধ্যে

ঐ রাশির শেষ বিংশতি অংশই শনির সুচ্চ স্থান। মিথুন রাশি রাহুর উচ্চ রাশি। মিথুনের ২০ অংশ রাহুর উচ্চ স্থান। তন্মধ্যে শেষ বিংশতি অংশই রাহুর সুতুঙ্গ। ধনু রাশি কেতুর উচ্চ রাশি। ধনুর ৬ অংশ কেতুর তুঙ্গ। শেষ ষষ্ঠাংশই কেতুর সুতুঙ্গ স্থান বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে।'

গ্রহগণের নীচ রাশি—তুলা রাশি রবি গ্রহের নীচস্থান। তুলার ১০ অংশ রবির নীচ স্থান। তন্মধ্যে শেষ দশমাংশই রবির সুনীচ স্থান। বৃশ্চিক রাশি চন্দ্র গ্রহের নীচ রাশি। বিছার ৩ অংশ চন্দ্রের নীচ স্থান। তন্মধ্যে শেষ তৃতীয়াংশ চন্দ্র গ্রহের সুনীচাংশ। মীন রাশি বুধগ্রহের নীচ রাশি। মীনের ১৫ অংশ বুধের নীচ স্থান। তন্মধ্যে শেষ পঞ্চদশাংশই বুধের সুনীচ স্থান। মকর রাশি বৃহস্পতি গ্রহের নীচ রাশি। মকরের ৫ অংশ বৃহস্পতির নীচ স্থান। ঐ রাশির শেষ পঞ্চমাংশই বৃহস্পতির সুনীচাংশ। কন্যা রাশি শুক্রের নীচ রাশি। কন্যার ২৭ অংশ শুক্রের নীচ স্থান। কন্যার শেষ সপ্তবিংশতি অংশই শুক্রের সুনীচাংশ। মেষ রাশি শনির নীচ রাশি। মেষের ২০ অংশ শনির নীচ স্থান। মেষের শেষ বিংশতি অংশই শনির সুনীচ স্থান। ধনু রাশি রাহুর নীচ রাশি। ধনুর ২০ অংশ রাহুর নীচ স্থান। তাহার মধ্যে ঐ ধনু রাশির শেষ বিংশতি অংশই রাহুর সুনীচ স্থান। মিথুন রাশি কেতুর নীচ রাশি। মিথুনের ৬ অংশ কেতুর নীচ স্থান। ঐ মিথুন রাশির শেষ ষষ্ঠাংশই কেতুর সুনীচ স্থান বলিয়া কথিত আছে।

ক্ষেত্র—রবির ক্ষেত্র সিংহ রাশি। চন্দ্রের ক্ষেত্র কর্কট রাশি। মঙ্গলের ক্ষেত্র মেষ ও বিছা এই দুই রাশি। বুধের ক্ষেত্র মিথুন ও কন্যা এই দুই রাশি। বৃহস্পতির ক্ষেত্র ধনু ও মীন রাশি। শুক্রের ক্ষেত্র বৃষ ও তুলা রাশি। শনির ক্ষেত্র মকর ও কুম্ভ এই দুই রাশি।

মূল ত্রিকোণ—রবির মূল ত্রিকোণ সিংহ রাশি। চন্দ্রের মূল ত্রিকোণ বৃষ রাশি। মঙ্গলের মূল ত্রিকোণ মেষ রাশি। বুধের মূল ত্রিকোণ কন্যা রাশি। বৃহস্পতির মূল ত্রিকোণ ধনু রাশি। শুক্রের মূল ত্রিকোণ কুম্ভ রাশি।

গ্রহগণ উচ্চরাশিগত হইলে অত্যন্ত বলবান হয়। স্বক্ষেত্রে থাকিলে বলবান হয়। মূল ত্রিকোণগত হইলে আনন্দযুক্ত হয়। নীচরাশিগত হইলে বলহীন হয়।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, জ্যোতিঃশেখর।

সমস্যা।

—:০:—

সময়টা বড়ই মন্দ পড়িয়াছে; রাজা ও প্রজা উভয়ের সমক্ষেই একটা বিরাট্ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। কি উপায়ে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহা কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দেশমধ্যে যে একটা অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইতেছে, তাহাকে নির্ব্বাপিত করিবার জন্য রাজপুরুষগণ প্রাণপণ করিতেছেন, কঠোর হইতে কঠোরতর শাসননীতি অবলম্বন করিয়া এই অসন্তোষের বীজটুকুর উৎপাটনে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের এই প্রাণান্ত চেষ্টা, বহ্নির নির্ব্বাণের কারণ না হইয়া ফুৎকারেরই কার্য্য করিতেছে। তদ্দর্শনে তাঁহারা ক্রমেই অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছেন। এই অধীরতার ফলে ক্ষুদ্র অসন্তোষ-বহ্নি ক্রমেই বহুব্যাপী হইয়া উঠিতেছে। এ দিকে প্রজাবৃন্দও কিছুতেই বুঝাইতে পারিতেছে না যে, তাহারা এই অসন্তোষের মূল কারণ নহে; শান্তিপূর্ণ ভারতে অশান্তির দাবানল জ্বালাইয়া তাহাতে তাহারা পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়া মরিতে ইচ্ছুক নয়, ব্রিটিশ শাসনের শান্তিতরুর সুশীতল ছায়াই তাহাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়। নরদেবতা রাজার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিয়া ভারতের পবিত্র ইতিহাসে কলঙ্কের—দুষ্কৃতির মসীময় চিত্র অঙ্কিত করিতে তাহারা নিতান্তই অনিচ্ছুক। তথাপি রাজপুরুষগণ বা কতিপয় নেটিভবিদ্বেষী সংবাদপত্র সম্পাদক যে ভারতে রাজদ্রোহের ভাবী ভীষণ চিত্র কল্পনায় আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা অসর্পভূত অজ্জুতে সর্পভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কিন্তু দেশবাসী কিছুতেই রাজপুরুষদের এই ভ্রম অপনোদন করিতে পারিতেছে না। তাই তাহাদের জন্য রেগুলেসন লাঠির সৃষ্টি হইয়াছে, পিউনিটিভ পুলিসের গুরুভার আসিয়া স্কন্ধে পড়িয়াছে, ১২৪ ক ধারাটা এতদিনের পর আবার জাগিয়া উঠিয়াছে; দুর্ব্বলের উপর বলবানের—বিজিতের উপর বিজেতার ইচ্ছা শক্তি কি ভাবে কার্য্য করিতে পারে, তাহার নিত্য নূতন দৃশ্য প্রকটিত হইয়া তাহাদিগকে ভীত বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিতেছে।

সর্ব্বাপেক্ষা যে একটা অত্যদ্ভুত চিত্র সম্প্রতি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহা ভারতবাসীর চিন্তার অতীত, ধারণার অতীত, কল্পনার অতীত। তাই তাহারা

মজঃফরপুরের বোমার কাণ্ড দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে; আর চিন্তাশীল মনস্বিবর্গকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছে—কেন এমন হইল?

বাস্তবিক, বর্ত্তমান ব্যাপার দেখিয়া সকলেরই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, কেন এমন হইল? বাঙ্গালী—সহস্র বৎসরের পরাধীন শান্তশিষ্ট নিরীহ বাঙ্গালী এমন অশান্ত অসহিষ্ণু হইল কেন? যাহারা বিদেশীয়ের ভ্রূকুটীমাত্র দর্শনে শতপদ পশ্চাতে সরিয়া যায়, পুলীসের লালপাগড়ী দেখিলে গৃহকোণ আশ্রয় করে, বর্ণপরিচয়ের সুবোধ গোপাল হইতে মেকলে-প্রমুখ মনীষিবর্গের গবেষণাপূর্ণ আলোচনা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই যাহারা ভীরু কাপুরুষ প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত, তাহারা এমন দুঃসাহসিক ভীষণ কার্য্যে অগ্রসর হইল কেন? যাহাদের শাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে—"অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ", যাহাদের নীতি গ্রন্থ শিক্ষা দিতেছে—"শৃঙ্গিনং দশহস্তেন", তাহাদের হৃদয়ে এরূপ জিঘাংসা প্রবৃত্তির উদয় হইল কি জন্য? লোহার ছুরিটী পর্য্যন্ত হাতে দেখিলে যাহাদের আত্মীয় স্বজন যাদুর হাত কাটিবার ভয়ে ভীত হন, এবং যাদু দৈবাৎ পড়িয়া গেলে আহা আহা শব্দের সহিত তৎস্থানীয় মৃত্তিকার উপর বহুতর দোষারোপ বর্ষিত হইতে থাকে, তাহারা এরূপ ভীষণ মৃত্যুক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল কোন্ সাহসে? যাহারা কেবল মরিতে জানে, এবং সহস্র বৎসর মরিয়াই আসিতেছে, তাহারা আবার মারিতে শিখিল কোথা হইতে? ক্ষুদ্র পতঙ্গ বহ্নিমুখবিবিক্ষু হইলে কি জন্য?

কেন তাহা সর্ব্বান্তর্যামী বিশ্ববিধাতাই বলিতে পারেন। তবে আমাদের মনে হয়, যদি লর্ড কর্জ্জনের ন্যায় শাসনকর্ত্তা এ দেশে না আসিতেন, যদি দুর্ব্বল ভারতবাসীর আর্ত্ত চীৎকারকে ফেরুপালের চীৎকারজ্ঞানে বঙ্গবিভাগ কার্য্যটা এমন জেদের সহিত এত শীঘ্র সম্পন্ন করা না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় আজি এই বিরাট্ সমস্যার মধ্যে পড়িয়া রাজা প্রজাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না। রাজ-পুরুষগণ যদি কেবল জেদ (Prestige) বজায় রাখিতে গিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মমার্গ হইতে বিচ্যুত না হইতেন, তাহা হইলে আজি বোধ হয় রেগুলেসন লাঠী, পিউ-নিটিভ পুলিস প্রভৃতির প্রয়োজন হইত না, এবং বর্ত্তমানে কঠোর শাসননীতির উদ্ভাবনায় তাঁহাদিগকে মস্তিষ্ক চালনা করিয়া ক্লান্ত হইতে হইত না। তাহা হইলে বর্ত্তমান অশান্তির চিত্র আরও সহস্র বৎসর পরেও ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিত কি না সন্দেহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনাদের বুঝি-বার দোষে রাজপুরুষগণ শান্ত ভারতে স্বহস্তে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন, সেই অগ্নিতে তাঁহারাই আজি দুর্ভাগ্য ভারতকে দগ্ধ করিতে সমুৎসুক। ভারত

চিরদিন সহিয়াই আসিতেছে, আজিও সে ইহা নীরবেই সহ্য করিবে। যে দুর্ব্বল, সহিষ্ণুতাই তাহার ধর্ম্ম।

রাজপুরুষগণের উপেক্ষা ও কঠোরতা দর্শনে কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি যুবক যে ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে,, অকারণে দুইটী সম্ভ্রান্ত মহিলার জীবন নাশ করিয়া ভারতের মস্তকে যে কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছে, কেহ কেহ তাহাকে জাতীয় সমষ্টিশক্তির উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, ইহা ব্যষ্টি শক্তির সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। সুতরাং এজন্য যাঁহারা সমগ্র বাঙ্গালার স্কন্ধেই দোষের ভার চাপাইতেছেন এবং তজ্জন্য বাঙ্গালী মাত্রকেই ফাঁসীকাষ্ঠে বিলম্বিত করিতে উপদেশ দিতেছেন, বাঙ্গালার অর্থে দেহ-পোষণ করিয়া এক্ষণে বাঙ্গালীর রক্তপানে সমুদ্যত হইতেছেন, প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে সেই সকল সংবাদপত্র-সম্পাদক ধুরন্ধরেরাই এই বিভ্রাটের জন্য সম্পূর্ণ দোষী। তাঁহারাই ধর্ম্মভীরু শান্ত বাঙ্গালীর হৃদয়ে এই জিঘাংসা প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিয়াছেন।

এই সকল ধনুর্দ্ধরেরাই তো এত দিন ধরিয়া দেশ বিদেশের অশান্তির বার্ত্তা প্রচার করিয়া এদেশে অশান্তির বীজ বপন করিয়াছেন। কোথায় কোন্ সুদূর সাগরপারে এনার্কিষ্ট (Anarchist) দলের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্য কি, কোথায় তাহারা কি ভাবে কার্য্য করিতেছে, কিরূপে বোমার আঘাতে রাজা বা রাজপুরুষের প্রাণনাশ করিয়াছে, ইত্যাদি অনাবশ্যকীয় অযাচিত সংবাদ প্রচার করিয়া ইঁহারাই তো শান্ত শিষ্ট ভারতবাসীর হৃদয়ে রক্ত-পিপাসা—আকাঙ্ক্ষার বহ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছেন? ইঁহাদের জীবিকার্থ প্রচারিত সংবাদই তো আজি অলর্ক-বিষের ন্যায় ভারতের শরীরে কার্য্য করিতেছে। সুতরাং দেশের বর্ত্তমান অবস্থার নিমিত্ত ইহারা কি কিছুমাত্র দায়ী বা দোষী নহেন? আজি যে ইঁহারা গবর্ণমেণ্টের অকৃত্রিম সুহৃদ্‌রূপে ভারতবাসীকে ধ্বংসের মুখে প্রেরণ করিবার জন্য 'সৎপরামর্শ' দান করিতেছেন, ইহা কি চোরকে চুরি করিতে উপদেশ দিয়া গৃহস্থকে সতর্ক হইতে বলা নহে? এই সকল মহাত্মা কেবল প্রজার নহে, রাজারও পরম বৈরী।

আমাদিগের বিশ্বাস, সুযোগ্য গবর্ণমেণ্ট এই সকল শত্রুরূপী মিত্রের অযাচিত উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া ধীর ও স্থির ভাবে কার্য্য করিবেন; এবং বর্ত্তমান অশান্তির মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সুবিজ্ঞতার ও সুশাসনের পরিচয় দিবেন। কঠোর শাসননীতি সর্ব্বত্র সুফলপ্রসূ হয় না। ইহা সাময়িক কিঞ্চিৎ সুফলপ্রদ

হইলেও ভবিষ্যতে যে একটা বিপরীত ফল প্রদান করে, বর্ত্তমান ঘটনাই তাহার সাক্ষী। এই অসন্তোষ-বহ্নি যাহাতে সত্বর নির্ব্বাপিত হইয়া রাজা ও প্রজার মধ্যে পুনঃ সদ্ভাব সংস্থাপিত করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কুঠোর শাসন নীতি মানুষের হস্তপদাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপরই প্রভুত্ব করিতে পারে, কিন্তু হৃদয়কে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় না। অধিকন্তু গৃহের এক পার্শ্বে আগুন লাগিলে ফুৎকার প্রদানে তাহাকে বহুব্যাপী করা কখনই বিজ্ঞজনানুমোদিত হইতে পারে না।

এ সময়ে রাজারও যেমন একটা কর্ত্তব্য আছে, প্রজারও তেমনই অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্য রহিয়াছে। যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে সকল দিক্ দেখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। যাঁহাদের একটী মাত্র অঙ্গুলি-সঙ্কেতের উপর আমাদের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদিগের সম্মুখে বৃথা স্পর্দ্ধা প্রকাশ বাতুলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আত্মশক্তির অতীত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা আর প্রজ্বলিত-হুতাশনে ঝম্প প্রদান একই কথা। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, উচ্ছৃঙ্খলতা উন্নতির সোপান নহে—অন্তরায়; এবং হঠকারিতায় শক্তির পোষণ হয় না, অপচয়ই হয়।

শিখগুরু।

—————:*:—————

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হর গোবিন্দ।

পিতা অর্জ্জুন মল মোগলের অত্যাচারে দেহ ত্যাগ করিলে হরগোবিন্দ ষষ্ঠ গুরুরূপে বরিত হইলেন। * তিনিই শিখ-সম্প্রদায়কে বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত

* অর্জ্জুন মলের দ্বিতীয় ভ্রাতা পৃথ্বীচাঁদ এই সময় গদি আরোহণের জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু শিখেরা তাঁহাকে চাঁদুশাহের সঙ্গী ও বন্ধু ভাবিয়া গুরু করিতে অস্বীকৃত হয়। পৃথ্বীচাঁদ, হরগোবিন্দ ও তাঁহার বংশের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁহার বংশধরেরাও গুরুদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন থাকায় গোবিন্দ সিংহ পরে এই বংশকে শিখসমাজচ্যুত করিয়াছিলেন। শুনা যায়, পৃথ্বীচাঁদ পিতা রামদাসের মৃত্যুর পর অর্জ্জুনের নিকট হইতে গুরুপদ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেবারও শিখদের চেষ্টায় তাঁহার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছিল।

করেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে শিখেরা ধর্ম্মভীরু ঈশ্বরভক্ত সম্প্রদায় ছিল। বাবা নানক তাহাদিগকে যুদ্ধকার্য্য হইতে বিরত হইবার উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা ত নানকের কাল নয়। এখন এই ক্ষুদ্র শিখসম্প্রদায়ের উপর মোগল-রাজের প্রখর দৃষ্টি পড়িয়াছে; যাহাতে এ সম্প্রদায় বৃদ্ধি না পায়, তাহাই এখন মোগলদের একান্ত চেষ্টা। মোগলহস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে হইলে এখন আর তাহা কেবল ঈশ্বরসেবায় হইবে না—ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ বিদ্যারও প্রয়োজন। তাই হরগোবিন্দ শিখদিগকে সামরিক বিদ্যায় বিভূষিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

হরগোবিন্দ যখন গুরুপদ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার বয়স একাদশ বর্ষমাত্র। এই বয়সেই তিনি আপনার ভাবী উন্নতির যথেষ্ট পরিচয় দেন। তিনি অতি তেজস্বী ছিলেন। পিতার মৃত্যুতে তাঁহার হৃদয়ে যে ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়াছিল, তাহা তিনি আর নিবাইতে পারেন নাই। সারা জীবন ঐ অগ্নির পূজা করিয়া তিনি শিখ-ইতিহাসে মহতী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

চাঁদু শাহের চক্রান্তে অর্জ্জুনের কারাবাস ও পরিণামে মৃত্যু হয়। তাই হর-গোবিন্দের সর্ব্ব প্রথম চেষ্টা হইল, চাঁদুশাহের নিপাত সাধন। বর্ষৈক মধ্যে তিনি চাঁদুশাহকে এ মরধাম হইতে দূর করিয়া দিলেন। * এই প্রসঙ্গে শুনিতে পাওয়া যায়, গুরু গদি আরোহণ করিলে তাঁহার কটিদেশে সর্ব্বদা দুইখানি তর-বারি ঝুলিত। কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিতেন—'একটি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য এবং অপরটি ভারত হইতে মহম্মদীয় ধর্ম্ম দূর করিবার জন্য ধারণ করিয়াছি। †

হরগোবিন্দের আশ্রয়-প্রার্থী হইয়া যে কেহ আসিত, সেই তাঁহার নিকট আশ্রয় পাইত। এইরূপে অনেক অপরাধী ও পলাতক তাঁহার শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার আস্তাবলে অষ্টশত যুদ্ধাশ্ব সর্ব্বদা বাঁধা থাকিত; তিনশত অশ্বারোহী সৈন্য সর্ব্বদা তাঁহার সহিত ঘুরিত, এবং ষাটজন বন্দুকধারী তাঁহার

* চাঁদুশাহের হত্যা সম্বন্ধে নানারূপ মত দেখা যায়। কেহ বলেন যে, হর কৌশলে জাহাঙ্গীরকে দিয়া চাঁদুকে হত্যা করান, কেহ বা বলেন, তিনি নিজেই হত্যা করেন। যাহা হউক, চাঁদু যে হত হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে সকলের একমত।

† (Malcolm's Sketch.) কিন্তু অন্য এক মতে জানা যায় যে, গুরু ধর্ম্মজগৎ ও বহির্জ্জগৎ একযোগে শাসন করিবার জন্য এরূপ দ্বি-অসি ধারণ করিতেন।

শরীররক্ষক ছিল। গোবিন্দপুর স্থাপন করিয়া তিনি তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইহা শিখদের আত্মরক্ষার একটি প্রধান গুপ্ত স্থান ছিল।

মোগলরাজ জাহাঙ্গীরের সহিত হরগোবিন্দের বন্ধুত্ব জন্মে ও মোগল সৈন্য-বিভাগে তিনি চাকুরি পান। সম্রাটের সহিত তিনি কাশ্মীর গিয়াছিলেন। কয়েকটি সামান্য কারণে শীঘ্রই উভয়ের মনোমালিন্য ঘটে। একবার তিনি মোগল গুরুদের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়াছিলেন, ও স্বীয় সৈন্যদের জন্য প্রদত্ত অর্থ নিজে রাখিয়াছিলেন; তাঁহার অনেকগুলি অনুচর ছিল ও তিনি শিকারপ্রিয় ছিলেন; আবার তিনি আপনাকে 'মানবের গুরু' ভাবিয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতেন। ইহাতে মোগল রাজসভার আইন অমান্য করা হয়, ও জাহাঙ্গীর অত্যন্ত বিরক্ত হন। অর্জ্জুনের যে জরিমানা করা হইয়াছিল, তাহা তখন পর্য্যন্ত আদায় হয় নাই। এখন হাতে পাইয়া সম্রাট্ গোবিন্দকে ধরিয়া বসিলেন। কিন্তু হর টাকা দিতে না পারায় গোয়ালিয়র দুর্গে কারারুদ্ধ হন। এখানে অল্পাহারে তাঁহাকে দ্বাদশ বর্ষ কাল অবরুদ্ধ থাকিতে হয়। পরে তিনি মুক্ত হন। কিন্তু কি উপায়ে মুক্ত হন, সে সম্বন্ধে কোন ঠিক খবর পাওয়া যায় না। *

১৬২৮ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়। এই বৎসর ভারতবাসীর চির-স্মরণীয়। মারাঠাকুলতিলক মহাত্মা শিবাজী এই বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, জাহাঙ্গীরের পর শাহজাহান দিল্লীর সম্রাট হইলে হরগোবিন্দ আবার মোগলের সেনাবিভাগে চাকুরী পান। এই সময় সম্রাটপুত্র ও পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দারার সহিত তাঁহার বড় সম্প্রীতি হয়। দারা হিন্দু ফকিরদের বড়ই ভাল বাসিতেন। দারার অনুরোধে হরগোবিন্দ মধ্যে মধ্যে লাহোরে যাইয়া দারার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। কিন্তু বিধির বিধান কেহ বুঝিতে পারে না। কি হইতে কি হইয়া যায়, পূর্ব্বাহ্নে কিছুই জানা যায় না। এই বন্ধুত্ব দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, শিখদের সহিত বুঝি মোগলদের আবার চিরবন্ধুত্ব হয়। কিন্তু তাহা হইল না,—এ বন্ধুত্ব বেশী দিন স্থায়ী হইতে পাইল না। অল্পদিনের মধ্যেই উভয়পক্ষের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা জ্বলিয়া উঠিল। একটি সামান্য ব্যাপার হইতে ইহা ঘটে।

---

* কেহ বলেন, সম্রাট পরে তাঁহার কষ্ট দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া ছাড়িয়া দেন; কেহ বলেন, কোন মুসলমানের কৌশলে তিনি মুক্ত হন, কেহ বা বলেন, শিখেরাই তাঁহাকে মুক্ত করে। এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া বড়ই দুষ্কর।

যাহা ঘটে, তাহা সামান্য ব্যাপার হইতেই ঘটে।—আর্কট প্রদেশের রায় বেলুড় গড়ের রাজকুমারীর খেলার জন্য রায় বেলুড় রাজত্ব নষ্ট হইল। এক দিন রাজকুমারীর সাধ হইল যে, কামানগুলি গড়ের উপর সাজাইলে কেমন হয় দেখিবেন। বালিকার আব্দার রক্ষার জন্য গড়ের উপর কামান তোলা হইল—গড় ভৈরবমূর্ত্তি ধারণ করিল। ইংরাজ কোম্পানীর হৃদয় কিন্তু ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সন্দেহবশতঃ রাজকুমারীকে একেবারে গ্রেপ্তার করিয়া ত্রিশিরা পল্লীর পার্ব্বত্য কেল্লায় নজরবন্দী করা হইল। রাজকুমারী বন্দিনী হইলেন; অধিকন্তু কোম্পানি তাঁহাদের রাজ্যাধিকার কাড়িয়া লইয়া তাঁহার ভ্রাতাকে সামান্য জমিদাররূপে অবনত করিয়া দিল। ইহা বেশী দিনের কথা নয়—সিপাহী যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে।*

একটি শিখ, গুরুর জন্য তুর্কীস্থান হইতে কতকগুলি বহুমূল্য অশ্ব লইয়া আসে; কিন্তু মোগল রাজপুরুষেরা সম্রাটের জন্য সেগুলি তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়। একটি ঘোড়া খোঁড়া হওয়ায় লাহোরের কাজি সেটি পুরস্কার পান। কাজি † আবার দশ হাজার টাকায় সেটি গুরুকে বিক্রয় করেন।

* ১৩১৪ সালের ১৫ই বৈশাখের "স্বরাজ" পত্রিকা। পৃষ্ঠা ৮৫।

† পূজনীয় শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'গুরুগোবিন্দ সিং' পুস্তকে নিম্নলিখিত বিষয়টি দেখা যায়। এই কাজির একটি কন্যা ছিলেন। তাঁহার নাম কবলা বিবি। কবলা বিবি মুসলমান হইলেও শিখগুরু গোবিন্দের প্রতি বড় অনুরক্তা ছিলেন। তিনি গুরুকে পতিত্বে বরণ করিতে বড়ই অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু পিতা ত তাহাতে মত দিবেন না। এই জন্য রমণী একদা অন্তঃপুর হইতে পলাইয়া যান ও গুরুর আশ্রয় লয়েন। গুরু তাঁহাকে বেশ যত্নের সহিত আশ্রয় দেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে কাজি খাজানা আদায়ের জন্য গোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইলে, গোবিন্দ তাঁহাকে বেশ পরিতোষ সহকারে আহার করান; পরে কবলা বিবিকে দিয়া কিছু মিষ্টান্ন কাজির নিকট পাঠাইয়া দেন। কাজি কন্যার পলায়নের কথা জানিতেন না। তিনি কন্যাকে এরূপ অন্যায়াচরণ করিতে দেখিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হন ও লজ্জিত হইয়া তথা হইতে পলাইয়া যান। কবলার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও গুরু তাঁহাকে বিবাহ করিলেন না। গুরু তাঁহার জন্য একটি সুন্দর আবাস নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। সেই আবাসের সংলগ্ন একটি সরোবর ছিল। তাহার নাম 'বিবেকসর'। কেন যে সে সরের এমন নাম হইল তাহা জানা যায় না। গুরু-পত্নীরা সকলেই পুত্রবতী ছিলেন। পুত্রবতী হইবার জন্য কবলারও বড় ইচ্ছা জন্মে। গুরুকে তাঁহার ইচ্ছার কথা জানাইলে গুরু 'কবলেসর' নামে একটি সরোবর খনন করিয়া দেন। 'কবলেসর'-ই কবলার পুত্র। কবলা বিবি এরূপ অপরূপ পুত্র পাইয়া পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

গুরু কিন্তু ঘোড়াটি লইয়া আর টাকা দিলেন না। আবার এক দিন হরর এক অনুচর মোগলরাজের একটি শ্বেতবর্ণ শিকারী পক্ষী ধরিয়া রাখিলেন। কাজেই মোগলেরা অতিমাত্র রাগিয়া গেল। সম্রাট গুরুর বিরুদ্ধে মুখলুস খাঁর অধীনে সাত হাজার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। গুরুও পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধ হইল; কিন্তু মোগলেরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। তাহাদের অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল এবং অপর সকলে ও সেই সঙ্গে মুখলুস খাঁও পলাইয়া গেলেন। তাহারা গুরুর শক্তি খর্ব্ব করিতে ও তাঁহার অনুচরগণকে দূর করিয়া দিবার জন্য সগর্ব্বে আসিয়াছিল; কিন্তু শিখদের সহিত প্রথম যুদ্ধেই একেবারে হৃতশক্তি হইল। এ যুদ্ধ অমৃতসরের নিকটে ঘটে।

সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধে শিখেরা জয়লাভ করিল বটে; কিন্তু তখনও তাহাদের এমন শক্তি হয় নাই যে, তাহারা মোগলরাজের সহিত রীতিমত যুদ্ধ চালাইতে পারে। তাই হর গোবিন্দ যুদ্ধ জয় করিয়াও মত্ত হইলেন না। তিনি বুঝিলেন, ইহাতে মোগলরাজের যে ক্রোধাগ্নি জ্বলিবে, তাহাতে তিনি নিজে দগ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত সমভাবে জ্বলিবে। তাই তিনি দ্বিতীয় সংঘর্ষণের হাত এড়াইবার জন্য হিসর প্রদেশের ভতিন্দা জঙ্গলে চলিয়া গেলেন। এ স্থান যথেষ্ট জলাভাবে শুষ্ক—মরুভূমি বিশেষ। মরুদেশ হইলেও ভতিন্দার নাম ভারতের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। এই ভতিন্দা এক সময় লাহোরাধিপতির অন্যতম রাজধানী ছিল। * আবার ১০০১ খৃষ্টাব্দে মামুদ গজনী লাহোরাধিপতি জয়পালকে পেশবার যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং শতদ্রু পারে ভতিন্দা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া অনেক ধন সম্পত্তি লইয়া দেশে ফিরিয়া যান। † তারপর ১০০৯ খৃষ্টাব্দে এই ভতিন্দায় হিন্দু পাঠানে এক মহাযুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে হিন্দুরা যে পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বদা স্মরণযোগ্য। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী তাঁহাদের ক্রোড়গতা হয়েন নাই; তিনি মামুদকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন।

যা'ক সে পুরাতন কথা। হর গোবিন্দ ইহার যেখানে অবস্থান করিতেন, তাহার নাম—'গুরুকা কোট' (গুরুর আবাস ভূমি)। ইহা প্রসিদ্ধ খাঁড়ুর হইতে সাড়ে সাত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে অবস্থান কালে অনেক ব্যক্তি

---

* Colonel Todd's Rajasthan. C. F. M. Elphinstone's History of India. Edited by E. B. Cowell M. A. p. 326.

† Elphinstone's History of India by Cowell. p. 326.

গুরুর শিষ্য ও অনুচর হয়। তাহাদের মধ্যে বুধই প্রধান। সে একজন প্রসিদ্ধ ডাকাত ছিল। সে গুরুর জন্য লাহোরের রাজ-অশ্বশালা হইতে দুইটি অশ্ব চুরি করিয়া আনিল। ইহাতে সম্রাট আরও রাগিয়া যান, এবং গুরুর বিরুদ্ধে কুমায় বেগ ও লাল বেগের অধীনে একটি প্রকাণ্ড বাহিনী প্রেরণ করেন। তাহারা হরর অনুসন্ধানে শতদ্রু পার হয় ও জলাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পায়। শীঘ্রই তাহাদের সহিত গুরুর যুদ্ধ বাধিল; কিন্তু সহজেই পরাজিত হইয়া তাহারা লাহোরে পলাইয়া গেল। সেনাপতিদ্বয় কিন্তু আর গৃহে ফিরিলেন না—যুদ্ধক্ষেত্রেই মহাশয্যায় শয়ান হইলেন।

সম্রাটের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধেও শিখেরা জিতিল। হর কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক সাবধান হইলেন। তিনি শতদ্রু পার হইয়া কর্ত্তার পুরে উপস্থিত হইলেন। নানক এ স্থানের সংস্থাপয়িতা। গুরু এখানে আসিয়া পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

এই খানে তৃতীয় যুদ্ধ ঘটে। পাঠান পৈণ্ডী খাঁ গুরুর ধাত্রীপুত্র ও অনুচর। গুরু তাহার প্রতি যথেষ্ট স্নেহশীল ছিলেন। এখন গুরুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের একটি শিকারী পক্ষী তাহার বাটীতে উড়িয়া গিয়াছিল। সে কিন্তু তাহা লইয়া আর দিতে চাহে না। ইহাতে সে গুরুর নিকট তিরস্কৃত হয়। ফলে পৈণ্ডী গুরুর বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। সে দিল্লি যাইয়া গুরুর বিরুদ্ধে সম্রাটের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করে। সম্রাটও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। সে সেই সৈন্য লইয়া গুরুকে আক্রমণ করে। সে যুদ্ধ বড় ভয়ানক হইয়াছিল। উভয় দলই যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইয়াছিল। অবশেষে কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী হরর প্রতি প্রসন্না হয়েন। যুদ্ধে পৈণ্ডী ও আরও অনেক মোগল সৈন্য হত হয়। অবশিষ্টেরা বিশৃঙ্খলভাবে পলাইয়া যায়।

সম্রাট আরও অধিক সংখ্যক সৈন্য পাঠাইবেন এই আশঙ্কায় হর পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লয়েন। পথে বিপাশা নদীর দক্ষিণ কূলে রুহিলাতে দিন কতক থাকিয়া তিনি পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। শতদ্রুর দক্ষিণ তীরস্থ হিরত পুরে * তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি এখানে ছিলেন। একত্রিংশৎ বর্ষ ছয় মাস দুই দিন গুরুপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে হরগোবিন্দ দেহত্যাগ করেন। হিরত পুরের স্মৃতিমন্দির আজিও তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের ও বীরত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ক্রমশঃ।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* কেহ কেহ ইহাকে খিরতপুর বলিয়াছেন।

সদ্‌গুরুর উপদেশ।

(মহানির্ব্বাণ দর্শন হইতে উদ্ধৃত)

—:(০):—

১। ওঁকার বা নিরঞ্জন ব্রহ্ম পর্য্যন্ত মায়ার অধিকার, তাহার পর পরম পুরুষের রাজ্য।

২। পরমপুরুষের প্রেমাসক্তি তাঁহার রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া মায়ার রাজ্য ভেদ করতঃ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত অণ্ডে অনন্ত পিণ্ডে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং সকল জীবের শ্বাসে শ্বাসে রহিয়াছে। যে জানে সে ধরে, যে না জানে সে কেবল প্রেমভক্তির লক্ষণ, শাস্ত্রাদি আবৃত্তি করিতে থাকে।

১০। সকল জীবের যাহাতে সংসার হইতে উদ্ধার হয় ইহাই পরম পুরুষের উদ্দেশ্য।

১১। পরমপুরুষের এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, বংশবৃদ্ধিক্রমে সংসার আবহমান কাল স্থায়িভাবে চলুক। কিন্তু মায়ার প্রভাবে চিরকাল স্থায়িভাবের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে।

১২। যে সকল নিয়মের অধীন হইয়া সংসার চলিতেছে তাহা প্রকৃতি বা মায়ার নিয়ম। পরমপুরুষের নিয়ম বা উদ্দেশ্য সেগুলি নহে। সংসার জীবাবস্থা হইতে পরম অবস্থায় নিত্য বিহার করুক, পরমপুরুষের ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

১৩। যে সকল উপদেশে আত্মদর্শনের কথা আছে তাহাই ঈশ্বরের (পরম-পুরুষ বা খুদ্‌খামিন্দের) কথা। কেন না ঐ উপদেশগুলি আত্মদর্শনের সাক্ষ্য দিতেছে। সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া সেই সকল উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে আত্মদর্শন নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে। পরমপুরুষের উদ্দেশ্যও তাহাই।

১৬। যখন জীব সমষ্টি অবস্থায় ছিল সেই সময় পরমপুরুষ সঙ্কেতে ডাকিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান ছিল না বলিয়া সে ডাক ধরিতে পারিল না।

১৭। এখনও পরমপুরুষ, জীব মাত্রকেই তাহাদের অন্তরে ডাকিতেছেন; কিন্তু ভ্রান্ত জীবেরা বুঝিতে পারিতেছে না যে, তিনি সঙ্কেতে ডাকিতেছেন।

১৮। যাহারা পরমপুরুষের ডাকের সঙ্কেত জানিতে পারিবে তাহারা অনায়াসে মহানির্ব্বাণ দর্শনের অধিকারী হইবে।

১৯। সেই সঙ্কেত তোমাদের মধ্যেই হইতেছে; বর্ত্তমান সদ্‌গুরুর স্মরণ-গ্রহণ কর, জনিতে পারিবে।

২০। পরমপুরুষ উচ্চরবে ডাকিতেছেন। জীব জন্ম-বধির, তাই শুনিতে পায় না।

২১। সে রবে (ডাকে) কোনরূপ ভাষার ব্যবহার নাই। কেবল রবমাত্র শুনিতে পাইবে।

২২। মন ধরা পড়িলেই তোমার মধ্যে পরমপুরুষের ডাক শুনিতে পাইবে। তখন প্রকৃত পথও পাইবে।

২৩। তিনি বধির নহেন যে তোমরা চীৎকার করিয়া ডাকিতেছ। তিনি স্বয়ং অহর্নিশ ডাকিতেছেন, মন দিয়া শুন—শুনিতে পাইবে।

২৪। পরমপুরুষ এক নামে সকলকে ডাকিতেছেন—কীটাণু হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যাদি দেবগণ সকলকেই ডাকিতেছেন কিন্তু কেহই তাঁহার ডাকের তত্ত্ব তল্লাস করিতেছে না।

২৫। পরম পুরুষ যে শব্দের সাহায্যে ডাকিতেছেন, তাহার নাম রব বা ডাক।

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

——(:০:)——

প্রবাসী।—মাসিকপত্র। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ সাল।

'গোরা' (উপন্যাস) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এখনও 'ক্রমশঃ' চলিতেছে। শুনিতে পাই ইহা একখানি ক্রমপ্রকাশ্য উপন্যাস, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিতেছি ইহা কবিবর রবিবাবুর 'দৈবী ভাষা'র মনস্তত্ত্বের সুগভীর গবেষণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এরূপ গভীর গবেষণায় লেখক মহাশয়ের মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া

পড়িতেছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু পাঠকের যে প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইতেছে। ইহার উপর রবিবাবুর 'দৈবীভাষা' ঠিক যেন "গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্"। 'তাহারই উর্দ্ধে বৃহস্পতি গ্রহ অন্ধকারের অন্তর্যামীর মত তিমিরভেদী অনিমেষ দৃষ্টিতে স্থির হইয়া আছে', কেমন, দৈবীভাষা নয় কি? 'এই গভীর কালোজল, এই নিবিড় কালো তট, ঐ উদার কালো আকাশ', জল কালো, আকাশ কালো সুতরাং নদীর তটও 'নিবিড় কালো' না হইলে মানাইবে কেন? কাক কালো, কোকিল কালো, ভ্রমর কালো, সুতরাং কৃষ্ণসলিলবিহারী রাজহংসও কালো না হইলে চলে কৈ? না হইলেও অন্ততঃ কবিবরের অনুপ্রাসের অনুরোধে তাহাকে 'কালো' হইতেই হইবে। 'দিনগুলি যেন কাহার চোখের উন্মীলিত দৃষ্টি', 'চোখ' ছাড়া শ্রোত্রনাসিকাদিরও 'উন্মীলিত দৃষ্টি' আছে না কি? 'এই সামান্য ক্রটীতেই গোরাকে ভারি একটা ধিক্কার দিল' কে ধিক্কার দিল? লেখক স্বয়ং, না আর—কেহ? 'নিজের মনের মধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইবার জন্য'—অলমতি বিস্তরেণ। সে দিন কোন 'বিখ্যাত ঔপন্যাসিক' বঙ্গভাষার গঙ্গাযাত্রা করাইয়াছিলেন, আর আজি ভারতীর 'বরপুত্র' তাঁহার আদ্যকৃত্য সম্পন্ন করিতেছেন। 'প্রবাসী'র প্রবন্ধের বাজার কি এতই মহার্ঘ্য হইয়াছে? অথবা কেবল নামমাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া সম্পাদক মহাশয় বঙ্গভাষার আদ্যকৃত্যে পুরোহিত সাজিয়াছেন? 'সমসাময়িক ভারত' শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনুবাদ হইলেও প্রবন্ধটী বহু জ্ঞাতব্যতথ্যে পূর্ণ। তবে প্রবন্ধের ভাষাটা একেবারে 'অনুবাদের' ভাষা। 'ভারতে ব্রিটিশ শান্তি' শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। প্রবন্ধটী যেমন সাময়িক, তেমনই শিক্ষণীয়। প্রবন্ধের একস্থলে লেখক যথার্থই বলিয়াছেন, 'শান্তি তো সকলেই চায়, অশান্তি চায় না; কিন্তু যাহা মনুষ্যত্বের বিনাশকারী তাহা কি মানুষের পক্ষে একটা আদরের বস্তু হইতে পারে? যে শান্তি কেবল নির্ব্বিঘ্নে খাওয়া পরার ব্যবস্থা করে তাহা কি শান্তি নামের যোগ্য? সে শান্তি আর মনুষ্যত্বের বিনাশ এ দুইয়ে বিভিন্নতা কি? উহা মৃত্যুর নিশ্চেষ্টতার নামান্তর মাত্র।' 'য়ুরোপে পদার্পণ' শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। মন্দ হয় নাই। 'দেবদূত' (দৃশ্যকাব্য বা নাটক) শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী। দৃশ্যকাব্য বা নাটক পাত্রপাত্রী দ্বারা অভিনীত হইলে তাহার সৌন্দর্য্য বা মিষ্টত্ব যেরূপ অনুভব করা যায়, কেবল পাঠে তাহার কিছুই হয় না। তাহার উপর সে দৃশ্যকাব্য যদি আবার মাসান্তে বা দ্বিমাসান্তে এক একটী দৃশ্য লইয়া পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার সৌন্দর্য্য

উপভোগ দূরে থাকুক, তাহা পাঠকের নিকট একটা বিড়ম্বনা বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং আমরা এই দৃশ্যকাব্যখানির এরূপ ক্রমপ্রকাশের সার্থকতা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। 'শিবাজী ও সুন্দরী' (কবিতা) শ্রীরমণীমোহন ঘোষ। বেশ হইয়াছে। 'বিবিধ প্রসঙ্গের' অনেকগুলি প্রসঙ্গই সুলিখিত। পরিশেষে 'প্রেমের কবিতা'র লেখকগণের জন্য যে কয়েকটী প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে কেবল প্রবাসী সম্পাদক নহেন, অনেক সম্পাদকই এই প্রথার অনুসরণে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। তবে 'বিশেষ দ্রষ্টব্য'টা একটু পরিশোধিত হইলে ভাল হয়। চিত্র সকলগুলিই সুন্দর, তবে শিবাজী ও মুসলমান বন্দিনী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

পূর্ণিমা।—মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী। ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১৫ সাল।

যে দেশে মাসিকপত্রের সাধারণ আয়ুষ্কাল তিন বৎসর, সে দেশে দুই একখানি দীর্ঘজীবী মাসিকপত্র দেখিতে পাইলে একটা বিস্ময়-সম্মিলিত আনন্দের সঞ্চার হয় না কি? বস্তুতই আমরা এই প্রবীণ সহযোগীর প্রথমসন্দর্শনে পরমানন্দ লাভ করিলাম। দুই একটী ব্যতীত ইহার সকল প্রবন্ধই সুলিখিত এবং সুখপাঠ্য। বর্ত্তমান সংখ্যায় 'নদীয়া কাহিনী' 'পল্লীকথা' এবং 'বৎসরের কথা', এই তিনটী প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা স্বদেশীর ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পঙক্তি			
২৫২ পৃষ্ঠা	৯ পঙক্তি	সীতানাথের স্থলে	অন্নদাচরণের	হইবে।
২৫৩ ,,	২২ ,,	সীতানাথের ,,	অন্নদাচরণের	,,
২৮৫ ,,	৭ ,,	কাণ্ডীয়গণ ,,	কাল্ভীয়গণ	,,
২৮৫ ,,	২৫ ,,	রামরাজ্য ,,	রাবণরাজ্য	,,
২৮৭ ,,	২৮ ,,	(Mahabharata)	(Ramayana)	,,
২৮৭ ,,	২৯ ,,	(Ramayana ,,	Mahabharata	,,
২৮৮ ,,	২১ ,,	মিলন দ্রব্য ,,	বিলাস দ্রব্য	,,

বর্ত্তমান সংখ্যার ৩১০ পৃষ্ঠা ১৫ পঙক্তিতে 'প চায়নে' স্থলে 'পানে চায়' হইবে।

বাঞ্ছিতের প্রতি।

ডেকেছিনু একদিন কতই কাতরে,
পশেছিল সে আহ্বান দূরে তার কাণে ;
তাই এসেছিল, কিন্তু মোর (ই) অনাদরে,
সে যে গো কাঁদিয়ে ফিরে গেল অভিমানে !

অনিদ্রায় অনাহারে কত দিবা রাতি,
আহত ব্যথিত দীর্ণ হৃদিখানি ল'য়ে—
কাটায়েছি তারই পুণ্য সাধনায় মাতি',
প্রলয়ের কত ঝঞ্ঝা গিয়াছে বহিয়ে।

একদা সে সিদ্ধিরূপে, মম সাধনার,
আসিয়া দাঁড়াল মোর কুটীরের দ্বারে ;
'এসেছি এসেছি অমি' বলি' কতবার
ডাকিল, তখন আমি মগ্ন ঘুমঘোরে।

নিদ্রাভঙ্গে উঠে যবে দেখিনু চাহিয়া,
চলে গেছে শূন্য করি' এ কুটীরখানি ;
পদচিহ্নটুকু তার রয়েছে পড়িয়া,
'এসেছিনু' 'এসেছিনু' ডাকে প্রতিধ্বনি।

হে প্রিয় ! হে প্রিয়তম ! বাঞ্ছিত আমার,
আবার ডাকিব, তুমি আসিও আবার।

পিপুল।

বঙ্গের নানাস্থানে, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ বনজঙ্গলে পিপুল গাছ স্বতঃই জন্মিয়া থাকে। কিন্তু অযত্নে বর্দ্ধিত হয় বলিয়া, ক্রমাগত দুই তিন বৎসর সামান্য পরিমাণে ফল প্রসব করিয়াই মরিয়া যায়। পতিত ফল-গুলির কোন প্রকার সদ্ব্যবহার করা হয় না। পিপুল যে কিরূপ মূল্যবান্ পদার্থ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতাই ইহার একমাত্র কারণ। বঙ্গের সর্ব্ব-ত্রই পিপুল জন্মে। সুতরাং রীতিমত পিপুলের চাষ করিতে পারিলে বিলক্ষণ লাভবান্ হওয়া যায়।

পাটের আবাদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিম্নভূমির আদর দিন দিনই যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু উচ্চভূমিগুলিতে ভালরূপ ধান্য অথবা পাট জন্মে না (ইহা জমির দোষ নহে, কৃষকেরই কৃষিতত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার ফল) বলিয়া, কৃষকের নিকট উহার বড়ই অনাদর। উচ্চভূমির অনেকাংশই অনাবাদি অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। যেগুলিও আবাদ করা হইয়াছে, তাহাতে কৃষকের বড় আয় হয় না। ফলে, উচ্চভূমির চাষে চাষার পেট ভরে না বলিয়া কৃষকমাত্রেরই দৃঢ়বিশ্বাস। এই ভুল বিশ্বাস দূর করিতে না পারিলে, দেশের উচ্চভূমির আদর বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা বড় কম। নিম্নভূমিতে পাটের চাষে কৃষকের আয় বেশী হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে খাটুনিও বড় বেশী। উচ্চভূমিতে পিপুলের চাষ করিতে পারিলে, তাহাতে পাটের প্রায় দ্বিগুণ আয় হইবার সম্ভাবনা, অথচ খাটুনি বড় কম। বিশেষতঃ ইহাতে পাটের ন্যায় প্রতি বৎসরই সমভাবে খাটিতে হয় না। একবৎসর খাটিলেই ক্রমাগত তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত ফলভোগ করা যায়। এমন সুখকর ও লাভজনক কৃষিকার্য্যেও এদেশের লোকের বীতরাগ!

প্রকার।

পিপুল দুই প্রকার।—এক প্রকার সরু ও লম্বা এবং অন্য প্রকার অপেক্ষাকৃত মোটা ও বেঁটে। এই শেষোক্ত জাতীয় লতাই রোপণ করিতে হয়। উভয় প্রকার পিপুলের পার্থক্য সাধা-রণ লোকে ফল দর্শন ব্যতীত বুঝিতে পারে না। বাজারে বেণেদের নিকট যে পিপুল পাওয়া যায়, সেই জাতীয় পিপুলেরই চাষ করা

কর্ত্তব্য। লম্বা জাতীয় পিপুলকে "ঘোড়া পিপুল" বলে। যদি ভুল ক্রমেও ভাল পিপুলের সঙ্গে ঘোড়া পিপুলের লতা রোপিত হয়, তবে ফল হইলে ("কোন্ জাতীয় লতা তাহা ফল না হইলে সহজে চেনা যায় না। যাহারা অনেকবার চাষ করিয়াছে, তাহারা গাছ দেখিয়াই কোন্ জাতীয় পিপুল লতা, তাহা স্থির করিতে পারে।) এইগুলি উৎপাটিত করিয়া দিতে হয়।

কিরূপ জমির আবশ্যক। উচ্চ (যে জমি বর্ষাকালেও জলমগ্ন হয় না), দোঁয়াশ (বেলে ও এঁটেল মিশ্রিত) এবং সমতল জমিই পিপুল আবাদের পক্ষে প্রশস্ত। কেবল এঁটেল অথবা কেবল বেলে জমিতে ইহা জন্মে না। আমাদের দেশের উচ্চভূমিগুলির অধিকাংশই অসমতল। সুতরাং পিপুলের চাষ করিতে হইলে শুধু দোঁয়াশ উচ্চভূমি নির্ব্বাচন করিলেই চলিবে না; নির্ব্বাচিত জমি অসমতল হইলে, তাহা সমতল করিয়া লইতে হইবে। ক্ষেত্র সমতল না হইলে, উচ্চ অংশ হইতে সমুদয় জল (বৃষ্টির বা ছেঁচার) গড়াইয়া নিম্ন অংশে চলিয়া আসে। জল নিম্নদিকে গড়াইয়া যাইবার সময় ক্ষেত্রের সারাংশও উহার সহিত ধৌত হইয়া নিম্নদিকে চলিয়া যায়, ইহাতে উচ্চভূমি শুষ্ক এবং অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে নিম্নপার্শ্বে অতিরিক্ত আর্দ্রতাবশতঃ ক্ষেত্রে পিপুলের পরিমাণ বড়ই কম হয়। ক্ষেত্র সমতল হইলে, ক্ষেত্রের সকল স্থানেই সম পরিমাণে জল শোষিত হয়, মৃত্তিকার সারাংশও মৃত্তিকাতেই থাকিয়া যায় এবং কোনও অংশের আর্দ্রতা বা শুষ্কতা বৃদ্ধি পাইতে পারে না। ফলে যথেষ্ট পরিমাণে পিপুল জন্মিয়া থাকে।

চাষের কথা। চৈত্র মাসের শেষ অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগে দুই এক-বার বৃষ্টি হইয়া, জমি একটু সরস হইলে পর বারম্বার উত্তমরূপে জমি চাষ করিতে হয়। পিপুলের চাষের জন্য জমি ধুলিবৎ চূর্ণ এবং তৃণশূন্য করিতে পারিলেই ভাল। ভূমি উত্তমরূপে কষিত এবং ধুলিবৎ চূর্ণ হইলে প্রথমতঃ তাহাতে ধঞ্চে, অড়হর অথবা জয়ন্তী গাছের বীজ-পাতলা করিয়া বপন করিতে হইবে। তৎপর বপিত বীজোদ্ভূত গাছগুলি একটু বড় হইলে অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শেষ ভাগে সমূল অথবা খণ্ডিত (পিপুল লতাকে ৪। ৫ অঙ্গুলি লম্বা করিয়া কর্ত্তন করিতে হইবে। এই কর্ত্তিত লতা হইতেও গাছ জন্মে। কিন্তু কর্ত্তিত লতার গাছে ভাল ফল ধরে না বলিয়া আমাদের দেশের অভিজ্ঞ কৃষক দিগের দৃঢ় বিশ্বাস।) পিপুল লতা দেড় হাত অন্তর রোপণ করিতে হয়। সম্মুখস্থ একএকটী ধঞ্চে অড়হর বা জয়ন্তী গাছ রাখিয়া, অবশিষ্টগুলি তুলিয়া

ফেলিতে হইবে। এই গাছগুলি পিপুল লতাকে ছায়া ও আশ্রয় প্রদান এবং ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বস্থ গাছে বেড়ার কার্য্য করিবে। আমরা কৃষকমাত্রকেই ধঞ্চের বীজ বপন করিতে পরামর্শ দিই। কারণ ধঞ্চে গাছগুলি অন্যত্র না ফেলিয়া ক্ষেত্রের মধ্যেই ফেলিয়া রাখিতে পারিলে, উহা পচিয়া কাঁচা সারের কার্য্য করিবে। ফলে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাও যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে।

অধিক রৌদ্রে লতাগুলি শুষ্ক হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই জন্য গাছগুলিকে ছায়া ও আশ্রয় প্রদান করিবার জন্য ধঞ্চে, অড়হর অথবা জয়ন্তী গাছের প্রয়োজন। এই কার্য্যের জন্য অড়হর গাছ রাখিলে, ক্রমাগত তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত ফাওস্বরূপ কৃষকের অড়হর ডাইল লাভ হয়। কিন্তু জয়ন্তী গাছে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি অথবা ফাও লাভ কিছুই হয় না। না হইলেও পিপুল লতাকে ছায়া প্রদান করিতে ও আশ্রয় দিতে ইহা ধঞ্চে অথবা অড়হর অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে।

ভাদ্র মাসে একবার ঘাস বাচিয়া ফেলিয়া মাটী গুঁড়া করিয়া দিতে হইবে। অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত আর কিছুই করিতে হইবে না। মাঘ মাসের শেষ ভাগ হইতেই রৌদ্রের তাপ প্রখর হইবে, এই সময় ধানের নাড়া অথবা বিচালি দ্বারা গাছগুলিকে ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য। প্রথম বৎসরই বর্ষাকালে পিপুল ধরিতে পারে। কিন্তু প্রথম বৎসর তত অধিক হয় না—বিঘা প্রতি গড়ে ১/০ মণের বেশী হইবার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয় বৎসরে—কার্ত্তিক মাসের প্রথম ভাগে জমি নিড়াইয়া তৃণাদি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। তৎপর কোপাইয়া দিলে আর কিছুই করিতে হইবে না। দ্বিতীয় বৎসরে প্রচুর পরিমাণে পিপুল জন্মিয়া থাকে। তৃতীয় বৎসরে একবার মাত্র নিড়াইয়া দিলেই হয়। তৃতীয় বৎসরেও দ্বিতীয় বৎসরের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে পিপুল পাওয়া যায়। চতুর্থ বৎসরে অপেক্ষাকৃত ফসল কম হয়। এই বৎসরই লতা তুলিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিতে হয়।

ফলসংগ্রহ। মাঘ মাসের শেষ অথবা ফাল্গুনের প্রথম ভাগ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ফল সংগ্রহের সময়। ফল সুপক্ক হইলেই, উহা তুলিতে হয়। ফল তুলিয়া, বেশ ভালরূপে শুকাইয়া লইলেই হইল।

আয় ও ব্যয়। এক বিঘা জমিতে পিপুলের চাষ করিলে মোট যে আয় ও ব্যয় হইবার সম্ভাবনা, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল। ব্যয়ের হিসাবটা ঠিক রাখিয়া আয়ের হিসাব খুব কম করিয়াই ধরা হইল।

প্রথম বৎসরে অর্দ্ধমণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে দেড় মণ হিসাবে তিন মণ

এবং চতুর্থ বৎসরে একমণ। চারি বৎসরে মোট উৎপন্ন ফসল সাড়ে চারিমণ। প্রত্যেক মণের মূল্য ৬০৲ করিয়া ধরিলেও ২৭০৲ টাকা। মূল এবং লতা বিক্রয় করিয়াও কমপক্ষে আরও ৩০। ৩৫৲ টাকা পাওয়া যায়। পিপুল লতা গৃহ-পালিত পশুর অতি উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য। মূলসহ লতার কিয়দংশ রোপ-ণের জন্য রাখিয়া বাকী অংশ বিক্রয় করিতে পারা যায়। পিপুলের মূল পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে। লতা তুলিয়া লইবার পর জমি কোপাইয়া মূলগুলি তুলিয়া লইতে হয়। এই মূলগুলি শুষ্ক করিয়া লইতে পারিলেই বিক্রয় করা যায়। মূল্য প্রতিমণ ২০—২৫৲ টাকা।

চারি বৎসরে মোট ব্যয় ৪০—৫০৲ টাকার বেশী হইতে পারে না। যাহাদের নিজের লাঙ্গল আছে, তাহাদের খরচ ইহার অর্দ্ধেকের বেশী হইবে না। সুতরাং ব্যয় বাদে চারি বৎসরে মোট আয় ২৫০৲ টাকা বা তদোধিক (পত্রিকায় স্থানা-ভাববশতঃ হিসাব দেওয়া গেল না)। যে মোটামুটি হিসাব দেওয়া গেল, তদ্দৃষ্টে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, এক বিঘা জমিতে বুঝিয়া শুঝিয়া পিপুলের চাষ করিতে পারিলে গড়ে প্রতি বৎসর ব্যয় বাদেও ৬০৲ টাকা লাভ করা যায়। ধঞ্চে গাছের বেড়া হইলে, তাহাতে যে বীজ পাওয়া যাইবে, সেই ধঞ্চে বীজের তৈলে কৃষকের জ্বালানি তৈলের এবং জ্বালানি কাষ্ঠের অভাব আংশিক দূর করিবে। অড়হর গাছের বেড়া হইলে, বেড়ার গাছেও ক্রমাগত তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত ডাইল পাওয়া যাইবে। ধঞ্চে কাষ্ঠের ন্যায় অড়হরের কাষ্ঠও জ্বালানি কাষ্ঠের কার্য্য করিবে। এই টুকুই কৃষকের ফাও লাভ।

কৃষক বুদ্ধিমান হইলে বেড়ার গাছে সিম লাউ প্রভৃতির গাছ উঠাইয়া দিয়া লাভের পথ আরও প্রশস্ত করিতে পারে।

ধান্য অথবা পাটে ব্যয় বাদে ইহার অর্দ্ধেকও আয় হয় না। লাভের জন্যই কৃষি করা; "পরের গোলামী না করিয়া স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্য করিতে পারিলে, ডিপুটী বা মুন্সেফ বাবুর অপেক্ষাও সুখে থাকা যায়" এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া যাঁহারা কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উচ্চভূমিতে পিপুল চাষ করিতে পরামর্শ দিতেছি। স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই গ্রাম্য কৃষকদিগকে পিপুলের চাষ করিতে উৎসাহিত করিলে, তাঁহাদের প্রবন্ধ পাঠ সার্থক এবং দেশের দশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ।

ভুল।

আকাশে পাৎলা পাৎলা মেঘ রহিয়াছে—অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে,—থাকিয়া থাকিয়া বায়ু বহিতেছে—পল্লীগ্রামের পথ ঘাট অল্প-বিস্তর কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে—স্থানে স্থানে জলও দাঁড়াইয়াছে। রাস্তা ঘাটে লোকজন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। গ্রামের পথ দিয়া অনেকদূর আসিলাম, বড় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না। একজন চাষী কোদালী হস্তে টোকা মাথায় দিয়া মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল,—ভিজা গামছা পরা—শীতলবায়ু তাড়নে কণ্টকিত দেহ চাষী হাত দুইটিকে পশ্চাতে রাখিয়া ঈষৎ নতদেহে পথ চলিয়া আসিতেছে। অনাবৃত দেহের প্রায় সকল স্থানই কর্দ্দমাক্ত! তাহার এই অবস্থা দেখিয়া স্বতঃ আমার মনে হইল এই চাষী, ইহাদের সম্বন্ধে আমরা কত উদাসীন! গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র উন্মুক্ত মস্তকে বহন করিয়া, বরষার অজস্র প্লাবন অনাবৃত দেহে সহ্য করিয়া—বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে আপনার জীবনীশক্তিকে ক্রমাগত নষ্ট করিতেছে—কাহাদের জন্য? এই যে আমি দূর সহর হইতে যে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সাহায্য-ভিক্ষার উদ্দেশে এই বর্ষায় বৃষ্টি-বাদলে কষ্ট করিয়া এই পল্লীগ্রামে আসিয়াছি, তাহার মূল কোথায়? তাহার মূল আমাদেরই স্থূল দৃষ্টির মধ্যে, আমাদেরই ভ্রমাত্মক কার্য্যের মধ্যে!—বলিতেছি।

দুর্ভিক্ষ কাহাদিগকে লইয়া? দেশের দশ পাঁচজন ধনবান্ লোক লইয়া দুর্ভিক্ষ নহে;—এই চাষী এবং তাহারই মত অবস্থাপন্ন লোকসমষ্টি লইয়া দুর্ভিক্ষ! তাহারা দুই বেলা পেট পূরিয়া খাইতে পায় না! কেন পায় না? সারাটি বৎসর শিশির বৃষ্টি রৌদ্র সহ্য করিয়া যে শস্য উৎপাদন করিল, যখন সেই শস্য বিভাগের সময় আসিল, তখন সেই উৎপন্নের অর্দ্ধেক ত ন্যায়গত হিসাবে লইলাম। তাহার পর উত্তমর্ণরূপে তাহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে তাহার আসল সুদ ও সুদের সুদ পর্য্যন্ত কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইয়া তাহাদিগকে রিক্তহস্তে গৃহে ফিরাইয়া দিলাম! সমস্ত বৎসরের পরিশ্রমের পুরস্কার, প্রভুর গোলাবাড়ীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ মধ্যে স্তূপাকারে ফেলিয়া সে শূন্যহস্তে গৃহে ফিরিয়া গেল! গৃহে ফিরিয়া অভুক্ত পরিবারের দীর্ঘনিশ্বাস, ক্ষুৎপীড়িত

বালক বালিকার কাতর ক্রন্দন তাহাকে কি মুহূর্ত্তের জন্য স্থির থাকিতে দেয়? উত্তমর্ণের খাতায় আবার তাহার ঋণের বোঝা বাড়িতে লাগিল। পক্ষান্তরে আমরা সেই চাষীর নিকট হইতে সমস্ত বৎসরের পরিশ্রমজাত শস্য অপহরণ করিয়া তদ্‌বিনিময়ে বিলাসিতার উপকরণ সমূহ ক্রয় করি! আপনার দেশবাসীকে অনশনে মারিতে কেন এত স্বার্থময় কুটিল উদ্যোগ! আমার তখন মনে হইল—এই যে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য চেষ্টা—এই যে আমাদের অভুক্ত ভ্রাতাদিগের মুখে অন্ন দিতে আকুল উদ্যোগ—এটা কি একটা রহস্য! তাহা না হইলে প্রথমে যাহাদের নিকট হইতে মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করি নাই, এখন তাহাদেরই সেই মুখের গ্রাসের সংস্থান করিতে এত উদ্যোগ! গোড়া কাটিয়া আগায় জল! তখন আমার নয়ন সম্মুখে আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম—আমাদের একটা মহাভুল!!

অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি.—কাদা মাড়াইয়া—জল পার হইয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি! অশ্বত্থ গাছের নিম্ন দিয়া—পুষ্করিণীর পার্শ্ব দিয়া—বংশকুঞ্জের ভিতর দিয়া—পল্লীগ্রাম-পথে অনেকদূর আসিলাম। পল্লীগ্রামে যাতায়াত আছে সত্য, কিন্তু পল্লীপ্রকৃতির এরূপ বর্ষাগম্ভীরা মূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ এতাবৎকাল ঘটিয়া উঠে নাই। স্বল্প মেঘাচ্ছন্ন আকাশে হাসিমাখা রৌদ্র নাই—বৃক্ষশাখায় বংশকুঞ্জে উৎফুল্ল বিহঙ্গকুলের মধুর কাকলি নাই, অনাকাঙ্ক্ষিত মৃদু সমীরণের হৃদয়োন্মাদী সরস প্রবাহ নাই। পরিপূর্ণা পুষ্করিণী কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া অম্ অম্ করিতেছে, গাছের পাতা বৃষ্টির জলে ঝম্ ঝম্ করিতেছে, ঝিঁ ঝিঁ পোকা তাহাদের সেই একঘেয়ে সুরে অনবরত চিঁ চিঁ করিতেছে। প্রকৃতির এরূপ দেহভরা গাম্ভীর্য্য আমি কখনও দেখি নাই।

যাইতে যাইতে দেখিলাম, বর্ষার জল পথের পার্শ্বস্থিত নালা-পথ দিয়া সবেগে ছুটিয়া যাইতেছে, একটা দুরন্ত বালক কর্দ্দম লইয়া সেই জলের গতিকে প্রতিরুদ্ধ করিবার অভিলাষে তাহার সম্মুখে বাঁধ দিতেছে। কিন্তু সে বেগের সম্মুখে সে ক্ষীণ বাঁধ কতক্ষণ টিকিবে। একবার বাঁধ দিল ভাঙ্গিয়া গেল—আবার দিল, আবার ভাঙ্গিয়া গেল। এইরূপে সেই বালকের প্রাণব্যয়ী চেষ্টা স্রোতমুখে পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল হইয়া গেল। তাহার এই বিফল আয়াস দেখিয়া আমার একটু হাসি আসিল—মনে হইল, শুধু এই বালক কেন, আমরা প্রায় সকলেই এই কুটিল কর্ম্মক্ষেত্রে ইহারই মত বিফল-মনোরথ! বালক যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া স্রোতমুখে বাঁধ বাঁধিতেছে,

সে আকাঙ্ক্ষার সাফল্য কোথায় ? বিবিধ প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধ পক্ষে যে সমবেত চেষ্টা, সে চেষ্টা সমবায়ের পুরস্কার কোথায় ? সে আকাঙ্ক্ষার সাফল্য নাই— সে চেষ্টার প্রতিদান নাই। ঐ বালক যেমন মুগ্ধ হৃদয়ে প্রবল স্রোতকে নিরুদ্ধ করিবে ভাবিয়া, আপনার ক্ষুদ্র শক্তিকে একত্র করিয়া স্রোতের মুখে বাঁধ বাঁধিতেছে, স্রোত সে শক্তিকে উপহাস করিয়া বাঁধ ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কুটিল কাল-স্রোতের প্রবল আবর্ত্ত ঠিক এইরূপ ভাবেই আমাদের কর্ম্মের বাঁধকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। বালকের শক্তি যেমন এই বর্ষা-স্রোতের মুখে পরাজিত, আমাদের শক্তিও সেইরূপ কালস্রোতে নিকৃষ্টরূপে পরাজিত। আমার তখন মনে হইল, ঐ বালক যেমন কার্য্যের তৎপরতায় আপনার শক্তিকে বৃথা নষ্ট করিবার জন্য একটা ভ্রান্ত বিশ্বাসকে হৃদয়ে পোষণ করিতেছে, সেইরূপ আমাদেরও এই গুরুতর কর্ম্মের অপ্রাকৃত আড়ম্বরের মধ্যে একটা মহাভুল আপনার অধিকার চিরস্থায়ী করিয়া নীরবে বসবাস করিতেছে।

বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "রজনীরঞ্জন রায়ের বাটী যাইব কোন্ পথে ?"

বালক বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি রায়েদের বাটী জানেন না! কোথা হইতে আসিতেছেন আপনি ?"

আমি বলিলাম, "আমি কলিকাতা হইতে আসিতেছি, কখনও এ গ্রামে আসি নাই, রায়েদের বাটী আমি জানি না।" আমার কথা শুনিয়া বালক আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। কেন হাসিল ঠিক বলিতে পারি না, তবে বোধ হয় বালকের বিশ্বাস ছিল যে, রজনী বাবুর ন্যায় একজন ধনবান লোক হয়ত কলিকাতার সকলের নিকটেই পরিচিত এবং সকলেই তাঁহার নাম ধাম ঠিকানা বিশেষরূপেই অবগত আছে; আরও হয়ত সে মনে করিত, কলিকাতার ন্যায় সহরে যাহাদের বাস তাহারা জগতের সংবাদ রাখিয়া থাকে; কিন্তু আমি কলিকাতাবাসী হইয়াও রায় মহাশয়ের ন্যায় একজন ধনবান ব্যক্তির বাটী কোন্ পথে যাইতে হইবে তাহা জানি না। সুতরাং আমি কি অজ্ঞ ? বোধ হয় এই সমস্ত ভাবিয়াই বালক হাসিয়াছিল। আমি বালকের নিকট আর বিলম্ব না করিয়া তাহার নির্দ্দেশিত পথ ধরিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম।

কিছুদূর যাইবার পর এক সুবৃহৎ অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। অট্টালিকার সম্মুখভাগে কতকটা জমি, বাগানের মত কেয়ারি করা, ছোট বড় নানাবিধ

ফুলের গাছ ; বাগানের চতুর্দ্দিকে অতি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। উদ্যানে প্রবেশের নিমিত্ত রেলিংবিশিষ্ট একটা গেট আছে। গেট হইতে বরাবর অট্টালিকা পর্য্যন্ত একটা সুর্‌কিমণ্ডিত রাস্তা, যেন অজগর সর্পের মত অসাড় ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। আমি সেই উদ্যান পার হইয়া সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া সম্মুখের এক কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। অনুমানে বুঝিলাম ইহাই রজনী-রঞ্জন রায়ের বাটী।

সে কক্ষটি, দপ্তরখানা। মোটা মোটা পায়াবিশিষ্ট কাঠের চৌকির উপর সতরঞ্জি পাতা, তাহার উপর চাদর বিছান ;—সে চাদর যে কতদিন রজকভবন দর্শন করে নাই তাহা নিশ্চয়রূপে জানিতে পুরাতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। তাহার কোন স্থানে কালি পড়িয়াছে, কেহ তাহাতে চূণ লেপিয়াছে, কেহবা তামাকু সাজিয়া আপনার অপরিস্কৃত হস্ত সেই চাদর সাহায্যে পরিস্কৃত করিয়াছে। এইরূপে অনেকের অনেক কলঙ্ক আপনার প্রশস্তদেহে নীরবে নির্ব্বিরোধে মাখিয়া সত্যযুগে ক্রয়ের পর হইতে নিশ্চেষ্ট ভাবে সেই চৌকির উপর পড়িয়া রহিয়াছে। চৌকির উপর পাঁচ সাতজন কর্ম্মচারী, সকলেরই সম্মুখে এক একটি বাক্স, তাহার উপর মোটা মোটা খেরুয়া বাঁধান খাতা লইয়া কেহ হিসাব লিখিতেছে, কেহ হিসাব মিলাইতেছে, কেহ তামাকু টানিতে টানিতে কেবলই পাতা উল্টাইতেছে। তাহাদের ক্রোড়দেশস্থ বাক্সগুলির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তৈল ও সিন্দুরচর্চ্চিত হইয়া তাহারা পুঞ্জীভূত মালিন্যকে যেন নিবিড় প্রণয়ালিঙ্গনে চিরতরে আবদ্ধ করিয়াছে। মেজের উপর আরও তিন চারিজন লোক বসিয়াছিল। আমি যখন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম তখন কর্ম্মচারীদিগের মধ্য হইতে একজন—সম্ভবতঃ তিনিই সর্ব্বপ্রধান—তাঁহার সেই চশমাশোভিত নয়নদ্বয়, তাঁহার সেই একদণ্ডবিহীন এবং তৎস্থলে সূত্র-সংবদ্ধ চশমা তাহার অন্য দিকের জয়েণ্টের মুখে বহুদিন হইতে স্ক্রুটি হারাইয়া গিয়াছিল, সেই স্থানে একটি আলপিন দ্বারা কার্য্য শেষ করা হইয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় চশমার সেই সূক্ষ্ম ছিদ্র আলপিনের অনধিকার প্রবেশে বাধা দেওয়ায় তাহার মস্তক সমন্বিত উর্দ্ধভাগ মলিন হইয়া যেন সাহেবদের বাবুর্চ্চিখানার চিমনির মত শোভা পাইতেছে ; এহেন যে চশমা—সেই চশমা-পরিহিত নয়নদ্বয় আমার দিকে ঈষৎ উন্নত করিয়া ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া, চশমার উপরি ভাগ দিয়া তীব্র দৃষ্টি পাত করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়ের কোথা হইতে আসা হয় ?"

আমি বলিলাম,—"আমি কলিকাতা হইতে আসিতেছি, ইহাই কি জমিদার রজনীরঞ্জন রায় মহাশয়ের বাটী ?"

কর্ম্মচারী। হাঁ মহাশয় ইহাই জমিদার শ্রীযুক্ত রায় রজনীরঞ্জন রায় বাহাদূরের বাটী। আপনি এখন যে স্থানে উপস্থিত ইহা তাঁহায় কাছারী বাটী। মহাশয়ের কি আবশ্যক ?

আমি। আমি কোন কার্য্যবশতঃ একবার রজনী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি।

কর্ম্মচারী ধীর ও গম্ভীর ভাবে মস্তক আন্দোলন করিতে করিতে বলিল,—"উঁ—হুঁ, ওটি এখন হইবে না।"

আমি। আপনি হয়ত বুঝিয়াছেন, কলিকাতা হইতে এই বৃষ্টিবাদলে আমি এতদূর আসিয়াছি। কাজটা অবশ্য জরুরি, এবার দেখা না হইলে হয়ত পুনরায় আসিয়া আমার সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ নাও ঘটিতে পারে।

কর্ম্মচারী বিরক্তির স্বরে বলিল,—"কি করিব মহাশয়, এটাত আর আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। বাবু এখন বিশ্রাম গৃহে ঘুমাইতেছেন।"

আমিও নাছোড়বন্দা, বলিলাম,—"তিনি যদি এখন প্রকৃতই ঘুমাইয়া থাকেন তাহা হইলে আমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু যদি একবার অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে সংবাদ দেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আমি এই স্লিপখানি দিতেছি, কোন লোক মারফৎ পাঠাইয়া দিন, যদি বাবু জাগ্রত থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে ইহা দিতে বলিয়া দিবেন।"

আমার কথা শুনিয়া কর্ম্মচারীর অনুগ্রহ হইল না, অধিকন্তু আরও বিরক্ত হইয়া বলিল,—"মহাশয় আপনিত বড় ভাললোক নন, আপনার যদি বিশেষ গরজ থাকে তবে ঐ বাহিরে যাইয়া বসুন—আর না হয়—"

মুখের কথা মুখেই রহিল, ঠিক সেই সময়ে একজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রৌঢ় —ঠিক প্রৌঢ় নহে তবে যুবকও বলা যাইতে পারে না, সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই কিছু ভীত হইল, আর সেই কর্ম্মচারী যেন একেবারে নিবিয়া গেল। তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —"এত গোলমাল কিসের হইতেছিল হে ?"

তখন সেই লোকটি, যে আমাকে এতক্ষণ চড়া চড়া কথা শুনাইতেছিল— অতি ধীর নম্রস্বরে বলিল,—"এই ভদ্রলোকটি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছিলেন, তা আপনি শুইয়া আছেন অনুমান করিয়া আমরা উহাঁকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিতেছিলাম।"

আমি বুঝিলাম ইনিই রজনী বাবু। রজনীবাবু আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"আপনি কি আমাকেই খুজিতেছিলেন ?"

আমি। আজ্ঞা হাঁ আপনাকেই খুজিতেছিলাম।

রজনী। কোথা হইতে আসিতেছেন ?

আমি। কলিকাতা হইতে আসিতেছি,আপনার নামে প—বাবুর পত্র আছে।

রজনী। কোন্ প—বাবু ?

আমি তাঁহার পরিচয় দিলে রজনী বাবু আমাকে ডাকিয়া অন্য কক্ষে লইয়া গেলেন। তখন বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আমরা একটি বিস্তীর্ণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। রজনী বাবু আমাকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিয়া তাহাতে বসিতে বলিলেন। কক্ষে অনেকগুলি চেয়ার ছিল, আমি তাহারই মধ্যে একখানিতে বসিবার উদ্যোগ করায় রজনী বাবু বলিলেন,—"ঐ খানিতে বসুন কথাবার্ত্তার সুবিধা হইবে।" যাহা হউক তাঁহারই কথামত প—বাবুর পত্র তাঁহাকে দিয়া সেই চেয়ার খানিতে উপবেশন করিলাম ; তিনি পত্রখানি লইয়া, আমার দক্ষিণ পার্শ্বে একখানি সোফা ছিল তাহারই উপর উপবেশন করিলেন।

রজনী বাবু পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, আমি সেই অবসরে একবার কক্ষটি দেখিয়া লইলাম। মেজের উপর কার্পেট পাতা, তাহার উপর দূরে দূরে তিনখানি মার্ব্বেল প্রস্তরের টেবিল স্থাপিত করিয়াছে। প্রত্যেক টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি করিয়া চেয়ার। আমি কক্ষের মধ্যস্থিত টেবিলের সম্মুখ ভাগে বসিয়াছিলাম, তাহারই দুইপাশে দুইখানি আবলুস কাঠের পীতবর্ণ মখমল-মণ্ডিত সোফা ; দেওয়ালগুলি সুন্দররূপে চিত্রিত। স্থানে স্থানে মার্ব্বেলের সাইড বোর্ড ও কর্ণার বোর্ডে সুদৃশ্য শ্বেত প্রস্তরের মূর্ত্তি ও বড় বড় দর্পণ সজ্জিত রহিয়াছে। কক্ষের চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি মেহগ্নি কাঠের আলমারি। তাহার কোনখানি আগাগোড়া পুস্তকে বোঝাই ; পুস্তকগুলির সুদৃশ্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিত পশ্চাৎভাগ বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। দেখিলাম তাহাতে Shakespeare এর সজীবতা রহিয়াছে, Tennyson এর ওজস্বিতা, Wordsworth এর প্রকৃতি অনুরাগ, Bane এর রাজনীতিজ্ঞান রহিয়াছে, Ruskin এর নৈতিকতত্ত্ব রহিয়াছে। অনেকের অনেক রহিয়াছে, কিন্তু সকলি পরের ধন, সকলি বৈদেশিক। আমাদের আপনার বলিবার কিছুই নাই। আমার বড় ক্ষোভ হইল। ক্ষোভে দুঃখে সে স্থান হইতে নয়ন ফিরাইয়া পার্শ্বের আলমারির দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম তাহাতে ছোট বড় সরু মোটা অনেক শিশি রহিয়াছে।

কাহারও গলায় ফিতা বাঁধা, কাহারও বুকে ছবি আঁকা, অনেক ধরণের অনেক শিশি রহিয়াছে। পড়িয়া দেখিলাম সকলগুলিই এসেন্সের শিশি, কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে কি ইহারও সকলগুলি বৈদেশিক। কোনটী ফ্রান্সের প্যারিসে, কোনটি ইংলণ্ডের লণ্ডনে, কোনটি জার্ম্মণির কোলনে প্রস্তুত। ভারতের কি কিছুই নাই? কর্ম্মজগতে ভারত কি এতই নিশ্চেষ্ট এতই নির্জ্জীব?

দেওয়াল গাত্রে দেখিলাম বড় বড় কয়েকখানি তৈলচিত্র রহিয়াছে। এক একখানি করিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখে একটার উপর দৃষ্টি পড়িল। সেটা ঠিক চিত্র নহে একটা কি লেখা! পড়িয়া বুঝিলাম বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট রজনী বাবুর দানশীলতায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রায়বাহাদুর উপাধি দিয়াছেন; এখানি তাহারই সার্টিফিকেট! কিন্তু সার্টিফিকেট্‌কে এরূপ ভাবে বাঁধাইয়া তোযাখানায় রাখিবার উদ্দেশ্য কি! প্রথমে বুঝিতে আমার একটু কষ্ট হইল—একটু চিন্তার পরেই সমস্যাটা পরিষ্কার হইয়া গেল। রজনী বাবু কেন যে আমাকে প্রথমে সেই নির্দ্দিষ্ট চেয়ারখানিতে উপবেশন করিতে বলিয়াছিলেন তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম—কারণ সে চেয়ারখানিতে বসিলে অতি সহজেই তাহাতে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়—আমার চক্ষে যে এতক্ষণ এখানি পড়ে নাই তাহাতেই আশ্চর্য্য বোধ হইল!

আমার চিন্তা তখন অন্যমুখী হইল। আপনার গৌরবকে লোকের নিকট বাড়াইয়া তুলিবার জন্য একি চেষ্টা! এরূপ নীচ প্রবৃত্তি এরূপ অধম চেষ্টাকে আশ্রয় করিয়া যাহার গৌরব প্রতিষ্ঠিত,সে ব্যক্তি প্রকৃতই কি সে গৌরবের ন্যায্য অধিকারী। যে ব্যক্তি প্রকৃত গুণী তাহার গুণ লোকসমাজের হৃদয়ঙ্গম করাইতে গুণের সার্টিফিকেট লোকচক্ষুর উপর এরূপ ভাবে ধরিতে হয় না প্রত্যেক সামান্য কার্য্য হইতে কোন অসামান্য কার্য্য পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই সেই গুণের অভিব্যক্তি স্পষ্টই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খাঁটি সোণায় গিল্টির আবশ্যক হয় না, শিশার উপরেই রাংতা পাতার আবশ্যক।

রজনী বাবু পত্রখানিকে দুই তিনবার পাঠ করিয়া একটু চিন্তার পর বলিলেন, "প—বাবু যাহা লিখিয়াছেন—সেটা খুব ভাল কথা। একটা ফণ্ড খুলিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণ। উদ্দেশ্যটা অতিমহৎ তাহাতে ভুল নাই, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি না স্বয়ং ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্য সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব—দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি নিবারণের ভার স্বয়ং ভারত গভর্ণমেণ্ট আপনার হস্তে লইয়াছেন—আমাদের এই ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় আবশ্যক কি?"

আমি বুঝিলাম রজনী বাবু ধনবান্ জমিদার হইলেও আর একজনের নিমকের চাকর—অথবা অপরকে নিমক খাওয়াইয়া আপনি চাকর সাজিয়াছেন। আমাকে বলিতে হইল, "আবশ্যক আছে বই কি! গবর্ণমেণ্টের হাতে দুর্ভিক্ষ-নিবারণের ভার আছে সত্য, কিন্তু তাহার কার্য্যকারিতা কোথায়? দেশের দুর্ভিক্ষের তুলনায় তাহা অতি অল্প। গ্রাম্য চৌকিদার থানার ইনেস্পেক্টরকে গ্রামবাসীর অনশন বার্ত্তা প্রদান করিল। ইনেস্পেক্টর বাবু জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে তাহা রিপোর্টে জানাইলেন। সাহেব বাহাদুর কিন্তু ব্যস্ত হইবার কোন কারণই দেখিতে পাইলেন না। যেহেতু Meteorological Department এর রিপোর্টে বলিতেছে, এ বৎসর আকাশের অবস্থা ভাল, বৃষ্টি উপযুক্তমত হইয়াছে, আকাশে ধূমকেতু দেখা দেয় নাই, আকস্মিক শিলাবৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু যখন ক্ষুৎপীড়িতের হাহাকারধ্বনি তাঁহার সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইবার উপক্রম করিল, তখন তিনি দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বলিয়া কতকটা ধারণা করিতে পারিলেন; তৎপরে Test workএর ব্যবস্থা করিতে করিতে দুর্ভিক্ষপীড়িতের অর্দ্ধেক মরিয়া গেল, Relief work দ্বারা আর বেশী কাহাকেও সাহায্য পাইতে হইল না। সেই জন্য বলিতেছি তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতার আবশ্যক আছে—অনশনের কষ্ট আমরা যতটা বুঝিতে পারি, তাঁহারা হয়ত ততটা বুঝিতে পারেন না। সেইজন্য তাঁহাদের এ বিষয়ে এতটা শৈথিল্য—যদি আমরা চেষ্টা করিয়া পূর্ণ করিতে পারি—দেশের ভ্রাতারা যখন অনশনে মরিতে থাকে, তখন পরের মুখাপেক্ষী না হইয়া যদি আমরাই তাহার ব্যবস্থা করিতে পারি, তবে সেটা কি একটা সুখের কথা নহে?"

রজনী বাবু ধীর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আপনি অত কথা বলিতেছেন কেন—আমি ত এত কথা বলিবার মত কিছু বলি নাই!"

প্রকৃতই কথা কিছু বেশী হইয়াছিল। রজনী বাবুর আচার ব্যবহার দেখিয়া এবং কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমাকে একটু বিরক্ত হইতে হইয়াছিল—সেই বিরক্তি দমন করিতে পারি নাই বলিয়াই এত কথা বাহির হইয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে আপনি কি বলিতেছেন?"

রজনী বাবু। আমি বলিতেছিলাম কি—ইংরাজের ন্যায় এরূপ একটা বিপুল রাজশক্তির সহিত প্রতিযোগিতায় আবশ্যক কি? বিশেষতঃ তাহাতে আমরা বাঙ্গালী—একটি গ্রাম্য দেবতার পূজা নির্ব্বাহের সময়েই কত বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া থাকি—আর এটা ত একটা বৃহৎ ব্যাপার। আমার ভয় হইতেছে

এতটা পরিশ্রম ও অর্থব্যয় শেষে একটা 'গোলে হরিবোল' হইয়া বৃথা অপব্যয়িত হইবে!

আমি। সে সম্বন্ধে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। যেহেতু দেশের গণ্যমান্য লোকসমূহ এ ব্যাপারের এক একটা অংশকে আপনাদের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে ফল খুব সন্তোষজনক হইয়াছে। এটা এখন সেপ্টেম্বর মাস যাইতেছে, দুর্ভিক্ষ প্রায় থামিয়া আসিয়াছে—আর যাহা অল্প পরিমাণে আছে তাহার জন্যই এই উদ্যোগ—আমরা যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহার অপেক্ষা অধিক ফললাভ করা গিয়াছে বোধ হয়।"

রজনীবাবু। তবে ত কাজ ভাল রকমই চলিতেছে—তা চলিবে বই কি! দেশের যত বড় বড় লোক রহিয়াছেন—তাহাতে কাজ ভাল হইবারই কথা,—তবে আর আমাকে কেন এর মধ্যে আনেন? আমরা পল্লীগ্রামের লোক, বুঝেছেন কিনা—এত গোলমালের মধ্যে আমরা যেতে পছন্দ করিনা বুঝেছেন কিনা!—ওরে কে আছিস্ রে!

কক্ষে একজন চাকর প্রবেশ করিল। রজনী বাবু তাহাকে তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "তোদের কি কোন বুদ্ধি নাই—ভদ্রলোক কতক্ষণ বসিয়া রহিয়াছেন—তামাকু দিতে হইবে না?"

আমি বলিলাম, "তামাকুর আবশ্যক নাই—আমি উহা ব্যবহার করি না।"

রজনীবাবু। তবে গোবিন্দকে ডাকিয়া এক 'কাপ' চা দিতে বলিয়া দে।

আমি। চা'য়েরও আবশ্যক নাই, আমি কদাচিৎ চা ব্যবহার করিয়া থাকি।

রজনী বাবু। তা ভাল ভাল—ওরকম কোনটার অভ্যাস না রাখা খুব ভাল। তবে কি জানেন আমাদের এ পল্লীগ্রামে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া চা ব্যবহার করিতে হয়। এখানকার জল হাওয়া ত সহরের জল হাওয়ার মত নয়—বড় ম্যালেরিয়ার ভয়। আরও একটা কথা এখানে ওখানে যাওয়া আশা আছে, লোকের সম্মান রক্ষার জন্যও চা'টা খাইতে হয়।

এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে তাহার চিন্তা করিতেছি, রজনী বাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"এতক্ষণ কথাবার্ত্তায় আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম—মহাশয়ের নামটি কি?

"শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

রজনী বাবু। আর একটা কথা, দেখুন অবিনাশ বাবু, এ বৎসর ত এই দুর্ভিক্ষ, প্রজারা খাজনা দিতে পারে না—কেহ একবারেই পারিবে না বলিয়াছে,

কেহ কায়ক্লেশে অর্দ্ধেক দিয়াছে। কিন্তু রাজা ত আমাদের নিকট হইতে এক পয়সাও ছাড়িবে না। এ বৎসর ঘর হইতে সকল খাজনা দিতে হইবে; এ দুর্ব্বৎসরে কোন্ দিক রক্ষা করি বলুন। প—বাবুর সহিত বাল্যকাল হইতে আমায় আলাপ পরিচয় আছে, আর উদ্দেশ্যটাও অতি মহৎ। কিন্তু কি করি বলুন, যে দুর্ভিক্ষের বৎসর। তবে আশ্বিন কিস্তির খাজনা আদায় হইলে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিব তাহার এ দিকে সুবিধা হইবে না।"

সাফ্ জবাব। দেশের এতবড় একটা ধনবান্ লোক, দেশের দশজনের নিকট পরিচিত গণ্যমান্য এত বড় একটা 'রায় বাহাদুর' দেশের এ দুঃবিপত্তি কালে এত উদাসীন থাকিবে, এত সাদা কথায় উত্তর করিবে তাহা আমরা মনেই করিতে পারি না। সেই জন্যই ত বলি আমরা যে কল্পনাকে লইয়া নাড়াচাড়া করি তাহা বুঝি কেবল কল্পনা। আমরা যে আশায় বুক বাঁধিয়া জীবিত রহিয়াছি তাহা বুঝি শুধু আশা মাত্র। তাহা না হইলে যখন সেই আশায় প্রবুদ্ধ হইয়া, গুরু কর্ত্তব্যের বোঝা মস্তকে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, যখন জগতের দশজনের একজন হইবার আশায় মুগ্ধ হৃদয়ে কর্ম্মীর পথ অনুসরণ করি, তখন দু'চার পা যাইতেই পদস্খলন হয় কেন? কর্ম্মের বিরাট সজীবতার মধ্যে এমন সাংঘাতিক ভুল একান্ত নির্জীব অবস্থায় আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাই কেন?

আমার আর বলিবার কিছুই নাই। "এখন তবে আমি আসিতে পারি?"

"আসুন মহাশয়, প্রণাম।"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

শিখগুরু।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

———:০:———

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হরগোবিন্দের গুরুত্বকালে শিষ্যসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। অর্জ্জুন যে প্রণালীতে অর্থাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে এবং পুত্র হরগোবিন্দের অস্ত্রের বলে মোগল সাম্রাজ্য মধ্যে একটি ক্ষুদ্র শিখরাজ্য কার্য্যতঃ স্থাপিত হইয়াছিল।

হরগোবিন্দ এত কর্ম্মের ভিতর থাকিয়াও আপনাকে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি আপনাকে সর্ব্বদাই 'নানক' বলিতেন। পরম গুরুর আত্মা যে পরবর্ত্তী গুরুগণের মধ্যেও অবস্থিতি করেন, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি ভাবিতেন, তাঁহার আত্মা ও নানকের আত্মা এক; অবস্থাভেদে এখন ভিন্নরূপে প্রকাশমান। তিনি শিখধর্ম্মের কয়েকটি প্রয়োজনীয় ও প্রধান সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিখদের মৎস্যমাংসাহার নিষিদ্ধ ছিল, তিনি কিন্তু মাংসাহারের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন,—তাঁহার আদেশে এক গোমাংস ব্যতিরেকে আর সব মাংসই শিখদের আহার্য্য হইল।

শিখগণকে সামরিক বীর করিয়া তুলিবার জন্য হরগোবিন্দ সমস্ত জীবন ও শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কারগুলিও ইহার অনুকূল। তিনি পিতার আদর্শকে আরও ফুটাইয়া তুলেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। আর একটি আশ্চর্য্য এই যে, তিনি শিখদিগকে নূতন কোন ধর্ম্মমত শিখান নাই, পিতার ধর্ম্মমতই তাহাদিগকে শিক্ষা দেন। আদি গ্রন্থের জন্য তিনি কোন গাথা লেখেন নাই। শিখদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার জীবন অতি অল্পবয়সেই সমাপ্ত হয়। তিনি চুয়াল্লিশ বর্ষ মাত্র বাঁচিয়াছিলেন। আরও কিছুদিন যদি হর বাঁচিতেন, তবে বোধ হয় তিনি একটি রাজ্য ভালরূপে স্থাপন করিয়া যাইতে পারিতেন।

গুরু হরগোবিন্দ স্বীয় গুণাবলী দ্বারা শিখসমাজের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। শিখেরা তাঁহার প্রীতির জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারিত। গুরু তাহাদের নিকট এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাহারা গুরুর কথা ভাবিতে ভাবিতে সংসারের সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। গুরু ইহলীলা শেষ করিয়া অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইলে বহুসংখ্যক শিখ অনুমৃত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। দুইজন গুরুর চিতায় আরোহণ করিয়া সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করিল। শেষে সপ্তম গুরু হর রায় তাহাদের সে মৃত্যুর প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি তাহাদের মরিতে নিষেধ করিলেন। শিখেরা গুরুবাক্য ঠেলিতে পারিল না। বিষণ্ণ মনে চুপ করিয়া রহিল।

শিখদের গুরু-ভক্তির আন্তরিকতা বুঝাইবার জন্য আমরা এখানে একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। একদা শ্রীগুরু হরগোবিন্দ অশ্বারোহণে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে অনেকগুলি শিখ অনুচর চলিয়াছে। এই সময় সেই পথ দিয়া একটি সিপাই একটি খাঁচা লইয়া যাইতেছিল, সেই খাঁচায় একটি তোতা পাখী বেশ পরিষ্কার স্বরে ঈশ্বরের স্তোত্র পাঠ করিতেছে। গুরু

পাখীর এরূপ বাক্‌চাতুর্য্য দর্শনে বড়ই মুগ্ধ হন। তিনি পাখীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তোতা দেখিতেছি পণ্ডিতের মত জ্ঞানবান হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া গুরু যথাস্থানে যাত্রা করিলেন।

গুরুর এ কথায় অনুচর শিখদের মধ্যে একটা মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, গুরু দ্বারে (অর্থাৎ গুরুর প্রাসাদের দ্বারদেশে) ঐই পাখীকে রাখিলে বেশ হয়, যে সব শিখ সে প্রাসাদের পাশ দিয়া যাইবে তাহাদের সকলেরই হৃদয় ইহার সঙ্গীত-সুধাপানে মুগ্ধ হইয়া যাইবে।

তাহাদের এ কথা গুরুর কর্ণে উঠিল। তিনি বলিলেন—"এ পাখীতে তাঁহার কোন আবশ্যক নাই, আর নিরপরাধ পাখীকে খাঁচায় পুরিয়া রাখা বড়ই অন্যায়। তবে যদি শিখেরা তাঁহাকে উপহার দিতে ইচ্ছা করে, তবে যেন উহা কিনিয়া লওয়া হয়, আর গুরু-দ্বারের নিকট ছাড়িয়া দেয়। সে ওখানে নিজে বাসা বাঁধিয়া থাকিবে। উহাকে কিন্তু খাঁচায় রাখা হইবে না।"

ভাই হরপাল অনুচরদের একজন। গুরুর কথায় তাঁহার বড় আমোদ হইল। তিনি আর কোন কথা না বলিয়া বরাবর সেই সিপাহির নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গুরুর জন্য এই পাখীটা দরকার। কি হইলে তুমি ইহা বেচিতে পার?" সিপাহি দেখিল, শিখটি বড়ই সরল, আর পাখী গ্রহণে তাঁহার বড়ই ঔৎসুক্য। সে তখন ভাবিয়া একটি দর হাঁকিল। দরটা বাস্তবিকই খুব বেশী হইল। এত বেশী যে, তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। সিপাহি পাখীর মূল্যস্বরূপ হরপালের কুমারী ভগ্নীকে প্রার্থনা করিল। পাখীটি তাহার বড়ই প্রিয় ছিল, তাই সে এমন দর হাঁকিল। সে ভাবিল, এমন দরে কেহই পাখী কিনিতে সম্মত হইবে না। কিন্তু হরপাল ভাবিলেন, তাঁহার যাহা কিছু, সবই ত গুরুর। তবে আর এ মূল্য দানে বাধা কি? এই ভাবিয়া ভক্ত তাহাকে ক্ষণেক অপেক্ষা করিতে বলিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। গৃহে যাইয়া হর মাতাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। মাতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"অনুমতি দাও, গুরুর জন্য পাখী কিনি।" সন্তানবৎসলা ভক্তিমতী মাতা পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"গুরুর ইচ্ছা পূর্ণ করাই প্রকৃত শিখের কর্ম্ম।" তারপর তিনি কন্যাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"বাছা! তোমাকে এখন পরের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে, তাহার প্রতি ভক্তিমতী থাকিও, তাহার মতের কখনও অন্যথাচরণ করিও না। তোমার এ বিবাহ ব্রাহ্ম বিবাহ অপেক্ষাও উচ্চ ধরণের। গুরু নিজে তোমার এ বিবাহের

সাক্ষী থাকিবেন।” তারপর মা কন্যাকে চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভগ্নী নীরবে ও ধীরভাবে ভ্রাতার সহিত চলিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহারা সিপাহীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

পাখীটি ত্যাগ করিতে সিপাহীর নিতান্তই অনিচ্ছা। সে হরপালের সহিত তাঁহার ভগ্নীকে আসিতে দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইল। সে আর একটা মতলব আটিল। হরপাল তাহাকে ভগ্নীদান করিলে সিপাহী বলিল;—“না, দামটা বড়ই অল্প হইল। তোমার ভগ্নীর সহিত তোমার কন্যাকেও চাই।” হরপাল তাহার এরূপ কথার খেলাপে একটু ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু তাহাকে একটু দয়ার পাত্র ভাবিয়া বলিলেন,—“আমার এই ভগ্নীকে তোমায় দিলাম। ইহাকে এখন রাখ। ক্ষণেক দাঁড়াও।” এই বলিয়া শিখ-বর গৃহে যাইয়া পাখীর বৃত্তান্ত তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন। শুনিয়া দেবী উত্তর করিলেন,—“আমার যা’ কিছু সবই তোমার। আবার তোমার যাহা কিছু সবই গুরুর। কাজেই আমাদের সবই তাঁহার সম্পত্তি। তুমি এখনি আমাদের কন্যাকে লইয়া যাও।” তৎপরে দেবী কন্যাকে বলিলেন যে, যাহার হাতে তাহাকে দেওয়া হইবে, তাহাকে যেন সে স্বামীর ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করে। কন্যা মাতার আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া পিতার সহিত যাত্রা করিল।

হরপাল ভগ্নী ও কন্যা বিক্রয় করিয়া তোতা কিনিলেন। পাখী পাইয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি ছুটিয়া গুরুর উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইচ্ছা, শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্মে তাহা উপহার দিবেন। কিন্তু সেখানে যাইয়া বীর শুনিলেন যে, গুরু উদ্যান তাগ করিয়া স্বীয়প্রাসাদে চলিয়া গিয়াছেন।

ইতিমধ্যে সিপাহিও বিস্মিত ও প্রফুল্লমনে গৃহে যাইয়া তাহার স্ত্রীকে সমস্ত ঘটনা বলিল। তাহার স্ত্রী সে সব কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ভীত হইল। স্বামীর নিষ্ঠুরতায় তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। হরপালের গুণ গান করিতে করিতে সে বলিল—“শীঘ্র যাইয়া গুরুর নিকট ক্ষমা চাও, নইলে সর্ব্বনাশ হইবে। গুরু ইচ্ছা করিলে, ঈশ্বরেরও অভিশাপ মোচন করিতে পারেন।” দুশ্চিন্তায় রমণীর হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুর নিকট যাইবার জন্য স্বামীকে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল। শিখদের স্বার্থত্যাগে ও গুরুভক্তিতে ইতিপূর্ব্বে সিপাহির হৃদয়ে একটা ভাবান্তর আসিয়াছিল। এখন স্ত্রীর কথায় তাহা আরও গভীর হইল। সে ভাবিল, যে গুরুর এমন ভক্ত হয়, সে গুরু না জানি আরও কত মহৎ। সে বলিল,—‘এই

বালিকারা আমার কন্যা।' তারপর তাহারা স্বামী স্ত্রীতে আত্মীয় জন পরিবেষ্টিত হইয়া গুরুর আবাসে যাত্রা করিল।

সিপাহি, তাহার স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়দের লইয়া গুরুর দ্বারে উপস্থিত হইল ও গুরুর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল। গুরুর নিকটে উপনীত হইলে তাহারা সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিল। সিপাহি কাতরভাবে গুরুর ক্ষমা চাহিল ও সকল কথা নিবেদন করিল। আরও বলিল—"অনুগ্রহ করিয়া আমায় শিখ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন।"

বিবরণ শুনিতে শুনিতে গুরু ধ্যানস্থ হইলেন। অনেকক্ষণ এইরূপ ভাবে কাটিয়া গেল। এই সময় হরপালও তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া গুরু স্বীয় আসন ত্যাগ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। গদগদ কণ্ঠে গুরু বলিলেন,—"তুমি, তোমার মা, তোমার স্ত্রী. তোমার ভগ্নী ও কন্যা সকলেরই হৃদয় খুব উচ্চ, আত্মা খুব মহৎ। তোমরা সকলেই মুক্ত।" তারপর বালিকাদের গুরুর আবাসে আনা হইল। গুরু তাহাদের আপনার কন্যার ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন। সিপাহি ও তাহার পরিবারবর্গ সকলে শিখ ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। যে ধর্ম্ম পালন করিয়া মানুষ এত মহৎ হয়, সেই ধর্ম্মের পালকেরা এক সময় ভারতকে স্বাধীন করিবার জন্য উন্মত্ত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? শিখ ধর্ম্ম কেবল উপদেশ দ্বারাই প্রচারিত হয় নাই। এরূপ আত্মোৎসর্গ না করিলে, কোন কালে কোন ধর্ম্মই উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

শ্রীবসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পার কর।*

—:০:—

পার কর কে গা তুমি, শোন না কাণে?
আমি গোয়ালার মেয়ে যাব বাথানে।
সারাদিন হেথা এসে রয়েছি বসে;
একে একে কত ডোঙ্গা গেল যে ভেসে।

* মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ৪। ৫ ক্রোশ ব্যবধানে হিজলের

যারে দেখি তারে বলি পার করনা,
ডোঙ্গাখানি একবার কূলে ধর না ?
ঘাস লয়ে যায় সবে আপন মনে ;
আমার মিনতি কেহ শোনে না কাণে।
বড় বান, মেঠো নদী কুমীরে ভরা ;
একা আমি ব'সে ঘাটে, বেণাতে ঘেরা।
বাথানে সাজান আছে দুধের হাঁড়ি ;
বেলা গেল, ফিরে যাব এখনি বাড়ী।
বাবার খাবার সাথে রহিল খোয়া,
বাথানে উঠিল যে গো সাঁজালে ধোঁয়া।
কে গা তুমি ডিঙ্গী বেঁধে আছ ও পারে ,
পার কর, ফিরে যাব এখনি ঘরে।
যাই আসি একা সাথে কেহ থাকে না,
গোয়ালার মেয়ে কারো ভয় রাখে না।
চরে দেখ ফেরে পাখি গাঁয়ের কোলে,
সাঁজ এল পড়ে আমি একা হিজলে।

প্রকাণ্ড বিল। হিজলে মুর্শিদাবাদ ও রাড় অঞ্চলের গোয়ালাগণ বাথান করিয়া বর্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত গরু রাখিয়া থাকে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে গোয়ালার মেয়েরা সকাল ও সন্ধ্যায় দুধ লইতে এই বাথানে আসে। দুধের হাঁড়ি ও ডালি-ভরা দুধের ঘটি মাথায় করিয়া যখন তাহারা মাঠের আল পথ ধরিয়া সারি সারি গ্রামে আসিতে থাকে, তখন সে দৃশ্য দেখিতে বড় সুন্দর। বর্ষার বানে বিল প্লাবিত হইলে বাথান উঠিয়া আসে। এদেশে গোয়ালা জাতির প্রকৃতি স্বভাবতঃ কিছু উদ্ধত। গোয়ালা নারীগণও সেইরূপ স্বাধীন ও সাহসী। পাহাড়ে নদীতে কখন বান আসে জানা যায় না, হঠাৎ নদীতে বান পড়ে। দ্বারকা নদী হিজলের মধ্য দিয়া ভাগীরথীতে মিশিয়াছে। দ্বারকাকে চলতি কথায় ডাগরা বলিয়া থাকে। ডাগ্‌রার পর পারে খেয়া ঘাটে গয়লা বউ দুধের হাঁড়ি নামাইয়া বসিয়া আছে। বেলা ডুবু ডুবু, তখনও পার হইতে পারে নাই। খেস মোটা রেশমী কাপড়, মুর্শিদাবাদে হিন্দুরমণীগণ শুদ্ধাচারী হইবার জন্য সদা সর্ব্বদা খেস্ ব্যবহার করিয়া থাকে, খেসের বহর সাধারণতঃ খুব ছোট হয়। বাথানের দুধ দেবসেবায় লাগিবে বলিয়া গোয়ালিনী খেস্ পরিয়াছিল। রুদ্রদেব কান্দী মহকুমার বিখ্যাত জাগ্রত দেবতা। মুর্শিদাবাদ জেলার লোকে মানত বা শাপশাপান্ত করিতে গেলে রুদ্রদেবের দোহাই দিয়াই করিয়া থাকে।

পশ্চিমে হইল রবি সোণার থালা,
মড়ি ঘাটে আলেয়া যে জ্বালিল আলা।
সকালে ফিরেছি ঘরে ধূলামাখা পায়,
তখনো পড়েনি বান কিছু ডাগ্‌রায়!
ফিরে চাও ওগো তুমি শোন না কাণে?
বাবার খাবার নিয়ে যাব বাথানে।
আমরা গোয়ালা জাতি একা আঁধারে,
গিয়ে থাকি মাঠে মাঠে কত গো পারে।
রুদ্রদেবের কিরে বাছা চাহ গো ভুলে,
খেস পরা, একা আছি নদীর কূলে!
যম হ'য়ে রাত এল হালিছে জিউ,
মাঠেতে 'মুনিষ পাট' নাহি গো কেউ।
খালি ঘটি ডালিভরা সাথে কিছু নাই,
ডিঙ্গী ভেড় ওগো বাছা পারে চলে যাই।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

প্রতাপ ও এনক আর্ডেন।*

——:•+:•——

বঙ্কিম চন্দ্রের প্রতাপ এবং টেনিসনের এনকে বাহ্যতঃ প্রভূত পার্থক্য অনুভূত হইবার কথা। প্রতাপ বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকের হাতের ক্রীড়াপুত্তল। বাঙ্গালীর সুখ দুঃখ, বাঙ্গালীর ভক্তি ভালবাসা, বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব লইয়া তাহার জীবন। আর এনক সুদূর প্রতীচ্যের চিরহরিৎ মালঞ্চের প্রস্ফুটিত কুসুম। প্রতীচ্য জীবনের প্রত্যেক দোষ গুণ তাহার জীবনের সহিত সংলিপ্ত।

জগতের দুই চারিটী জিনিষ বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা পদার্থ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় যে, তদ্দ্বারা তাহাদিগকে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধসূত্রে সংবদ্ধ করা যাইতে পারে।

---

* Enoch Arden.

প্রতাপ ও এনক জীবনের প্রত্যেক ঘটনাবলী অনেকাংশে বিভিন্ন হইলেও তাহাদের কার্য্যের মধ্যে এমন একটা সাদৃশ্য আছে যে, একজনকে দেখিতে পাইলেই অপরকেও দেখা যাইবে।

উভয়েই বীর। কিন্তু উদয় নালার যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা ফষ্টরের হস্ত হইতে শৈবলিনীকে উদ্ধার করিতে প্রতাপ যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, এনকের বীরত্বের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। এনক মৎস্যব্যবসায়ী সামান্য ধীবর-সন্তান, এই বিষয়ের উন্নতিই তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। শত্রুর বিপক্ষে অস্ত্রচালনা তাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। তাহার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে যুদ্ধক্ষেত্র বহুদূরবর্ত্তী। তবুও এনক বীর। কবি নিজে বলিয়াছেন :—

"So passed the strong heroic soul away"

এই Heroic soul কথাটী একটু বুঝিয়া দেখিবার আবশ্যক। কবি এই কথাটী তাঁহার নায়কের আধ্যাত্মিক বীরত্ব প্রকাশের নিমিত্ত ব্যবহার করিয়াছেন। বাহ্য বীরত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।

প্রতাপেরও সেই আধ্যাত্মিক বীরত্বই এই প্রবন্ধের প্রধান অবলম্বনীয়। বাহিরে আমরা প্রতাপের যে বীরজনোচিত কার্য্যাবলী দেখিতে পাই তাহাও এই আভ্যন্তরিক বীরত্বের প্রকারান্তর। সুতরাং আমরা শাখা পত্র না দেখিয়া মূল দেখিবার চেষ্টা করিব।

সহজ কথায় বলিতে গেলে উভয়েই প্রণয়ের বীর। উভয়েই নিঃস্বার্থ ভালবাসার জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি। প্রণয়পাত্রের সুখেচ্ছাই তাহাদের জীবনের সর্ব্বস্ব। তাহাদেরই সুখের জন্য উভয়ে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগে কৃত-সংকল্প। প্রণয়েই উভয় জীবনের আরম্ভ, প্রণয়েই উভয় জীবনের সমাপ্তি।

বঙ্কিম চন্দ্র প্রথমেই দেখাইয়াছেন, কেমন করিয়া প্রকৃতির শ্যামল অঞ্চলতলে, অপরের অজ্ঞাতে দুইটী বালক বালিকার নিষ্কলুষ সাদা প্রাণে প্রণয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইল; নৌকা গণনা, তারা গণনা, পুষ্পচয়ন, মালা গাঁথা, পক্ষিস্বরের অনুকৃতি প্রভৃতি বিবিধ শিশুসুলভ চপলতার মধ্যে কেমন করিয়া জাহ্নবীসৈকতে প্রতাপ শৈবলিনীর হৃদয়বিনিময় ঘটিয়া গেল। এনক আর্ডেন কাব্যেও আমরা দেখিতে পাই যে, এনক ও এনি সমুদ্রকূলে তেমনি ক্রীড়াপরায়ণ। এখানে এনকের সঙ্গে ফিলিপকে দেখিতে পাওয়া যায় এইমাত্র প্রভেদ।

"Here on this beach a hundred years ago,

Three children of three houses, Annie Lee,

And prettiest little damsel in the port,
And Philip Ray the miller's only son,
And Enoch Arden, a rough sailor's lad,
Made orphan by a winter shipwreck, played
Among the waste and lumber of the shore,
Hard coils of cordage, swarthy fishing nets,
Anchors of rusty fluke, and boats updrawn;
And built their castles of dissolving sand,
To watch them overflowe'd or follwing up
And flying the white breaker, daily left
The little footprint daily washed away.
A narrow cave ran in beneath the cliff:
In this the children play'd at keeping house
Enoch was host one day, Philip the next,
While Annie still was mistress;"

তৎপরে কবি বলিতেছেন :—

"But when the dawn of rosy childhood past,
And the new warmth of life's ascending sun
Was felt by either, either fixt his heart
On that one girl;"

'চন্দ্রশেখরে' কেবল প্রতাপই শৈবলিনীকে ভালবাসিল, কিন্তু 'এনক আর্ডেন' কাব্যে এনক ও ফিলিপ উভয়েই এনির প্রতি সমান অনুরক্ত হইয়া পড়িল।

বাল্যলীলার অবসান হইলে উভয়কেই জীবন যাত্রায় প্রবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতাপ চলিতে চলিতে বাধা পাইল। এতদিন যাহাকে নিতান্ত আপনার ভাবিত, কালের কুটিলগতি বশতঃ সেই শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের পরিণীতা ভার্য্যা হইল। প্রতাপ, রূপসীকে বিবাহ করিয়া ঐশ্বর্য্য, বল, যশ প্রভৃতির প্রতি মনঃসংযোগ করিয়া তাহাকে ভুলিতে চেষ্টা করিল।

এনকের পথে কোন বাধা উপস্থিত হইল না। এনিকে পাইয়া সে আপনার ক্ষুদ্র কুটীরের উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হইল। শ্রমলব্ধ মৎস্য লইয়া ধনিগণের প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত সকল স্থলেই সমান পরিচিত হইল।

অতঃপর তাহার ভাগ্যে যাহা ঘটিল তাহার সহিত প্রতাপের জীবনের ঘটনার একটু পার্থক্য আছে। প্রতাপ ক্রমশঃ যশ ও সম্পদের দিকে প্রধাবিত হইতে লাগিল। এনকের জীবন-বায়ু কিন্তু প্রতিকূল বহিতে লাগিল। তাহা-

জের মাস্তুলের উপর হইতে পড়িয়া তাহাকে শয্যাশায়ী হইতে হইল। তাহার মৎস্যের ব্যবসায় অপরে আসিয়া অধিকার করিয়া লইল। দারিদ্র্যের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করিল; ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশা ক্রমে অন্ধকারে লীন হইতে লাগিল।

ইহার পর উভয়েরই জীবনের গতি এক পথে। এনকের শেষ আশাটুকু একবারে মুছিয়া যাইতে না যাইতে নিবিবার আগে একবার দীপ হাসিল; আবার তাহার প্রাণে একটু ক্ষীণ আশার সঞ্চার হইল। সে চীন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। প্রাণাধিকা এনির প্রবল প্রতিবাদ কোথায় ভাসিয়া গেল, কচি শিশুগুলির স্নেহমুখ তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। এনির জন্য সমস্তদিন পরিশ্রম করিয়া আপনার ক্ষুদ্র কুটীরখানি সাজাইয়া দিল; তাহার ভরণ পোষণের নিমিত্ত একটী ক্ষুদ্র দোকান প্রতিষ্ঠিত করিল। তারপর সন্তানগণের মুখচুম্বন করিয়া শিশু সন্তানটীর কেশগুচ্ছ লইয়া তাহার সুখের বাসা—শান্তি-কুটীর পরিত্যাগ করিল।

পূর্ণ আশা বুকে লইয়া এনক চীনে উপস্থিত হইল। সেখানে সামান্য ব্যবসায়ে কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতেও সক্ষম হইল। ফিরিবার কালে সন্তানগণের জন্য নানাবিধ বর্ণের নানাবিধ খেলানা সংগ্রহ করিল। এনির মুখ, সন্তানগণের স্নেহ উপদ্রব বোধ হয় তাহার মনে জাগিতে লাগিল। এনক গৃহাভিমুখে ফিরিল।

কয়দিন জাহাজ বেশ চলিল। বৃত্তাকার সমুদ্র ক্রমেই পশ্চাতে পড়িতে লাগিল। জাহাজের সম্মুখ প্রদেশে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রজল গর্জ্জন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

পরে আমরা এনককে যেরূপে দেখিতে পাই তাহা কল্পনাতীত।

যে এনক স্ত্রীপুত্রের সুখের জন্য আপনাকে বলিদান দিতে সমুৎসুক, যাহাদের কিয়ন্মাত্র অমঙ্গলে যাহার অন্তরে দারুণ বেদনার সঞ্চার করিত, যাহাদের বিষণ্ণমুখ দেখিলে যাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইত, যাহাদের ভবিষ্যৎ দারিদ্র্যের আশঙ্কায় নিজ সুখেচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়া সুদূর সমুদ্রযাত্রায় প্রবৃত্ত, সেই আজি ভগ্নপোত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া একাকী সাগরতরঙ্গশব্দিত বন্য-জন্তু-সমাকুল, জনসমাগমবিরহিত ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থান করিতেছে। চারিদিকে ভীষণ সাগরকল্লোল, মধ্যে ক্ষুদ্র পাহাড়—আপাদমস্তক বন্য পাদপপূর্ণ। নানাবিধ ক্ষুদ্র বিহঙ্গমের কলকাকলি, বিদ্যুৎপ্রভামণ্ডিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গের

ইতস্ততঃ গমনাগমন সকলে মিলিয়া তাহার মনে বহুদিবসাতীত একটা সুখ স্মৃতির উদয় করিয়া দিতেছে।

এনকের এই অবস্থায় ফিলিপ এবং এনির বিবাহ হইয়া গেল। পূর্ব্বে যেমন গির্জ্জা হইতে ঘণ্টাধ্বনি হইয়াছিল এখনও তেমনই হইল। এনক ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না! কিন্তু সুদূর বিজন প্রদেশেও তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে যেন সেই ঘণ্টার ক্ষীণ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অলক্ষিতে তাহার অদৃষ্টপথে সহসা অর্গল পতিত হইল; বিনা জলদোদয়ে তাহার মস্তকে কঠোর কুলিশ পতিত হইল। এনি বা এনক কেহই জানিল না যে, তাহাদের একের বিনাশের বীজ এইখানে রোপিত হইল।

এদিকে শৈবলিনী অর্দ্ধসংসারী পণ্ডিত চন্দ্রশেখরের হস্তে পতিত হইল সত্য, কিন্তু বাল্যে প্রতাপ ও তাহার মধ্যে যে প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেখা গিয়াছিল, তাহার উদ্ধারের কোনরূপ যত্ন দেখা গেল না। বিনা যত্নেও বৃক্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুইজনের এক জনও তাহা দেখিল না বা জানিল না। পরে দুই একটী ঘটনায় এই প্রধূমিত বহ্নিতে আবার ঘৃতাহুতি পড়িল। ফষ্টরের হস্তবিমুক্ত শৈবলিনীকে দেখিয়া সুপ্ত সিংহ আবার জাগিয়া উঠিল। মনে প্রবল ভাবলহরী কেবল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। যদি বিবাহের পর আর কখনও উভয়ের সাক্ষাৎ না ঘটিত, তাহা হইলে এতদূর হইত কিনা সন্দেহ। যাহাকে একদিন মাত্র ভালবাসা গিয়াছে, বৎসরের পর বৎসরের আবর্ত্তনে তাহাকে ভুলিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু সহসা আবার যদি কখনও সাক্ষাৎ ঘটে, তাহা হইলে পুনরায় সেই পূর্ব্ব ভাব জাগিয়া উঠে।

অতঃপর উভয়কে এক কাষ্ঠফলক অবলম্বনে জাহ্নবীবক্ষে সন্তরণ-নিরত দেখিতে পাই।

পূত জাহ্নবীবক্ষে চিরপরিচিত প্রতাপ এবং শৈবলিনী ভাসিল। এখানে কেহ তাহাদিগকে দেখিতে নাই, কেহ দোষ দিতে নাই, উভয়ে অবাধে কথোপকথনে রত।

শৈবলিনী বলিল "আমি শপথ করিব। কিন্তু তুমি একবার ভাবিয়া দেখ আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ, আমি তোমাকে চাহিনা, তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব?"

প্রতাপ হাত ছাড়িল। শৈবলিনী আবার ধরিল। তখন অতি গম্ভীর, স্পষ্টশ্রুত, অথচ বাষ্পবিকৃত স্বরে শৈবলিনী কথা কহিতে লাগিল—বলিল—

"প্রতাপ, হাত চাপিয়া ধর। প্রতাপ. শুন, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি তোমার মরণ বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন, তোমার শপথ! আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্ব্ব সুখে জলাঞ্জলি! আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

শৈবলিনী প্রতাপের হাত ছাড়িয়া দিল; কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল।

প্রতাপ ও এনক দুই জনকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় তাহাদের শৈশব-সঙ্গিনীর প্রতি অনুরাগ অপরিমেয়; কিন্তু প্রতাপ ও শৈবলিনীর মধ্যে চন্দ্রশেখর ও রূপসীর প্রকাণ্ড ব্যবধান। এনক এনির মধ্যেও সুবিস্তৃত সাগর এবং ফিলিপের তদ্রূপ ব্যবধান। উভয় পিপাসীর সম্মুখেই শীতল বারিনির্ঝর, কিন্তু সে বারিপানে তাহাদের অধিকার নাই।

বাল্য জীবন অবসান মাত্র তাহাদের পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল, এতদিনে তাহা সম্পূর্ণ হইতে চলিল। ফষ্টরের হস্ত হইতে শৈবলিনীকে মুক্ত করার পর প্রতাপ ভৃত্যকে বলিয়া দিয়াছিল "শৈবলিনীকে জগৎ শেঠের গৃহে লইয়া যাইও।" কিন্তু ভৃত্য স্বেচ্ছায় তাহাকে প্রতাপের গৃহেই উপস্থিত করিল। "প্রতাপ জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন যে, শ্বেত শয্যার উপর কে নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালে গঙ্গার স্থির শ্বেতবারি-বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল শ্বেত পদ্মরাশি ভাসাইয়া দিয়াছে। মনোমহিনী স্থির শোভা! দেখিয়া, প্রতাপ চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বা ইন্দ্রিয়বশ্যতা প্রযুক্ত যে তাঁহার চক্ষু ফিরিল না এমন নহে—কেবল অন্যমন বশতঃ তিনি বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল। অকস্মাৎ স্মৃতিসাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।" তাঁহার শৈবলিনী আজ তাঁহার নিকট পর। চোখে দেখিবার বা একবার বাক্যালাপ করিবার অধিকারও তাঁহার নাই। প্রতাপ কেবল দেখিয়া আশা মিটাইল।

ইহার পর শৈবলিনীর নরক যন্ত্রণা। যন্ত্রণার অবসানে শৈবলিনী স্বামী পাইল—সংসার পাতিতে বসিল। প্রতাপ মনে মনে কাঁদিল। তাহার আশা ভরসা ফুরাইল। কিন্তু বড় সুখীও হইল।

শৈবলিনীর সুখ দেখিয়া, তাহার সেই সুখ চিরস্থায়ী করিবার জন্য প্রতাপ জীবন বিসর্জ্জনে সমুৎসুক। প্রতাপ উদয়নালার পথে। শৈবলিনী গোপনে ডাকিয়া বলিল "যত দিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ

করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কতদিন বশে থাকিবে জানি না। এজন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।”

কথাটা সময়োচিত হইয়াছিল। প্রতাপ তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিল। পালনের সময়ও পাইল। প্রতাপ অশ্ব ছুটাইল। তারপর যাহা ঘটিল তাহা বলিবার আবশ্যক করে না। শৈবলিনীর সুখের জন্য—চন্দ্রশেখরের সুখের জন্য—প্রতাপ মরিল। প্রতাপের আত্মত্যাগ অপেক্ষা শৈবলিনীর প্রতি প্রবল আসক্তি-ত্যাগই তাহার অধিক মহত্ত্বের পরিচায়ক। বীর প্রতাপ, বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া, জিতেন্দ্রিয়তার পূর্ণ পরিচয় দিয়া, আপনার পরীক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া চলিয়া গেল। ক্রমশঃ।

শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী।

নিয়তি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

——ঃ০ঃ——

প্রায় একপক্ষ কাল পরে যমুনার স্কন্ধের ক্ষত আরোগ্য হইল। তখন বেদনোরে ফিরিবার জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে আপনার মনোভাব সঙ্গসিংহকে জ্ঞাপন করিল। সঙ্গসিংহ তাহাকে আরও কয়েক দিন থাকিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে বলিলেন; কিন্তু যমুনা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, তারার জন্য তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া সঙ্গসিংহও আর কোন বাধা দিলেন না। যমুনা তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। সঙ্গসিংহ জনৈক ভীলকে পথপ্রদর্শকরূপে তাহার সঙ্গে দিলেন। যাইবার সময় যমুনা আবার পুরুষবেশ ধারণ করিল; কতকটা সঙ্গসিংহের অনুরোধে, কতকটা পথে নিরাপদ হইবার ইচ্ছাতেই সে লজ্জা ত্যাগ করিয়া আবার পুরুষবেশে সাজিল। সঙ্গ দেখিলেন, স্ত্রীবেশ অপেক্ষা পুরুষবেশে যমুনাকে যেন অধিক সুন্দর দেখায়। কোমলতার সহিত কঠোরতার সম্মিলন বড়ই সুন্দর। তাই বীরত্বের সহিত করুণার সম্মিলন সুন্দর, প্রণয়ের মধ্যে ক্রোধের আবির্ভাব সুন্দর; তাই বিচ্ছেদের পার্শ্বে মিলন সুন্দর, মিলনের সহিত অভিমান সুন্দর, অভিমানের সহিত অশ্রু সুন্দর; তাই পাদপের সহিত লতিকার আলি-

জন সুন্দর, অশনির সহিত নববারিধারার আস্বাদন সুন্দর, সংহারমূর্ত্তি রুদ্রের পার্শ্বে অন্নপূর্ণার স্নেহকরুণ মূর্ত্তি সুন্দর; তাই শূন্য কদলীপত্ররূপ অন্ধকার গগনে লুচিরূপ পূর্ণচন্দ্রের প্রথমোদয় সুন্দর,পরিবেশকের হস্তরূপ নীরস শাখায় রসগোল্লা-রূপ সুরসাল ফলের ঘন আন্দোলন সুন্দর, গৃহিণীর তীব্রকণ্ঠের উচ্চ ঝনৎকারের সহিত তাঁহার নথশোভিত নাসার ঘন আকুঞ্চন বিকুঞ্চন সুন্দর; আর নিম্ন আদালতের পরাজয়রূপ অপমানের পার্শ্বে আপীলরূপ সুদৃশ্য মাকাল ফল এমন মনোমুগ্ধকর!

অপরাহ্নকাল; কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বর্ষণক্লান্ত পাণ্ডুর মেঘ তখনও আরাবল্লীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; পর্ব্বতশৃঙ্গে সান্ধ্যসৌরকর গলিত সুবর্ণধারা ঢালিয়া দিতেছে। পাদপকণ্ঠলম্বিতা লতিকার পল্লবাগ্র হইতে তখনও অভিমানিনীর শেষ অশ্রুবিন্দুর ন্যায় এক এক ফোঁটা বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িতেছে। পর্ব্বতপাদদেশে ক্ষুদ্র শিশু বৃক্ষতলে বসিয়া এক কৃষ্ণকায় বালক মধুর স্বরলহরীতে সান্ধ্যাকাশ প্লাবিত করিতেছে; পর্ব্বতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাহার আকুল কণ্ঠস্বরের করুণ প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া যমুনা দাঁড়াইল। একপক্ষেরও অধিককাল পরে জন্মভূমির স্নেহক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়া, আরাবল্লীর চিরপরিচিত মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে কি এক অপূর্ব্ব আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল, তারাকে দেখিবার জন্য, তাহার স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ হইবার জন্য তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি অস্থির হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহার আর যাওয়া হইল না, পা আর উঠিল না; বালকের সেই হৃদয়-দ্রবকারী কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া সে মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বালকের সঙ্গীতের ভাষা দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু সুর যেন পরিচিত; সেই আবেগপূর্ণ সুর যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিতে লাগিল। যমুনার হৃদয়তন্ত্রীতেও কয়দিন হইতেই যেন এমনই একটা আকুল সুর বাজে বাজে করিতেছিল; আজি আঘাত পাইয়া সে তন্ত্রীও যেন বাজিয়া উঠিল। যমুনা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই কৃষ্ণকায় বালকের দুর্ব্বোধ্য ভাষায় গীত সঙ্গীতের আকুল সুরটী শুনিতে লাগিল। এ সুর যেন তাহারই আকুল হৃদয়ের প্রতিধ্বনি; তাহার প্রাণের তারগুলি যেন এই সুরের সঙ্গেই বাঁধা।

যমুনা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, ধীরে ধীরে গিয়া বালকের নিকটে দাঁড়াইল। বালক গান ছাড়িয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। যমুনা দেখিল, কৃষ্ণবর্ণ হইলেও বালকের মুখখানি কি সুন্দর! তাহাতে যেন কোমলতা ও

সরলতা মাখান রহিয়াছে। টানা টানা ভাসা ভাসা উজ্জ্বল চক্ষু দুইটীতে সৌন্দর্য্য উছলিয়া পড়িতেছে। যমুনা স্থির দৃষ্টিতে বালকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; বালকও বিস্ময়পূর্ণ নয়নে যমুনার মুখখানি দেখিতে লাগিল।

যমুনা জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি বালক?"

বালক উত্তর করিল,—"আমি কানাইয়া।"

যমুনা। তুমি কোথা হ'তে আসছ?

বালক। গদবার হ'তে।

গদবারের নাম শুনিয়া যমুনা চকিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসিল,—"গদবার হ'তে কেন এসেছ?"

কা। পৃথ্বীরাজের সঙ্গে।

য। পৃথ্বীরাজ? পৃথ্বীরাজ কি এসেছেন?

কা। হাঁ এসেছেন।

য। কোথায় তিনি?

কা। ঐ ছাউনীতে।

আপনার দৌত্য নিষ্ফল হয় নাই দেখিয়া যমুনার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বলিল,—"কবে এসেছেন?"

কা। আজ মধ্যাহ্নে।

য। তুমি কে?

কা। তাঁর ভৃত্য।

য। তিনি কেন এসেছেন জান?

কানাইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার যমুনার মুখের দিকে চাহিল; তারপর ধীরে ধীরে বলিল,—"শুনেছি পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।"

য। বেদনোর অধিপতির নিকট এ সংবাদ গিয়েছে?

কানা। বোধ হয় এখনও যায় নাই।

যমুনা আর সেখানে দাঁড়াইল না, লম্ফপ্রদানে অশ্বারোহণ করিয়া অশ্বে কষাঘাত করিল; অশ্ব তীরবেগে বেদনোর অভিমুখে ছুটিল।

সে স্থান বেদনোর দুর্গ হইতে প্রায় পাঁচক্রোশ ব্যবধান। যমুনা বেগে অশ্বচালনা করিয়া যখন দুর্গের ক্রোশৈক দূরে উপস্থিত হইল, তখন একটু রাত্রি হইয়াছে; আকাশে চাঁদ উঠে নাই, নক্ষত্র ফুটিয়াছে। সেই অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে যমুনা দেখিল, সম্মুখে কিছুদূরে একদল সৈন্য পর্ব্বত পার্শ্ব দিয়া ধীরে ধীরে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের বেশ দেখিয়াই যমুনা চিনিতে পারিল, ইহারা

পাঠান সৈন্য। সৈন্যের সংখ্যা অল্প নয়, পিপীলিকাশ্রেণীবৎ দলে দলে অসংখ্য সৈন্য নিঃশব্দে চলিয়াছে। যমুনা অশ্বরশ্মি সংযত করিল। এ সময়ে এত পাঠান সৈন্য দুর্গাভিমুখে চলিতেছে, সুতরাং দুর্গ আক্রমণই যে ইহাদের উদ্দেশ্য তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। এই অসংখ্য পাঠানসৈন্যের অতর্কিত নৈশ আক্রমণ হইতে দুর্গরক্ষা করা যে কঠিন ব্যাপার তাহাও বুঝিতে বাকী রহিল না। যমুনা অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

যমুনা ভাবিল, হয় তো দুর্গবাসীরা এ আক্রমণের কোনই সংবাদ না পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। তারপর পাঠানের এরূপ আকস্মিক আক্রমণে তাহারা ব্যতিব্যস্ত, বিপন্ন হইয়া পড়িবে; হয় তো অস্ত্র ধারণের পূর্ব্বেই পাঠান হস্তে পশুবৎ নিহত হইবে; রজনী প্রভাতে দুর্গশিরে মহম্মদীয় কেতন সগর্ব্বে উড্ডীয়মান হইবে। এ বিপৎ-প্রতিকারের উপায় কি? পাঠানদের আক্রমণের পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া দুর্গবাসীদিগকে সতর্ক করিয়া দিলে হয় তো এত সহজে পাঠানেরা দুর্গ হস্তগত করিতে পারিত না। কিন্তু সে পথও রুদ্ধ; দুর্গে যাইবার একমাত্র পথ, সে পথ অগ্রগামী পাঠান সৈন্য দ্বারা অধিকৃত। তাহাদিগকে ভেদ করিয়া দুর্গে যাওয়া অসম্ভব। তবে কি হইবে? এতদিন পরে বেদনোরও কি পাঠান-হস্তগত হইবে? তোড়া গিয়াছে, বেদনোরও কি যাইবে? হা ভগবান, শূরতানের সকল আশাই কি বিলুপ্ত হইবে।

যমুনা স্থির দৃষ্টিতে অগ্রগামী পাঠানসৈন্যের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার একটা কথা মনে পড়িল, একটা উপায় স্থির হইল; অকূল সমুদ্রে যেন সহসা কূল পাইল। তাহার মুখমণ্ডল প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল; অঙ্গুষ্ঠে ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া অশ্বের মুখ ফিরাইতে গেল। সহসা পশ্চাৎ হইতে গম্ভীর কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল,—"কে তুমি বালক?"

যমুনা সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিল; দেখিল, প্রশ্নকর্ত্তা যোদ্ধৃবেশধারী অশ্বারোহী; অশ্বারোহী পাঠান-পরিচ্ছদে সজ্জিত। যমুনার বুক কাঁপিয়া উঠিল; ভাবিল, হায় শেষ আশাসূত্রটুকুও বুঝি ছিন্ন হইল।

অশ্বারোহী পাঠান আবার গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—"কে তুমি বালক?"

সাহসে বুক বাঁধিয়া যমুনা বলিল,—"আমি একজন রাজপুত।"

পাঠান। এ দিকে কোথায় যাইতেছ?

যমুনা। দুর্গে।

পা। কি জন্য।

য। আমি এই দুর্গের অধিবাসী।

পা। কিন্তু আজি এ দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

য। কেন?

পা। দেখিতেছ না?

য। দেখিতেছি।

পা। কি দেখিতেছ?

য। দেখিতেছি সম্মুখে পাঠানসৈন্য।

পা। এ সময়ে এখানে সৈন্য কেন, তাহা বুঝিয়াছ কি?

য। দুর্গ আক্রমণই বোধ হয় ইহাদের উদ্দেশ্য।

পা। তাই যদি বুঝিয়া থাক তবে আর অগ্রসর হইও না, ফিরিয়া যাও।

য। ফিরিব কেন?

পা। অগ্রসর হইলেই পাঠান হস্তে প্রাণ হারাইবে।

য। রাজপুত প্রাণের মায়া করে না। বেদনোর—আমার জন্মভূমি বেদনোর বিপন্ন, আর আমি প্রাণ লইয়া পলাইব?

পা। এই বয়সেই তুমি দেশকে এত ভালবাসিতে শিখিয়াছ?

য। আমরা মাতৃস্তন্যের সহিত দেশভক্তি শিক্ষা করি।

পাঠান প্রশংসমান দৃষ্টিতে যমুনার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"ধন্য তোমাদের স্বদেশভক্তি! কিন্তু শুন বালক! এই ভক্তির প্রাবল্যে পাঠান-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বৃথা উন্মত্ততার পরিচয় দিও না। যদি তোমার দেশের উপর যথার্থ ভক্তি থাকে, তবে ফিরিয়া যাও, অন্য উপায় অবলম্বনে আজি বেদনোরকে—দুর্গেশতনয়া তারাবাইকে রক্ষা করিবার চেষ্টা কর।"

যমুনা বিস্মিত কণ্ঠে বলিল,—"তারাবাইকে রক্ষা!"

পা। হাঁ, সেই আজিকার এই নৈশ আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য।

য। কিন্তু শূরতান জীবিত থাকিতে সে আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব।

পা। শূরতান আজি দুর্গে অনুপস্থিত।

য। হা ভগবান, শূরতান অনুপস্থিত!

পা। শূরতানের অধিকৃত দূর পল্লীতে কয়েকজন পাঠান অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে; শূরতান তাহাদিগকে দমন করিতে গিয়াছেন। আর অধিক কথার সময় নাই, যাও বালক! আপনার কর্ত্তব্য পালন কর।

য। আপনি কে?

পা। আমিও একজন পাঠান সৈনিক।

য। কিন্তু আপনাকে সামান্য সৈনিক বলিয়া বোধ হইতেছে না।

পা। তোমার অনুমান মিথ্যা নহে। কিন্তু আমার আর অপেক্ষার সময় নাই।

য। একটা কথা—আপনি পাঠান, আমি রাজপুত, সুতরাং আমি আপনার শত্রু; কিন্তু আপনি এ সময়ে শত্রুকে হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিতেছেন কেন?

পা। তোমার ছদ্মবেশ আমার দৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারে নাই বলিয়া। ইসুফ খাঁ স্ত্রীজাতির অঙ্গে হস্তক্ষেপকে বীরধর্ম্মের কলঙ্ক বলিয়া মনে করে।

বিস্ময়-গদগদ কণ্ঠে যমুনা বলিল,—"আপনিই কি পাঠানবীর ইসুফ খাঁ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পাঠান বলিল,—হাঁ, আমিই সেই নিমকহারাম ইসুফ খাঁ।"

যমুনা বলিল,—"আপনি পাঠানকুলের উজ্জ্বল রত্ন।"

ইসুফ খাঁ অশ্বে কষাঘাত করিল; অশ্ব বেদনোর অভিমুখে ছুটিল। যমুনাও আর অপেক্ষা না করিয়া, যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে দ্রুত অশ্ব চালনা করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বীরকণ্ঠনাদ-প্রতিধ্বনিত আরাপল্লীর পাদদেশে, নক্ষত্রকণ্টকিত নৈশনীলাকাশ তলে, নরশোণিতপ্লাবিত ভীমদর্শন রণভূমিতে তুরগপৃষ্ঠারূঢ়া বীরবালা—যেন কৃতান্তের লীলাভূমি ভীষণ শ্মশানক্ষেত্রে প্রস্ফুটিত অপরিম্লান পারিজাত্। বালার কণ্ঠে রত্নহার ঘন আন্দোলনে বিদ্যুৎস্ফুরণবৎ চঞ্চলা দীপ্তি বিকীর্ণ করিতেছে, ললাটনিহিত হীরকখণ্ড দানবদলনী চণ্ডিকার ললাটলোচনের ন্যায় ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে, সুবর্ণকেয়ূরবিভূষিত শিরীষসুকোমল ভুজযুগে অসিচর্ম্ম ঘন ঘন নাচিতেছে, বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠ থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জিতেছে, মার্ মার্। চারিদিকে অগণ্য শত্রুসৈন্য; ক্ষুব্ধজলধিবৎ উন্মত্ত পাঠানবাহিনী দীন্ দীন শব্দে আরাবল্লিশিখর কম্পিত করিতেছে। আর মুষ্টিমেয় রাজপুতসৈন্য আত্মসম্মান,

জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য একে একে সেই পাঠান-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। যে পড়িতেছে সে আর উঠিতেছে না, তথাপি কেহ পশ্চাৎপদ হইতেছে না। রাজপুত মরিতেছে বটে, কিন্তু শত্রু না মারিয়া মরিতেছে না। একজন রাজপুত দশজন পাঠানসৈন্য মারিতেছে, দশজন পাঠান একজন রাজপুতকে মারিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতেছে।

পাঠান সর্দ্দার লিল্লা খাঁ আজি নৈশ আক্রমণ করিয়াছেন। এদিকে শূরজান অন্য দুর্গে অনুপস্থিত। রাজপুতগণ প্রমাদ গণিল। তাহারা তারাকে এ সংবাদ দিল। সংবাদ পাইয়া তারা একটু চিন্তিতা হইল। কিন্তু সে চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্য; মুহূর্ত্তপরেই সে রণসাজে সজ্জিতা হইয়া বাহির হইল। বীরবালার সেই রণসাজসজ্জিতা তেজোময়ী মূর্ত্তি দর্শনে নিরুৎসাহ সৈনিকগণের হৃদয় নবোৎসাহে মাতিয়া উঠিল। তাহারা 'হর হর বোম বোম' শব্দে বিপক্ষের গতিরোধার্থ অগ্রসর হইল।

তারা দেখিল, পাঠানগণের তখন দুর্গের নিকটে আসিতে বিলম্ব আছে। তারা আর অপেক্ষা না করিয়া সৈন্য সহ দুর্গের বাহিরে আসিল, এবং সৈন্যগণকে ব্যূহাকারে সজ্জিত করিয়া শত্রুর আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অল্পকাল মধ্যেই পাঠানবাহিনী রাজপুতবাহিনীর সম্মুখীন হইল। পাঠানগণ দীন্ দীন্ শব্দে রাজপুতদিগকে আক্রমণ করিল, রাজপুতগণও হর হর শব্দে পাঠান-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। উভয় পক্ষের ভীষণ সংঘর্ষে অধিত্যকা ভূমিতে শোণিত-নদী প্রবাহিত হইল, উভয়বাহিনীর বীরহুঙ্কারে নৈশ গগন প্রকম্পিত হইতে লাগিল। সে সংঘর্ষে কত পাঠান মরিল, কত রাজপুত যোদ্ধা অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইল। জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠান রাজপুত মারিতেছে, জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য রাজপুত পাঠান মারিতেছে। আবার কোথাও বা অন্ধকারে আত্মপর চিনিতে না পারিয়া রাজপুত রাজপুত মারিতেছে, পাঠান পাঠান মারিতেছে। আর সেই নরশোণিত-তরঙ্গিত রণভূমিতে রক্তপিপাসু উন্মত্ত সেনাদলের মধ্যে বীরবালা রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে মার্ মার্ শব্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে মূর্ত্তির সম্মুখে যে পড়িতেছে সেই মরিতেছে; শত শত পাঠানযোদ্ধার ছিন্ন শির মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভূমি চুম্বন করিতেছে। তথাপি নিবৃত্তি নাই, ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই; বীররমণী দানবদলনী মূর্ত্তিতে পাঠানসৈন্য দলিত মথিত করিতেছে। রমণীর গাত্রে রুধিরধারা, অসি চর্ম্ম শোণিতলিপ্ত, নয়নে প্রলয়াগ্নির করাল শিখা, মুখে কেবল মার্ মার্ শব্দ। কে আছ চিত্রকর! একবার ভারতের ঐ অতীত

চিত্রখানি—ঐ দানবদলনী মুর্ত্তি চিত্রিত কর, আমরা একবার প্রাণ ভরিয়া ঐ চিত্রখানি—ঐ মূর্ত্তিটী দেখি!

ভৈরবী রূপিণী রমণীর হস্তে দলে দলে পাঠান সৈন্য মরিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহাকে নিরস্ত্র করিতে পারিল না। সেনাপতির আদেশ—জীবিতা সিংহীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে হইবে। সুতরাং সৈন্যগণ রমণীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে সাহসী হইল না, কেবল তাহাকে বন্দিনী করিবার জন্য বিফল প্রয়াস করিতে লাগিল। কিন্তু রমণী বন্দিনী হইল না, মৃগযূথমধ্যচারিণী কেশরিণীর ন্যায় দলে দলে শত্রুসৈন্য নিপাত করিয়া ফিরিতে লাগিল। পাঠান প্রমাদ গণিল।

কিন্তু ক্রমেই বলক্ষয় হইয়া আসিল। পাঠানের সংখ্যা অধিক, রাজপুতের সংখ্যা অল্প। একজন পাঠান মরিলে দশজন পাঠান আসিয়া তাহার স্থান সম্পূরণ করিতে লাগিল, কিন্তু একজন রাজপুত মরিলে তাহার স্থান আর পূর্ণ হইল না। সুতরাং রাজপুতশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। তারা ইহা দেখিল, বুঝিল, তথাপি ভীত বা হতাশ হইল না। সে কয়েকজন মাত্র সৈন্য লইয়া অসংখ্য পাঠানসৈন্যের মধ্যে একাই ভীমবিক্রমে যুঝিতে লাগিল।

কিন্তু আর বুঝি যুদ্ধ চলে না; প্রহরেক কাল অসি চালনা করিয়া তারার মৃণাল-ভুজদ্বয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল, অসিমুষ্টি শিথিল হইল, সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। শত শত পাঠান সৈন্য তাহাকে বেড়িয়া দীন্ দীন্ রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। তারা ভাবিল, এই বার বুঝি শেষ, 'মা ভবানি! রাজপুত-গৌরব রক্ষা কর মা!' শোণিতসিক্ত অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তারা ললাটের স্বেদ মোচন করিল।

এমন সময় একটা শত্রু-চালিত বর্শা আসিয়া তারার অশ্বের কণ্ঠে বিদ্ধ হইল। অশ্ব চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। তারা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লাফাইয়া পড়িল। চারিদিকে পাঠানগণ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। এক জন সৈন্য অগ্রসর হইয়া তারাকে ধরিতে গেল। তারা অসিচালনা করিয়া তাহাকে নিহত করিল। আবার একজন গেল, সেও মরিল, আবার গেল আবার মরিল। তখন ক্রুদ্ধ পাঠানগণ একেবারে সকলে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তারা ডাকিল,—"মা ভবানি!"

সহসা সেই সৈন্যশ্রেণী ভেদ করিয়া এক অশ্বারোহী দ্রুতবেগে তারার সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বলিল,—"রাজকুমারি! "আপনি বন্দিনী।"

যে আসিল সে ইসুফ খাঁ। সেনাপতিকে দেখিয়া সৈন্যগণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। ইসুফ খাঁ আবার গম্ভীর স্বরে বলিল,—"রাজকুমারি! আপনি বন্দিনী।"

গর্ব্বমিশ্রিত হাস্যসহকারে তারা উত্তর করিল,—"এখনও আমার হাতে অস্ত্র আছে।"

ইসুফ বলিল,—"অস্ত্র ত্যাগ করুন।"

তারা বলিল,—"জীবন থাকিতে নয়।"

ই। তাহা হইলে জীবনও থাকিবে না।

তা। তখন যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন।

ই। কেন বৃথা পরিশ্রম করিবেন, আপনি বহু শত্রুসৈন্যবেষ্টিত।

তারা হাসিল; যেন প্রলয়-কাদম্বিনীর বক্ষে চপলা চমকিত হইল। গর্ব্বিত কণ্ঠে তারা বলিল,—"খাঁ সাহেব, আমি রাজপুত রমণী।"

ই। তাহা হইলেও আপনি একা, আপনার অশ্ব নিহত।

তা। আপনারা আমাকে একটা অশ্ব দিয়া কি বীরধর্ম্মের মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে পারেন না?

ই। শত্রুকে কেহ কখনও ইচ্ছা করিয়া অশ্ব দেয় না।

তা। তবে অনিচ্ছাতেই দিন।

ইসুফের অশ্ব নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল,তারা লম্ফ দিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল; তারপর চক্ষের পলক না পড়িতেই অশ্বে কষাঘাত করিয়া সেই সৈন্যশ্রেণী ভেদ করিয়া ছুটিল। পাঠানগণ বিস্মিত স্তম্ভিত। একজন পাঠানসৈন্য অগ্রসর হইয়া তাহাকে বাধা দিতে গেল, কিন্তু সে অশ্বপদাহত হইয়া দশ হাত দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। তখন সে চীৎকার করিয়া বলিল,—"রমণীকে ধর, লিল্লা খাঁর হুকুম, উহাকে বন্দিনী কর।"

ঈষৎ হাসিয়া ইসুফ খাঁ বলিল,—"সিংহজি, বৃথা চেষ্টা।"

ইসুফ খাঁ রমণীর অনুসরণ জন্য সৈন্যগণকে আদেশ দিল। কিন্তু তাহারা অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই পশ্চাৎ হইতে দিগন্ত কম্পিত করিয়া শব্দ উঠিল—হর হর বোম বোম।

ইসুফ খাঁ সবিস্ময়ে দেখিল, একদল রাজপুত সৈন্য আসিয়া পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতেছে। তাহাদের অগ্রে সেই ছদ্মবেশী বালক, বালকের পশ্চাতে বিখ্যাতবীর পৃথীরাজ স্বয়ং।

অশ্বপদাহত সৈনিক উঠিয়া আসিয়া ইসুফকে বলিল,—"খাঁ সাহেব, আপনি ইচ্ছা করিয়া তারাকে ছাড়িলেন।"

ইসুফ খাঁ ঈষৎ হাসিল মাত্র। সৈনিক বলিল,—"কিন্তু এজন্য আপনাকে দিল্লার নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে।"

ইসুফ বলিল,—"আজি ফিরিতে পারিলে তো ?"

সৈ। কেন ফিরিবে না ?

ই। দেখিয়াছ ঐ কে আসিয়াছে ?

সৈ। ও কে ?

ই। পৃথ্বীরাজ।

সৈনিক মাথায় হাত দিয়া সেই খানে বসিয়া পড়িল।

ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পাত ও পলু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাতের সহিত পলুর অতি নিকট সম্বন্ধ। পলু ডিম্ব প্রসব করিবার প্রায় এক সপ্তাহ পরেই পাতের দরকার হইয়া থাকে, এবং যতদিন পর্য্যন্ত সেই সমস্ত পোকা পুনরায় গুটী না বাঁধে, ততদিন পর্য্যন্ত একমাত্র পাতের উপরই তাহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। পলু দুই প্রকার ছোট ও বড়। বড় রেশম পোকা বৎসরের মধ্যে কেবল একবার মাত্র গুটী বাঁধিয়া রেশম উৎপন্ন করিয়া থাকে।

প্রথম বৎসরে আন্দাজ বৈশাখ মাসে বড় পোকা গুটী কাটিয়া পুনরায় ডিম পাড়িলে রেশমচাষী সেই সমস্ত ডিম খুব যত্নের সহিত পরিষ্কার কাপড় বা কাগজের উপর সাজাইয়া নূতন হাঁড়িতে ভরিয়া মুখবন্ধ করিয়া দ্বিতীয় বৎসরের জন্য তুলিয়া রাখে। এই জাতীয় পলুর ডিম্ব দীর্ঘ এক বৎসরের মধ্যে নষ্ট হয় না। চৈত্র বন্দে পুনরায় পাত জন্মাইলে চৈত্র মাসেই হউক অথবা দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম বৈশাখেই হউক সেই সমস্ত ডিম্ব বাহির করিতে হয়। বদ্ধপাত্র

হইতে ডিম্বগুলি বাহির করিয়া ৫।৭ দিন বাতাসে রাখিলে ডিম ফুটিয়া পোকা আপনিই বাহির হইয়া পড়ে।

এই বড় জাতীয় পলু পোকা সেই চৈত্র বন্দের পাত আহার করিয়া বৎসরে কেবল একবার মাত্র গুটী বাঁধিয়া থাকে, অন্য মাসের কোন বন্দের সময় এই সমস্ত পোকা গুটী বাঁধিতে পারে না বা সে সময় এই জাতীয় পতঙ্গের ডিম্ব ফুটিবার কোন ক্ষমতা থাকে না। ছোট পলু বৎসরে পাঁচ বন্দের কাটা পাতা আহার করিয়া পাঁচবার ডিম্ব প্রসব করতঃ রেশমের গুটী বাঁধিয়া থাকে। বড় পলু বৎসরে এক বন্দের পাত খায়, একবার মাত্র ডিম পাড়ে। ছোট পলু বৎসরে পাঁচ বন্দের পাত আহার করে, কাজেই তাহাদের সারা বৎসরে পাঁচ বার ডিম পাড়িতে হয়। সেই কারণে রেশমের চাষীরা সাধারণতঃ ছোট পলুর চাষই অধিক করিয়া থাকে। পলুর বীজ রাখিবার জন্য পলু পোকার গুটী বা কোয়া গুলি রৌদ্রে না দিয়া পৃথক্ করিয়া সজীব রাখা হয়। পাত বা তুঁতের প্রথম বন্দ আরম্ভ হইলে অর্থাৎ চৈত্র মাসে তুঁতের পাতা সর্ব্ব প্রথমে পলু বা রেসম পোকার আহারের উপযুক্ত হইলে, পলু পোকা তাহাদের সেই নিজ লালায় প্রস্তুত গুটী কাটিয়া দিব্য পালকসংযুক্ত পতঙ্গের আকার ধারণ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, তখন সেই পতঙ্গকে স্থানবিশেষে চকরা চকরী বলিয়া থাকে। এই চকরা চকরী ২।৩ দিনের মধ্যে পুনরায় ডিম পাড়িবে; সেই ডিম ৫।৭ দিনের মধ্যে ফুটিয়া পোকা বাহির হইবে। আবার সেই পোকা চৈত্র বন্দের পাত খাইতে আরম্ভ করিবে।

পালকবিহীন সাদা গুবরে কড়া পোকার মত পোকা। পাত খাইতে খাইতে তাহারা পরিপুষ্ট হইয়া নিজের মুখ-নিসৃত লালা দ্বারা আপনা আপনিই জড়িত হইয়া পড়িল। তাহাদের সেই বদন-বিনিসৃত লালাই আবার আমাদের দুর্লভ রেশমে পরিণত হইল। রেশম পোকা যখন তাহাদের সেই লালার আবরণ—রেশমের গুটী—কাটিয়া বাহির হইবে, তখন আমরা দেখিতে পাইব যে, রেশম পোকা আর সেই পালকবিহীন কড়া পোকা নাই, তাহারা দিব্য প্রজাপতির রূপ ধারণ করিয়াছে। এইরূপ আর এক জাতীয় কীট দেখিতে পাওয়া যায়; তাহারা সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে আস্‌নি প্রভৃতি বৃক্ষের পত্র আহার করিয়া প্রভূত পরিমাণে তসর উৎপন্ন করিয়া থাকে।

প্রবাল নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক কীটের লালা হইতে কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রবাল দ্বীপের উৎপত্তি হইতেছে। ভগবানের কি বিচিত্র

লীলা! সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তার অদৃশ্য অপূর্ব্ব বিচিত্র বিধানের উপরেও মানুষ কখনও কখনও হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াসী হয়, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে।

সেই অনন্তদেবের আজ্ঞায় পোকার লালা রেশম হইতেছে, সমুদ্রের কীট প্রবাল হইতেছে, ঝিনুকের ব্যাধি দুর্লভ মুক্তা হইয়া রাজমুকুট পরিশোভিত করিতেছে।

ভগবান তাঁহার প্রিয়-সৃষ্ট মনুষ্যের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বনে, বাগানে, জলে স্থলে, উদ্ভিদে, কীট পতঙ্গে প্রচুর আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে চিনিতে পারি না, তাঁহার শুভ নিয়ম মানিয়া চলিতে পারি না, তাই অভাবে পড়িয়া সেই দয়ার্ণব জগদীশ্বরকে অকারণ নিন্দা করি।

মানব ভগবানের প্রিয়-সৃষ্ট না হইলে, তিনি মানবের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী না হইলে, বিশাল বিস্তৃত মহীরুহ অশ্বথ বৃক্ষে কখনও ক্ষুদ্র ফল ধরিত না,—মানবের জীবনধারণের একমাত্র আহার ধান্য ও গম কখনও শ্যামল অমর দূর্ব্বাদল হইতেও অমর হইয়া ফলোৎপাদনে সমর্থ হইত না।

যে দিন পলুর কোয়া ফাটিয়া চকুরা চকুরী বাহির হইবে, সেই দিনই তাহাদের স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম হইবে। স্ত্রী পুরুষে একত্রে জোড় লাগিয়া থাকিলে রেশম চাষীরা তখন পুরুষ পোকাকে স্ত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়। কাক প্রভৃতি পক্ষীতে মরদ পোকাকে খাইয়া ফেলে। এক্ষণে দেখুন, পুরুষ পলু, কোয়া হইতে বাহির হইয়া কতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিল। সঙ্গম হইবার পরদিনই স্ত্রী পলু একেবারে অনেক গুলি ডিম্ব প্রসব করিয়া ফেলে। প্রসবের অব্যবহিত পরে জননীর অবস্থাও পিতার অনুরূপ হয়। রেশম চাষীরা পুরুষের মত প্রসবান্তে মাতাকেও বাহিরে ফেলিয়া দেয়, তখন তাহাদিগকে অন্যান্য পক্ষীতে মারিয়া ফেলে। পিতামাতা ধ্বংস করিয়া চাষীরা ডিম্বগুলি নরম পালক দ্বারা (কোন কোন স্থানে এ জন্য কেবল মাত্র শঙ্খচিলের পালকই ব্যবহৃত হইয়া থাকে) টানিয়া টানিয়া একস্থানে করিয়া রাখে। ৮। ১০ দিন পরে ডিম্বগুলি একটু কাল রঙ ধরিলেই ফুটিয়া যায়। ডিম ফুটার পর হইতে চারি চিয়ানে পলু পোকা পুনরায় গুটী বাঁধিয়া থাকে। সেই জন্য কথায় বলে —চারি চিয়ানে পলু, আর সাত সেরেতে কলু।—অর্থাৎ আন্দাজ সাতসের সরিষা দিলে কলুর একবারকার ঘানি উঠে, আর পলু পোকাও চারিবার চিয়াইলে রেশম প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়।

ডিম ফুটিয়া পোকা বাহির হইলে পাতের পাতা যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া তাহাদের উপর ছড়াইয়া দেওয়া হয়। পলু পোকা এইরূপ ভাবে ক্রমান্বয়ে ৭।৮ দিন পাত খাইতে খাইতে ২।৩ দিন আর কিছুই আহার করে না। পরে তাহাদের উপর পাতের কুচি দিলে যখন মাথা নাড়িতে আরম্ভ করে. তখন পুনরায় আবার খাবার দিতে হয়। এই যে ৭।৮ দিন পলু পোকা পাত আহার করিতে করিতে মধ্যে ২।৩ দিন আহার বন্ধ করে, ইহাকেই এদেশের লোকে পলু পোকার চিয়েন উঠা কহিয়া থাকে। ক্রমশঃ।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

বিসর্জ্জন।

——:০:——

"The wreath my life, the wreath shall be,
The tie to bind my soul to thee."

"ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।"

(১)

কি কুক্ষণে আজি হায়! পোহাইল নিশি,
কাঁদাইতে অভাগায়—সারাটা জীবন।
একটী রতন ছিল আলো করি' হৃদি;
কাল-চোর পশি' তাহে করিল হরণ॥

(২)

কেমনে বর্ণিব মরি, কত ভালবাসা,
কতগুণে বিভূষিতা—'সুশীলা' আমার।
রাখিয়া সে সব স্মৃতি, কণকপ্রতিমা;
পলা'ল কাঁদায়ে সবে, ছাড়িয়া সংসার॥

(৩)

কত আশা হৃদে ছিল প্রমদার মোর,
কত কথা বলেছিল—এ ক্ষুদ্র জীবনে।
পুরাইবে কত সাধ পুত্র কন্যা লয়ে;
বিষাদ রহিল শুধু—সলিল নয়নে॥

(৪)

এস মোর গৃহলক্ষ্মী—হৃদয়রঞ্জিনী,
কি দশা সবার দেখ তোমার বিহনে।
সুখের সংসার আজ নিরানন্দময়;
আনন্দ-দায়িনী—তুমি 'আনন্দ'ভবনে॥

(৫)

ওই শুন পুত্র কন্যা তব নাম লয়ে,
ভাসিছে নয়ন-নীরে, চাহি'মুখ পানে।
মুছাও তা'দের আঁখি, নয়নের নিধি;
জুড়াও ব্যথিত প্রাণ বাক্য-সুধাদানে॥

(৬)

দয়াবতী তুমি সতি! চিরদিন খ্যাত,
তবে কেন নিরদয় আজি সে সবায়?
স্নেহের পুত্তলি তারা—স্নেহময়ী তুমি;
তোমা বিনা আজ তারা সব অসহায়॥

(৭)

পতির মঙ্গল তরে পতি-সোহাগিনি !
কত কষ্ট সহিয়াছ—হৃদয় পাতিয়া।
প্রতিশোধ দিতে তার তাই কি মানিনে,
কাঁদা'য়ে আমায় তুমি, যাইলে চলিয়া ?

(৮)

যাও তবে সিমন্তিনী করি আশীর্ব্বাদ,
জুড়াও সংসার জ্বালা রহি' পুণ্যধামে।
আমি শুধু স্মৃতিটুকু হৃদয়ে লইয়া ;
গাহিব বিষাদ গান তব প্রেম নামে॥

(৯)

তব নাম নিশি দিন স্মৃতি পটে ল'য়ে,
ভুঞ্জিব বিয়োগ ব্যথা—যাবৎ-জীবন।
অচ্ছেদ্য প্রেমের ডোর, অনন্ত উদ্দেশে ;
হইবে দোঁহায় চির আত্মার মিলন॥

(১০)

যাও সতি পতিব্রতা পুণ্য পতি-ধামে,
শোক দুঃখ বিবর্জ্জিত—পবিত্র সদন।
আমি শুধু রহিলাম ভগ্নহৃদি লয়ে ;
কঠোর কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পালন,
সংসার-শোভনা বামা—হৃদয়-রতন,—
কণক-প্রতিমা আজ দিয়ে বিসর্জ্জন॥*

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

সমালোচনা।

সয়রুল মোতাখরীণ।— ৺ গৌর সুন্দর মৈত্র কর্তৃক অনুবাদিত ; শ্রীযোগীন্দ্র প্রসাদ মৈত্র কর্তৃক প্রকাশিত।

আমরা সমালোচনার্থ ইহার কিয়দংশ (নমুনা খণ্ড) প্রাপ্ত হইয়াছি ; এবং তৎপাঠে আনন্দ লাভ করিয়াছি। পারস্য ভাষায় লিখিত 'সয়রুল মোতাখরীণের' ইংরাজি অনুবাদ বহুদিন পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বঙ্গভাষায় এই অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থের অনুবাদ না থাকায় এ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে একটা বিশেষ অভাব অনুভূত হইতেছিল। ৺ গৌর সুন্দর মৈত্র মহাশয় এই অভাব মোচনে উদ্যোগী হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তবে দুঃখের বিষয়, তাঁহার কৃত অনুবাদ সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি এই মরজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনুবাদ অতি সরল ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। তবে 'হিজরীর' সহিত বঙ্গীয় সাল দিলে আরও একটু ভাল হইত। আমরা এই গ্রন্থকে সম্পূর্ণ মুদ্রিতাবস্থায় দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

---

* আমাদের প্রিয় সুহৃদ্, 'অঙ্কুরে'র সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দ-গোপাল ঘোষ মহাশয়ের সাধ্বী সহধর্ম্মিণী গত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ (১৩১৫) রবিবার অকালে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহারই উদ্দেশে এই কবিতাটি লিখিত হইয়াছে। আমরা আনন্দ বাবুর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।—স্বঃ সং।
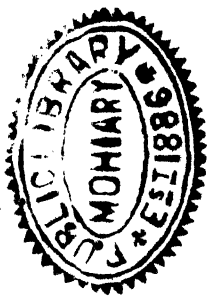
৩য় খণ্ড, ১০ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১৫ সাল।

আমন্ত্রণ।

—:*:—

ভারতের ত্রিংশ কোটি নর-নারী মাঝ,
মনুজেন্দ্র ভগীরথ যদি কেহ রহ,
প্রকাশ হে বিশ্ব-পূজ্য ঋষি-বেশে আজ,
তোমার প্রতীক্ষা কবি করে অহরহঃ।

হের ওই সগরের অগণ্য সন্ততি
অভিশপ্ত জ্ঞানহারা ভস্ম, ধূলিলীন ;—
চাহি আজ মন্দাকিনী সুর-স্রোতস্বতী ;
চাহি আজ উগ্রতপঃ নৈরাশ্য-বিহীন !

নিয়ে এস তুষ্ট করি দেব আশুতোষে,
জাহ্নবীর পূত-ধারা ভারত হৃদয়ে ;
সুমঙ্গল-জয়-দৃপ্ত শঙ্খের নির্ঘোষে,
দেখাও প্রকৃত পথ অগ্রগামী হয়ে !

ভাসাইয়া মদমত্ত দৃপ্ত ঐরাবত
জাগাইয়া দাও বিশ্বে শক্তিহীনে যত !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

———

শিখ গুরু।

—:০:—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হররায়।

হর গোবিন্দের তিনটি স্ত্রী ছিলেন। ইঁহাদের গর্ভে তাঁহার পাঁচটি পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম—গুরুদত্ত, তেগ বাহাদুর, সুরতমল, অমরায় ও অটল রায়। জ্যেষ্ঠ গুরুদত্ত পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে মরধাম ত্যাগ করেন। (১) আজও শিখেরা তাঁহার কীর্ত্তি মহিমা গান করে। তাঁহার বীরত্ব এবং শারীরিক বল ও কৌশল সম্বন্ধে অনেক গল্প এখনও শুনা যায়। হিরত পুরে তাঁহার একটি স্মৃতিমন্দির আছে। তাঁহার এক পুত্র ছিল—তাঁহার নাম হররায়। পিতামহ হর গোবিন্দ পৌত্র হররায়কে বড় ভাল বাসিতেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহাকে সপ্তম গুরুপদে বরিত করিয়া যান। (২)

১৬২৮ খৃষ্টাব্দে হররায়ের জন্ম হয়; এবং ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে একাদশ বর্ষ বয়সে তিনি গুরু হন। গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইবার পর কিছু দিন তিনি হিরত পুরে অবস্থান করেন; কিন্তু কুলহরের রাজাকে বশীভূত করিবার জন্য মোগলসৈন্য আসায় (৩) তিনি তথা হইতে পূর্ব্ব দিকে সিরমুর জেলান্তর্গত টাকসাল (বা টাঙ্গশাল) (৪) গ্রামে চলিয়া যান ও ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তথায় বাস করেন।

---

(১) ট্রিয়ম্ব সাহেব একথা স্বীকার করেন না; কেন করেন না, তাহার কিন্তু কোন কারণ দেখান নাই।

(২) ট্রিয়ম্ব সাহেব হররায়ের অভিষেক সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প দিয়াছেন। গল্পটী এই—একদিন হরগোবিন্দ কাহাকে গুরুপদ দিয়া যাইবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় তাঁহার পৌত্র হররায় তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া উপবেশন করিল। গোবিন্দ অন্যমনে তাহাকে লইয়া আমোদ করিতে লাগিলেন। বালক ক্রীড়াচ্ছলে পিতামহের মস্তক হইতে পাগড়ি খুলিয়া নিজের মাথায় বসাইয়া দিল। এ দৃশ্য দেখিয়া গোবিন্দ বড় সন্তুষ্ট হন ও বালককেই গুরুপদ দিবেন ঠিক করেন। পরে শিখদের ডাকিয়া মনোভাব তাহাদের জানাইলে তাহারাও তাঁহার মতে সম্মতি দিল। এইরূপে বালক হররায় গুরু নির্ব্বাচিত হন।

(৩) শুনা যায়, হররায় এই মোগল সৈন্যের সহিত যোগ দিয়া কুলহর-পতির দমনে সাহায্য করেন।

(৪) The plan meant seems to be Taksal or Tungsal, near

এই সময় ভারতের ভাগ্যাকাশে এক বৈপ্লবিক ঝড় উঠে। তাহাতে ভ্রাতা ভ্রাতার রক্তপাত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, পুত্র পিতাকে বন্দী করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান অত্যন্ত পীড়িত হন ও সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হয় যে, অনতিবিলম্বে তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। এই সংবাদ শুনিবা মাত্র তাঁহার পুত্রগণ সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হন ও তাহাতেই যত বিপদ ঘটে।

শাহজাহানের চারিটি পুত্র। জ্যেষ্ঠ দারা পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন; তিনি রাজকার্য্যে পিতাকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন। রাজ্যশাসন-শক্তি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি সাহসী ও সবল, কিন্তু ক্রোধী ও হঠকারী ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র সুজা বড়ই আমোদপ্রিয় ছিলেন; কিন্তু তাঁহার অনেকগুলি গুণও ছিল। যুবাকাল হইতেই তিনি রাজকার্য্যে ও সামরিক কার্য্যে দক্ষ ছিলেন। এই সময় তিনি বঙ্গের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। বিশ বৎসর তিনি এই কার্য্য কম দক্ষতা ও সাফল্যের সহিত সম্পন্ন করেন নাই। তৃতীয় ঔরঙ্গজেব সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ ব্যক্তি। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। ভ্রাতাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা কৌশলী ও চতুর। কনিষ্ঠ মুরাদ বক্স সাহসী ও দয়ালু বটে; কিন্তু তিনি বড়ই সরল-প্রকৃতি ছিলেন। দারা ধর্ম্ম বিষয়ে আকবরের ন্যায় উদার; —ঔরঙ্গজেব একজন গোঁড়া, দারাকে তিনি 'কাফের' বলিয়া ঘৃণা করিতেন। মোগল বংশে জ্যেষ্ঠের প্রভুত্ব নাই—অসিরই প্রাধান্য দেখা যায়। ভ্রাতৃগণ যখন সসৈন্যে সিংহাসন-প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

সুজাই প্রথমে বাঙ্গালা হইতে দিল্লি যাত্রা করেন। ওদিকে গুজরাটের রাজ-প্রতিনিধি মুরাদ রাজ-কোষাগার লুণ্ঠন করিয়া আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর রাজ্য-ধ্বংসে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া বিজাপুর রাজ্য হইতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ লইয়া মুরা-দের সহিত মিশিলেন ও কৌশলে তাঁহাকে জয় করিয়া লইলেন। তিনি আসি-য়াই মুরাদকে সম্রাট বলিয়া সেলাম করিলেন ও মুরাদের রাজ্যলাভে সন্তোষ জানাইয়া বলিলেন যে, তিনি নিজে সংসারের সুখে বিতৃষ্ণ হইয়াছেন, কাফের

---

the present British station of Kussowlee to the northword of Ambala.—*Cunningham.*

দারা রাজ্য ভোগ করিবে, ইহা তিনি ধর্ম্মের নামে সহ্য করিতে পারিবেন না। পিতাকে দারার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াই তিনি ফকিরি লইয়া মক্কায় যাইবেন। মুরাদ ঔরঙ্গজেবের মনের কথা বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার বাক্-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। যুক্ত বাহিনী রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইল। দারা উভয় দিকের আক্রমণ রোধ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। জয়-পুর-রাজ জয় সিংহকে ও স্বীয় পুত্রকে সুজার বিরুদ্ধে ও রাজা যশোবন্তকে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। এই যুদ্ধদ্বয়ের উপর দারার ভাগ্য নির্ভর করিতেছিল, তথাপি তিনি সেই দুই যুদ্ধেরই ভার হিন্দু সেনাপতির উপর দিলেন। ইহাই তাঁহার বিশ্বাস-প্রবণতার প্রমাণ।

এই অবসরে শাহজাহান সুস্থ হইলেন ও স্বীয় ক্ষমতা স্বহস্তে লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হইয়া গিয়াছে—পুত্রেরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, আর ফিরিতে পারিল না। সুজা পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় পলাইয়া গেলেন ও পর বর্ষে মিরজুমলা পশ্চাদ্ধাবন করিলে তিনি আরাকান রাজের আশ্রয় লয়েন; কিন্তু সেখানে তিনি সপরিবারে আশ্রয়দাতাকর্ত্তৃক নিহত হন। এ দিকে ঔরঙ্গজেব কিন্তু রাজপুতরাজকে উজ্জয়িনীতে পরাজিত করিয়া দিল্লির দিকে চলিলেন। সেখানে দারা পিতার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া একটি যুদ্ধ দান করিলেন; ফলে তিনি পরাজিত হইয়া পলাইতে বাধ্য হইলেন। ইহার তিন দিন পরে ঔরঙ্গজেব জয়োল্লাসে রাজধানী প্রবেশ করিলেন এবং পিতাকে পদ-চ্যুত ও বন্দী করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

এইরূপে সিংহাসনের ও রাজকোষের অধিকার পাইয়াই ঔরঙ্গজেব ছদ্মবেশ দূরে ফেলিয়া দিলেন। সংসার ত্যাগের ও মক্কা গমনের কথা আর শুনা গেল না—শাসন ক্ষমতা অধিকার করিয়া ঔরঙ্গজেব আপনাকে আলমগীর (পৃথ্বীশ্বর) বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তাঁহার উন্নতির পথের একটি কণ্টক বর্ত্তমান থাকিতেও তাঁহার মনে শান্তি নাই। এক দিন মুরাদকে নিমন্ত্রণ করিয়া অপরিমিত ভাবে তাঁহাকে মদ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন ও আগ্রার দুর্গে বন্দী করিলেন। সুজার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মিরজুমলা তাঁহাকে ভারত ত্যাগ করাইয়াছিলেন। দারা পঞ্জাবে পলাইয়া যান। সেখানে তিনি হর রায়ের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পান; কিন্তু দারার প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী বিমুখ। তাই তাঁহাকে তথা হইতে গুজরাটে পলাইতে হয়। সেখানে তথাকার শাসনকর্ত্তার সাহায্য পাইয়া দারা ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে আবার অগ্রসর হন, কিন্তু পরাজিত হইয়া জুন

রাজ্যে (১) আশ্রয় লয়েন। ইহার রাজা পূর্ব্বে দারার নিকট যথেষ্ট উপকার পাইয়াছিল। কিন্তু কৃতঘ্ন রাজা তাঁহাকে ঔরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ করে। (২) যেখানে তিনি দুই দিন পূর্ব্বে রাজবৎ সম্মান পাইয়াছিলেন, সেই দিল্লীর রাস্তা দিয়া তাঁহাকে সর্ব্বসমক্ষে বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। কয়েকজন মোল্লার নিকট দারার নাম মাত্র বিচার হইল। তাঁহারা সম্রাটের মনস্তুষ্টির জন্য দারাকে বধ করিবার আদেশ করিলেন। তদনুসারে দারার মস্তক দেহচ্যুত হইয়া রক্ত-পিপাসী সম্রাটের নিকট প্রদত্ত হইল। ছিন্ন দেহটি হস্তিপৃষ্ঠে তুলিয়া সকলকে দারার দুর্দ্দশা জানান হইল। কাশ্মীর-রাজ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দারার পুত্র সুলেমানকে ধরাইয়া দিল—পিতার ন্যায় পুত্রকেও রাজপথে হাতে হাতকড়ি দিয়া বন্দী ভাবে যাইতে হয়। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া দর্শকের মধ্যে এমন পাষাণ কেহ ছিল না, যাহার চক্ষে বারিধারা দেখা যায় নাই। তাঁহাকে, তাঁহার ছোট ভাইকে ও মুরাদের এক পুত্রকে ভীষণ গোয়ালিয়র দুর্গে বদ্ধ করিয়া হত করা হয়। মুরাদকেও অচিরাৎ রাজাদেশে হত হইতে হয়। এই রূপে সমস্ত কণ্টকগুলি উন্মূলিত করিয়া পাষাণপ্রাণ ঔরঙ্গজেব সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

এইবার ভ্রাতাদেয় সাহায্যকারীদের শাস্তি দিবার পালা। হররায় দারাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এই কথা স্মরণ করিয়া সম্রাট হরর নিকট সংবাদ পাঠা-ইলেন—"যদি বিদ্রোহী সাজিয়া রাজা হইবার সাহস থাকে, তুমি আমার বিরুদ্ধে

---

(১) ইহা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। সিন্ধু দেশের পূর্ব্ব ধারে অবস্থিত। এইখানে অবস্থান কালে দারার স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

(২) খাফি খাঁর মতে, এই বিশ্বাসঘাতক জুনের অধিপতি নহেন। তিনি ধান্দরের অধিপতি। তাঁহার নাম মালিক জিবান। জিবান রাজানুগ্রহ লাভের আশায় দারাকে ও তৎপুত্র সেপের শেকোকে বন্দী করিয়া ঔরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ করেন। নিদ্রিত সেপেরকে বন্দী করিতে উদ্যত হইলে সেপেরের নিদ্রা ভঙ্গ হয় ও তিনি পাপীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তীরধনু লইয়া জিবানের তিন জন অনুচরকে বধ করেন। পরে বন্দী হইলে তাঁহাকে 'পিছমোড়া' করিয়া বাঁধা হয়। তৎপরে দারা বন্দী হন। দারা পুত্রের এরূপ অপমান দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া জিবানকে তিরস্কার করেন। জিবান তদ্বাক্যে বিচলিত হইয়া সেপেরের বন্ধন মোচন করিয়া দেন। কিন্তু তৎপরে তিনি দারার সমস্ত ধন সম্পত্তি অপহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে রাজহস্তে সমর্পণ করেন। (শ্রীযুক্ত রাম প্রাণ গুপ্ত প্রণীত 'মোগল বংশ' পুস্তকের 'শাহ জাহান' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

যুদ্ধায়োজন কর।" (১) এ সংবাদ পাইয়া হর একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিলেন। বিচার করিয়া দেখিলেন—সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিয়া সফল হইতে পারিবেন, এমন আশা তাঁহার নাই। কাজেই তিনি বাধ্য হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন; এবং পুত্র রামরায়কে এই উত্তর দিয়া দিল্লী পাঠাইলেন—"আমি জনৈক ফকির। আপনার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা ছাড়া আর আমার কোন কাজ নাই। আমার পুত্রকে দিয়া এই পত্র পাঠাই-লাম। বিশেষ কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় নিজে যাইতে পারিলাম না। আশা করি, আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন ও আমার পুত্রের সহিত সদয় ব্যবহার করিবেন।" (২) রাম রায় দিল্লীতে গিয়া সম্রাটকে পত্র দিলে সম্রাট বলিলেন—'হর রায় যে ফকির, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।' কিন্তু কথাটা কতদূর সরল প্রাণে বলিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। তবে রাম রায়ের সহিত যে অতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে একটি বহুমূল্য পোষাক পুরস্কার দিয়াছিলেন এবং রাজসভায় রাখিয়াছিলেন, একথা ঠিক্। যাহা হউক, রাম রায়কে রাজ-সভায় রাখিয়া ঔরঙ্গজেব কৌশল ক্রমে হর রায়ের কোন রূপ ভবিষ্যৎ উপদ্রব হইতে পঞ্জাব রক্ষা করিলেন।

হরর অন্তিম দশার কিন্তু আর দেরি নাই। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই হর তেত্রিশ বর্ষ ছয় মাস চৌদ্দ দিন গুরু পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর (৩) হিরত পুরে শান্তিতে লোকান্তর গমন করিলেন।

হররায় বড়ই শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি পিতামহ-নির্দ্দিষ্ট পথে বেশ সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তিনি শিবাজীর সমবয়স্ক হইয়াও শিবাজীর ন্যায় অদম্য হৃদয়ের অধিকারী হন নাই। হর গোবিন্দের পর হররায় গুরু না হইয়া যদি গোবিন্দ সিংহ গুরু হইতেন, তবে এই সময় শিখেরা অনেক কাজ করিতে পারিত।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১) M' gregor's History of the Sikhs.

(২) Ibid.

(৩) অনেকেই এই তারিখ লিখিতে ভুল করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন মতে ১৬৬০ হইতে ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের কোন একটি বর্ষে হর মরেন। কিন্তু তাহা ঠিক নয়।

বাঙ্গালীর ব্যবসা।

—:•:—

স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচনা ও আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছে। এতদিনে বাঙ্গালী বুঝিতে পারিয়াছে যে, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পকলার শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত কোন জাতিরই স্থায়ী উন্নতি লাভ সম্ভবপর নয়। তাই সহর বন্দর প্রভৃতি স্থানে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্যে লিপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের ইহাই যে সর্ব্বোত্তম ফল ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। দাসত্বজীবী বাঙ্গালীর স্বাধীন ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি যে দেশের পক্ষে পরম মঙ্গলের বিষয় তাহা কে অস্বীকার করিবে? বিদ্যা বুদ্ধিতে ভারতের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত বাঙ্গালী জাতির ব্যবসা বাণিজ্যেও শ্রেষ্ঠতা লাভ করা কি বাঞ্ছনীয় নয়? কত দিনে বাঙ্গালী যে ব্যবসা ক্ষেত্রে ভারতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিতে পারিবে তাহা কে বলিতে পারে? তবে বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যেরূপ উৎসাহ লক্ষিত হইতেছে তাহাতে আশা করা যায়, অচিরেই বাঙ্গালার বাণিজ্য ক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

অনেকেরই—বিশেষতঃ শিক্ষিত লোকের ধারণা, ব্যবসা বাণিজ্য করিতে হইলে কোনরূপ শিক্ষা দীক্ষারই আবশ্যক হয় না। আমরা ব্যবসা সূত্রে অনেক শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া এরূপ ভ্রান্ত ধারণার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছি। অনভিজ্ঞ লোকের বিশ্বাস, কোন রূপে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিলেই অক্লেশে ব্যবসা কার্য্য পরিচালনা করিতে পারা যায়। কিন্তু যাঁহারা ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে যে, তদ্বিষয়ে পূর্ব্বে আবশ্যকীয় শিক্ষার প্রয়োজন তাহা কোন ব্যবসায়ীই অস্বীকার করিবেন না, এবং এই জন্যই সমস্ত সুসভ্য দেশেই বালকগণকে ব্যবসা শিক্ষার্থ কোন সৎ ব্যবসায়ীর নিকট শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করার রীতি প্রচলিত আছে। ব্যবসাকে যিনি যতই সহজসাধ্য বলিয়া অনুমান করুন না কেন, কার্য্যক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে হইলে বিশেষ

অভিজ্ঞতার আবশ্যক। নচেৎ কোন ব্যবসায়ীরই বিশেষ উন্নতি লাভ সম্ভবপর নয়।

যে কোন কার্য্যেই হউক অনভিজ্ঞ লোকের প্রতি পদেই ত্রুটী হওয়ার সম্ভাবনা। হয়ত সময় বিশেষে এরূপ ভ্রম প্রমাদ হইতে পারে, যদ্দ্বারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়াও অসম্ভব নয়। এই জন্য কোন ব্যবসা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তদ্‌বিষয়ক মূল সূত্রগুলি শিক্ষা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করাই নিরাপদ।

অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভে দেশী বস্ত্রের যখন ভারী টানাটানি তখন অনেক ভদ্রলোক দেশী বস্ত্রের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবং অধিক দিন না যাইতেই তাঁহাদের অনেককে আবার ব্যবসাক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ যে বস্ত্র ব্যবসা সম্বন্ধে পূর্ব্ব অনভিজ্ঞতা তাহা প্রত্যেক ব্যবসায়ীই স্বীকার করিতে বাধ্য। আমরাও আন্দোলনের প্রথমেই দেশী বস্ত্রের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু এই ব্যবসায়ের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার অভাবে কার্য্যক্ষেত্রে নিষ্ফল হইতে হইয়াছে। অবশ্য, কার্য্য করিতে করিতেই তদ্‌বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে। কিন্তু ব্যবসা দ্বারা ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে অনেক সময় একমাত্র বিফলতাই অভিজ্ঞতার দ্বারা লব্ধ হইয়া থাকে। অধুনা বঙ্গের ব্যবসা কার্য্য কেবল মাত্র অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোক দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। ব্যবসায়ী সমাজে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্যান্য সুসভ্য দেশের ন্যায় বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজ ব্যবসায়ের প্রতি যদি মনোনিবেশ করিতে আরম্ভ করেন তবে বাঙ্গালার ব্যবসা ক্ষেত্রের যে অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অল্পদিন হইতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্যবসায়ে কথঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিয়াছেন বলিয়াই ইতিমধ্যে দেশীয় ২।৩টী জীবনবীমা কোম্পানী, ১টী ব্যাঙ্ক এবং ১টী ষ্টীমার কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। পরের দাসত্ব অপেক্ষা স্বাধীন ব্যবসাবৃত্তি যে নিজের এবং দেশের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর তাহা এখনও বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বলিয়াই এখনও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ তত আকৃষ্ট হয় নাই।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় বাণিজ্য ক্ষেত্রে একমাত্র মাড়োয়ারী সদাগরগণই কর্ণধার রূপে দণ্ডায়মান। বৈদেশিক এবং দেশীয় ব্যবসায়িগণের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী

রূপে ইহাঁরাই আদান প্রদানের কার্য্য করিয়া থাকেন। ইহাঁদের ব্যবসায় বুদ্ধি এরূপ তীক্ষ্ণ যে, বাঙ্গালীর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিকেও ইহাঁরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়াছেন। তবে ইহাঁদের মধ্যেও শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক না থাকায় বৈদেশিক-দিগের সহিত প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। এই উত্তর-বঙ্গের ব্যবসা বাণিজ্য একমাত্র মাড়োয়ারী সদাগরগণেরই হস্তগত। উত্তর-বঙ্গের হাট বাজার সহর বন্দর সমস্তই মাড়োয়ারী সদাগরগণ কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ভূসম্পত্তিও করিয়াছেন এবং একাধারে ব্যবসায়ী ও জমিদাররূপে পরিণত হইতেছেন। বঙ্গদেশেও সাহা তিলি প্রভৃতি কয়েকটী ব্যবসায়ী জাতির মধ্যে অনেক অর্থশালী লোক আছেন, কিন্তু মাড়োয়ারী ধনিগণের তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। বঙ্গীয় ব্যবসায়িগণ বঙ্গদেশের বহির্ভাগে যাইতে একান্তই নারাজ। কিন্তু এই মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ব্যাপিয়া ব্যবসা পরিচালনা করিতেছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানেও বঙ্গবাসী দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু তৎসমস্তই দাসত্বের অনুরোধে দূর-প্রবাসী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের বাঙ্গালী-দাস-উপনিবেশসমূহ যদি ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি একটু মনোনিবেশ করিতেন তবে বঙ্গের অবস্থা নিশ্চয়ই অন্যরূপ ধারণ করিত। অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত লোকের উপর ব্যবসাকার্য্য সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত থাকায় বঙ্গের ব্যবসাক্ষেত্রের কোনই উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না। শিক্ষিত লোক ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলে নিশ্চয়ই অনেক নূতন রকমের ব্যবসা দৃষ্ট হইবে এবং ব্যবসাক্ষেত্র ক্রমেই প্রসারিত হইতে থাকিবে।

শ্রীনন্দকুমার দত্তগুপ্ত।

নিয়তি।

—:*:—

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

তারার সহিত যুদ্ধে পাঠানসেনাগণ ক্লান্ত ও পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তাহারা পৃথ্বীরাজের আকস্মিক আক্রমণে একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সেনাপতি ইসুফ খাঁ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে সংযত করিতে পারিল না। তাহারা অন্ধকারে যে যেদিকে পারিল, পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা

করিল। কেবল কতকগুলি সৈন্য পাঠানগৌরব কলঙ্কিত করিতে পারিল না। সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া ইসুফ খাঁ পৃথ্বীরাজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইল।

কিন্তু পৃথ্বীরাজের ভীমবিক্রমের সম্মুখে তাহারা কতক্ষণ টিকিবে? ঝটিকার অগ্রে তৃণরাশির ন্যায় তাহারা উড়িয়া যাইতে লাগিল। তথাপি পাঠানগণ ভীত বা পলায়নপর হইল না, প্রকৃত বীরের ন্যায় একে একে রণশয্যায় শয়ন করিয়া পাঠান-গৌরব রক্ষা করিল। তাহাদের অসাধারণ বীরত্ব, জীবনদানে অকাতরতা দেখিয়া বিপক্ষগণ বিস্মিত হইল। তাহারাও শত্রু-মাহাত্ম্যে অনুপ্রাণিত হইয়া ভীমবিক্রমে যুঝিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে যুদ্ধক্ষেত্র প্রায় পাঠানশূন্য হইয়া আসিল। কেবল কয়েকজনমাত্র সৈন্য লইয়া ইসুফ খাঁ তখনও অসাধারণ পরাক্রমে যুঝিতে লাগিল। যেন অসংখ্য সাগরতরঙ্গের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া একটী ক্ষুদ্র তৃণ প্রচণ্ড উর্ম্মিমালার প্রতিরোধে স্বীয় উন্মাদিনী শক্তি নিয়োগ করিতে থাকিল। সহচরগণ একে একে রণভূমিতে শায়িত, বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে অশ্ব নিহত, পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন, সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা, শত্রুর ভীম হুঙ্কারে কর্ণ বধির, অসিচালনে হস্ত অবশপ্রায়; তথাপি ইসুফ যুদ্ধ হইতে বিরত হইল না, শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া বা বিপক্ষকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া পাঠানকুল কলঙ্কিত করিল না। তাহার অদ্ভুত বীরত্ব দর্শনে পৃথ্বীরাজ মুগ্ধ হইলেন। মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ধন্য পাঠানবীর!"

যমুনা ইহা দেখিল; বুঝিল, পাঠানবীর আজি জীবন্তে ফিরিবে না; শত্রু-সংহার আজি তাহার মুখ্য লক্ষ্য নয়, জীবনদানই প্রধান লক্ষ্য। যমুনা চীৎকার করিয়া বলিল,—"একলিঙ্গের দোহাই, কেহ আর পাঠানবীরের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিও না।"

ইসুফের কর্ণে এ চীৎকার প্রবেশ করিল; সে একবার যমুনার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল মাত্র। সে হাসিতে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সে আবার দৃঢ়মুষ্টিতে অসি ধারণ করিয়া শত্রুসৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

তারপর—তারপর ইসুফ দেখিল, রজনীর অন্ধকারটা গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে; মৃত্যুর অট্টহাস্যের তীব্র প্রতিধ্বনি আসিয়া কর্ণপটাহে ধ্বনিত হইতেছে; চিরস্থিরা ধরণী চক্রবৎ বিঘূর্ণিত হইতেছে; স্মৃতির উজ্জ্বল

আলোক ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতেছে। ইসুফের হস্ত হইতে অসি চর্ম্ম খসিয়া পড়িল; ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে একবার উচ্চারিত হইল,—"আল্লা!" তারপর তাহার অবশ দেহ শত্রুশবের উপর ঢলিয়া পড়িল। পৃথ্বীরাজ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেখিলেন, যে কয়জন পাঠান তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তাহাদের একজনও আর ফিরিল না।

পৃথ্বীরাজ সৈন্যসহ আপন শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যমুনা তাঁহাকে শূরতানের আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু পৃথ্বীরাজ সসম্মানে তাহার প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন,—"সত্বর রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য পিতা অনুমতি করিয়াছেন। সুতরাং এ যাত্রা তোমার প্রভুর আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না। পিতার অনুমতি লইয়া শীঘ্রই বেদনোর-অধিপতির গৃহে অতিথি হইবার চেষ্টা করিব।"

ঈষৎ হাসিয়া যমুনা, পৃথ্বীরাজকে বিদায় দিল; পৃথ্বীরাজ সৈন্য সহ চলিয়া গেলেন।

তখন রজনী অবসানপ্রায়; পূর্ব্বাকাশের কোলে উষার কণকরশ্মি ফুটিয়া উঠিয়াছে; রজনীর অন্ধকার ধীরে ধীরে আরাবল্লীর নিভৃত গুহার আশ্রয় লইয়া আত্মগোপন করিতেছে। যমুনা অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া বসিয়া দেখিল, রণভূমি নিস্তব্ধ; কিছুকাল পূর্ব্বে যে স্থান যোদ্ধার হুঙ্কারে, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায়, আহতের আর্ত্তনাদে, অশ্বের হ্রেষায় প্রকম্পিত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, সে স্থান এক্ষণে শ্মশানবৎ নিস্তব্ধ নির্জ্জন। সেই স্তব্ধ শ্মশানভূমি হইতে কেবল মাঝে মাঝে মুমূর্ষু-কণ্ঠ-নিঃসৃত ক্ষীণ আর্ত্তনাদ উঠিয়া প্রভাত-গগনে বিলীন হইতেছে।

যমুনা অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। তারপর ঘুরিয়া ফিরিয়া, শবরাশি অতিক্রম করিয়া, যেখানে পাঠানবীর ইসুফ খাঁ রণশয্যায় শয়ন করিয়াছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইল। দেখিল, সম্মুখে রুধিরকর্দ্দমিত ভূমিশয্যায় রক্তাক্ত দেহে ইসুফ খাঁ পতিত। যমুনা জানু পাতিয়া সেই স্থানে বসিল; তারপর ধীরে ধীরে ইসুফের নাসিকার নিকট হাত রাখিল। দেখিল, অল্প অল্প নিশ্বাস বহিতেছে; আশায় আনন্দে যমুনার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। উদ্বেগকম্পিত হস্তে বক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তখনও সে স্থান শীতল হয় নাই, তখনও বক্ষ মৃদু মৃদু স্পন্দিত হইতেছে। যমুনা বুঝিল, এখনও পাঠান মরে নাই, চেষ্টা করিলে হয়তো বাঁচিতে পারে। যমুনা নত হইয়া, ইসুফের কাণের কাছে মুখ রাখিয়া উদ্বেগ বিকম্পিত কণ্ঠে ডাকিল,—"খাঁ সাহেব!"

কোন উত্তর নাই। যমুনা আবার ডাকিল,—"খাঁ সাহেব!" ইসুফ নীরব নিশ্চল। কণ্ঠস্বর আরও উচ্চ করিয়া যমুনা ডাকিল,—"খাঁ সাহেব!"

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া যমুনার হাত চাপিয়া ধরিল। তীব্রকণ্ঠে বলিল,—"পাপিষ্ঠা!"

যমুনা সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, পশ্চাতে তারা। যমুনা সবেগে উঠিয়া তারার গলা জড়াইয়া ধরিল। তারাও আপনার মৃণাল ভুজপাশে যমুনাকে আবদ্ধ করিল। যেন একটি প্রস্ফুটিত কমল আর একটি প্রস্ফুটিতপ্রায় কমলকে জড়াইয়া ধরিল; জ্যোৎস্না আসিয়া কুসুম-স্তবককে আলিঙ্গন করিল; সৌন্দর্য্যের সহিত মাধুর্য্যের মধুর সম্মিলন হইল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না; উভয়েরই হর্ষ-বিস্ফারিত লোচনযুগল হইতে আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তারা কথা কহিল; ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"পাপিষ্ঠা, আমাকে ত্যাগ করিয়া শেষে পাঠানের প্রেমে মজিয়াছ?"

যমুনাও হাসিল; বলিল,—"প্রেম কি আর হিন্দু পাঠান বিচার করে?"

যমুনার গলা ছাড়িয়া দিয়া তারা বলিল,—"রহ পাপিষ্ঠা, বিচার করে কি না তোমায় দেখাইতেছি।"

যমুনা বলিল,—"তাহার আগে এই পাঠান যাহাতে বাঁচে তাহার উপায় কর দেখি।"

তা। পাঠানের উপর এত দরদ কেন?

য। পাঠান যে আমার প্রেমের মানুষ।

তা। এত রাজপুত ছাড়িয়া, আমাকে ছাড়িয়া পাঠানের উপর প্রেমের ঝোঁকটা পড়িল কেন?

য। নিজের জাতি ছাড়িয়া, আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া পাঠান তোমাকে রক্ষা করিল কেন? বেদনোরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিল কেন?

তারা বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে যমুনার মুখের দিকে চাহিল। যমুনা বলিল,—"এখন যদি নিজে অকৃতজ্ঞ হইতে না চাও, আমাকে অকৃতজ্ঞ করাইতে না চাও, রাজপুত জাতির মাথায় অকৃতজ্ঞতার ভার চাপাইতে না চাও, তাহা হইলে যাহাতে এই পাঠানবীরের জীবনরক্ষা হয় তাহার চেষ্টা কর।"

একটু ভাবিয়া তারা বলিল,—"সত্য।"

অদূরে কয়েকজন পরিচারক আহত সৈনিকগণের শুশ্রূষার জন্য উপস্থিত

ছিল। তারার আদেশে তাহারা ইসুফের সংজ্ঞাহীন দেহ স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়া দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইল। তারা ও যমুনা তাহাদের পশ্চাৎ চলিল।

কিয়দ্দূর যাইতে সহসা এক মৃত পাঠান সৈনিকের উপর তারার দৃষ্টি পতিত হইল। তারা নিকটে গিয়া উত্তম্‌রূপে সৈনিককে পর্য্যবেক্ষণ করিল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"হায় হতভাগ্য!"

যমুনা জিজ্ঞাসা করিল,—"এ হতভাগ্য কে?"

তারা উত্তর করিল,—"অনঙ্গ সিংহ।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

জ্যেষ্ঠ পুত্র সঙ্গ নিরুদ্দিষ্ট, কনিষ্ঠ জয়মল্ল নিহত; এদিকে সূর্য্যমল্ল সিংহাসন অধিকারের জন্য সারঙ্গদেব প্রমুখ কয়েকজন সর্দ্দারের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে। এ অবস্থায় বৃদ্ধ রাণা রায়মল্ল চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অনেক চিন্তার পর শেষে পৃথ্বীরাজকে আনয়ন করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। পৃথ্বীরাজকে আনয়নের নিমিত্ত গদবারে দূত প্রেরিত হইল।

কিন্তু পৃথ্বীরাজ তখন গদবারে ছিলেন না; তিনি তোড়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, সুতরাং পথিমধ্যেই দূতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পিতার স্নেহাহ্বান শ্রবণে পৃথ্বীরাজের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার বহুদিনের সঞ্চিত আশা এবার ফলবতী হইল। পিতার চরণবন্দনার জন্য তিনি চিতোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে তাঁহার হৃদয়ে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অগ্রে তারার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন, কি পিতৃ সন্দর্শনে যাইবেন? কোন্ কর্ত্তব্যটী অগ্রে পালনীয়? পিতা যখন আহ্বান করিয়াছেন, তখন তাঁহার আহ্বান উপেক্ষা করিয়া, তাঁহার অনুমতি না লইয়া তোড়া বিজয়ে যাত্রা করিলে—বিজয়লক্ষ্মীরূপিণী তারাকে অঙ্কশায়িনী করিলে যদি পিতা ক্রুদ্ধ হন? যদি তিনি ক্রোধবশে আবার তাঁহাকে চিতোর-সিংহাসনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন? আবার, পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া তোড়াবিজয়ে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই যদি বিজয়লক্ষ্মী তারা হস্তচ্যুতা হয়? একদিকে সিংহাসন—চিরবাঞ্ছিত চিতোর-সিংহাসন, অন্যদিকে তারা—সুন্দরীশিরোমণি, প্রেমময়ী, হৃদয়ের আরাধ্যদেবতা-স্বরূপিণী তারা। এক্ষণে কোন্ কর্ত্তব্য অগ্রে পালনীয়? তারা বড় না চিতোর-সিংহাসন বড়? তুচ্ছ সিংহাসন—নশ্বর পার্থিব সিংহাসন! তারা যে স্বর্গ সুন্দরী।

হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পৃথ্বীরাজ বেদনোরের অনতিদূরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তখনও কি কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু অবধারণের পূর্ব্বেই ছদ্মবেশিনী যমুনা আসিয়া বেদনোর রক্ষার্থ তাঁহাকে আহ্বান করিল।

এতদিনের চিন্তায় পৃথ্বীরাজ যে কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারেন নাই, পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে—সে যুদ্ধ খণ্ড যুদ্ধ হইলেও—তাহাতে তিনি আপনার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিলেন। মুষ্টিমেয় পাঠানসৈন্যের অদ্ভুত বীরত্ব দর্শনে পৃথ্বীরাজ বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, এই দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে পরাজিত করিতে হইলে শক্তিমান্ রাজপুত সৈন্যের আবশ্যক। সুতরাং অগ্রে চিতোর যাত্রাই শ্রেয়স্কর। নতুবা বিবেচনার দোষে হয়তো শেষে সকল দিক নষ্ট হইবে। সিংহাসনও যাইবে, তারা-লাভের আশাও চির জীবনের মত বিলুপ্ত হইবে।

যুদ্ধাবসানে পৃথ্বীরাজ সৈন্য সহ চিতোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চিতোরে উপস্থিত হইয়া পৃথ্বীরাজ পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। বহুদিন পরে পিতাপুত্রের আবার সম্মিলন হইল। স্নেহময় পিতা সাদরে পুত্রকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন। তারপর কিয়দ্দিবস পিতৃসকাশে অবস্থিতি করিয়া পৃথ্বীরাজ পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সৈন্য সহ পাঠানবিজয়ে যাত্রা করিলেন।

পৃথ্বীরাজ গেলেন, কিন্তু এবার তাঁহার সহিত কানাইয়া গেল না। পৃথ্বীরাজ তাহাকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন, কিন্তু সে যাইতে চাহিল না। পৃথ্বীরাজ চলিয়া গেলে সে একা বসিয়া গান করিতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মহরমের পবিত্র দিবস। ধর্ম্মোন্মত্ত পাঠানগণ শুভ্র পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া দলে দলে বিচরণ করিতেছে; মহরমের শোকসঙ্গীতে তোড়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সেই সঙ্গীতের মধ্য হইতে একটা করুণস্মৃতি উত্থিত হইয়া অতীতের দুঃখময়ী কাহিনীকে যেন নূতন করিয়া জাগাইয়া দিতেছে। সেই কারবালার ভীষণ রণক্ষেত্র, রণক্ষেত্রে তৃষাতুর পুত্রের জন্য শত্রুর নিকট হুসেনের সেই এক বিন্দু বারিভিক্ষা, বারির পরিবর্ত্তে শত্রুর—পাষাণ হৃদয় শত্রুর কঠোর-হস্ত-নিক্ষিপ্ত সেই বজ্রসম শর, হুসেনের—অদৃষ্টনিপীড়িত হুসেনের হতাশহৃদয়-নিঃসৃত সেই আকুল দীর্ঘশ্বাস, সকলই যেন একে একে আজ পাঠানগণের সম্মুখে জাগিয়া

উঠিতেছে; তাহাদের আকুল কণ্ঠনিঃসৃত শোকসঙ্গীতের করুণ প্রতিধ্বনি তুলিয়া দিগন্তও যেন হায় হায় করিতেছে। বহুশতাব্দীর অতীত কাহিনী আজি আবার নূতন মূর্ত্তিতে মহম্মদশিষ্যগণের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে!

মহরমের 'তাজিয়া' বাহির হইয়াছে। তাজিয়ার অগ্রে পশ্চাতে সহস্র সহস্র মুসলমান; সকলের মুখেই শোকসঙ্গীতের করুণ রোল। রাজপথে লোকারণ্য। সেই লোকারণ্য ভেদ করিয়া তাজিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

ক্রমে তাজিয়া লিল্লার প্রাসাদ সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেখানে আসিয়া তাজিয়া দাঁড়াইল; সকলে সমস্বরে পাঠানসর্দ্দারের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সে শব্দ লিল্লার কর্ণে প্রবেশ করিল। লিল্লা তখন শোভাযাত্রায় বাহির হইবার জন্য বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। জনৈক পরিচারক মহার্হ পরিচ্ছদে তাঁহার দেহ ভূষিত করিয়া দিতেছিল। প্রাসাদের ভিতরে ও বাহিরে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

মহামূল্য পরিচ্ছদে দেহ সুসজ্জিত করিয়া লিল্লা যেমন বাহির হইতে যাইবেন, অমনই তিনটী অশ্বারোহীর উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। অশ্বারোহিত্রয়ের মধ্যে দুইজন পুরুষ, একজন স্ত্রীলোক; তিনজনই রণসাজে সজ্জিত। তাহাদের আকৃতি ও বেশভূষা দেখিয়াই লিল্লা বুঝিতে পারিলেন, ইহারা রাজপুত। এই অসংখ্য পাঠান ভেদ করিয়া রাজপুতত্রয় কিরূপে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিল, এই রমণীই বা কোন্ সাহসে এ স্থানে আসিল, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তোমরা?"

তাঁহার মুখের কথা শেষ না হইতেই অশ্বারূঢ়া রমণী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় হস্তস্থিত বর্শা নিক্ষেপ করিল। বর্শা সবেগে আসিয়া লিল্লার বক্ষে বিদ্ধ হইল। লিল্লা চীৎকার করিয়া সেই স্থানে পড়িয়া গেলেন। চারিদিক হইতে একটা ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল। যাহারা লিল্লাকে বর্শাবিদ্ধ হইতে দেখিয়াছিল, তাহারা সর্দ্দারের নিকট ছুটিল, যাহারা দেখে নাই, তাহারা ব্যাপার কি জানিবার জন্য বৃথা কোলাহল করিতে লাগিল। আর যাহারা বর্শানিক্ষেপকারিণীকে দেখিয়াছিল, তাহারা তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিল। কিন্তু রমণী ও তাহার সঙ্গীদ্বয় তখন আর সেখানে নাই; তাহারা এই গোলযোগের মধ্যে একেবারে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়াছে।

কিন্তু দ্বার হইতে বাহির হওয়া সহজ হইল না। এক বৃহৎকায় হস্তী দ্বার

রোধ করিয়া দণ্ডায়মান। এ দিকে পশ্চাতে অসংখ্য পাঠান প্রভুহন্তা আততায়ীকে ধরিবার জন্য উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে। অশ্বারোহিত্রয় একবার পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিতে ভীতির চিহ্ন নাই, সাহসের ও গর্ব্বের রেখা বিদ্যমান।

অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহী পার্শ্বচারিণী অশ্বারোহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তারা, আর রক্ষা নাই।"

তারা ঈষৎ হাসিল; বলিল,—"মহাবীর পৃথ্বীরাজের মুখে একথা শোভা পায় না। পাঠানের প্রাণ লইতে আসিয়াছি, পাঠান-হস্তে প্রাণ দিতে আসি নাই।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তারা অশ্ব ছুটাইয়া অসি হস্তে দ্বারাবরোধকারী হস্তীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া গজরাজ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং আপনার যমদণ্ড সদৃশ শুণ্ড উত্তোলন করিয়া তারাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই তারা আপনার হস্তস্থিত অসি দ্বারা সবলে তাহার শুণ্ডোপরি আঘাত করিল। সে প্রচণ্ড আঘাতে শুণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়িল। তখন করবিহীন করিরাজ কাতর চীৎকার করিতে করিতে দ্বার পরিত্যাগ করিয়া ছুটিল। এই অবসরে তারা, পৃথ্বীরাজ ও তাঁহাদের সঙ্গী রাজপুত প্রাসাদের বাহির হইয়া পড়িল। তারার অসাধারণ সাহস, অলৌকিক বীর্য্য দর্শনে পৃথ্বীরাজ বিস্মিত স্তম্ভিত। তিনি বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে তারার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তারা, তুমি কে ?"

তারা ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"আমি রাজপুত রমণী।"

পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"কিন্তু এমন রমণী যাহাদের জননী, এমন রমণী যাহাদের ভগিনী, এমন রমণী যাহাদের কন্যা, এমন রমণী যাহাদের সহধর্ম্মিণী, সে জাতি বিদেশীর—বিধর্ম্মীর পদতলে দলিত হয় কেন ?"

তারা বলিল,—"অদৃষ্ট। কিন্তু সে কথা পরে; আপাতত এই রমণীকে এ পাঠান-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করুন।"

পৃথ্বীরাজ দেখিলেন, সত্যই তখন তাঁহারা পাঠান-সমুদ্র মধ্যে নিপতিত; চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র পাঠান আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এ দৃশ্য দর্শনে পৃথ্বীরাজের হৃদয় ভীত বা বিচলিত হইল না। তিনি মুহূর্ত্তে অসি নিষ্কোষিত করিয়া গগনভেদী স্বরে চীৎকার করিলেন,—হর হর বোম্ বোম্। সঙ্গে সঙ্গে সেই উদ্বেলিত পাঠানসমুদ্রের মধ্য হইতে ভীমশব্দে প্রতিধ্বনি উঠিল—হর হর বোম্ বোম্। পাঠানগণ সবিস্ময়ে দেখিল, সেই শোভাযাত্রী পাঠান-

মণ্ডলী হইতে শত শত রাজপুত উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে মুহূর্ত মধ্যে বাহির হইয়া পাঠান সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

তখন সেই পবিত্র উৎসবক্ষেত্র ভীষণ রণক্ষেত্রে পরিণত হইল। উৎসবমত্ত পাঠানের শোণিত-প্রবাহে সে ক্ষেত্র রঞ্জিত হইল। রাজপুতের ভীষণ অস্ত্রাঘাতে দলে দলে পাঠানসৈন্য প্রাণ দিতে লাগিল। পাঠান হস্তেও রাজপুত মরিল; কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প।

যুদ্ধ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, অল্প ক্ষণের মধ্যেই পাঠানগণ পরাজিত হইল। সর্দ্দার লিল্লা খাঁ নিহত, সৈন্যগণ সেনাপতিবিহীন, অস্ত্রশস্ত্রে সম্পূর্ণ সজ্জিত নহে। সুতরাং ইহার ফল যাহা হইতে পারে তাহাই হইল। অধিক সংখ্যক পাঠান মরিল, অবশিষ্ট অল্প সংখ্যক পাঠান তোড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। বহুদিন পরে তোড়াটঙ্ক আবার পাঠানশূন্য হইল, আবার হিন্দুর বিজয়নিনাদে তোড়াবক্ষঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; সে জয়-নিনাদে বুঝি দিল্লির পাঠান-সিংহাসন পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। প্রভাতে যে স্থান দীন্ দীন্ শব্দে জাগরিত হইয়াছিল, নিয়তির বিচিত্র বিধানে সেই স্থানই হর হর বোম্ বোম্ শব্দের সহিত সন্ধ্যাদেবীকে বন্দনা করিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অমরতা।

হে মরণ! তব দীপ্ত রুদ্র মূর্ত্তি স্মরি,
সদা ভয়ে কাঁপিত পরাণ;
কল্পনায় তব ভীম ভ্রূকুটী নেহারি,
হ'তো বিশ্ব শূন্যময় জ্ঞান।
মনে হ'তো বিশ্ব তব ক্রীড়ার কন্দুক,
ধ্বংসমাত্র নিয়ম তোমার;
ভাবিতাম তুমি মৃত্যু! সুখে মহাদুখ;
ছবি তুমি নিরমমতার।

কিন্তু আজি একি হেরি স্বপনের প্রায়,
শেষ নহে তব আলিঙ্গন।
জীবনে দুর্লভ যাহা—তুমি দাও তায়,
ধ্বংস মাঝে নবীন গঠন।
তব ভয়ে ভীত যেই রোগে শোকে মরে,
সেই শুধু হারায় জীবন;
কিন্তু যে জীবন দেয় অপরের তরে,
মৃত্যু তার সুখনিকেতন।
কাঁদিয়া যে মরে তার বিফল মরণ,
তারই রহে জীবনে মমতা;
হাসিমুখে যে তোমারে করে আলিঙ্গন,
মরণে সে পায় অমরতা।

শ্রীমতী মঙ্গলতা দেবী।

জ্যোতিষ-রহস্য।

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব।

(গ্রহগণের গতি, স্থিতি প্রকৃতি।)

রাশিভোগ। রবিগ্রহের এক রাশি ভোগের কাল একমাস; চন্দ্রের ২ দিন, ১৫ দণ্ড; মঙ্গলের ৪৫ দিন; বুধের ১৮ দিবস; বৃহস্পতির ১ বৎসর; শুক্রের ২৮ দিন; শনির ২ বৎসর ৬ মাস; রাহু ও কেতুর ২ বৎসর ৬ মাস। মঙ্গল হইতে শনিগ্রহ পর্য্যন্ত এই পঞ্চগ্রহের বক্র ও শীঘ্র গতি বশতঃ উক্ত নির্দ্দিষ্ট রাশি-ভোগ কালের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। কিন্তু সমুদায় রাশিচক্র ঘুরিয়া আসিতে, রবিগ্রহের ১ বৎসর, চন্দ্রের ২৭ দিন, মঙ্গলের ১ বৎসর ৬ মাস, বুধের ৭ মাস ৬ দিন, বৃহস্পতির ১২ বৎসর, শুক্রের ১১ মাস ৬ দিন, শনির ৩০ বৎসর, এবং রাহু কেতুর ১৮ বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া যায়। রবি হইতে শনি পর্য্যন্ত সপ্তগ্রহ রাশিচক্রে বামাবর্ত্তে অর্থাৎ মেষ হইতে বৃষ, বৃষ হইতে মিথুন রাশিতে গমন করে; কিন্তু রাহু ও কেতু দক্ষিণাবর্ত্তে অর্থাৎ

মেষ হইতে মীন, মীন হইতে কুম্ভ রাশিতে গমন করিয়া পরিশেষে মেষে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ষড়্‌বিধ গতি। রবি ও চন্দ্রের গতি সরল। মঙ্গল হইতে শনি পর্য্যন্ত পঞ্চগ্রহের, শীঘ্র, সম, মন্দ, বক্র, অতিবক্র এবং সহজ এই ষড়্‌বিধ গতি নির্ণীত হইয়াছে। শীঘ্রগতি হইতে অতিচার ও মহাতিচার গতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। রাহু ও কেতুর বক্রগতি।

অষ্টপ্রকার গতি। কথিত ষড়্‌বিধ গতি ব্যতীত গ্রহগণের অপর অষ্টপ্রকার গতি আছে। যথা:—বক্র, অনুবক্র, কুটিল, মন্দ, মন্দতর, সম, শীঘ্র ও শীঘ্রতর। তন্মধ্যে সম, মন্দ, মন্দতর, শীঘ্র ও শীঘ্রতর এই পঞ্চ প্রকার গতিকে সরল গতি;—আর কুটিল, বক্র, ও অনুবক্র এই তিন প্রকার গতিকে বক্র গতি কহে। রবি ও চন্দ্রের বক্র ও শীঘ্র গতি নাই।

অতিবক্রী গ্রহ। মঙ্গল হইতে শনি পর্য্যন্ত পঞ্চগ্রহের মধ্যে যে কোন গ্রহ, বক্রী হইয়া যদ্যপি অবস্থিত রাশি হইতে, পুনর্ব্বার পূর্ব্ব রাশিতে গমন করে, তাহা হইলে সেই গ্রহটীকে অতিবক্রী গ্রহ কহা যায়।

অতিচারী গ্রহ। মঙ্গল হইতে শনিগ্রহ পর্য্যন্ত পঞ্চ গ্রহের মধ্যে কোন একটী গ্রহ যদি নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত এক রাশিতে বাস না করিয়া অন্য রাশিতে গমন করে, তাহা হইলে সেই গ্রহকে অতিচারী গ্রহ বলা হইয়া থাকে।

অতিচারের দিন সংখ্যা। মঙ্গল গ্রহ অতিচারী হইলে ১৫ দি বুধ ১০ দিন, বৃহস্পতি ৪৫ দিন, শুক্র ১০ দিন, এবং শনিগ্রহ ৬ মাস কাল এক রাশিতে থাকিয়া, পুনরায় পূর্ব্ব রাশিতে প্রত্যাগমন করে। অতিচারী গ্রহ যত দিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ব রাশিতে পুনরাগমন না করে, ততদিন তাহাকে অতিচারী গ্রহ বলা যায়।

মহাতিচারী গ্রহ। কোন একটী অতিচারী গ্রহ, তাহার অতিচার গমনের নির্দ্দিষ্ট ভোগ কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর, পূর্ব্ব রাশিতে পুনরায় আগমন না করিয়া যদি তাহার পরবর্ত্তী রাশিতে গমন করে, তাহা হইলে, সেই গমনকে মহাতিচারী গমন বলা যায়। বৃহস্পতি গ্রহ মহাতিচারী হইলে এক বৎসর লুপ্ত সংবৎসর অর্থাৎ কালাশুদ্ধি হইয়া থাকে।

উদয়াস্ত দিক্ নির্ণয়। মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, শুক্র ও বক্রী বুধ এই পঞ্চগ্রহের স্ফুটরাশ্যাদি, রবিগ্রহের স্ফুটরাশ্যাদি হইতে অধিক হইলে পশ্চিম দিকে অস্তমিত হইয়া থাকে এবং রবির স্ফুট রাশ্যাদি অল্প হইলে পূর্ব্ব দিকে

উদিত হইয়া থাকে। রবির স্ফুট রাশ্যাদি হইতে, শীঘ্রগামী চন্দ্র, বুধ ও শুক্র এই তিন গ্রহের স্ফুটরাশ্যাদি অল্প হইলে পূর্ব্ব দিকে অস্ত এবং স্ফুটরাশ্যাদি অধিক হইলে পশ্চিম দিকে উদয় জানা যায়।

উদয়াস্তের অংশ নিরূপণ। রবিগ্রহের স্ফুট হইতে, বৃহস্পতির স্ফুট ১১ অংশ অধিক হইলে উহার পশ্চিম দিকে অস্ত এবং ১১শ অংশ অল্প হইলে উহার পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া থাকে। শনির ১৫ অংশ অধিক হইলে পশ্চিমে অস্ত এবং ১৫ অংশ অল্প হইলে পূর্ব্বদিকে উদয় হয়। মঙ্গল গ্রহের ১৭ অংশ অধিক হইলে পশ্চিমে অস্ত এবং ১৭ অংশ অল্প হইলে পূর্ব্বদিকে উদয় বুঝা যায়। চন্দ্রগ্রহের স্ফুট, রবির স্ফুট হইতে ১২ অংশ অধিক হইলে পশ্চিম দিকে উদিত (সেই সময়ে শুক্লা দ্বিতীয়া তিথির আরম্ভ হয়) এবং ১২শ অংশ ন্যূন হইলে, পূর্ব্ব দিকে অস্তমিত হইয়া থাকে। (তখন অমাবস্যার আরম্ভ হয়)। রবি-স্ফুট হইতে বক্রী শুক্রের স্ফুট ৮ অংশ অল্প হইলে পূর্ব্বদিকে উদয় বুঝা যায়। শীঘ্রগামী শুক্র-স্ফুট রবিস্ফুট হইতে ১০ অংশ অল্প হইলে পূর্ব্ব দিকে অস্ত এবং ১০ অংশ অধিক হইলে পশ্চিম দিকে উদয় নিরূপিত হয়। বক্র ও শীঘ্রগামী বুধের উদয়াস্তের দিক, বক্র ও শীঘ্রগামী শুক্রের উদয়াস্তের অনুরূপ বুঝিতে হইবে। ইহার বিশেষ এই যে, বক্রী বুধের ১২ অংশে এবং শীঘ্র বুধের ১৪ অংশে উদয়াস্ত হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ জ্যোতিঃশেখর।

এরোরুট।

—(:০:)—

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ—এরোরুটের আদি জন্মস্থান আমেরিকা। ইহা প্রথমতঃ আমেরিকা হইতে ইউরোপে আনীত হয়, তৎপরে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। প্রায় দুইশত বৎসর যাবৎ ভারতবাসীর সহিত ইহার পরিচয়। ইহা কোন্ সময়ে ইউরোপ হইতে এদেশে আনীত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই। অনেকের মতে ইংরেজাধিকারের পর হইতেই ভারতের নানাস্থানে ইহার আবাদ হইতেছে। পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এদেশে পদার্পণ করিবার

বহু পূর্ব্বেই এরোরুট এদেশে আনীত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা যে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ অথবা ফরাসিদিগের কর্ত্তৃক এদেশের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ দেখা যায় না। পেঁপে, গোল আলু বা বিলাতি আলু এবং চিনা বাদাম প্রভৃতি যে সমুদয় শস্য আমেরিকা হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে, তন্মধ্যে গোল আলু, পেঁপে এবং এরোরুট সমসাময়িক।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কলম্বস নূতন মহাদ্বীপ আবিষ্কার করেন। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের (West India) অধিকাংশ অধিবাসীই সরল, দয়ালু এবং ভীরু প্রকৃতির ছিল বলিয়া কলম্বস অধিকাংশ দ্বীপই নির্ব্বিবাদে অধিকার করেন। একবার মাত্র কামানের শব্দ শুনিয়াই, দ্বীপবাসিগণ ভয়ে জড় সড় হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে, তাহারা বিনা যুদ্ধেই বশ্যতা স্বীকার করে। তবে কোন কোন স্থানের যুদ্ধপ্রিয় অসভ্য জাতির সহিত তাঁহাকে নাম মাত্র যুদ্ধও করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় বিপক্ষ দল ধনুকের অগ্রভাগে এরোরুটের মূল বিদ্ধ করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিল। সেই মূল কলম্বসের সহচরগণ খাদ্যাভাবে আহার করিয়া, তাহার গুণের বিষয় অবগত হয়। পরে যুদ্ধাবসানে এই মূল বহু পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে আনয়ন করে। এই সময় হইতেই এরোরুটের আবাদ ক্রমে ক্রমে ইউরোপময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। Arrow অর্থাৎ ধনুকের অগ্রভাগে root অর্থাৎ মূল বিদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহারা এই মূলের নাম এরোরুট নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই ইহা এরোরুট নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। যাহারা বিনা যুদ্ধে বশ্যতাস্বীকার করিয়াছিল, তাহারা কলম্বসের সঙ্গিগণকে ভস্মাচ্ছাদিত এক প্রকার খাদ্য দ্রব্য এবং নানাবিধ ফলমূল খাইতে দিয়াছিল। এই ভস্মাচ্ছাদিত দ্রব্যের নাম তাহারা "বেটেটো" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল। এই "বেটেটো"ই ইউরোপে আসিয়া "পটেটো" অর্থাৎ গোল আলু নামে সুপরিচিত হয়। ইউরোপ বা বিলাত হইতে আমাদের দেশে প্রথমতঃ গোল আলুর আমদানি হইয়াছিল বলিয়াই, ইহা এদেশে বিলাতি আলু নামেই পরিচিত হইয়াছে।

বিলাতি আলু ও এরোরুট একই সময়ে আমেরিকা হইতে ইউরোপে নীত হয়। কিন্তু ইহা একসঙ্গে ভারতে আনীত হইয়াছিল কি না সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

গোল আলু, পেঁপে এবং চিনাবাদাম প্রভৃতির ন্যায় এরোরুট ভারতের প্রায়

সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে ইহার বহুল চাষের বিস্তার হইলে, দেশের দশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়। ইহাতে কৃষকের লাভও বিস্তর। আমেরিকার মৃত্তিকা ও আবহাওয়ার সহিত ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গ ও আসামের মৃত্তিকাদির অনেকাংশেই সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে, আমেরিকার বৃক্ষলতাদি এখানে এবং এখানকার বৃক্ষলতাদি আমেরিকায় যেরূপ সুন্দররূপে বর্দ্ধিত ও বহুফলপ্রসূ হয়, অন্যান্য ভূভাগের কোন বৃক্ষ সম্বন্ধেই সেরূপ বলা যায় না।

কিরূপ জমির আবশ্যক।—কৃষিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ মূলজাতীয় উদ্ভিদকে যে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ; তন্মধ্যে গোল আলু, পেঁয়াজ প্রভৃতি গোলাকার মূলবিশিষ্ট এবং শঠি, হলুদ, আদা, এরোরুট এবং রজনীগন্ধা ফুল প্রভৃতি ঝাড় বিশিষ্ট গাছগুলি দুই বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত হইলেও, প্রায় একই প্রকার জমিতেই উত্তম রূপে জন্মিয়া থাকে। সুতরাং এরোরুটের জন্য কিরূপ জমির আবশ্যক, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনার বিশেষ কোন আবশ্যক নাই। পলি পড়া বা চরভরাটী (বর্ষার প্রবল স্রোতে নানা স্থান হইতে মৃত্তিকার সহিত উদ্ভিজ্জের ও মৃত্তিকার গলিত সারাংশ এবং পর্ব্বত-বিধৌত নানাবিধ ধাতব পদার্থ নদী, খাল, বিল প্রভৃতির উভয় কূলে স্তরে স্তরে আসিয়া সঞ্চিত হওয়ায় যে জমি প্রস্তুত হয় তাহাকেই পলিপড়া জমি কহে। এই শ্রেণীস্থ জমি নদীর উভয়কূলে ১০।১২ মাইল পর্য্যন্ত ধরা যায়।) জমির মধ্যে যেগুলি বর্ষায় জলমগ্ন হয় না, এইরূপ উচ্চভূমিই এরোরুটের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দোঁয়াশ (বেলে ও এটেল মিশ্রিত) জমি মাত্রই এরোরুটের পক্ষে প্রশস্ত। এরোরুট গাছের গোড়ায় জল লাগিলে, আদা ও হলুদের ন্যায় উহারও মূল পচিয়া যায়, ফলে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই গাছ শুষ্ক হইয়া যায়। এই জন্য যে সকল জমি বর্ষায় জলমগ্ন হইয়া যায় বা যাহাতে বর্ষার জল সঞ্চিত হয়, তাহাতে এরোরুটের আবাদ হয় না। বঙ্গে ও আসামে বহু পরিমাণে জঙ্গলময় উচ্চভূমি অনাবাদি অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। এই সকল পতিত জমিতে এরোরুটের আবাদ করিতে পারিলে বিলক্ষণ লাভবান্ হওয়া যায়।

চাষের কথা।—বৎসরের মধ্যে দুইবার এরোরুটের মূল রোপণ করা যায়। বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত বৎসরের প্রথম ভাগে একবার এবং মাঘ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত বর্ষশেষে অন্যবার—এই দুই সময়ই প্রশস্ত। বৈশাখ মাসে রোপণ করিতে হইলে, মাঘ মাসের শেষে অথবা ফাল্গুন মাসের প্রথম ভাগে এক

পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলে পর নির্ব্বাচিত জমিতে বারম্বার উত্তম রূপে চাষ দিয়া মাটী ধুলিবৎ চূর্ণ ও আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। এরোরুট মূলজাতীয় উদ্ভিদ, সুতরাং অন্ততঃ এক ফুট গভীর কর্ষণ না হইলে, মূলের বিস্তৃতির পক্ষে বড়ই অসুবিধা হয়, ফলে, মূলগুলি পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। এরোরুটের গাছে কোনই কাজ হয় না। উহার মূল হইতেই অর্থলাভ হইয়া থাকে, সুতরাং গভীর রূপে ভূমি কর্ষিত না হইলে গাছ বেশ সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হইবে সত্য, কিন্তু তাহাতে মূলের ওজন কম হইবে। ফলে কৃষকেরই মহা ক্ষতি। আমাদের দেশের কৃষকেরা যে প্রকার লাঙ্গল ব্যবহার করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা একফুট গভীর চাষের আশা করা যায় না। প্রথমতঃ কোদালি দ্বারা সমুদয় ক্ষেত্রটী কোপাইয়া তৎপরে চাষ দিতে পারিলেই ভাল হয়। প্রতিবার চাষের পরই ক্ষেত্র হইতে আগাছা দুর্ব্বাঘাস এবং তৃণাদি বাছিয়া ফেলিয়া দিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার করিতে এবং মৃত্তিকা চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। ফাল্গুন মাসের মধ্যেই উক্ত প্রকারে জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। চৈত্রমাসে আর কিছুই করিতে হইবে না। বৈশাখ মাসে দুই একবার বৃষ্টি হইয়া গেলেই রোপণের পূর্ব্বে আরও একবার চাষ দিয়া মাটী ধূলিবৎ চূর্ণ ও আল্‌গা করিয়া দিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়। বৈশাখ মাসই এরোরুট রোপণ করিবার প্রশস্ত সময়। কিন্তু বৈশাখ মাসে বৃষ্টি না হইলে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ অথবা আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগেও রোপণ করা যায়। বৈশাখ মাসে রোপণ করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত অধিক দিন ক্ষেত্রে থাকিতে পায় বলিয়া মূলগুলি সুচারুরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে।

মাঘ অথবা ফাল্গুন মাসের মধ্যে দুই একবার বৃষ্টি হইয়া গেলেও এরোরুটের মূল রোপণ করা যায়। এই সময়ে রোপণ করিতে হইলে, আশ্বিন মাসের শেষ অথবা কার্ত্তিক মাসের প্রথম ভাগে পূর্ব্বোক্তরূপে বারম্বার চাষ এবং মই দিয়া ও মাটী ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া মৃত্তিকা ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় পদার্থই বাছিয়া ফেলিতে হইবে। ক্ষেত্র পরিষ্কার হইয়া গেলে, ইক্ষু ও পটোল ক্ষেত্রের ন্যায় চারি দিকে পগার কাটিয়া কর্ত্তিত সমুদয় মৃত্তিকা ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়। এই কার্য্য অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যেই শেষ করিতে হইবে। পৌষ মাসে আর কিছুই করিতে হইবে না। মাঘ অথবা ফাল্গুন মাসে দুই এক-বার বৃষ্টি হইয়া গেলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে রোপণের পূর্ব্বে একবার লাঙ্গল দেওয়া ও মৃত্তিকা ধূলিবৎ চূর্ণ ও আল্‌গা করিয়া লওয়া আবশ্যক। খোলা ময়দান অপেক্ষা কতকাংশ গাছের আওতায় এরোরুট ক্ষেত্র করিতে পারিলে, লাভের সম্ভাবনা

অধিক। আদা, হলুদ প্রভৃতির ন্যায় কদলী ক্ষেত্রের আওয়াতেই ইহা সুন্দর রূপে জন্মে ও বহু মূলবিশিষ্ট হয়। কদলী ক্ষেত্রে এরোরুট রোপণ করিতে হইলে, বৈশাখ মাসে কদলি বৃক্ষের সহিতই রোপণ করিতে হয়। স্বতন্ত্র ভাবে মাঘ অথবা ফাল্গুন মাসে রোপণ করাই সঙ্গত।

রোপণ প্রণালী।—পিলি (রোপিত বীজের উপর আইল বাঁধিয়া দেওয়ার নাম পিলি বা আলি) ও সিরালি, (নালার মধ্যে বীজ প্রোথিত করিবার নাম সিরালি বা নালা) এই উভয় প্রণালীতেই এরোরুটের বীজ রোপিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের মধ্যে এক হাত ব্যবধানে এক একটী গর্ত্ত করিয়া মূল রোপণ করিলেও চলে। কিন্তু এই উপায় অবলম্বন করিলে, নালায় যে খরচ পড়ে তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী পড়িবে। রোপণ প্রণালী গুলি বিবৃত হইল। রোপণের ব্যয়, সময়ের ন্যূনাধিক্য, কার্য্যের সুবিধা অসুবিধা এবং জল বৃষ্টির বিষয় বুঝিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

আনুমানিক এক হাত ব্যবধান রাখিয়া, লাঙ্গলের "ঈষ" বা লোহার ফাল খানা মৃত্তিকা-প্রোথিত করিয়া টানিয়া গেলে যে অতি সামান্য দাগ পড়িয়া যায় তাহাকে নালা কহে। এই নালার মধ্যে এক হাত ব্যবধানে মূল ফেলিয়া মাটী চাপা দিয়া গেলেই রোপণ কার্য্য শেষ হইল। প্রথমতঃ নালার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রূপে মূল ফেলিয়া গিয়া, দুইধার হইতে দুই জন লোক কোদালিতে মাটি কাটিয়া অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ আইল বাঁধিয়া দিবে। এই উভয় প্রণালীতেই এরোরুট রোপণ করা যায়। গোল আলু পিলি বা আলি প্রণালীতে রোপণ না করিয়া, নালায় মধ্যে দিলে, তাহা রক্ষা করা কষ্টকর হইয়া পড়ে। কারণ নালার মধ্যে অতি সহজেই জল প্রবেশ করিতে পারে, ফলে আলুর অঙ্কুরোদগম হইবার পূর্ব্বে বা পরে যে সময়েই হউক তাহা পচিয়া নষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু এরোরুট নালার মধ্যে দিলে সে ভয়ের সম্ভাবনা বড় কম। সুতরাং এরোরুট নালা-প্রণালীতে রোপণ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সহজ ব্যয়সাধ্য। এক জন লোকেই এ কার্য্য সমাধা করিতে পারে।

পিলি বা আলি (রোপণের পর আইল বাঁধিয়া দেওয়া) প্রণালীতে রোপণ করিলে খরচ বেশী পড়ে সত্য; কিন্তু যে স্থানে অধিকাংশ সময়েই প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়, সে স্থানের পক্ষে এই প্রণালী অবলম্বন করাই উচিত।

জলসেচন ও নিড়ি।—বীজ উপ্ত হইবার পর আবশ্যক মত দুই

একবার নিড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অঙ্কুরোদ্গম হইবার পর, প্রথম নিড়ানি কালে গাছের গোড়ায় সার দিতে পারিলে ভাল হয়। অস্থিচূর্ণে এরোরুটের ফসল অধিক হয়। বর্ষাকালে বর্দ্ধিত হয় বলিয়া জলসেচন করিবার কোনও আবশ্যক হয় না। অতিবৃষ্টিতে ক্ষেত্রের মাটী বসিয়া গেলে কোদালি দ্বারা কোপাইয়া মাটী চূর্ণ করিয়া দিতে হয়। এরোরুট ক্ষেত্রের মাটী সর্ব্বদাই আল্‌গা থাকা আবশ্যক। চাপা মৃত্তিকায় মূল বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

মূল তুলিবার সময়।—গাছের বৃদ্ধি শেষ হইয়া গেলেই, পাতার বর্ণ বিবর্ণ হইতে থাকে এবং ক্রমশঃই গাছ শুষ্ক হইয়া যায়। এই সময়েই মূল উত্তোলন করা উচিত। গাছের পাতা শুষ্ক হইবার পূর্ব্বে মূল উঠাইলে, তাহাতে রস অধিক থাকে বলিয়া শাঁস কম হয়। আবার অধিক বিলম্ব হইয়া গেলেও মূলের ছিব্‌ড়া অধিক হয়—সার ভাগ কমিয়া যায়। আষাঢ় মাসের মধ্যে মূল রোপিত হইলে, অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যেই মূল উত্তোলন করিতে হইবে।

মূল উত্তোলন প্রণালী।—ক্ষেত্রস্থিত সমুদয় মূল এক সময়ে উত্তো-লন করা অনুচিত। যে পরিমাণ মূলের দ্বারা এক দিনের মধ্যেই এরোরুট প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে, ঠিক সেই পরিমাণে উত্তোলন করাই যুক্তিযুক্ত। একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মূল উত্তোলন করিয়া স্তূপীকৃত অবস্থায় রাখিলে গরমে মূলের শাঁস বিকৃত হইয়া যায়। ফলে তাহার দ্বারা যে এরোরুট প্রস্তুত হয় তাহার বর্ণ দুধের মত সাদা না হইয়া ঈষৎ লাল বা হলুদের আভা-মিশ্রিত মলিন হয়। এইরূপ এরোরুটই নিকৃষ্ট। একসঙ্গে অধিক মূল সংগ্রহ করিয়া রাখিলে তাহা ঢেকিতে কুটিয়া বা পাটায় (শিল নোড়া) বাটিয়া লইতে গেলে যত অধিক সময় লাগে ততই উহার রস শুষ্ক হইয়া যায়। রস শুষ্ক হইয়া গেলে কুটিতে অথবা বাটিয়া লইতে পরিশ্রম বেশী হয়; বিশেষতঃ পালোর ভাগও কমিয়া যায়।

অতি প্রত্যুষেই মূলোত্তোলন করা বিধেয়। প্রাতে মূল উঠাইলে, সমস্ত দিনের মধ্যেই তাহার পালো প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে পারা যায়।

ক্রমশঃ।

শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ।

ঋণ শোধ।

---

(১)

"কেন বালিকা, তুমি রাত্রি দিন কাঁদ? তোমার স্বামীর খোঁজে চারিদিকে লোক পাঠাইয়াছি—বিলাতেও পত্র লিখেছি।"

"সাহেব, তোমার দয়ার শরীর, তুমি অভাগিনীর জন্য যথেষ্ট কষ্ট করিতেছ, কিন্তু—কিন্তু—"

"আবার কাঁদিতেছ? ছি!"

"না কাঁদিয়া থাকি কেমন করে, সাহেব?"

"তোমার সেই স্বামীর স্বামী জগৎস্বামীকে ডাক, তা'হলে প্রাণে শান্তি পাবে।"

শিশিরসিক্তা কমলের ন্যায় জলভারাকুল নয়ন দুইটি একবার সাহেবের মুখ পানে তুলিয়া বালিকা বলিল, "সাহেব, আমরা হিন্দুর মেয়ে, স্বামীকে আমরা ঈশ্বরের উপর স্থান দিয়া থাকি। যদি সেই স্বামীকে না পেলাম তবে এ জীবনে আর প্রয়োজন কি?"

সাহেব। হিন্দু মেয়ের প্রাণ কি ধাতুতে গঠিত তা' আমরা জানি না; আমরা জানি, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ দুই দিনের জন্য, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ চির-দিনের। তাঁর সঙ্গে মানুষের তুলনা!

বালিকা। সাহেব, তুমি স্ত্রীলোক নও তাই এ কথা বলিতেছ। তুমি যদি স্ত্রীলোক হ'য়ে হিন্দুর ঘরে জন্মাতে তা'হলে আমার মনোভাব বুঝিতে পারিতে। একবার আমাদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা হয়; আমি দেখিলাম, আমার স্বামী দণ্ডবৎ হইয়া প্রতিমা-পদতলে প্রণাম করিতেছেন। আমি কিন্তু সেই মৃণ্ময়ী প্রতিমাকে প্রণাম না করিয়া আমার জীবন্ত দেবতা স্বামীর চরণে প্রণাম করিলাম।

সাহেব। তোমাদের ধর্ম্ম তোমরা ভাল জান, আমরা কিন্তু কাহারও জন্য চিরদিন কাঁদিয়া নিজের জীবন অশান্তিময় করি না।

বলিয়া সাহেব ক্ষুণ্ণমনে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

(২)

বালিকার নাম পুষ্প—বয়স পনর বৎসর; শ্বশুরালয় বেদগ্রামে। স্বামী সনাতন মিত্র, কলিকাতায় কালেজে পড়িতেন। বালিকার শ্বশুর নাই—শ্বাশুড়ী ছিলেন। কিছু জমিজমা ছিল, তাহাতেই কোন রকমে সংসার চলিত। সুখ দুঃখে সংসার এক রকম বেশ চলিয়া আসিতেছিল। এমন সময় সহসা একদিন বজ্রনির্ঘোষ তুল্য সংবাদ আসিল, সনাতন দেশ ছাড়িয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। কথাটা কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। যে পরশ্রীকাতর, সে রাষ্ট্র করিল, সনাতন প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। সঠিক সংবাদ কোথাও পাওয়া গেল না। গৃহিণী অবশেষে হতাশ হইয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। সে শয্যা তাঁহাকে আর ত্যাগ করিতে হইল না। স্বল্পকাল মধ্যে চিতার উপর শুইয়া তিনি সকল চিন্তা, সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন।

পুষ্প মরিল না—তাহার পাষাণ হৃদয় কিছুতেই ভাঙ্গিল না। কিন্তু বড়ই বিপাকে পড়িল। শ্বশুরের ভিটায় আর কেহ নাই,—সে একা। একে কুলবধূ তা'র উপর বয়সে নবীনা। বিষয়াদি দেখে এমন লোকও নাই। যাহাদের দেখিবার কথা তাহারা রক্ষা না করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া পুষ্প শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে আসিল। সেখানে এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বই আর কেহ নাই। গুণময় ভ্রাতা সুযোগ ছাড়িলেন না; তিনি স্বল্পকাল মধ্যে ভগ্নির অলঙ্কার গুলি আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। অনাথিনী পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

পথে অনেক বিপদ; বিশেষ যা'র রূপ-যৌবন আছে তা'র বিপদের সীমা নাই। বালিকা দেখিল, সে যেখানে যায় সেইখানেই উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র যুবকের দল তাহার পিছু যায়। কোন গৃহস্থ, অভাগিনীকে আশ্রয় দিল না। আশ্রয় না পাইয়া সে আর জীবনভার বহন করিতে পারিল না,—আত্মহত্যা করিয়া দুঃখময় জীবনের অবসান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

বালিকা ব্রহ্মপুত্র তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। নীলাকাশ-প্রতিবিম্বিত নীলাম্বুহৃদয়ে আশ্রয় অন্বেষণে বালিকা আকণ্ঠ জলে নামিল; কিন্তু মরিতে পারিল না; স্বামীকে মনে পড়িল। তাহার মনে আশা জাগিল, একদিন স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিবে। বালিকা নদীতট হইতে ফিরিয়া বনপথ অবলম্বন করিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতে বালিকা সভয়ে দেখিল, কয়েক জন দস্-

মায়েস তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছে। পুষ্প চীৎকার করিয়া উঠিল। দুর্ব্বৃত্তেরা ছাড়িল না,—বালিকাকে ধরিল। পুষ্প সাধ্যমত আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু বালিকার বল কতটুকু?—শীঘ্রই সে অবসন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল।

তখন নিরুপায় হইয়া পুষ্প কাতর কণ্ঠে ডাকিল, "কোথায় দুর্গতিনাশিনী দুর্গে, অনাথিনীকে রক্ষা কর মা! শুনেছি তোমার নাম স্মরণে বিপদ থাকে না। আমি তোমাকে ডাকিতেছি মা, আমাকে রক্ষা কর।"

মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে পুষ্প দেখিল, একজন সাহেব অশ্বারোহণে তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল; এবং ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বেত্রহস্তে দুর্ব্বৃত্তদের আক্রমণ করিল। পাষণ্ডেরা প্রহৃত হইয়া যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল। সাহেব অচৈতন্য পুষ্পকে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া লইয়া স্বীয় বাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সাহেব একজন চা-কর—নাম জর্জ্জ বার্ড।

(৩)

আজ দুই মাস হইল পুষ্প, সাহেবের আশ্রয়ে আসিয়াছে। সাহেব তাহাকে অন্যত্র পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন না—বালিকাও ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যত্র গেল না। সে কোথায় আর যাইবে? এ বিশ্ব সংসারে তাহার স্থান কোথায়? পুষ্প সাহেবের গৃহে আশ্রয় পাইয়া কৃতার্থ হইল।

সাহেবের পুত্র কন্যা নাই; কিন্তু স্ত্রী আছে। ক্ষোভের বিষয়, মেম সাহেব কুরূপা। কুরূপা হইলেও স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা ছিলেন না, প্রেমময় হৃদয়ের অগাধ ভালবাসা অযাচিতরূপে পাইয়াছিলেন। এত ভালবাসা পাইয়াও মেম সাহেবের মনে শান্তি ছিল না,—তিনি স্বামীর চরিত্রে অযথা সন্দিহান ছিলেন। সাহেব কিন্তু নিষ্কলঙ্ক—দেবচরিত্র।

পুষ্প সাহেবের গৃহে আশ্রয় লইল বটে, কিন্তু মোটা সাড়ী ছাড়িয়া গাউন পরিল না—শাঁখা খুলিয়া হাতে ব্রেসলেট উঠাইল না। সে সহস্র অনুরোধ সত্ত্বেও বুট মোজা পরিল না—সাহেবের গৃহে অন্নজল গ্রহণ করিল না। উদ্যানের অপর প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র গৃহ ছিল; পুষ্প তথায় আশ্রয় লইল। একা থাকিত না, একজন হিন্দু দাসী তাহার কাছে শুইয়া থাকিত। দাসী জল আনিয়া দিত, পুষ্প স্বহস্তে পাক করিত। আহারের কোন আড়ম্বর ছিল না। কিছু চাউল, আর দুটা আলু বা কাঁচকলা হইলেই বালিকার চলিয়া যাইত।

তবে একাদশীর দিন মাছ না খাইয়া ছাড়িত না। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহার স্বামী জীবিত আছেন—একদিন না একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে।

সাক্ষাতের আশা থাকিলেও বালিকা সময়ে সময়ে না কাঁদিয়া থাকিতে পারিত না। সাহেব কত বুঝাইতেন পুষ্প বুঝিত না;—সাহেবের পদতলে কার্পেটমণ্ডিত হর্ম্ম্যতলে বসিয়া কাঁদিত। সাহেবও সেই সঙ্গে কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। আবার অপরের অজ্ঞাতসারে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া বালিকাকে কত সান্ত্বনা দিতেন।

একদিন সাহেব বিলাত হইতে একখানা পত্র পাইয়া সানন্দে পুষ্পকে বলিলেন,—"বেটি, আজ আমার জামাইয়ের খবর পেয়েছি।"

"কার খবর পেয়েছ বাবা?"

"আমার জামাইয়ের—তোর স্বামীর।"

পুষ্প আর দাঁড়াইতে পারিল না,—কাঁপিতে কাঁপিতে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল; এবং ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি খবর—কি খবর পেয়েছ?"

বলিতে বলিতে পুষ্প চৈতন্য হারাইয়া ভূ-পৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল।

(৪)

তা'র পর আরও কয়েক মাস অতীত হইয়াছে। পুষ্প বার্ড সাহেবের গৃহে তেমনই আছে। তবে এখন বড় একটা কাঁদে না। যদি কখনও কান্না আসে, গোপনে কাঁদে। হাসিমুখ ছাড়া বিষাদাচ্ছন্ন মুখ সাহেবকে দেখায় না। সাহেব মহাসুখী।

একদিন বার্ড সাহেব, পুষ্পকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুষ্; (সাহেব পুষ্প বলিতে পারিতেন না) আমাদের দেশে যাবে?"

"না।"

"কেন?"

"তা'হলে জাতি যাবে।"

"তবে তোমার স্বামীরও জাতি গিয়াছে

পুষ্প অন্যমনস্ক হইল—কথাটার উত্তর দিতে পারিল না। সাহেব বলিলেন, "পুষ্, তোমার স্বামী বিলাত হইতে সাহেব সাজিয়া আসিতেছেন; তুমি তাঁহার উপযুক্ত স্ত্রী হইবার চেষ্টা কর।"

পুষ্প, কাতরনয়নে সাহেবের মুখপানে চাহিয়া রহিল—কোন উত্তর করিল

না। সাহেব তখন সে কথা ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুষ্, তুমি লেখা পড়া জান ?"

"জানি—স্বামী শিখাইয়াছিলেন।"

"তবে একখানা পত্র লিখিয়া দাও, তোমার স্বামীর নিকট তাহা পাঠাইয়া দিব।"

পুষ্পের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। সাহেব বলিলেন, "পত্রে আমার কথা লিখিও না।"

পুষ্প। তোমার কথা ছাড়িয়া দিলে লিখিবার আর যে বড় একটা কিছু থাকে না।

সা। থাকে বই কি। লিখিও যে, এক্ষণে তুমি তোমার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছ ; আর সেই সম্পত্তি হইতে—

পু। সম্পত্তি হইতে কি ?

সা। সম্পত্তি হইতে তুমি তাঁহাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইতেছ।

পু। কথাটা আমি বুঝিলাম না।

সা। আর কি করিয়া বুঝাইব ?

পু। তুমি কি আমার স্বামীকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইতেছ ?

সা। হাঁ—তোমার নাম দিয়া আমি পাঠাইতেছি। এবার বুঝেছ ?

পু। আমার স্বামী কি দুর্দ্দশায় পড়িয়াছেন ?

সা। এমন কিছু নয় ; তবে কিছু টাকার প্রয়োজন হ'য়েছে। তা' তুমি কিছু ভেবো না।

বালিকা ছল্‌ছল্‌ নয়নে সাহেবের মুখপানে চাহিয়া রহিল ; একটিও কথা কহিতে পারিল না। সাহেব সেখানে আর দাঁড়াইলেন না—স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

(৫)

সাহেব একদা মেমসাহেব ও পুষ্পকে লইয়া নৌকা-বিহারে বহির্গত হইয়াছেন। সুন্দর তরণী—ফুলমালায় বিশোভিত। সুন্দর জল—নীল, স্বচ্ছ, বীচিবিক্ষেপী। সুন্দর আকাশ—নীলিমা-মণ্ডিত—দিগন্ত-প্রসারিত।

বজরার ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া পুষ্প শুইয়া আছে। কাম্‌রার ভিতর সাহেব ও মেম। পুষ্প আকাশ দেখিতেছে। আকাশ দেখিয়া বুঝি তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না। তাই নীরবে পলকশূন্য নয়নে চাহিয়া

আছে। অনন্ত আকাশে ছিদ্র নাই, দাগ নাই,—শুধু আকাশ—শুধু অনন্ত নীল। পদনিম্নে জল,—শুধু জল—মলা নাই, রেখা নাই—শুধু জল। পুষ্প কখন জল দেখিতেছে, কখন বা আকাশ দেখিতেছে। কোন্‌টা সুন্দর? জল না আকাশ? পুষ্প ভাবিল, বুঝি আকাশটাই সুন্দর। আকাশ সীমাহীন, অনন্ত বিস্তৃত—বিকার নাই, চাঞ্চল্য নাই, গর্জ্জন নাই—বুঝি অনন্ত-রূপাধারের প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধরিয়া আকাশ এত স্থির, এত সুন্দর।

দেখিতে দেখিতে আকাশ রূপান্তর পরিগ্রহ করিল। উত্তর-পশ্চিমকোণে মেঘ সঞ্চিত হইয়া নীলাকাশের কিয়দংশ কৃষ্ণবর্ণে সমাচ্ছাদিত করিল! মেঘান্তরালে মারুত লুকাইয়া ছিল, এক্ষণে আলস্য ছাড়িয়া সোঁ সোঁ শব্দে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে আকাশ পৃথিবী কম্পিত করিতে লাগিল। ব্রহ্মপুত্রের নীল জল সহসা জাগিয়া উঠিয়া, ফেনরাশি মাথায় বাঁধিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে ছুটিল। সমস্ত জীব জন্তু শঙ্কিত হৃদয়ে আশ্রয়ান্বেষণে ছুটিল। মাঝি-মাল্লারা ভয় পাইয়া, সাহেবকে ডাকিয়া বলিল, "হুজুর, ম্যাব উঠেছে।"

সাহেব বাহিরে আসিলেন এবং চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া পুষ্পকে বলিলেন, "পুষ্, ভিতরে এস।"

"কেন বাবা, আমি ত বেশ আছি।"

সাহেব সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মাঝিদের আদেশ করিলেন, "নৌকা কিনারায় লাগাও।"

এমন সময়ে মেম সাহেব বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি হ'য়েছে?"

উত্তর কেহ দিল না—দিবার প্রয়োজনও হইল না;—মেঘের আড়ম্বর দেখিয়াই মেম সাহেব বুঝিলেন, ব্রহ্মপুত্রের বিশাল তরঙ্গময় বক্ষ এখন তত নিরাপদ নয়। তিনি তখন নিতান্ত ভীত হইয়া বলিলেন, "পুষ্, ভিতরে এস।"

পুষ্প উঠিল; সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিবার উপক্রম করিল। এমন সময় বায়ু সহসা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বজরার উপর আসিয়া পড়িল। নৌকা টলিল,—পুষ্প পদস্খলিত হইয়া নদীবক্ষে পড়িয়া গেল।

সাহেব কালবিলম্ব না করিয়া অঙ্গ হইতে বস্ত্রাদি উন্মোচন করিতে লাগিলেন। মেম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মতলব কি?"

কার্য্যে বিরত না হইয়া সাহেব উত্তর করিলেন, "পুষ্‌কে রক্ষা করিব।"

মেম। নিজের জীবন বিপন্ন করে?

সাহেব কোন উত্তর না করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। মেম সাহেব চীৎকার করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে তোমার কে, যে তাহার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিতেছ?"

নদগর্ভ হইতে উত্তর আসিল, "সে আমার আশ্রিত।"

(৬)

পুষ্প মরে নাই—বাঁচিয়াছে। সাহেব আবার তাহাকে কুঠীতে আনিয়াছেন। পূর্ব্বে সাহেব তাহার ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রাণরক্ষা করিলেন। পুষ্প, ভক্তি ও প্রীতিভাণ্ড শূন্য করিয়া সাহেবের চরণে ঢালিল।

এইরূপে দুই তিন বৎসর কাটিয়া গেল। পুষ্প মধ্যে মধ্যে স্বামীর পত্র পাইত; সেও মধ্যে মধ্যে স্বামীকে পত্র লিখিত। পুষ্প একবার স্বামীকে লিখিয়াছিল, "বার্ড সাহেব কেমনতর জানিতে চাহিয়াছ; কিন্তু কেমন করিয়া সে সৌম্যমূর্ত্তি, সে উদার হৃদয় তোমার চক্ষের সাম্‌নে আঁকিয়া ধরিব? আমি কখন দেবতা দেখি নাই, সুতরাং বলিতে পারি না তিনি দেবতা কিনা। স্বর্গে যদি বার্ড সাহেবের মত তেত্রিশ কোটি দেবতা থাকেন তা হ'লে স্বর্গ কত পবিত্র, কত পুণ্যময়!"

স্বামী সনাতন মিত্র ইংলণ্ড হইতে প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, "তুমি ঠিক বলিয়াছ, পুষ্প! যে দেশে বার্ড সাহেবের মত দেবতা থাকেন, সে দেশ পবিত্র, পুণ্যময়। তুমি জান কিনা জানি না, এই বার্ড সাহেব—এই দেবতার দেবতা আমাকে মাসে মাসে দুই শত টাকা দুই বৎসর ধরিয়া নিয়মমত পাঠাইতেছেন। যদি এই দেবতা সাহায্য না করিতেন তাহা হইলে হয়ত আমাকে এতদিন অনাহারে মরিয়া যাইতে হইত, অথবা অনাবৃত দেহে এই ভীষণ তুষার-পাতের মধ্যে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইত। পুষ্প, আমি দেখি নাই, বার্ড সাহেব কেমন, কিন্তু আমি দূর হইতে বুঝিতে পারিতেছি, বার্ড সাহেব মহাপুরুষ। যদি মানুষের কোটি জন্ম থাকে তা'হলে আমার কোটি জীবন তাঁহার কার্য্যে উৎসর্গ করিলেও সে মহাপুরুষের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।"

(৭)

কয়েক মাস পরে সনাতন, সিবিল সার্‌ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ফিরিয়া আগে বার্ড সাহেবের গৃহে আসিলেন। সাহেব অভ্যর্থনা করিতে দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। সাহেব অভিবাদন করিলেন; কিন্তু সনাতন প্রত্যভিবাদন করিলেন না,—পলকশূন্য নয়নে

সাহেবের পানে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল—সমস্ত দেহ কাঁপিতে থাকিল। তা'র পর সাহেবের পদতলে পতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ বলিলেন, "সাহেব, হিন্দুরা দেবতাকে এইরূপে অভিবাদন করে।" সাহেব আদরভরে সনাতনকে বুকে টানিয়া লইলেন।

* * * * * * *

তা'র পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। সনাতন মিত্র এক্ষণে এম্, মিট্রা ও জেলার জজ। যে জেলাতে বার্ড সাহেবের বাস, সেই জেলাতে মিট্রা সাহেব এক্ষণে জজ। মিট্রা সাহেব শুনিলেন, বার্ড সাহেব একজন যুবতী স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়াছেন। কথাটা তাঁহার বিশ্বাস হইল না—লোকেও বিশ্বাস করিল না। তাহারা বলাবলি করিল, "মিষ্টার বার্ড নিষ্কলঙ্ক, দেবচরিত্র—মেমসাহেব যুবতীকে স্বামীর প্রেমাসক্ত বিবেচনা করিয়া অকারণ হত্যা করিয়াছেন।"

সে যাই হউক, মিট্রা সাহেব আর থাকিতে পারিলেন না,—স্ত্রীকে লইয়া ছুটিয়া আসিলেন। সেখানে তখন পুলিস আসর জমকাইয়া বসিয়াছে। মিষ্টার বার্ড কিন্তু নীরব। পুলিসের সকল প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—"আমাকে ফাটকে লইয়া চল, আমি খুন করিয়াছি।" পুলিস সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন খুন করিয়াছেন?" বার্ড সাহেব সে প্রশ্নের কোনই উত্তর দিলেন না। না দিলেও পুলিস সাহেবের মনে ধারণা জন্মিল যে, মেম সাহেবই প্রকৃত হত্যা-কারী—মিষ্টার বার্ড, স্ত্রীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আপনাকে হত্যাকারী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তাই তিনি বার্ডকে ছাড়িয়া তাঁহার স্ত্রীকে আসামী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না।

এমন সময় মিট্রা সাহেব সস্ত্রীক উপস্থিত হইলেন। পুলিস সাহেব সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু মিষ্টার বার্ড উঠিলেন না—একটি কথাও কহিলেন না,—নীরবে, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। পুষ্প ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল, এবং স্নেহ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিল, "বাবা!"

সাহেব পুষ্পের পানে চাহিয়া দেখিলেন না—একটা কথাও কহিলেন না; পুলিস সাহেবকে শুধু বলিলেন, "আমাকে যদি এখনি জেলখানায় না লইয়া যাও আমি আত্মহত্যা করিব।"

পুলিস সাহেব মোকদ্দমা রুজু করিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট আসামীকে প্রেরণ করিলেন। কলিকাতা হইতে একজন ব্যারিষ্টার আসিয়া আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। কে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছে, লোকে তা জানিল না;

লোকে শুধু বলাবলি করিল,—"এত বড় কৌঁসিল তাহাদের দেশে পূর্ব্বে আর কখন আসে নাই।" কৌঁসিল যত বড়ই হউন না কেন, তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। করিবার যো কি? আসামী আদালতগৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া যখন ব্যারিষ্টারকে বলিল,—"কে তুমি? আমি তোমাকে চাই না—তুমি দূর হও," তখন ব্যারিষ্টার সাহেব আর কি করিতে পারেন? আবার যখন সাক্ষীরা হলপ লইয়া বলিতে লাগিল, "বার্ড সাহেব খুন করেন নাই—মেম সাহেব খুন করিয়াছেন," তখন আসামী গর্জ্জন করিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা! আমি খুন করেছি।" ম্যাজিষ্ট্রেট নিরুপায় হইয়া মোকদ্দমা দায়রা সোপরদ্দ করিলেন।

দায়রার জজ মিট্রা সাহেবের কাছে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। কলিকাতার বড় কৌঁসিল, জেলার সমস্ত উকীল, আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। কৌঁসিল বলিলেন,—"আসামী নিরপরাধ।" আসামী তদুত্তরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"না, আমি নিরপরাধ নই—আমি হত্যা করেছি।" কৌঁসিল বলিলেন,—"আসামী ক্ষেপিয়াছেন।" ডাক্তার সাহেব সাক্ষ্য দিলেন,—"আসামী ক্ষেপেন নাই—সম্পূর্ণ সজ্ঞান।"

দুই তিন দিন ধরিয়া মোকদ্দমা চলিল। দুই তিন দিনের পর জজ সাহেব রায় প্রকাশ করিলেন। তিনি স্বয়ং রায় পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন আদালত গৃহ নিস্তব্ধ; উকীল, ব্যারিষ্টার, জনসাধারণ উৎকণ্ঠিত-চিত্তে জজের মুখ পানে চাহিয়া আছে। জজের কিন্তু বিকার নাই,—স্থির, নিষ্কম্প। তিনি অবিকম্পিত কণ্ঠে জজ্‌মেণ্ট পাঠ করিয়া অবশেষে আদেশ দিলেন,—"আসামী জর্জ্জ বার্ড, তোমার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম।"

তাঁহার বাক্য অবসান হইতে না হইতে বন্দুকের শব্দে আদালত গৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সকলে সভয়ে জজ সাহেবের পানে চাহিয়া দেখিল, তাঁহার রক্তাপ্লুত দেহ ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইতেছে। সকলে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল; আসামীও এক লম্ফে জজ মিট্রার সমীপস্থ হইলেন। এবং তাঁহার রক্তাপ্লুত দেহ বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"পুত্র সনাতন!, এ কি করিলে? আত্মহত্যা!"

মুমূর্ষু একবার চাহিয়া দেখিল—উত্তর করিতে পারিল না।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বার্ড সাহেব বলিলেন,—"জন্মজন্মান্তরে যেন তোমার মত কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র পাই!"

সমাপ্ত।

শ্রীসুরেশ্বরী দেবী।

পাত ও পলু।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয়-চিয়েনেও পলু এইরূপ পাত খাইতে খাইতে ৭।৮ দিন পরে হঠাৎ ২।৩ দিন আহার বন্ধ করিয়া পুনরায় আহার আরম্ভ করে। এইরূপ চারি চিয়ানের আহারের পর পলু পোকা পাকিয়া উঠে, রঙ্ দেখিতে হলুদের ন্যায় হয়; তখন তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোপ করা বিস্তৃত পলুর ডালার উপর পৃথক্ পৃথক্ রাখিয়া দিলে তাহারা লালা বাহির করিয়া তদ্দ্বারা নিজে নিজে পরিবেষ্টিত হইয়া রেশমের গুটী বাঁধিয়া থাকে। রেশম পোকা পালন করিবার সময় পলুর চাষাকে অনেক সাবধানে থাকিতে হয়। তাহারা অপরিষ্কার কাপড়ে কিম্বা অশুদ্ধ শরীরে পলু রাখিবার গৃহে প্রবেশ করে না, এমন কি ব্যায়রামে পোকা মরিতে আরম্ভ করিলে তাহারা মৎস্য মাংস পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে, নিজেরা তৈল পর্য্যন্তও ব্যবহার করে না। ছিটা, কালশীরা, রসা, কটাসে প্রভৃতি পলু পোকার কতকগুলি ছোঁয়াচে ব্যাধি আছে, এই সমস্ত ব্যায়রাম একটী পোকাকে ধরিলে প্রায় সে চাষীর সমস্ত পলুগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলে। ছিটা ব্যায়রামটী পলুদিগের বেশী মারাত্মক হইয়া থাকে। ছিটা যে চাষার পলুতে প্রবেশ করিবে, সেবার তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াযাইবে।

এখানে গবর্ণমেণ্ট হইতে পলু পোকার ডাক্তার আসিয়া গ্রামে গ্রামে চাষার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, তুঁতের জল গন্ধকের গুঁড়া প্রভৃতি ব্যবহার করাইয়া অনেক রোগাক্রান্ত পলুকে ভীষণ ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়া চাষাদিগকে সেই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছে, কিন্তু চাষিরা এতদূর Conservative (রক্ষণশীল) যে, প্রাণান্তেও বাপ ঠাকুরদাদার সেই পুরাতন বিধান পরিত্যাগ করিয়া তাহারা নূতন বৈজ্ঞানিক কোন উপায় অবলম্বন করিবে না, পলু পোকার ব্যাধিগুলির বিস্তৃত বর্ণনা করিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে, কাজে কাজেই ব্যাধির কথা অন্য প্রবন্ধে লিখিবার বাসনা রহিল।

পলু পোকা গুটী বাঁধিলে, গুটীগুলি রৌদ্রে দিয়া ভিতরের পোকা মারিয়া ফেলিলে আর গুটি কাটিয়া পোকা বাহির হইয়া যাইবার ভয় থাকে না। এই

সমস্ত রৌদ্রতপ্ত গুটী বা রেশমের কোয়া কুঠেল সাহেব ও অন্যান্য ব্যবসাদার খরিদ করিয়া লইয়া গরম জলে ফেলে এবং এক প্রকার খোঁচা কাটির দ্বারা খোঁচাইতে থাকে। গরম জলে ফেলিয়া খোঁচাইতে খোঁচাইতে রেশমের আঁশ বাহির হইয়া পড়ে, সেই আঁশ চরকার দ্বারা পাক দিতে আরম্ভ করিলে ক্রমশঃ সমস্ত আঁশ বাহির হইয়া পড়ে। বড় কুঠেল সাহেব ও ব্যবসাদারদিগের রেশম প্রস্তুত করিবার পৃথক্ ষ্টীমমেসিন আছে। এই প্রকারেই রেশম সূত্র প্রস্তুত হইয়া বিদেশে চলিয়া যায়।

রেশমের কাজে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কেবল জীবহিংসা করিতে হয় বলিয়া অনেকে এই কাজে অগ্রসর হয় না। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, রেশমের ব্যবসা করিতে গেলে বংশ থাকে না। রক্তবীজের ন্যায় বিলাতী ব্যবসাদার আসিয়া এই লাভজনক ব্যবসাটী একচেটে করিয়া ফেলিয়াছে, কই তাহাদের ত কাহারও বংশলোপ হইতেছে না! ভীরু, অন্ধসংস্কারাপন্ন অলস বাঙ্গালীদিগেরই পদে পদে বংশনাশের ভাবনা বলবতী হইয়া পড়ে।

এত বংশরক্ষা করিবার চেষ্টা যাহাদের, তাহাদেরই ত দিন দিন বংশ লোপ পাইয়া যাইতেছে। যে সমস্ত হিন্দু-প্রধান গণ্ডগ্রাম দিন দিন উজাড় হইয় পড়িতেছে, সেরূপ সমৃদ্ধিশালী জনাকীর্ণ পল্লী কি কখনও পুনরায় স্থাপিত হইবে? যিনি বংশ দিয়াছেন, তিনিই রক্ষা করিবেন, এই কথা স্মরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে বিপুল বীর্য্যে অগ্রসর না হইলে আর পুরাতন রেশম ব্যবসায়কে ভারতবাসী কখনও পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে না।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

নিশীথচিন্তা।

(নিদ্রার প্রতি)

(১) শান্তিপ্রদায়িনী নিদ্রা, শ্রান্তিবিনাশিনী!
কাতরে করুণা কর, নয়নবাসিনী।
এস-মা অভাগা ডাকে—কর শান্তিদান,
পারি না সহিতে আর, কোলে দাও স্থান॥

(২) অধম সন্তান বলে দয়া নাই মনে,
কাঁদে যে সতত, তারে না রাখ চরণে।
বুঝেছি উদয় তুমি—যেখানে নয়ন,
আঁখিনীরে কলুষিত হয়নি কখন॥

(৩) তোমার মহিমা মাতঃ, শুনি সর্ব্বস্থানে,
তবে কেন নিরদয়, কৃপাবিন্দু দানে।
তোমার কৃপায় মাতঃ চিন্তাকুল জন,
ভুলে দুঃখ তব সঙ্গে হইলে মিলন।

(৪) হেন কৃপা-বিন্দুদানে কেন মা নিদয়!
মা হয়ে সন্তানে মাগো! কাঁদাতে কি হয়?
সহে না যাতনা আর ভাবিতে পারি না;
না দেখি উপায় কোন রবিসুত বিনা॥

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

সমালোচনা।

পরলোক রহস্য। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত। ৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৴০ আনা।

অধুনাতন শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশেরই নিকট পরলোক কল্পনা রাজ্যের একটী রহস্যবিশেষ। এখন পরলোক মানেন বা তাহাতে বিশ্বাস করেন, এমন লোক অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। "হেসে খেলে লওরে যদু" ইহাই এখন অনেকের মূলমন্ত্র। কেবল আধুনিক যুগ বলিয়া নয়, প্রাচীন যুগেও চার্ব্বাক নামক সম্প্রদায়বিশেষ এই মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু এই পরলোকটা—যাহা বহুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতেও আলোচিত ও বিশ্বাসের বিষয়ীভূত হইয়া আসিতেছে, তাহা বাস্তবিকই অস্তিত্বশূন্য কল্পনার সামগ্রী কি না, পরলোকে আস্থাবান্ ব্যক্তির হৃদয়েও সময়ে সময়ে এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে। পণ্ডিতপ্রবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থে এই বিষয়েরই আলোচনা ও মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বহুবিধ যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পরলোক বাস্তবিকই অস্তিত্বশূন্য কল্পনার বিষয় নহে; পর-

লোক বলিয়া একটা বাস্তব জিনিষ আছে, এবং সেখানে তোমাকে, আমাকে, সকলকেই যাইতে হয়, ও তথা হইতে আবার এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিতে হয়। মৃত্যু ও জন্ম এতদুভয়ের যে ব্যবধান, তাহাই পরলোক। এই পরলোক প্রত্যক্ষ নহে, পরোক্ষ। যাহা পরোক্ষ, তাহাতে কাহারও সন্দেহ জন্মিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। তাহা হইলে সংসারে অনেক পরোক্ষ বিষয়কেই অস্তিত্ববিহীন হইতে হয়। গ্রন্থের পাতনিকায় কথিত হইয়াছে যে, এই পরলোক অনেকের নিকট দিগ্‌ভ্রমের মত। যুক্তি ও প্রমাণাদির দ্বারা সন্দেহ নিরাকৃত হইতে পারে, কিন্তু দিগ্‌ভ্রম সহজে দূর হয় না। উহাকে দূর করিতে হইলে অভ্যাস ও অনুশীলনের প্রয়োজন। আলোচ্য গ্রন্থখানি দ্বারা এই প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। পূজ্যপাদ বেদান্তবাগীশ মহাশয় এই গ্রন্থখানিতে যেরূপ সুগভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, এবং যেরূপ যুক্তি প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিয়া পরলোকের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছে। যিনি দুরূহ বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আমরা এইরূপ সুখবোধ্য ভাষায়-দুরূহ তত্ত্বের মীমাংসারই আশা করি। আমরা পরলোকে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলকেই এই জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আলোচ্য বিষয়টী দুরূহ হইলেও গ্রন্থের ভাষা এমন সরল ও প্রাঞ্জল যে, অধুনা অনেক উপন্যাস বা নাটকাদিতেও এতদপেক্ষা কঠিন ভাষা ব্যবহৃত হয়। সুতরাং গুরুতর বিষয় বলিয়া কেহ যেন গ্রন্থখানিকে দুর্ব্বোধ্য জ্ঞান না করেন। ইহার প্রাপ্তি স্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান, এবং সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী।

আলোচনা।—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। ১২ শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩১৫ সাল।

পত্রিকা খানির বয়স নিতান্ত কম নয়। বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহার আকারও কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার গুণের ভাগ সেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। ইহা আমাদের অযৌক্তিক উক্তি নয়, বর্ত্তমান সংখ্যার আলোচনা করিলে সকলকেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিতে হইবে। এই অষ্টাংশিত রয়েলের চতুর্ব্বিংশতি পৃষ্ঠাত্মক পত্রিকাখানিতে এবারে ৮টী কবিতা স্থান পাইয়াছে; এবং প্রায় সকল কবিতার মধ্যেই সেই "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে" এবং "শুধু এক ফোঁটা নয়ন জল" ইত্যাদির এক-

টানা স্রোত চলিয়াছে। এ দেশে আজ কাল প্রেমিক লেখক এবং প্রেমের কবিতা যে যথেষ্ট সুলভ তাহা আমরা জানি, কিন্তু মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা এবং পাঠকগণের সময় ও অর্থ বোধ হয় এত সুলভ নয় যে, সম্পাদক মহাশয় এক সংখ্যায় এতগুলি ব্যর্থ কবিতা প্রকাশ দ্বারা তাহাদের অপব্যবহার করিতে পারেন। 'ধর্ম্মালোচনার কাল নির্ণয়' একটী প্রবন্ধ। প্রবন্ধের লেখক স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়। সুতরাং একটু আগ্রহের সহিতই প্রবন্ধটী পাঠ করিলাম। পাঠে নূতন কথা কিছুই পাইলাম না, পাইলাম কেবল পঞ্চভৌতিক, জর্জ্জরীত, সম্পদশালী, উৎসুকা, কঠীন, অবশিষ্ঠ, প্রশস্থ, শ্রীপুত্র, অভ্যস্থ, বাহ্যিক প্রভৃতি কয়েকটী নূতন পদ, আর—'অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বাং ন যায়তে' এই একটী নব সংস্কৃত সংস্কৃত শ্লোক। 'বীরা' গল্প। লেখক শ্রীফকির চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রবন্ধটীর নামের নীচেই লিখিত আছে '(গল্প)' সুতরাং আমাদিগকেও অগত্যা বলিতে হইবে এটী গল্প। ইহার লেখক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বোধ হয় সম্পাদক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অতি-নিকট আত্মীয় হইবেন। নিতান্ত আত্মীয়তার অনুরোধ না থাকিলে সম্পাদক মহাশয় কখনই অগ্নিদেবকে উপহার দিবার যোগ্য এই গল্পটীকে পত্রিকায় স্থান দান করিতে পারিতেন না। আমরা জানি, 'অনুরোধে পড়িয়া ঢেঁকি গেলা'র ন্যায় সম্পাদকদিগকে অনেক সময়ই অনেক দুষ্পাচ্য বস্তু উদরস্থ করিতে বাধ্য হইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ অতি-দুষ্পাচ্য বস্তুটীর গলাধঃকরণ চেষ্টা যুক্তিযুক্ত নহে। আত্মীয়তা থাকিলে এরূপ লেখককে গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ডের অধীনস্থ করিলেই সম্পাদক মহাশয়ের প্রকৃত আত্মীয়ের কর্ত্তব্য পালন করা হইত। ভরসা করি, অতঃপর বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবেন না। একে তো গল্পটিতে কিছুমাত্র নূতনত্ব বা বাঁধুনী নাই, তাহার উপর ভাষার ভুলে গল্পটী একেবারেই অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে। ভাষার ভুলগুলি উদ্ধৃত করিলে আমাদিগকেও পত্রিকার স্থান এবং পাঠকগণের সময় ও অর্থের অপব্যবহার করিতে হয়; সুতরাং সেরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া আমরা কেবল কয়েকটী 'বিশুদ্ধ' পদের নমুনা উদ্ধৃত করিলাম। যথা—ধুমুদ্গীরণ, স্রোতোস্বিনী, অন্যমনোস্কভাবে, বনভ্যান্তর, নিলাম্বর, অভ্যস্থ, ন্যস্থ, নির্ঝরিনীর, রানীর, বরনীয়, কৃপান, সম্মীত (?) স্তম্ভীত, বীণা-বিনিন্দীত, মূর্ত্তিমতি, পরিবর্ত্তণ ইত্যাদি। এ গুলি লেখকের ভুল না মুদ্রাকর-প্রমাদ? যাহারই ভুল হউক, আমরা কিন্তু সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ের স্কন্ধেই এই ভুলের বোঝাটী অর্পণ করিলাম।

আর্য্যবিভূতি।—মাসিক পত্রিকা। ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩১৫। এই মাসিক পত্রিকা খানি নূতন, ইহার ৩য় সংখ্যা পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রত্যেক সংখ্যাতেই দুই একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রবন্ধগুলি এমনই নীরস ও শব্দাড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় লিখিত হয় যে, তাহা সাধারণ পাঠকের চিত্ততৃপ্তিকর না হইয়া চিত্তবিরক্তিকর হইবারই সম্ভাবনা। বিশেষতঃ, একই সঙ্গে একই লেখকের লেখনী-নিসৃত প্রবন্ধমালা পাঠ করিতে করিতে ধৈর্য্যরক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান সংখ্যায় মাতৃগীতা, মাতৃভাষা, মনুষ্যত্ব ও পার্থিবাগ্নির বিকাশ, আমরা কাহারা (কবিতা), কি চাই (কবিতা), আপদ্ধর্ম্ম, নিভৃতবিলাস (গীতি কবিতা), বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিরহস্য, স্বপ্ন, যজমান ও পুরোহিত, জাতীয় শিক্ষার আলোচনা, রঘুবংশ, গ্রন্থসমালোচনা, এই কয়টী বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। 'মাতৃগীতা' সংস্কৃত স্তোত্র ; জানি না 'আর্য্যবিভূতি'র কয়জন গ্রাহক সংস্কৃতাভিজ্ঞ। 'মাতৃভাষা' ক্রমপ্রকাশ্য, সুতরাং শেষ না দেখিলে ভালমন্দ বলা যায় না। 'মনুষ্যত্ব ও পার্থিবাগ্নির বিকাশ'—ভাষা-সাগরের উদ্দাম তরঙ্গ অতিক্রম করিতে পারিলে একটু রত্নের সন্ধান পাওয়া যায়। 'আপদ্ধর্ম্ম' মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব হইতে উদ্ধৃত। এরূপ 'উদ্ধার' করিতে পারিলে সম্পাদক মহাশয়কে আর প্রবন্ধের জন্য চিন্তিত হইতে হইবে না। 'বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি-রহস্য,' ও 'স্বপ্ন' মন্দ হয় নাই। 'যজমান ও পুরোহিত' ক্রমপ্রকাশ্য। 'রঘুবংশ' কালিদাস প্রণীত সংস্কৃত রঘুবংশের অমিত্রাক্ষরিক অনুবাদ। এই অনুবাদ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মহাকবি কালিদাসের প্রেতাত্মা যদি আজিও কোন স্থানে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার সুললিত কাব্যের এই 'গুরুগম্ভীর' অনুবাদ পাঠ করেন, তবে তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবেন না। তদ্ব্যতীত আমরা 'গ্রহিলেন' পদের ন্যায় ভবিষ্যতে ইহাতে 'ভোজিলেন' 'গমিলেন' 'শ্রবিলেন' প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদগুলিও যে অচিরে 'প্রত্যক্ষিব' এরূপ আশা করিতে পারি। প্রথম হইতেই পত্রিকাখানি বড়ই অনিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইতেছে।

৩য় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১৫।

পূজা।

—:+:—

বালার্ক-কিরণ-দ্যুতি সর্ব্ব-অঙ্গে করিয়া ধারণ,
এলে কি জননি, পুনঃ দীন সুতে দিতে দরশন?
সারা বৎসরের আঁখিনীরে অন্ধপ্রায় দু'নয়ন,
মুছা'তে কি ত্রিনয়নে! বৎসরান্তে তব আগমন?
অন্ধকার বাঙ্গালার গৃহে তিন দিবসের তরে,
জ্বালিতে আশার আলো এলে কি মা পুনঃ বর্ষপরে?
এস তবে শক্তিময়ি! শান্তিময়ি! ব্রহ্মাণ্ডজননি!
এস স্নেহময়ি! এস ভীতজনে অভয়দায়িনি!
গৃহে অন্ন নাহি মাগো, শুষ্ক বাঙ্গালার নদ নদী;
উঠে শুধু হাহাকার ধ্বনি বঙ্গমাঝে নিরবধি।
জ্বলে ধূ ধূ কালানল দীপ্ত করি বঙ্গের গগন;
গরজে প্রলয়-ঝঞ্ঝা ভৈরব নিনাদে ঘন ঘন।
এ দুর্দ্দিনে কি আছে মা! কোথা পাব পূজা-উপহার?
গত কত শত বর্ষ—নিবে গেছে দীপ বাঙ্গালার!
নাহি মা নৈবেদ্য, নাহি বাঙ্গালায় কুসুম চন্দন;
আছে শুধু দীর্ণ বক্ষঃ—ধরিতে ও রাতুল চরণ।
আছে শুধু তপ্তশ্বাস, হৃদিমাঝে ক্ষীণ রক্তধারা;
সে তপ্ত শোণিতবিন্দু পানে কি গো তৃপ্তি হবে তারা?
এস মা আনন্দময়ি! এস তবে আঁধার ভবনে;
যা' আছে—লহ মা, তুচ্ছ বলি তারে ঠেল না চরণে।

———

আশ্বিন।

—:+:—

কে তুমি বাপু, শরতের নবীন ঊষার অস্ফুট আলোক সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া, কাশকুসুমের শুভ্র উত্তরীয় গায়ে জড়াইয়া, সদ্যঃপ্রস্ফুটিত চন্দ্রমল্লিকা দুইটী দুই কাণে গুঁজিয়া, নব্য বাঙ্গালী বাবুর মত চেরা সিঁথির পাশে ঢেউ-খেলান মেঘের তেড়ীর তরঙ্গ তুলিয়া, রজনীগন্ধার সুকোমল ছড়ি ঘুরাইয়া, হাসিতে হাসিতে, হেলিতে দুলিতে নিশাবিহারী 'বাবুর দলের' ন্যায় মৃদুমন্থর গমনে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে? তোমার ঐ তেড়ীফেরান ছড়িঘুরান নধর কান্তি—ঐ বিলাসবিভ্রমযুক্ত হাবভাব দর্শনে পাখিগুলা ঘুমভরা চোখে ডাকিয়া উঠিল; জলে নলিনীসুন্দরী আড়নয়নে চাহিয়াই হাসিয়া ফেলিল; স্থলে রূপসী সেফালিকা হাসিতে হাসিতে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল; পুকুরের ঘোলা জল কালো হইয়া উঠিল; হংসগুলা ছুটিয়া গিয়া তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িল; তোমার ছড়ির বাহার দেখিয়া কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত মেঘগুলা ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল; বিলের ধারে দাঁড়াইয়া কেশে ফুলগুলা ধবল দশনরাজি বিস্তার পূর্ব্বক বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে তোমার ঐ বাবুসজ্জার দিকে চাহিয়া রহিল। আর ভর্ত্তৃহরির মত কবির দল গাহিয়া উঠিল—"বনস্পতীনাং সরসাং নদীনাং" ইত্যাদি। কে তুমি বাপু, যাদুকরের মত বিধাতার সৃষ্টিরাজ্যে এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আনয়ন পূর্ব্বক গালভরা হাসি, দেহভরা সৌন্দর্য্য, বুকভরা আনন্দ লইয়া—রাঙ্গামেঘের উপর চড়িয়া, আমার অহিফেন-নিমীলিত প্রভাত-নিদ্রা-বিজড়িত নয়ন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে?

থাম বাপু, উদরস্থ অহিফেনটা অধুনা নেত্রদ্বয়ের উপরেই সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিলেও আমি যেন তোমাকে চিনিয়াছি। তুমিই কি বর্ষ মহাশয়ের প্রিয় পুত্র, শরৎসুন্দরীর প্রিয় প্রণয়ী, জগদম্বার প্রিয় ভক্ত ও দূত, মাসোপাধিক শ্রীশ্রীযুক্ত আশ্বিনচন্দ্র? তোমারই আগমনে কি বর্ষে বর্ষে বিধাতার রাজ্যে এমনই একটা নববিপ্লব উপস্থিত হয়? তোমারই জন্য কি প্রকৃতিরাণী থরে থরে সৌন্দর্য্য-সম্ভার সাজাইয়া রাখে? শ্রীমতী শরৎ সুন্দরী মোহন সাজে সাজিয়া তোমারই জন্য কি প্রতীক্ষা করে? তোমাকে দেখিয়াই কি প্রোষিতভর্ত্তৃকা আশা-উৎফুল্ল

দৃষ্টিতে পথের পানে চাহিয়া দিন গণনা করিতে থাকে? তুমিই কি সোণালি মেঘের উপর চড়িয়া, বর্ষে বর্ষে বঙ্গে আসিয়া জগদম্বার শুভাগমন বার্ত্তা প্রচার কর? তোমারই আগমনে কি বঙ্গের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে—ধনীর বিলাসাড়ম্বরপূর্ণ প্রাসাদে, দরিদ্রের হাহাকারভরা পর্ণকুটীরে আনন্দের উচ্চরোল উঠে—না না উঠিত? তোমারই দর্শনে কি সারা বৎসরের শোক তাপ দূরে চলিয়া যাইত? তুমিই কি সোণার বাঙ্গালার বিস্তৃত প্রান্তরে শ্যামসাগরের তরঙ্গ তুলিয়া ফুল্লকণ্ঠে গাহিতে—সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং? তবে দাঁড়াও বাপু, তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। তোমার কাজ অনেক—অনেক জায়গায় তোমায় ঘুরিতে হইবে তা জানি। তবুও যখন দয়া করিয়া বৃদ্ধের কুটীরদ্বারে পদার্পণ করিয়াছ, তখন দয়া করিয়াই আমার প্রাণের কথা কয়টা শুনিয়া যাও। কি জানি, আবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হইবে কি না।

তোমায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে না। ঐ সম্মুখে সেফালিকাতলায় প্রকৃতি-রাণীর স্বহস্ত-রচিত কোমল গালিচা বিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ সুকোমল কুসুমাসনে বসিয়া আমার একটু করুণ কাহিনী শুনিয়া যাও।

বাপু হে, তুমি এমনই করিয়া কতবার যে আসিয়াছ, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আজি তুমি আমার সম্মুখে যে সাজে দাঁড়াইয়াছ, আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের সম্মুখেও একদিন এমনই করিয়া দাঁড়াইয়াছিলে; আবার তাঁহার অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহকেও এমনই সাজে দেখা দিয়াছিলে। যখন আদিরাজ বেণতনয় মহাবল পৃথু গোরূপধারিণী ধরিত্রীকে দোহন করিয়াছিলেন, তখনও তুমি এইরূপে আসিয়াছিলে; যখন রক্ষঃকুলধূমকেতু রামচন্দ্র প্রকৃতিরঞ্জনার্থ প্রাণ-প্রিয়া জানকীকে বনবাসে প্রেরণ করিতে করিতে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"সত্যং কেনাপি কার্য্যেণ লোকস্যারাধনং ব্রতং। যৎ পূরিতং হি তাতেন মাঞ্চ প্রাণাংশ্চ মুঞ্চতা।" তখনও তুমি এমনই করিয়া তাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জকে দেখা দিয়াছিলে; আবার দ্বাপরাবসানে বৃন্দাবনের পুণ্যারণ্য হইতে সুমধুর বংশীধ্বনি উত্থিত হইয়া যখন ভারতবাসীকে নবপ্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল, এবং পরিশেষে সেই সুমধুর বংশীধ্বনি আবার যখন ভীষণ রণভেরীতে পরিণত হইয়া ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে নব ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তখনও তুমি এমনই করিয়া সেই ধর্ম্মরাজ্যে বিচরণ করিয়াছিলে।

কিন্তু এ সব বহু পুরাতন কথা, অল্পদিনের কথাই বলি। যখন মহারাজ লক্ষ্মণসেন—ধূর্ত্ত অমাত্যবৃন্দের কুহকজালে জড়িত বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন সপ্তদশ (?)

অশ্বারোহীর হস্তে সোণার বাঙ্গালাকে তুলিয়া দিয়া, বাঙ্গালার নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিল ; হিন্দু গৌরবাবসানে ক্রমে যখন পাঠান ও মোগলের গৌরব-রবি ভারতের মধ্যগগনে বসিয়া প্রখর কিরণমালা বিস্তার করিতেছিল ; যখন সোণার বাঙ্গালা প্রকৃতই 'সোণার বাঙ্গালা' ছিল, এবং তাহার সুবর্ণের লোভে মধুগন্ধলুব্ধমক্ষিকাদলবৎ অধুনা ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত বৈদেশিক বণিক্‌বৃন্দ দলে দলে ছুটিয়া আসিত, তখন তুমি কিরূপে আসিতে, তখন—সে অন্ধকারময় যুগে স্থূলবস্ত্রপরিহিত তেড়িবিরহিত অর্দ্ধনগ্নকায় বাঙ্গালী কিরূপে তোমার অভ্যর্থনা করিত, লৌহবলয়প্রকোষ্ঠা কাংস্যাভরণভূষিতা বঙ্গললনাগণ কিরূপে তোমায় বরণ করিত, তাহা বলিতে পার কি ? তখন এত বিলাসিতার ছড়াছড়ি ছিল না, এত গাউন বডি সেমিজ ব্রেস্‌লেটের বাহার ছিল না, এত জেস্‌মিন, কাশ্মিরী বোকে, সুইট্‌ হার্ট, কিস্‌ মি কুইক, কুন্তলীন প্রভৃতি এসেন্সের মধুর (!) গন্ধ উঠিত না, পিয়ার্স সোপ, ভিনোলিয়া, রোজ টয়লেট্‌, ওরিয়েন্টাল সোপ, বেঙ্গল সোপ, বুল্‌বুল সোপ প্রভৃতির নামও কেহ জানিত না, এত বুট শ্লিপার পম্প্‌সু'র আদরে বাঙ্গালী অভ্যস্ত ছিল না ; সুতরাং সে সময়ে—সেই অতীত যুগে হে মাসবংশাবতংস আশ্বিনচন্দ্র ! একমাত্র আতর গোলাপ মাখিয়া, উত্তরীয়মাত্র-সম্বল নগ্নপদ অসভ্য বাঙ্গালী যখন তোমাকে আবাহন করিত, তখন সে আড়ম্বরশূন্য আবাহনে তোমার মন উঠিত কি ? আর আজি যে কোট কামি-জাদি বহিরাবরণে অন্নশূন্য কৃশোদর আবৃত করিয়া, এসেন্সের মধুরগন্ধ ছড়াইয়া বিলাসের মূর্ত্তিমান্ অবতাররূপে বাঙ্গালী তোমায় অভ্যর্থনা করিতেছে, ইহাতে তুমি সুখী হও কি ? হে মাসকুলরত্ন ! সত্য করিয়া বল, ইহাতে তোমার চিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রফুল্ল হয় কি ? অতীতের সেই আড়ম্বরবিহীন প্রাণ-ঢালা অভ্যর্থনা স্মরণে তোমার স্মৃতিসাগর মথিত করিয়া একটীও দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হয় কি ?

এখন আর তুমি বাঙ্গালীর নিকট সে আদর—সে অভ্যর্থনা পাও কি ? সেই ধনধান্যসমৃদ্ধা শস্যশ্যামলা পল্লী, সেই সুস্থ সবলকায় পল্লীবাসী, সেই শঙ্খ-সিন্দূরশোভিতা বঙ্গকুললক্ষ্মী, সেই বোধনের মধুর ঢকাধ্বনি—সভ্যতার খরপ্রবাহে সে সকলই ভাসিয়া গিয়াছে ; আছে কেবল তাহাদের একটী বিকৃত ছায়া ! কায়শূন্য ছায়ার আদর তোমায় মিষ্ট লাগে কি ?

কিন্তু আমি তো দেখিতেছি, কে আর তোমায় তেমন প্রাণ ঢালিয়া আদর করিবে ? ঐ দেখ, বাঙ্গালার গগন বিদীর্ণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসা-আড়িষ্ট বাঙ্গালীর

হাহাকার উত্থিত হইতেছে, ম্যালেরিয়ারাক্ষসীর বিকটদশনে বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বিচূর্ণিত হইতেছে, অভাবগ্রস্ত বাঙ্গালীর অন্তরে বাহিরে অভাবের প্রচণ্ড দাবানল ধূ ধূ জলিতেছে, কে তোমার অভ্যর্থনা করিবে? ঐ দেখ, অন্নহীন গৃহহীন ধর্ম্মহীন কর্ম্মহীন বাঙ্গালী স্বহস্তপ্রজ্বলিত হুতাশনে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতেছে, কে আর তোমায় বরণ করিয়া লইবে? ঐ দেখ, সোণার বাঙ্গালা শ্মশান, বাঙ্গালার পল্লী শ্বাপদসঙ্কুলা অরণ্যানী, বাঙ্গালার শস্যক্ষেত্র মরুভূমি! ঐ দেখ, বাঙ্গালীর উদর অন্নশূন্য, বাঙ্গালার চণ্ডীমণ্ডপ প্রতিমাশূন্য, বাঙ্গালার জল-স্থল-ব্যোম শান্তিশূন্য! ঐ শুন, বাঙ্গালার মাথার উপর রাজদ্রোহিতার ভীমবাত্যা কি ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে,—ওকি বাপু, উঠিলে যে? তুমিও কি সভীশানের ধার ধার না কি?

তবে যাও তুমি, মহামায়ার প্রিয় অনুচর! বাঙ্গালীর উৎসবনিকেতন! বাঙ্গালার গৃহে গৃহে তোমার আগমনবার্ত্তার সহিত অন্নপূর্ণার আগমনবার্ত্তা প্রচার কর; মৃতপ্রায় বাঙ্গালীর কর্ণে মাতৃপূজার মোহন মন্ত্র ঢালিয়া দাও। ঘনঘটাচ্ছন্ন ব্যোমবক্ষে চকিতচপলাস্ফুরণবৎ বাঙ্গালার শুষ্ক শ্মশানবক্ষে মাত্র তিনটী দিনের জন্য উৎসবের মধুর কল্লোল উত্থিত হউক। তুমি যাও, বর্ষান্তে আবার আসিও; এই অধমের ক্ষুদ্র কুটীরে আসিয়া আবার আমাকে দেখা দিও। আমি তোমাকে এই সেফালিকাতলে প্রকৃতিরচিত কুসুমাসনে বসাইয়া তোমার অভ্যর্থনা করিব; রুদ্ধ হৃদয়ের গৈরিকস্রোত তোমার সম্মুখে ঢালিয়া দিয়া অন্তরের দাবানল শান্ত করিব। তবে যাও আশ্বিন! এক বৎসরের জন্য বিদায়!

শ্রীঅভিরাম শর্ম্মা।

এরোরুট।

—:×:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পালো প্রস্তুত করিবার সহজ উপায়—মূল উঠাইয়া নির্ম্মল জলে বারম্বার বিধৌত করিলেই, মূলগুলি মৃত্তিকাশূন্য ও বিশেষ রূপে পরিস্কৃত হয়। মূলগুলি পরিষ্কার করিয়া লইয়া, তাহা উত্তমরূপে ঢেঁকিতে কুটিয়া লইতে হয়। তৎপরে উহা পরিষ্কার জলপূর্ণ পাত্রে (পাত্রটী নূতন হইলে, কাজ সহজসাধ্য হয়) ফেলিয়া, ছিবড়াগুলি তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। পাত্রস্থিত ঘোলা জল কিছু সময় স্থির ভাবে রাখিয়া দিলে, জলমধ্যস্থিত শ্বেতসার আপনা হইতেই

পাত্রের নিম্নভাগে পতিত হয়। ধীরতার সহিত পাত্রের জল ফেলিয়া দিয়া, শ্বেত-সারকে তিন চারিবার (পালো ময়লা শূন্য না হওয়া পর্য্যন্ত) উল্লিখিত প্রণালীতে বিধৌত করিলে, উহা দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়। এই সময় পালো গুলি কোন পরিষ্কার প্রশস্ত পাত্রে রাখিয়া, শুষ্ক করিয়া লইতে পারিলেই (রৌদ্রে শুষ্ক করাই বিধেয়) এরোরুট প্রস্তুত হইল।

পালো প্রস্তুত হইবা মাত্রই তাহা শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। তাহা না হইলে পালো বিকৃত হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই জন্যই বৃষ্টির দিনে অথবা যে দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, সেই দিন পালো প্রস্তুত করা বিধেয় নহে। এইরূপ দিনে পালো প্রস্তুত করিলে, তাহা সত্ত্ব শুষ্ক করিয়া লইবার কোনই উপায় থাকে না। ফলে, এরোরুট বিবর্ণ হইয়া যায় এবং দুইতিন দিনের মধ্যেই অম্ল গন্ধ জন্মিয়া থাকে। প্রস্তুত করিবার সময় যাহাতে পালোতে কোনও প্রকারে বিন্দুমাত্রও ধূলিকণা মিশ্রিত হইতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। শুষ্ক করিবার সময়, বাত্যাবেগে ধূলিকণা মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, বস্ত্র দ্বারা পালো ঢাকিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কোনও প্রকারে পালোতে সামান্য পরিমাণ ময়লা লাগিলেও তাহা তুলিয়া ফেলা সাধ্যাতীত।

তৈয়ারি এরোরুট অনাবৃত না রাখিয়া মৃত্তিকা অথবা কাচের পাত্রে ঢাকিয়া রাখিলে, বহু দিবস পর্য্যন্ত বেশ ভাল থাকে। যাহাতে কোনও প্রকারে বাতাস লাগিতে না পারে, এই রূপ অবস্থায় (air tight) রাখিতে পারিলে এক বৎসর বা ততোধিক সময় পর্য্যন্ত এরোরুট অবিকৃত থাকে। কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে এরোরুট বিবর্ণ ও বিস্বাদ হইয়া যায় এবং তাহাতে পোকা জন্মিয়া থাকে।

উপকারিতা—এরোরুট বর্ত্তমানে খাদ্যরূপে, বিলাসিতায় এবং অন্যান্য নানা প্রকারে ব্যবহৃত হইতেছে।

(১) খাদ্যরূপে—এরোরুট শিশু ও রোগীদিগের পক্ষে অতি লঘু এবং বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য। ইহা সাগু, বার্লি, টেপিওকা প্রভৃতি যে সমুদয় পালো বা শ্বেত-সার পদার্থ শিশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে উপকারিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এরো-রুটের বিস্কুট অতি উপাদেয় লঘু খাদ্য। এরোরুটে প্রস্তুত হালুয়া ও পিষ্টকাদি বড় কোমল এবং বিশেষ সুস্বাদু হয়। যাঁহারা চা পান করিয়া থাকেন, তাঁহারা চার সহিত এরোরুট মিশ্রিত করিয়া লইলে, তাহার স্বাদ ও উপকারিতা অনেক বেশী হয়। যে সব শিশু বিশুদ্ধ এরোরুট খায় তাহারা, যে সব ছেলে শুধু দুগ্ধই

পান করিয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশেই দুর্ব্বল অথবা রোগা হয় না। সহরে বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব বলিয়াই, দুগ্ধপায়ী শিশুদিগের সহজেই পিত্তা-রের দোষ জন্মে। এই দোষে যত সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তাহার অর্দ্ধাংশই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। কিন্তু দুগ্ধের সহিত বিশুদ্ধ এরোরুট মিশ্রিত করিয়া দিলে এ দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা বড় কম। সাহেবেরা চা, কফি এবং কোকোয়া প্রভৃতির সহিত নিত্যই খাদ্যরূপে এরোরুট ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদের অন্যান্য নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্যেও এরোরুট ব্যবহৃত হয়।

আমাদের দেশে শিশু-খাদ্যের বিশেষ অভাব। দুগ্ধের দর দিন দিনই বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া, অধিকাংশ শিশুর অদৃষ্টেই যথোচিত দুগ্ধপান ঘটিয়া উঠে না। জমাট দুগ্ধ (Condensed milk) পান করিয়াই অনেক শিশুকে দুগ্ধপানের সাধ মিটাইতে হয়। এই নামমাত্র দুগ্ধের দ্বারা শিশুর ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই সাধিত হইয়া থাকে। দুগ্ধের পরিবর্ত্তে শিশু-খাদ্যরূপে একমাত্র এরোরুটই ব্যবহৃত হইতে পারে। সুতরাং যে পরিমাণে ইহার চাষের বিস্তার হইবে, সেই পরিমাণেই শিশুর খাদ্যাভাব বিদূরিত হইবে। কৃষক মাত্রেরই এরোরুট চাষে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, দুর্ভিক্ষের সময় শুধু এরোরুট খাইয়াও বহু দিবস পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করা যায়।

(২) বিলাসিতা—এরোরুট শরীরে মাখিয়া ধুইয়া ফেলিলে, শরীরের ঘামাচি মরিয়া যায়, শরীর দাগশূন্য এবং কোমল হয়। শরীরে মাখিবার পাউডার ইহাতে প্রস্তুত করা যায়। এরোরুটের আবিরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সচরাচর বাজারে যে আবির পাওয়া যায়, তাহা বনহরিদ্রার পালোতে প্রস্তুত হয় বলিয়া, মূল্য বড় সুলভ। মূল্য বেশী পড়ে বলিয়া, আজকাল এরোরুটের আবির বড় প্রস্তুত হয় না। ইহার দ্বারা আবির প্রস্তুত করিলে, তাহা যেমন মসৃণ, উপকারক ও সুন্দর হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না।

(৩) অন্যান্য প্রকারের ব্যবহার—এরোরুটে কাপড়, জামা ইত্যাদি ইস্ত্রী করিলে, সুন্দর এবং বহু দিবস স্থায়ী হয়। গলার নেকটাই, কলার ইত্যাদি এরোরুটের ইস্তিরি বলিয়াই তাহা এত শক্ত হয়। ইস্তিরি করিবার ইহাই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ উপাদান। চিত্রকর এবং ফটোগ্রাফারগণ এরোরুটের আঠা প্রস্তুত করিয়াই, কার্য্য করিয়া থাকে। ইহার আঠায় কাগজে কোন দাগ পড়ে না; বিশেষতঃ বহু দিবস পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

ফসল ও আয়ের পরিমাণ—বুঝিয়া চাষ করিতে পারিলে প্রতি বিঘায়

৫০/ মণ বা ততোধিক পরিমাণ মূল পাওয়া যায়। এই মূলে ন্যূন পক্ষেও ৫।৬ মণ এরোরুট প্রস্তুত হয়। প্রতি মণ ১২৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় করিলেও ৬০৲ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। জমির খাজনা, বীজ সংগ্রহ, চাষ, নিড়ানী, রোপণ এবং পালো প্রস্তুত প্রভৃতিতে যে ব্যয় হয়, তাহাতে প্রথম বৎসর বড় লাভ হয় না। দ্বিতীয় বৎসর হইতে, ক্রমাগত তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত (ইহার পর ক্রমশঃই মূলের পরিমাণ কমিয়া যাইতে থাকে; বিশেষতঃ একই ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত একই প্রকারের ফসল থাকে বলিয়া, মৃত্তিকা অনুর্ব্বর হইয়া যায়।) যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই লাভ।

যে ক্ষেত্রে একবার এরোরুটের আবাদ হয়, তাহাতে বহুবৎসর পর্য্যন্ত স্বতঃই এরোরুটের গাছ জন্মিয়া ক্ষেত্র ভরিয়া যায়। মূল উঠাইবার সময় সমুদয় মূল উঠাইতে পারা যায় না। ক্ষেত্রে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতেই গাছ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং প্রথম বৎসরের ন্যায় ক্রমাগত ৩.৪ বৎসর পর্য্যন্ত বিনা ব্যয়েই মূল সংগ্রহ করিতে পারা যায়। এজন্য আর পৃথক কিছুই ব্যয় করিতে হয় না। (আবশ্যক বোধে নিড়ির জন্য নামমাত্র ব্যয় করিলেই চলে)। পালো প্রস্তুতের ব্যয় বাদে, আর সমুদয়ই কৃষকের লাভ। পালো প্রস্তুতের ব্যয় ১০৲ টাকা বাদ দিলেও, এই সময় হইতে গড়ে প্রতিবৎসর ন্যূনপক্ষে ৫০৲ টাকা লাভ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এক বিঘা জমিতে বিনাব্যয়ে ও বিনা পরিশ্রমে প্রতিবৎসর ৫০৲ টাকা লাভ উপেক্ষার বিষয় নহে।

অনাবাদি পতিত জমিতে এরোরুটের চাষ করিলে (এরূপ জমিই প্রশস্ত) লাভের পরিমাণ আরও বেশী হইবে। কদলীক্ষেত্রে অল্পমূল্যের আদা অথবা হরিদ্রার পরিবর্ত্তে, উহার চতুর্গুণ মূল্যের এরোরুটের মূল রোপণ করিলে, কৃষকের আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়। ইহাও কৃষকের উপেক্ষার বিষয় নহে।

উপসংহার।—যে দেশে বিনা পরিশ্রমে বিঘাতে ৫০৲ টাকা লাভ হয় সে দেশের লোক যে অনাহারে মরে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! কয়েক বিঘা জমিতে বুঝিয়া শুঝিয়া কৃষি করিতে পারিলে, যে দেশে ডেপুটী অথবা মুন্সেফ বাবুর অপেক্ষাও সুখে থাকা যায়, সে দেশের শিক্ষিত লোক যে ১৫৲ টাকা বেতনের জন্য, দুই তিন বৎসর বিনাবেতনে শিক্ষানবিশী কার্য্য করিতে প্রস্তুত হয়, ইহা ততোধিক আশ্চর্য্যের বিষয়!! যে চাষার দেশে, (যে দেশের বার আনার বেশীই চাষ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সে দেশ চাষার দেশ নয় তো কি?) চাষার ছেলেকেও চাষা বলিলে গালি দেওয়া হয়, সে দেশের

সংবাদপত্রে প্রকাশ্যভাবে প্রবন্ধ লিখিয়া, ভদ্রলোকের ছেলেকে চাষা বানাইতে চেষ্টা করিয়াও (এ চেষ্টা ক্রমাগত ৭।৮ বৎসর করিতেছি) যে, মানহানির মোকদ্দমায় পড়িতেছি না, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়! মোট কথা, বাবু হইয়াই আমরা কাবু হইয়া পড়িয়াছি, চাষা না হইলে আমাদের আশা কোথায়?

পতিত স্থানগুলিতে এরোরুট চাষের প্রচলন করিতে পারিলে, কৃষকেরাও দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে, জমিদারেরও পতিত স্থান হইতে দু'পয়সা আয়ের পথ হয়। দেশের অধিকাংশ জমিদারই প্রজার রক্ত শোষণ করিতে জানেন, কিন্তু প্রজার আয়ের পথ করিয়া দিয়া যে কিরূপে নিজের আয়ের উপায় করিয়া লইতে হয়, সে সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞ। এই জন্যই দেশের দুঃখ, দরিদ্রতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ।

জ্যোতিষ রহস্য।

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব।

দীপ্তাংশ—রবির দীপ্তাংশ ১৫ অংশ। চন্দ্রের ১২ অংশ। মঙ্গলের ৮ অংশ। বুধের ৭ অংশ। বৃহস্পতির ৯ অংশ। শুক্রের ৭ অংশ। শনির ৯ অংশ। তুঙ্গ স্থানস্থ কোন গ্রহের দীপ্তাংশের মধ্যে যদি অপর কোন গ্রহ থাকে, তাহা হইলে সেই গ্রহটীকে পরাজিত গ্রহ বলা যায়। পরাজিত গ্রহ বলহীন বলিয়া, তদ্দশা ভোগকালে জাতককে অশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। গ্রহগণ যে রাশির যত অংশে থাকে, সেই অংশ হইতে, সেই গ্রহের নির্দ্দিষ্ট দীপ্তাংশ, অর্দ্ধেক পূর্ব্বে ও অর্দ্ধেক পরে কল্পনা করিবে। দীপ্তাংশের মধ্যেই গ্রহগণের তেজঃ পূর্ণরূপে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

গ্রহগণের মধ্যগতি বা মধ্যভুক্তি।

গ্রহ	অংশ	কলা	বিকলা	অনুকলা
রবি	০	৫৯	৮	১০
চন্দ্র	১৩	৩৪	৫২	০
মঙ্গল	০	৩১	২৬	২৮
বুধ	০	৫৯	৮	১০
বৃহস্পতি	০	৪	৫৯	৯
শুক্র	১	৩৬	৭	৪৪
শনি	২	০	২৩	০
চন্দ্রমন্দোচ্চ	০	৬	৪১	১০
রাহু	০	৩	১৯	২০

এই সমস্ত অঙ্ক গ্রহদিগের দৈনিক ভুক্তি বলিয়া কথিত হয়।

গ্রহগণের শীঘ্র ভুক্তি।

গ্রহ	অংশ	কলা	বিকলা	অনুকলা
মঙ্গল	০	৫৯	৮	১০
বুধ	৪	৫	৩২	২১
বৃহস্পতি	০	৪	৫৯	৯
শুক্র	১	৩৬	৭	৪৪
শনি	০	২	০	২৩

গ্রহগণের গতি।

রবির গতি।

	কলা	বিকলা	অনুকলা	প্রত্যনুকলা
১ দণ্ডে	০	৫৯	৮	১০
২ „	১	৫৮	১৬	২০
৩ „	২	৫৭	২৪	৩০
৪ „	৩	৫৬	৩২	৪০
৫ „	৪	৫৫	৪০	৫০
৬ „	৫	৫৪	৪৯	০
৭ „	৬	৫৩	৫৭	১০

৮ "	৭	৫৩	৫	২০
৯ "	৮	৫২	১৩	১০
১০ "	৯	৫১	২১	৪০
২০ "	১৯	৪২	৪৩	২০
৩০ "	২৯	৩৪	৫	০
৪০ "	৩৯	২৫	২৬	৪০
৫০ "	৪৯	১৬	৪৮	২০
৬০ "	৫৯	৮	৯	০

চন্দ্রের গতি।

	কলা	বিকলা	অনুকলা	প্রত্যনুকলা
১ দণ্ডে	১৩	১০	৩৪	৫২
২ "	২৬	২১	৯	৪৪
৩ "	৩৯	৩১	৪৪	৩৬
৪ "	৫২	৪২	১৯	২৮
৫ "	৬৫	৫২	৫৪	২০
৬ "	৭৯	৩	২৯	১২
৭ "	৯২	১৪	৪	৪
৮ "	১০৫	২৪	৩৮	৫৬
৯ "	১১৮	৩৫	২৩	৪৮
১০ "	১৩১	৪৫	৪৮	৪০
২০ "	২৬৩	৩১	৩৭	২০
৩০ "	৩৯৫	১৭	২৬	০
৪০ "	৫২৭	৩	১৪	৪০
৫০ "	৬৫৮	৪১	৩	২০
৬০ "	৭৯০	৩৪	৫২	০

চন্দ্রকেন্দ্রের গতি।

	কলা	বিকলা	অনুকলা	প্রত্যনুকলা
১ দণ্ডে	১৩	৩	৫৩	৫৩
২ "	২৬	৭	৪৭	৪৬
৩ "	৩৯	১১	৪১	৩৯

৪ ,,	৫২	১৫	৩৫	৩২
৫ ,,	৬৫	১৯	২৯	২৫
৬ ,,	৭৮	২৩	২৩	১৮
৭ ,,	৯১	২৭	১৭	১১
৮ ,,	১০৪	৩১	১১	৪
৯ ,,	১১৭	৩৫	৪	৫৭
১০ ,,	১৩০	৩৮	৫৮	৫০
২০ ,,	২৬১	১৭	৫৭	৪০
৩০ ,,	৩৯১	৫৬	৫৬	৩০
৪০ ,,	৫২২	৩২	৫৫	২০
৫০ ,,	৬৫৩	১৪	৫৪	১০
৬০ ,,	৭৮৩	৫৩	৫৩	০

মঙ্গলের গতি।

	কলা	বিকলা	অনুকলা	প্রত্যনুকলা
১ দণ্ডে	০	৩১	২৬	২৮
২ ,,	১	২	৫২	৫৬
৩ ,,	১	৩৪	১৯	২৪
৪ ,,	২	৫	৪৫	৫২
৫ ,,	২	৩৭	১২	২০
৬ ,,	৩	৮	৩৮	৪৮
৭ ,,	৩	৪০	৫	১৬
৮ ,,	৪	১১	৩১	৪৪
৯ ,,	৪	৪২	৫৮	১২
১০ ,,	৫	১৪	২৪	৪০
২০ ,,	১০	২৮	৪৯	২০
৩০ ,,	১৫	৪৩	১৪	০
৪০ ,,	২০	৫৭	৫৮	৪০
৫০ ,,	২৬	১২	৩	২০
৬০ ,,	৩১	২৬	২৮	০

বুধের গতি।

	কলা	বিকলা	অনুকলা	প্রত্যনুকলা।
১ দণ্ডে	৪	৫	৩২	২১
২ ,,	৮	১১	৪	৪২
৩ ,,	১২	১৬	৩৭	৩
৪ ,,	১৬	২২	৯	২৪
৫ ,,	২০	২৭	৪১	৪৫
৬ ,,	২৪	৪৩	১৪	৬
৭ ,,	২৮	৩৮	৪৬	২৭
৮ ,,	৩২	৪৪	১৮	৪৮
৯ ,,	৩৬	৪৯	৫১	৯
১০ ,,	৪০	৫৫	২৩	৩০
২০ ,,	৮১	৫০	৪৭	০
৩০ ,,	১২২	৪৬	১০	৩০
৪০ ,,	১৬৩	৪১	৩৪	০
৫০ ,,	২০৪	৩৬	৫৭	৩০
৬০ ,,	২৪৫	৩২	২১	০

বৃহস্পতির গতি।

	কলা	বিকলা	অনুকলা	প্রত্যনুকলা
১ দণ্ডে	০	৪	৫৯	৯
২ ,,	০	৯	৫৮	১৮
৩ ,,	০	১৪	৫৭	২৭
৪ ,,	০	১৯	৫৬	৩৬
৫ ,,	০	২৪	৫৫	৪৫
৬ ,,	০	২৯	৫৪	৫৪
৭ ,,	০	৩৪	৫৪	৩
৮ ,,	০	৩৯	৫৩	১২
৯ ,,	০	৪৪	৫২	২১
১০ ,,	০	৪৯	৫১	৩০
২০ ,,	১	৩৯	৪৩	০

৩০ „	২	২৯	৩৪	৩০
৪০ „	৩	১৯	২৬	০
৫০ „	৪	৯	১৭	৩০
৬০ „	৪	৫৯	৯	০

শুক্রের শীঘ্র গতি।

	কলা	বিকলা	অনুকলা	প্রত্যনুকলা
১ দণ্ডে	১	৩৬	৭	৪৪
২ „	৩	১২	১৫	২৮
৩ „	৪	৪৮	২৩	১২
৪ „	৬	২৪	৩০	৫৬
৫ „	৮	০	৩৮	৪০
৬ „	৯	৩৬	৪৬	২৪
৭ „	১১	১২	৫৪	৮
৮ „	১২	৪৯	১	৫২
৯ „	১৪	২৫	৯	৩৬
১০ „	১৬	১	১৭	২০
২০ „	৩২	২	৩৪	৪০
৩০ „	৪৮	৩	৫২	০
৪০ „	৬৪	৫	৯	২০
৫০ „	৮০	৬	২৬	৪০
৬০ „	৯৬	৭	৪৪	০

শনির গতি।

	কলা	বিকলা	অনুকলা	প্রত্যনুকলা
১ দণ্ডে	০	২	০	২৩
২ „	০	৪	০	৪৬
৩ „	০	৬	১	৯
৪ „	০	৮	১	৩২
৫ „	০	১০	১	৫৫
৬ „	০	১২	২	১৮

৭ ”	০	১৪	২	৪১
৮ ”	০	১৬	৩	৪
৯ ”	০	১৮	৩	২৭
১০ ”	০	২০	৩	৫০
২০ ”	০	৪০	৭	৪০
৩০ ”	১	০	১১	৩০
৪০ ”	১	২০	১৫	২০
৫০ ”	১	৪০	১৯	১০
৬০ ”	২	০	২৩	০

রাহুর গতি।

	কলা	বিকলা	অনুকলা	প্রত্যনুকলা
১ দণ্ডে	০	৩	১০	৪৫
২ ”	০	৬	২১	৩০
৩ ”	০	৯	৩২	১৫
৪ ”	০	১২	৪৩	০
৫ ”	০	১৫	৫৩	০
৬ ”	০	১৯	৪	৩০
৭ ”	০	২২	১৫	১৫
৮ ”	০	২৫	২৬	০
৯ ”	০	২৮	৩৬	৪৫
১০ ”	০	৩১	৪৭	৩০
২০ ”	১	৩	৩৫	০
৩০ ”	১	৩৫	২	৩০
৪০ ”	২	৭	১০	৫০
৫০ ”	২	৩৮	৫৭	৩০
৬০ ”	৩	১০	৪৫	৪

কেতুর গতি পৃথক লিখিবার আবশ্যক নাই। কেন না, উহার গতি রাহুর অনুরূপ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, জ্যোতিঃশেখর।

দয়ারামের কথা।

———•:+:•———

আহারান্তে দয়ারাম হুঁকাটী হাতে লইয়া সবেমাত্র খড়ের বিঁড়াটী টানিয়া বসিয়াছে, এমন সময় জমিদারের কাছারীর পাইক আসিয়া বলিল,—"পালের পো, নায়েব মশায় তোমায় ডাকছেন।"

দয়ারাম একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল,—"নায়েব মশায় ডাকছেন? কেন রে কালু?"

পাইক বলিল,—"ত' জানি না।"

দয়ারাম হুঁকায় একটা টান দিয়া বলিল,—"আচ্ছা একটু পরে যাচ্ছি।"

পাইক বলিল,—"পরে নয়, এখুনি, আমার সাথে যেতে হবে।"

দয়া। এত জোর তলব?

পা। হাঁ।

অগত্যা দয়ারাম হুঁকা রাখিয়া উঠিল, এবং বাম কাঁধে গামছা খানি ফেলিয়া পাইকের সঙ্গে চলিল। পথে যাইতে যাইতে দয়ারাম ভাবিল, আমাকে এত জোর তলব কেন?

দয়ারামের এরূপ ভাবিবার একটু কারণ ছিল। দয়ারাম সাতোয়ান প্রজা, জমিদারের সত্তর বিঘা জমি সে জোত করে, কিন্তু কখনও পাই পয়সা খাজানা বাকী পড়ে নাই। তা'ছাড়া সে কখন কোন হাঙ্গামার মধ্যে যায় নাই। সুতরাং এমন অসময়ে তাহাকে ডাকিবার কারণ কি?

কাছারীতে উপস্থিত হইয়া দয়ারাম এ প্রশ্নের উত্তর পাইল। সেখানে আরও অনেক প্রজা উপস্থিত ছিল। তাহাদের নিকট দয়ারাম শুনিল, আগামী বৈশাখ মাসে নায়েব মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ। তজ্জন্য তাঁহার কিঞ্চিৎ অর্থের প্রয়োজন; সুতরাং প্রজাদের নিকট হইতে টাকায় দুই আনা হিসাবে মাথট তুলিয়া নায়েব মহাশয় সে প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কিন্তু প্রজারা ইহাতে সম্মত নহে, তাহারা টাকায় এক পয়সা মাথট দিতে রাজী। নায়েব মহাশয়ও ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি প্রজাদিগকে চাপিয়া ধরিলেন। তখন প্রজারা সকলেই বলিল,—"দয়ারাম পাল যদি স্বীকার করে, তবে আমরাও ইহাতে রাজি আছি।" অগত্যা এই মধ্যাহ্ন কালে দয়ারামের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

দয়ারাম আসিলে নায়েব শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সিংহ মহাশয় তাহাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিলেন, এবং দুই আনা হিসাবে মাথট দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দয়ারাম তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিল না। দয়ারাম যে দুই আনা হিসাবে মাথটের কয়টা টাকা দিতে অসমর্থ ছিল, তাহা নহে। কিন্তু সে ভাবিয়া দেখিল, সে স্বীকার করিলেই সকলকেই এই হিসাবে দিতে হইবে। যাহারা মহাজনের নিকট ধার করিয়া খাজানা শোধ করে, তাহাদের পক্ষে ইহা যে কতদূর কষ্টকর হইবে তাহা দয়ারাম বুঝিল। বুঝিল বলিয়াই সে নায়েব মহাশয়ের প্রস্তাবে রাজী হইল না। অনেক জেদাজেদি, অনেক কথা কাটাকাটির পর দয়ারাম বলিল,—"এক পয়সার এক কড়া বেশী মাথট দিব না। তবে দুই আনা হিসাবে মাথট ধরিলে আমার নিকট যত টাকা হয়, আমি তাহা আপনাকে ভিক্ষা স্বরূপ দিতে পারি।"

দয়ারাম উঠিয়া আসিল। তাহার সঙ্গে অন্যান্য প্রজারাও উঠিল। নায়েব মহাশয় দশনে অধর চাপিয়া রোষকষায়িত দৃষ্টিতে দয়ারামের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু দয়ারাম তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না।

কয়েক দিন পরে দয়ারাম চৈত্র কিস্তীর খাজানা দিয়া আসিল। নায়েব মহাশয় খাজানার টাকা লইয়া তাহাকে দাখিলা দিলেন। দয়ারাম একটু আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল, ক্রুদ্ধ নায়েব মহাশয় দাখিলার জন্য তো তাহাকে হাঁটা-হাঁটি করাইলেন না? কিন্তু নিরক্ষর দয়ারাম যদি পড়িতে পারিত, তবে সে দেখিতে পাইত যে, ৯৩।/১৫ পয়সা খাজনা দিয়া সে ৩।/১৪॥=ক্রান্তির দাখিলা পাইয়াছে।

তারপর পৌষের কিস্তীতেও দয়ারাম ৮৫॥/৫ পয়সা খাজানা দিয়া ৬৫॥/৩৮—ক্রান্তির দাখিলা পাইল; এবং সে অন্যান্য দাখিলার সহিত সেই দাখিলা খানিকেও কাপড়ে জড়াইয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিল। এইরূপে সে দুই বৎসরে যত খাজানা দিল, প্রায় সকলেরই এইরূপ এক একখানা দাখিলা পাইল। কিন্তু দয়ারাম সে কথা জানিল না।

সে বৎসর শ্রাবণ মাসে খুব ঘটা করিয়া দয়ারাম পুত্রের বিবাহ দিল। দয়ারামের মাতা তখনও জীবিতা। তাঁহার সাধ পূরাইতে পুত্রের বিবাহে দয়ারামকে অনেক টাকা খরচ করিতে হইল। কিন্তু ইহার পর হইতেই বিধাতা বুঝি দয়ারামের উপর বাম হইলেন। আশ্বিন মাসে অনাবৃষ্টি হইল। মাঠের ধান্য

মাঠে শুকাইয়া গেল। যে সব জমিতে সেঁচিবার উপায় ছিল, সেইগুলি মাত্র রক্ষা হইল। কিন্তু তাহা কয়েক বিঘা মাত্র।

বিপদ্ একা আসে না। কার্ত্তিক মাসে দয়ারাম মাতৃহীন হইল। যা' কিছু ছিল সমস্ত খরচ করিয়া, অধিকন্তু একশত টাকা ঋণ করিয়া দয়ারাম মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিল। পৌষের কিস্তীতে জমিদারের খাজানা বাকী পড়িল। কিন্তু ইহাতেও দয়ারাম দমিল না, পর বৎসরের মুখ চাহিয়া সে আশায় বুক বাঁধিল।

পরবর্ত্তী বৈশাখ মাসে একদিন আদালতের জনৈক পেয়াদা আসিয়া দয়ারামের হাতে একখানা সমন দিয়া গেল। সমন পাইয়া দয়ারাম বিস্মিত হইল। সে তাড়াতাড়ি হেম ঘোষের নিকট ছুটিয়া গিয়া সমনখানা পড়াইল। সমন পড়িয়া হেমঘোষ বলিল,—"জমিদার তোমার নামে তিন বৎসরের বাকী খাজানা ২১৩৷৴৩ পাই দাবীতে নালিস রুজু করিয়াছেন, আগামী ১৪ই জ্যৈষ্ঠ মোকদ্দমার দিন।"

তিন বৎসরের খাজানা বাকী! দয়ারাম কিছুই বুঝিতে পারিল না, সে ছুটিয়া নায়েব মহাশয়ের নিকট গেল। নায়েব মহাশয় বলিলেন,—"আমি ও সব কিছু জানি না। খাজানা দিয়া থাক, আদালতে তাহা প্রমাণ করিবে।"

দয়ারাম তখন উকীলের বাড়ী ছুটিল। উকীল মহাশয় সাহস দিয়া বলিলেন, —"যখন খাজানা দিয়া দাখিলা লইয়াছ, তখন ভয় কি? মোকদ্দমায় জবাব দাও।"

তাহাই হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে দয়ারাম জবাব দিল, "খাজানা কিস্তী কিস্তী শোধ করা হইয়াছে, এবং তাহার রীতিমত চেক দাখিলা লওয়া হইয়াছে। নায়েব মহাশয় কেবল আক্রোশ বশে আমাকে জব্দ করিবার জন্য এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন।"

হাকিম চেক দাখিলা আদালতে দাখিল করিবার জন্য হুকুম দিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে দয়ারাম দাখিলাগুলি লইয়া উকীলের নিকট উপস্থিত হইল। দাখিলা দেখিয়াই উকীল মহাশয় বসিয়া পড়িলেন, এবং দয়ারামকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিলেন। দয়ারাম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"এখন উপায়?"

উকীল বলিলেন,—"তুমি যখন খাজানা দিয়েছিলে, তখন সেখানে আর কোন প্রজা ছিল?"

দয়া। ছিল।

উ। তাহারা সাক্ষ্য দিবে?

দয়া। নিশ্চয়ই দিবে।

তখন উকীল মহাশয় চেক দাখিলা আদালতে হাজির করাইয়া দিয়া হাকিমকে জানাইলেন যে, প্রতিবাদী, বাদীর নায়েব মহাশয়ের কন্যার বিবাহে মাথট দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় তিনি উহার উপর রুষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং প্রতিবাদী রীতিমত খাজানা দিলেও বাদীর গোমস্তা (তিনি নায়েবের সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ) রীতিমত দাখিলা দেয় নাই। প্রতিবাদী নিরক্ষর, সুতরাং সে ইহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। এক্ষণে হুজুর যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে অন্যান্য প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারি।

হাকিম এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। তখন কয়েকজন প্রজাকে সাক্ষী করিয়া এবং তাহাদের সমন খরচা দিয়া দয়ারাম ফিরিয়া আসিল।

বলা বাহুল্য, ঋণ করিয়াই দয়ারাম মোকদ্দমা চালাইতেছিল। এদিকে আষাঢ় মাস যায় যায়। কিন্তু দয়ারামের জমিতে তখনও চাষ পড়িল না।

কিন্তু এজন্য দয়ারাম ততটা দুঃখিত হইল না, যতটা দুঃখিত হইল সাক্ষীদের ব্যবহার দেখিয়া। যাহাদের জন্য দয়ারাম নায়েব মহাশয়ের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল, যাহাদের কষ্টের কথা চিন্তা করিয়াই সে মাথট দিতে স্বীকৃত হয় নাই, তাহারাই আদালতে শপথ করিয়া অম্লানবদনে বলিল, "দয়ারামকে খাজানা দিতে আমরা দেখি নাই।" কেহ বা বলিল, "দয়ারামকে দাখিলার লিখিত টাকা দিতেই দেখিয়াছি।" কেহ বলিল, "মাথট লইয়া নায়েবের সহিত দয়ারামের কোন গোলযোগই হয় নাই। নায়েব মহাশয় এক পয়সা হিসাবেই মাথট চাহিয়াছিলেন, দুই আনা হিসাবে চাহেন নাই।"

দয়ারাম বিস্মিত স্তম্ভিত। মূর্খ দয়ারাম জানিত না যে, সংসারে প্রায়ই উপকারের প্রতিদানে অপকারটাই পাওয়া যায়।

এক বৎসর মোকদ্দমা চলিল। দয়ারামের স্ত্রীর অলঙ্কার, বালিকা পুত্রবধূর গহনা, সমস্তই একে একে বাঁধা পড়িল। এক বৎসর পরে পরবর্ত্তী বৈশাখ মাসে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল। জমিদার, দয়ারামের বিরুদ্ধে মায় খরচা ২৫৭।৶৫ পাই ডিক্রী পাইলেন। দয়ারাম সংসার অন্ধকার দেখিল।

কিন্তু তখন আর উপায় কি? দয়ারাম টাকার জন্য মহাজনের দ্বারস্থ হইল। কিন্তু মহাজন, জানি না কাহার ইঙ্গিতে সহজে টাকা দিল না, আজি কালি করিতে করিতে একমাস কাটিয়া গেল। এদিকে জমিদার একমাস পরেই ডিক্রী জারি করিয়া তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করাইলেন। দয়ারাম

জমিদারের নিকট আপনার দুঃখের কাহিনী শুনাইতে ছুটিল। কিন্তু জমিদার মহাশয় তখন দার্জ্জিলিঙ্গের সুশীতল অঙ্কে বসিয়া বায়ু সেবন করিতেছিলেন। সুতরাং দয়ারামের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া তাঁহাকে বিব্রত হইতে হইল না। কয়েক দিন পরে দয়ারামের ঘটী বাটী, বাক্স বিছানা, গরু বাছুর, এমন কি ঘরের দরজাটী পর্য্যন্ত নীলামে উঠাইয়া নায়েব মহাশয় ৪৫।/০ আনা আদায় করিলেন। দয়ারামের রহিল কেবল একটী ঘটী, একটী থালা, দুইটী বলদ, আর একখানি লাঙ্গল। আইন অনুসারে এ গুলির বিক্রয় নিষিদ্ধ।

ক্রমে বর্ষা আসিয়া পড়িল। দয়ারাম দেড়ীসুদে বীজধান্য সংগ্রহ করিয়া সেই একখানি হাল লইয়া বহু কষ্টে কতক জমি আবাদ করিল। অর্দ্ধেকের উপর জমি পড়িয়া রহিল। মহাজনের ঘর হইতে ধান্য আনিয়া দয়ারাম অতি কষ্টে দিন চালাইতে লাগিল।

সে বৎসর বেশ ফসল জন্মিল। অগ্রহায়ণ মাসে স্বর্ণবর্ণ জমির নিকট দাঁড়াইয়া দয়ারাম ভাবিল, ইহাকেই বলে রাত্রির পর দিবা। কিন্তু পরদিন নায়েব মহাশয় আদালতের পেয়াদা সঙ্গে সেই জমির ধারে দাঁড়াইয়া যখন ঢোল সহরত দ্বারা সেই ফসল ক্রোক করাইলেন, তখন দয়ারাম আপনার ভুল বুঝিতে পারিল।

ফসল ক্রোক করা আর আদালতের সাহায্যে নিঃস্ব প্রজার গলায় ছুরি বসান একই কথা। ক্রোক দেওয়া ফসলের নিকট প্রজার যাইবার উপায় নাই; আর জমিদারেরও সেদিকে লক্ষ্য করিবার আবশ্যক নাই। সুতরাং জমির ধান জমিতে পড়িয়াই মাটী হয়। কিন্তু জমিদারের ইহাতে এক পয়সাও ক্ষতি নাই, তাঁহার প্রাপ্য টাকার এক কড়াও ইহাতে উসুল যায় না। সর্ব্বনাশ হয় কেবল দরিদ্র প্রজার। জানি না, প্রজাবৎসল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি উদ্দেশ্যে এই সর্ব্বনেশে আইনের সৃষ্টি করিয়াছেন।

দয়ারামের জমির ধান জমিতে পড়িয়া মাটী হইতে লাগিল। দয়ারাম গিয়া নায়েব মহাশয়ের নিকট কাঁদিয়া পড়িল এবং তাঁহাকে জমির ধান কাটাইয়া আনিয়া বিক্রয় করিয়া লইতে অনুরোধ করিল। এরূপ করিলে উপস্থিত ফসলটাও মাঠে পড়িয়া নষ্ট হইত না, দয়ারামের দেনাও কথঞ্চিৎ শোধ হইত। কিন্তু নায়েব মহাশয় এতটা আয়াস স্বীকার করিতে রাজি হইলেন না। সুতরাং দয়ারামের রক্তজলকরা ধানগুলা যে জমিতে জন্মিয়াছিল, সেই জমিতেই লয় প্রাপ্ত হইল।

এদিকে তখন দয়ারামের আবার দুই বৎসরের খাজানা বাকী পড়িয়াছে।

সুতরাং আবার তাহার নামে বাকী খাজানার নালিশ রুজু হইল। এবার আর দয়ারাম আদালতে গেল না। বিনা গোলযোগে তাহার নামে আবার ২১৫৲ টাকার ডিক্রী হইল। দয়ারামের তখন উপবাসে দিন কাটিতেছে। মহাজন ধার দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে জমিদারের কি? দয়ারাম মরুক বাঁচুক, জমিদারের খাজানা চাইই। সুতরাং তখন নায়েব মহাশয় তাহার জমির প্রজাই স্বত্ব বিক্রয় করিয়া লইলেন এবং অবশেষে নিষ্কর বাস্তু ও তৎসংলগ্ন গৃহ নীলাম করিলেন। তখন অনশনে অর্দ্ধাশনে এবং ম্যালেরিয়ার আক্রমণে দয়ারামের স্ত্রীপুত্র তাহার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। কেবল বালিকা পুত্রবধূ তখনও শ্বশুরের মায়া কাটাইতে পারে নাই।

* * * *

সে বৎসর জমিদার বাড়ীতে খুব ধুমধামের সহিত পূজা হইতেছিল। কলিকাতা হইতে যাত্রা আসিয়াছিল, থিয়েটার আসিয়াছিল, জনৈকা নামজাদা বাইজীরও শুভাগমন হইয়াছিল। অষ্টমী পূজার দিন যখন জমিদার মহাশয় বৈঠকখানায় বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসিয়া স্তাবকগণের মুখে বাইজীর সুখ্যাতি এবং তাঁহার অর্থব্যয়ে অকাতরতার গুণগান শ্রবণে শ্রুতিযুগল পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন, তখন দরজায় জনৈক ভিক্ষুক এক শীর্ণকায়া বালিকার হাত ধরিয়া এক মুষ্টি ভিক্ষা চাহিতেছিল। কিন্তু মুষ্টিভিক্ষার পরিবর্ত্তে সে দ্বারবানের নিকট অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল। নায়েব মহাশয় সেখানে ছিলেন। তিনি একটু গর্ব্বের হাসি হাসিয়া আপন মনে বলিলেন,—"মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং"।

তোমরা হয়তো এই পূজার সময়ে আমার নিকট একটা মজার গল্প শুনিবার আশা করিয়াছিলে; কিন্তু এক চাষা দয়ারামের কথা বলিতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সুতরাং এবারকার মত ঐ অর্দ্ধচন্দ্রপুরস্কৃত ভিখারীটীকেই উপহার দিয়া আমি অদ্য তোমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি

বা

যৌথ ঋণদান সমিতি।

কয়েক বৎসর হইতে গবর্ণমেণ্ট 'কো-অপারেটীভ ক্রেডিট সোসাইটী' নামে একটী বিভাগ খুলিয়াছেন। উদ্দেশ্য, পল্লীগ্রামস্থ দরিদ্র কৃষকগণের অবস্থার

উন্নতি সাধন। উদ্দেশ্যটী যে মহৎ তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বিভাগ সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়মাবলী সঙ্কলিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা অতি অল্প। বিগত কয়েক বৎসরের এই বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করিলেই ইহার নিষ্ফলতার বিষয় সম্যক্ প্রতিপন্ন হয়।

প্রায় ৩ বৎসর হইল অর্থাৎ ১৯০৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আমি এই উত্তর বঙ্গের উত্তর প্রান্তে উক্তরূপ একটী ক্রেডিট সোসাইটী (ঋণদান সমিতি) স্থাপন উদ্দেশ্যে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটীসমূহের তদানীন্তন রেজিষ্ট্রার গোর্লে সাহেব বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করি। সাহেব বাহাদুরও আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া পত্রোত্তর প্রদান করেন এবং তৎসঙ্গে কো-অপারেটীভ ক্রেডিট সোসাইটী সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী সমূহও প্রেরণ করেন। নিয়মাবলী পাঠে সোসাইটী স্থাপনের আশা সম্পূর্ণ তিরোহিত হওয়ায়, আমি তৎসম্বন্ধে কয়েকটী আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করার জন্য সাহেব বাহাদুরকে জানাইলে, তিনি কোনরূপ আশা প্রদান না করায় সেই স্থানেই এ বিষয়ের যবনিকা পতিত হয়।

কো-অপারেটীভ ক্রেডিট সোসাইটীর মূল সূত্র,—পল্লীগ্রামস্থ দরিদ্র কৃষকগণের দ্বারা পরস্পর সাহায্যের নিমিত্ত ঋণ-সমিতি স্থাপন। যাঁহারা বঙ্গদেশের কৃষকগণের অবস্থা অবগত আছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, বঙ্গীয় কৃষক-মণ্ডলীর শতকরা নিরানব্বই জনেরই অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, তাহারা নিজ আবশ্যকীয় গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতেও অক্ষম। যাহারা স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে পারে না তাহারা যে অর্থ সঞ্চয় করিয়া ঋণ সমিতি স্থাপন করিবে ইহা কি সম্ভব? আর কদাচিৎ ১।১টী সম্পন্ন কৃষক থাকিলেও তাহারা ঋণ সমিতি স্থাপন করিয়া ঋণদানের ব্যবস্থা করিবে কেন? পল্লীগ্রামে কি ঋণগ্রহীতার অভাব? যাহাদের অর্থ আছে, তাহাদের প্রার্থীর কখনও অভাব হয় না। আর নিজের অর্থ দ্বারা সমিতি স্থাপন করিয়া অপরের অধীন হইতেই বা কে ইচ্ছা করে? সুতরাং এরূপ সমিতি স্থাপিত হওয়া একরূপ অসম্ভব।*

উক্তরূপ নানাবিধ আপত্তি উত্থাপন করিয়া আমি সাহেব বাহাদুরকে জানাই যে, যদি গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত পক্ষে দরিদ্র কৃষকগণের অবস্থার উন্নতি কামনা করেন, তবে গ্রামে গ্রামে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করুন। কৃষক সংখ্যার তারতম্য অনুসারে প্রত্যেক থানার অধীন দুই হইতে চারিটী কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপিত করিলেই

* এ সম্বন্ধে আমাদের যে বক্তব্য আছে তাহা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।—স্বঃ সং

প্রত্যেক কৃষক আবশ্যক মত সাহায্য পাইতে পারিবে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের মূলধন দশ হাজার টাকা হইলেই কাজটী চলিতে পারিবে। যদিও এরূপ বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক এক সঙ্গে স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর নয়, তথাপি প্রতি বৎসর দশ লক্ষ টাকা দ্বারা এরূপ এক শত ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে ২০।২৫ বৎসরের মধ্যেই আবশ্যকীয় সমস্ত ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে পারিবে।

বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই টাকা প্রতি প্রতিমাসে অর্দ্ধ আনা হারে সুদ দেওয়ার রীতি প্রচলিত। টাকা প্রতি মাসে অর্দ্ধ আনা হইলে, শতকরা মাসে তিন টাকা দুই আনা ও বৎসরে ৩৭॥০ সাড়ে সাইত্রিশ টাকা সুদ হয়। এরূপ অত্যধিক সুদের হার জগতের আর কুত্রাপি প্রচলিত আছে কিনা সন্দেহ। কৃষিব্যাঙ্ক যদি অর্দ্ধ আনার পরিবর্ত্তে টাকা প্রতি মাসে এক পাই হারে সুদ গ্রহণ করে, তাহা হইলেও বৎসরে শতকরা সওয়া ছয় টাকা সুদ পাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট প্রমিসারী নোট দ্বারা শতকরা বার্ষিক তিন টাকা হারে সুদ প্রদানে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। যদি তিন টাকা সুদে ঋণ গ্রহণ করিয়া কৃষিব্যাঙ্ক দ্বারা সওয়া ছয় টাকা সুদে ঋণ দান করা যায়, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক পরিচালনের আবশ্যকীয় ব্যয় সঙ্কুলান করিয়াও যথেষ্ট লাভ থাকিতে পারে। অথচ দরিদ্র কৃষকগণও অর্দ্ধ আনার পরিবর্ত্তে এক পাই হার সুদে ঋণ পাইলে বিশেষ উপকৃত হইতে পারে। এরূপ ব্যাঙ্ক স্থাপনে রাজা প্রজা উভয়েরই মঙ্গল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কি আর প্রজার মঙ্গলের জন্য এতদূর করিবেন ?

গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া আমরা নিজেদের সাহায্যে এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি কি না তাহাও বিবেচ্য। যাঁহারা ভারতগবর্ণমেণ্টের ঋণের বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, গবর্ণমেণ্টের প্রায় চারিশত কোটি টাকা ঋণের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে এক শতাধিক কোটি টাকা ঋণ গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ ভারতবাসীর একশত কোটিরও অধিক টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট বার্ষিক তিন টাকা এবং সাড়ে তিন টাকা সুদে লাগান আছে। এই টাকা গবর্ণমেণ্ট কখনও যে পরিশোধ করিবেন এ সম্ভাবনা নাই। তবে নিয়মিত বার্ষিক সুদ পাওয়া যাইতে পারিবে। ভারতবাসীর এই পর্ব্বত প্রমাণ টাকার কিয়দংশ কি কৃষিব্যাঙ্কে নিয়োজিত হইতে পারে না ? দ্বিগুণ সুদ পাইয়াও কি ভারতবাসী কোম্পানীর কাগজওয়ালাগণ দেশের মঙ্গলের জন্য নিজ নিজ অর্থ নিয়োজিত করিতে ইচ্ছুক নহেন ? কে ইহার উত্তর প্রদান করিবে ?

অধুনা কলিকাতায় কয়েকটী দেশীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেকটীর

মূলধনও প্রচুর। এই সমস্ত ব্যাঙ্ক এ পর্য্যন্ত মফঃস্বলে কোন শাখা প্রশাখা স্থাপন করেন নাই। সুতরাং দেশের লোকে ইহাদের দ্বারা এখনও কোনরূপ উপকৃত হইতে আরম্ভ করেন নাই। ইহাঁদের কার্য্যপ্রণালী কিরূপ হইবে তাহা ভবিষ্যতে দ্রষ্টব্য। তবে দেশমধ্যে ইতিপূর্ব্বে যে কয়েকটী জীবনবীমা কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের মূলধন বোধ হয় কোন বৈদেশিক ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। কারণ, আমাদের দেশের যৌথ কোম্পানী সমূহ বৈদেশিক ব্যাঙ্ককেই একমাত্র নিরাপদ স্থান বলিয়া মনে করেন। এই সমস্ত জীবনবীমা কোম্পানীর মূলধন দ্বারা কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন সম্ভব কি না তাহাও বিবেচ্য। ফলতঃ স্বদেশী আন্দোলন দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হইয়া দেশের লোক যখন আত্মপ্রতিষ্ঠায় যত্নপর হইয়াছে, তখন কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন দ্বারা কৃষকগণের উপকার ও তাহাদের মনোমধ্যে দেশীয় লোকের প্রতি আস্থা স্থাপন করান দেশের পক্ষে প্রভূত মঙ্গলের বিষয় কিনা, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীনবকুমার দত্ত গুপ্ত।

শারদীয়া।

—০:*:০—

তুই মা আসিলি যদি আজি আর্য্যভূমে
জ্ঞানৈশ্বর্য্য সিদ্ধি-শৌর্য্য সাথে করি সুখে,
জাগাইয়া দে মা তবে মগ্ন যারা ঘুমে,
করিতে অর্চ্চনা তোর প্রশান্ত কৌতুকে!
শরতের স্বর্ণোজ্জ্বল বালার্ক-কিরণে
কি নবীন চারু সাজে সজ্জিতা অবনী;
প্রাচীন-সন্তানে শুধু ও রাঙ্গা চরণে
দিবে অর্ঘ্য সুতবৃন্দ নিয়ত জননী?
অভিনব নৈবেদ্যের হোক্ আয়োজন
স্বার্থশূন্য অকলুষ হৃদয়-রুধিরে;
শোনা মা 'মাভৈঃ' রবে আশ্বাস বচন,
কোটি কণ্ঠে জয়-ধ্বনি উঠুক্ গম্ভীরে!

শঙ্করি! জননী মোর! কি কহিব হায়,—
আছে ঋদ্ধি, আছে সিদ্ধি এমনি পূজায়!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

প্রতাপ ও এনক আর্ডেন।

——(:০:)——

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এদিকে যুগান্তরব্যাপী বিজনবাসের পর সহস্রবাসনা বুকে করিয়া স্ত্রীপুত্রের মুখ দেখিবার আশায় এনক স্বদেশে প্রত্যাগত। বাটী গিয়া কি দেখিবে? এনি কি করিতেছে, জীবনধন শিশুপুত্রগুলি কত বড় হইয়াছে, স্বহস্ত-প্রোথিত বৃক্ষগুলি কেমন হইয়াছে। এইরূপে নানা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া এনক ফিরিতেছে। পথিপার্শ্বস্থ নগ্নপ্রায় বৃক্ষের উপর বিহঙ্গমকাকলি উঠিতেছে; শুষ্কপত্র ঝরিয়া পড়িতেছে; সাগরোত্থিত ঘন কুজ্ঝটিকায় পথ গৃহ ভরিয়া গিয়াছে; দেখিতে দেখিতে এনক বাটী আসিতেছে। কিন্তু—

"Home - home—what home—had he a home ?"

নিজ কুটীর দ্বারে আসিয়া দেখিতে পাইল, অন্ধকার কুয়াসার ভিতর হইতে একখানি বাটী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইতেছে। এনক ভাবিল, বুঝি এনি মরিয়া গিয়াছে, তাহার শিশুগুলি কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার শান্তি-কুঞ্জে আগুন লাগিয়াছে।

বিফল-মনোরথ হইয়া সমুদায় ব্যাপার জানিবার নিমিত্ত এনক গোপনে একস্থানে আশ্রয় লইল। একে একে সকল কথা শুনিল। তাহার মনে কোন-রূপ বিকার উপস্থিত হইল না। একবার এনিকে, তাহার সন্তানগণকে দেখিতে সাধ হইল মাত্র। একবার দেখা—কেবল দেখিবে এনি সুখে আছে। অন্ধ-কারে গোপনে চোরের মত জানালার পার্শ্ব হইতে রাত্রিযোগে একবার তাহা-দিগকে দেখিতে অগ্রসর হইল। তাহার মনে তখন ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত! "কি জানি যদি চীৎকার করিয়া উঠি," এই ভাবিয়া এনক রোগীর গৃহের ন্যায় নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিল। সে দেখিতে পাইল:—

"For cups and silver on the burnished board
Sharkled and show ; so genial was the hearth :
And on the right hand of the hearth he saw
Philip, the slighted suitor of old times,
Stout, rosy, with his babe across his knees ;
And o'er her second father stoopt a girl,

A later but a loftier Annie Lee,
Fair hair'd and tall, and from her lifted hand
Dangled a length of ribbon and a ring
To tempt the babe, who rear'd his creasy arms,
Caught at and missed it, and they laugh'd,
And on the left hand of the hearth he saw
The mother glancing often toword her babe,
But turning now and then to speak with him
Her son, he stood beside her tall and strong, —
And saying that which pleased him, for he smiled."

তাহার সন্তানগণ ফিলিপের পার্শ্বে উপাবিষ্ট, তাহারই স্ত্রী আজ ফিলিপের আদরিণী, এনির সন্তানের পিতা ফিলিপ। এনক বুঝিল, এ অবস্থায় স্বীয় প্রত্যাগমন জানাইলে ফিলিপের জীবন চিরদিনের জন্য মরুভূমি হইয়া যাইবে, এনির সুখসাধ অতল সলিলে নিক্ষিপ্ত হইবে। আপনার স্ত্রীপুত্র লইয়া যে আপনি সুখী হইবে সে পথও বন্ধ হইয়াছে। তখন সে প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহারা যেমন অন্ধকারে আছে তেমনি থাক; এনকের মৃত্যুর পর তাহারা একথা জানিতে পারিবে। কি উজ্জ্বল স্বার্থত্যাগ! আপনার স্ত্রীকে পরের স্ত্রী দেখিয়া, তাহাদেরই সুখের জন্য আপনার সুখরাশি বিসর্জ্জন দিয়া অন্ধকারে জীবন লয় করিতে কয় জন পারে? আপনার ধন পরের হাতে অর্পিত দেখিয়া কে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে? ফিলিপের গৃহের পশ্চাতে বসিয়া এনক প্রতিজ্ঞা করিল:—

"Not to tell her never to let her know."

তখনও ফিলিপের ভবনের জানালার লাল কাচ ভেদ করিয়া গৃহস্থিত উজ্জ্বল আলোক নিকটস্থ ভূমিতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

ফষ্টর-হস্তবিমুক্ত শৈবলিনীকে দেখিয়া প্রতাপের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, এনকের মনেও সেই ভাবের উদয় হইল। বরং তাহার হৃদয়ে অধিক ব্যথার সঞ্চার হইয়াছিল। কারণ, শৈবলিনী প্রতাপ হইতে মূলেই বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, কিন্তু এনক এনিকে লইয়া সংসার পাতিবার অবসর পাইয়াছিল। প্রতাপের সুখের আশায় ছাই পড়িল, কিন্তু এনকের সুখের ঘর ভাঙ্গিয়া গেল। প্রতাপের ন্যায় নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়া সেও প্রণয়-পরীক্ষা সমাপ্ত করিল। তাহার প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছিল।

দিন দিন এনকের স্বাস্থ্যাবনতি ঘটিতে লাগিল। অবশেষে একদিন শয্যাশায়ী হইল। মৃত্যুর দিন সমাগত দেখিয়া Miriam Lane কে ডাকিয়া সকল

কথা খুলিয়া বলিল। তারপর জগতে অক্ষয় নাম রাখিয়া, যথার্থ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া, অজেয় এনক অনন্তধামে প্রস্থান করিল।

প্রতাপ মরিল, এনকও মরিল। উভয়েরই মৃত্যুর উদ্দেশ্য এক। যাহাকে ভালবাসিয়াছে তাহার সুখের পথে কণ্টক হওয়া উভয়েরই নীতিবিরুদ্ধ। তাই প্রতাপ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া, অকালে পূর্ণ আশা বুকে লইয়া সমরক্ষেত্রে শয়ন করিল। এনক অজ্ঞাতে অন্ধকারে, দারুণ পিপাসা হৃদয়ে লইয়া অনন্তে মিলাইল।

পবিত্র হিন্দুর চোখে প্রতাপের দুই একটা ব্যবহার দূষণীয় বোধ হইবে। শৈবলিনী পরস্ত্রী। বিধর্ম্মীর হস্ত হইতে বিমুক্ত করিবার অধিকার প্রতাপের যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহার অজ্ঞাতে তাহার শয়নগৃহে চোরের ন্যায় প্রবেশ করাটা অনেকে অনুমোদন করিবেন না। প্রতাপ, শৈবলিনীকে আপনার দৃঢ়ভাব জ্ঞাপন করিবার জন্য উদ্ধতভাবে যে সকল কথোপকথন করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ কৃত্রিম।

এ ত্রুটীর জন্য প্রতাপকে দায়ী করা যায় না। ইহাও তাহার মহৎ চরিত্রের একাংশ। রূপসীকে বিবাহ করিয়া যদি প্রতাপ রীতিমত সংসারী হইত, যদি শৈবলিনীকে চিরদিনের মত ভুলিয়া যাইত, যদি শৈবলিনীর প্রণয় কেবলমাত্র বাল্যজীবনের সুখস্মৃতিতে পর্য্যবসিত হইত, তাহা হইলে প্রতাপকে আমরা কখনও দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে পারিতাম না। যাহাকে একদিন মাত্র ভালবাসিয়াছি, তাহাকে আর জীবনে ভুলিব না ইহাই প্রকৃত প্রেমিকের পরিচয়। যাহার সহিত একদিন মন খুলিয়া কথা কহিয়াছি, বহু বৎসর পরেও তাহার সহিত তেমনি ভাবে কথা কহিব ইহাই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা। শৈবলিনীকে ভুলিলে প্রতাপ পবিত্র ভালবাসার আদর্শস্থানীয় হইতে পারিত না। প্রতাপের মনুষ্যত্ব এইখানে।

যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহাকে দেখিবার জন্য চেষ্টা করে। প্রতাপ শৈবলিনীকে ভালবাসিত, অতএব সময় পাইয়া তাহাকে দেখিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারে নাই; ইহা প্রত্যেক মনুষ্যজীবনে সম্ভব। প্রতাপও মানুষ। প্রতাপ বুঝিত, নিজের হৃদয় দমন করিবার ক্ষমতা তাহার যথেষ্ট আছে, কিন্তু শৈবলিনী অবলা—ক্ষমতাবিহীনা, কোন্ দিন কি করিয়া বসে; তাই শৈবলিনী হইতে প্রতাপ বহুদূরে থাকিতে চেষ্টা করিল।

এনকের চরিত্র সাবধানে সমালোচনা করিতে হয়। তাহার চরিত্রে দোষ

দেওয়া কঠিন। সেও প্রতাপের ন্যায় গোপনে এনির সুখৈশ্বর্য্য দেখিয়াছিল, কিন্তু এনক নিজের বিবাহিতা পত্নীর দশা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। তাহার ভালবাসার সামগ্রীর কঠোর দরিদ্রজীবনের পরম সুখাগম সন্দর্শন করিয়াছিল।

এনক আর্ডেন সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, এনি ও ফিলিপ সম্বন্ধে দুই একটা কথা না বলিলে অবিচার করা হয়।

এনক আর্ডেন কাব্য মধ্যে দুই একটা ঘটনা আমাদের চোখে বিষবৎ প্রতীয়মান হয়। এনির দ্বিতীয় বিবাহ কোন্ হিন্দু সমীচীন বোধ করিবেন? কিন্তু আমরা যখন যে জাতির কাব্য পড়িব. তখন আমাদিগকে তাহাদেরই চোখে দেখিতে হইবে। এনকের বহুদিন অনুপস্থিতি হেতু এনি ও ফিলিপের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছিল যে, অবশ্যই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। বিধবার পুনঃপরিণয় ইংরাজ জাতির পক্ষে দূষণীয় নহে, বিশেষতঃ এনি সামান্য ধীবরপত্নী; উচ্চশিক্ষা তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কিন্তু এনকের সেই নিঃস্বার্থ প্রেম একেবারে ভুলিয়া যাওয়াটাই এনির পক্ষে নিতান্ত লজ্জাকর।

এনির অবস্থা বিশেষভাবে আলোচনা করিলে ঘৃণার পরিবর্ত্তে তাহার উপর একটা প্রবল সহানুভূতির উদয় হইবে। ফিলিপ এনির দেহমাত্র বিবাহ করিয়াছিল; মন পায় নাই। ফিলিপের সামান্য আদরেই এনকের সেই প্রাণস্পর্শী ভালবাসা তাহার মনে পড়িয়া যাইত। ফিলিপের প্রত্যেক কাজেই সে এনকের কোন না কোন চিহ্ন দেখিতে পাইত।

"But never merrily beat Annie's heart.
A footstep seemed to fall beside her path,
She knew not whence ; a whishper on her ear,
She khew not what ; nor loved she to be left
Alone at home, nor ventured out alone."

এনি যদি ফিলিপকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিত, তাহা হইলেও তাহার ন্যায়বিচার করা হইত না। সেও তাহার বাল্যসঙ্গী, সেও তাহাকে এনকের ন্যায়ই ভালবাসিত; বিপদের দিনে সেই তাহার একমাত্র ভরসাস্থল। পাছে এনি ব্যথা অনুভব করে, এই জন্য ফিলিপ তাহাকে উপঢৌকনের ছলে আহার্য্য পাঠাইত। এনকের অবর্ত্তমানে ফিলিপই তাহার সন্তানের পিতার স্থান অধিকার করিয়াছিল। ঘটনার পর ঘটনার বিপর্য্যয়ে এনি অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া

পড়িয়াছিল। একদিকে প্রবল কর্ত্তব্য জ্ঞান, অন্যদিকে প্রবল কৃতজ্ঞতা। এনি স্বভাবতই মৃদু প্রকৃতিবিশিষ্টা স্ত্রীলোক—ব্যবসায়ে কেমন করিয়া লাভ করিতে হয় তাহা পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে অজ্ঞাত—সে ফিলিপের নিকট কেবল বৃথা সময় প্রার্থনা করিতে লাগিল। ক্রমেই যখন ফিলিপ নিতান্ত ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িল, তখন একরূপ জ্ঞানহারা অবস্থায় তাহার দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কবি উভয় বিবাহ বর্ণনা করিতে এক ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন;—

"So these were wed and merrily rang the bells,
Merrily rang the bells and they were wed."

এই "Merrily" কথার মধ্যেই দুইটী অর্থ প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। সহজ চোখেই দেখিতে পাওয়া যায়, এনকের বিবাহের ঘণ্টাধ্বনিতে প্রাণ ছিল, কিন্তু এ ধ্বনি নিতান্ত প্রাণহীন। এনির প্রথম বিবাহ জীবিত অবস্থায় হইয়াছিল, শেষ বিবাহ মৃত অবস্থায় সম্পাদিত হইল।

শৈশব হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমরা প্রতাপ এবং এনককে দেখিলাম। উভয়েই অতুল চরিত্র সম্পন্ন। বাল্যে সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট, যৌবনের প্রারম্ভে উদ্যমশীল—অন্তে সমচরিত্র সম্পন্ন। একটী ফুল পূর্ব্বে ফুটিয়াছে, অপরটী পশ্চিমে ফুটিয়াছে; কিন্তু উভয়ের প্রভা কখনও বিলীন হইবে না—আতপতাপে কখনও পরিম্লান হইবে না। যুগের পর যুগ আসিবে, যাইবে, ফুল দুইটী তেমনি ফুটিয়া রহিবে। শত ঝঞ্ঝা প্রলয়-হুঙ্কারে মাথার উপর দিয়া ছুটিয়া যাইবে, ফুল দুইটী একটুমাত্র দুলিবে না। চিরদিন সমানভাবে দুই ভাষা-কাননকে সুবাসে মোহিত করিতে থাকিবে।

শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী।

নিয়তি

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অগ্নির সহিত প্রবল বাত্যার সম্মিলন হইল। অগ্নি সূর্য্যমল্ল, বাত্যা সারঙ্গ দেব। সারঙ্গ দেব কে? সারঙ্গদেব রাণা লক্ষসিংহের জনৈক বংশধর। সুতরাং চিতোর সিংহাসনের সমুজ্জ্বল কান্তি তাঁহার হৃদয়েও লালসার কালানল জ্বালাইয়া

দিয়াছিল। সে অনল নির্ব্বাণের আশায় তিনিও আসিয়া সূর্য্যমল্লের সহিত যোগ দিলেন। সন্ন্যাসিনীর ফুৎকারে যে অগ্নি এতদিন ধূমায়িত হইতেছিল, সারঙ্গদেবের সহায়তায় তাহা প্রচণ্ড ভাবে জ্বলিয়া উঠিল। সমগ্র চিতোর ভস্মীভূত না করিয়া সে অগ্নি বুঝি নির্ব্বাপিত হইবে না।

তৎকালে মোজাফর নামক জনৈক মুসলমান মালবে রাজত্ব করিতেছিলেন। সূর্য্যমল্ল ও সারঙ্গদেব তাঁহার নিকট গমন করিয়া চিতোর আক্রমণের জন্য সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মোজাফর দেখিলেন, যে অন্তর্বিপ্লবের ফলে ভারতে মহম্মদীয় সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আজি আবার চিতোরে সেই অন্তর্বিপ্লবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। চিতোর অধিকারের ইহাই স্বর্ণসুযোগ। মালবপতি এ সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না; তিনি সূর্য্যমল্ল ও সারঙ্গদেবের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া সতৃষ্ণনয়নে চিতোর সিংহাসনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আর বিজিগীষু সূর্য্যমল্ল তাঁহার প্রদত্ত সৈন্য লইয়া সানন্দে ভ্রাতার রক্তপানের জন্য —আত্মীয়-শোণিতে রাজপুতানার বক্ষ কর্দ্দমিত করিয়া তাহাতে ভাবী মোগল-পতাকা প্রোথিত করাইবার জন্য হিংস্রশার্দ্দূলবৎ প্রধাবিত হইলেন। হায়, অভাগিনী ভারতভূমি! বিজাতীয়ের শাণিত অসি সম্মুখে কখনও তুমি আপন উন্নত মস্তক নত করিলে না, কেবল গৃহবিপ্লবের প্রচণ্ড হুতাশনেই তোমার সর্ব্বস্ব পুড়িয়া ছারখার হইল!

সূর্য্যমল্ল প্রথমে মিবারের দক্ষিণ সীমা আক্রমণ করিলেন। সে আক্রমণে বিশেষ কোন বাধা পাইলেন না। সুতরাং তিনি অল্পায়াসেই একে একে সাদ্রি, বাটোরা এবং নায়ী ও নিমচের অন্তর্গত বিস্তৃত ভূভাগ হস্তগত করিলেন। এই বিজয়ে তাঁহার গর্ব্ব ও সাহস যেন আকাশ স্পর্শ করিল। তখন বিজয় হুঙ্কারে রাজপুতানার বক্ষ প্রকম্পিত করিতে করিতে চিতোর আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন।

বৃদ্ধ রাণা রায়মল্ল এ আক্রমণের সংবাদ পাইলেন। দুরাকাঙ্ক্ষ সূর্য্যমল্লের ব্যবহার দর্শনে ক্রোধে ক্ষোভে ঘৃণায় তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সূর্য্যমল্লের এই আক্রমণ প্রতিরোধার্থ মন্ত্রিবর্গ ও সর্দ্দারগণকে লইয়া এক পরামর্শ সভা আহ্বান করিলেন। সূর্য্যমল্ল উত্তম সুযোগ দর্শনেই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ অনুপস্থিত, অধিকাংশ সৈন্য তাঁহার সহিত গিয়াছে, অল্প সংখ্যক সৈন্যই চিতোরে রহিয়াছে। এ অবস্থায় বৃদ্ধ রাণা যে সহজে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিবেন তাহার সম্ভাবনা অল্প। মন্ত্রী ও সর্দ্দারগণও

ইহা বুঝিলেন। তাঁহারা মহারাণাকে পৃথ্বীরাজের প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কিন্তু রাণা দেখিলেন, সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে গেলে চিতোর সিংহাসন রক্ষা কঠিন হইয়া পড়িবে। তিনি সভামধ্যে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সর্দ্দারগণ অনেক চিন্তার পরও কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের কেহ কেহ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"চতুর সূর্য্যমল্ল উত্তম সুযোগ দেখিয়াই আক্রমণে সাহসী হইয়াছে।"

রাণার নয়নদ্বয় জলিয়া উঠিল। তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"সূর্য্যমল্ল ভুল বুঝিয়াছে। পৃথ্বীরাজ চিতোরে নাই, কিন্তু পৃথ্বীরাজের জন্মদাতা আছে। বৃদ্ধ রায়মল্ল জীবিত থাকিতে সূর্য্যমল্ল চিতোরে পদার্পণ করিতে পারিবে না।"

রাণার বার্দ্ধক্যপীড়িত মুখমণ্ডল যেন যুবজনোচিত বীরত্বগরিমায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; লোলচর্ম্ম দেহ বীরগর্ব্বে কম্পিত হইল; কোষস্থ অসি ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। সর্দ্দারগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। এমন সময় এক সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে সভাগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসিনী চারণীদেবীর মন্দিরের পরিচারিকা।

সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া সকলেই চমকিত হইলেন। রায়মল্ল ও সর্দ্দারগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসিনী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"মহারাণা, আমি সম্প্রতি এস্থান ত্যাগ করিব বলিয়া আপনার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

মহারাণা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন দেবি, আপনি এস্থান ত্যাগ করিবেন?"

সন্ন্যাসিনী উত্তর করিলেন,—"আমার কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়াছে।"

মহারাণা বলিলেন,—"আপনি কি কোন বিশেষ কার্য্যসাধনে ব্রতী ছিলেন?"

সন্ন্যাসিনী গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন,—"হাঁ।" তারপর তীব্রদৃষ্টিতে রায়মল্লের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মহারাণা! আমায় চিনিতে পারেন কি?"

মহারাণা বিস্ময়ের সহিত সন্ন্যাসিনীর মুখের দিকে চাহিলেন। তখন সন্ন্যাসিনী সর্দ্দারদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"সর্দ্দারগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ আমায় চিনিতে পার কি?"

সভাস্থ সকলেই বিস্মিত। সকলেরই বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি সন্ন্যাসিনীর মুখের উপর স্থাপিত। তখন গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর স্বরে সভাস্থল প্রকম্পিত করিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"মহারাণা! আমায় না চিনিতে পারেন, কিন্তু রাণা ক্ষেত্র সিংহের পুত্র চাচার নাম কখনও শুনিয়াছেন কি?"

রাণা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"চাচা! রাণা মকুলের হত্যাকারী চাচা!"*

সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"হাঁ, মকুলের হত্যাকারী চাচা। কিন্তু নরহত্যাকারী হইলেও তিনি আমার স্নেহময় পিতা।"

সভাস্থ সকলেরই মুখ হইতে বিস্ময়সূচক অস্ফুটধ্বনি বিনির্গত হইল। সন্ন্যাসিনী বলিতে লাগিলেন,—"শুনুন মহারাণা, শুন সর্দ্দারগণ, আমি সেই চাচার কন্যা। এখন কেন আমি সন্ন্যাসিনী শুনিবেন? আমি এতদিন কি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম শুনিবেন? প্রতিশোধ—পিতৃহত্যার প্রতিশোধ।"

সভাস্থ সকলেই নীরব, বিস্ময়ে অভিভূত। সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"একদা—তখন আমি বালিকা—একদা রাত্রিকালে রাতকোট দুর্গে পিতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া আমি সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম। সহসা নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া এক গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হইল। আমি ভয়ে পিতাকে জড়াইয়া ধরিলাম। পিতা আমার—"

সন্ন্যাসিনীর নয়নে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। অঞ্চলে নেত্রমার্জ্জনা করিয়া সন্ন্যাসিনী বলিতে লাগিলেন,—"পিতা আমার স্নেহপূর্ণ স্বরে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'ভয় নাই মা, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া সুখে নিদ্রা যাও; বর্ষার গম্ভীর মেঘধ্বনি হইতে এই শব্দ উত্থিত হইয়াছে।' কিন্তু পিতার কথা শেষ না হইতেই একদল সশস্ত্র দস্যু কৃতান্তের ন্যায় তথায় উপস্থিত হইল। তারপর তাহারা কাপুরুষের ন্যায় অস্ত্রাঘাতে শয্যাশায়িত নিরস্ত্র পিতাকে হত্যা করিল। সে দস্যু কে? মহারাণা! সে দস্যু আপনারই পিতা কুম্ভ।"

রায়মল্ল শিহরিয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"সেই দিন হইতে—সেই বালিকা বয়স হইতে আমি এই নৃশংস পিতৃহত্যার প্রতিশোধের জন্য সন্ন্যাসিনী সাজিলাম। রাঠোর বংশের সর্ব্বনাশ সাধনই

* সূত্রধর জাতীয়া এক পরিচারিকার গর্ভে রাণা ক্ষেত্রসিংহের চাচা ও মৈর নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ক্ষেত্রসিংহের পৌত্র মকুল রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ইহাদিগকে সাতশত অশ্বারোহীর অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কোন কারণে রাজা মকুল ইহাদিগকে এক সময়ে অপমানিত করিলে ইহারা ক্রুদ্ধ হইয়া পূজাকালে ধ্যানমগ্ন মকুলকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। অতঃপর ইহারা পলায়ন করিয়া রাতকোট দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মকুলের পুত্র কুম্ভ একদা রজনীযোগে গোপনে সেই দুর্গে প্রবেশপূর্ব্বক শয্যাশায়ী চাচা ও মৈরকে অস্ত্রাঘাতে নিহত করিয়াছিলেন। (রাজস্থান)

আমার জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিলাম। পিতৃ-আশীর্ব্বাদে আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে, ব্রত উদ্যাপিত হইয়াছে, রাঠোর বংশের মধ্যে নিদারুণ গৃহবিগ্রহানল প্রজ্বলিত হইয়া তাহাকে ধ্বংসের জন্য আহ্বান করিতেছে। আমারই চক্রান্তে আপনার পুত্রগণের হৃদয় ভ্রাতৃবিদ্বেষ-বিষে জর্জ্জরিত হইয়াছে, আমারই পরামর্শে সূর্য্যমল্ল বিদ্রোহী হইয়াছে, আমারই চেষ্টায় আজি রাঠোর বংশের উত্তপ্ত শোণিতে ধরণী রঞ্জিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু সে পাপ দৃশ্য আর আমি দেখিতে চাহি না, আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। মহারাণা, বিদায়।"

সগর্ব্ব পদক্ষেপে সভাস্থল কম্পিত করিয়া সন্ন্যাসিনী চলিয়া গেলেন। সভাস্থ সকলে চিত্রপুত্তলিকাবৎ নীরবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

এমন সময়ে জনৈক দূত আসিয়া সংবাদ দিল, সূর্য্যমল্ল গাম্ভীরী নদীর পরপারে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন। রাণা সর্দ্দারগণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার জন্য আদেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া রায়মল্ল ত্বরিত গতিতে গাম্ভিরী নদীতীরে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া সূর্য্যমল্লের আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরপারে সূর্য্যমল্লের শিবির। মধ্যে নদী ব্যবধান। নদী সঙ্কীর্ণকায়া, অগভীরা, কিন্তু স্রোতঃশালিনী। পর্ব্বতনিঃসৃতা সলিলধারা প্রবল বেগে ছুটিয়াছে, শৈলগাত্র ভেদ করিয়া, উপলখণ্ড হইতে উপলখণ্ডে আছাড়িয়া পড়িয়া উন্মাদিনীর মত নাচিতে নাচিতে নদী উদ্দামগতিতে চলিয়াছে; কে জানে কবে কোথায় তাহার এই উন্মাদগতির শেষ। নদী যে অনন্তাভিসারিণী।

নদী পার হইয়া আক্রমণ করা সূর্য্যমল্লের পক্ষে সহজ হইল না; তাঁহাকে সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইল। কিন্তু সুযোগ সহজে মিলিল না, নদীবেগের হ্রাস হইল না। সূর্য্যমল্ল অধীর হইয়া পড়িলেন। রায়মল্লের সৈন্য সংখ্যা অল্প, উপযুক্ত সেনানীরও অভাব। এ সময়ে আক্রমণ করিতে পারিলে বিজয় নিশ্চিত। সূর্য্যমল্ল নদী পার হইয়া আক্রমণ করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। কিন্তু সারঙ্গদেব তাঁহাকে নিষেধ করিলেন; বলিলেন,—"কেন বৃথা সৈন্যগুলাকে গাম্ভিরীর খর স্রোতে ভাসাইয়া দিবে?" সূর্য্যমল্ল বলিলেন,—"তা' ছাড়া উপায় কি?" সারঙ্গদেব বলিলেন,—"বর্ষার জলপ্রবাহে নদীর বেগ বর্দ্ধিত হইয়াছে, দুই একদিন অপেক্ষা কর, বেগ কমিয়া যাইবে।"

সূর্য্যমল্ল বলিলেন,—"কিন্তু দুই এক দিনে বেগ যদি না কমে?"

সা। আরও দুই দিন অপেক্ষা করিব।

সূ। তখনও যদি বেগ সমান থাকে?

সা। তখন অন্য উপায় দেখিব।

সূ। এতদিনে হয়তো পৃথ্বীরাজ আসিয়া আমাদিগকেই আক্রমণ করিবে।

সা। আমরাও প্রতি-আক্রমণে বিরত থাকিব না।

সূ। কিন্তু তখন জয়াশা কি সুদূরপরাহত হইবে না?

সারঙ্গদেব ঈষৎ হাসিলেন; বলিলেন,—"পৃথ্বীরাজকে যদি এমনই একটা অসাধারণ বীর বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে এ উদ্যম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। কেননা, রায়মল্লের সহিত যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ নহে।"

সূর্য্যমল্ল গর্ব্বিতকণ্ঠে বলিলেন,—"পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ নহি, কিন্তু জয়ের আশায় সন্দিহান।"

সারঙ্গদেব কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আর বলা হইল না। এক কৃষ্ণকায় যুবক আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। উভয়েই একটু বিস্মিতদৃষ্টিতে যুবকের দিকে চাহিলেন। কিন্তু যুবক সে দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিল,—"আপনারা নদী পার হ'তে ইচ্ছা করেন?"

সূর্য্যমল্ল বলিলেন,—"কি উপায়ে পার হইব?"

যু। আমার সঙ্গে আসুন, দেখাইয়া দিব।

সূ। তুমি যে আমাদের সৈন্যদিগকে ভুলাইয়া নদীগর্ভে ডুবাইয়া দিবে না তাহার প্রমাণ কি?

যু। প্রমাণ আমার কথা।

সূ। তুমি অপরিচিত, তোমার কথায় বিশ্বাস কি?

সদম্ভে যুবক বলিল,—"মীনেরা রাজপুতদের মত বিশ্বাসঘাতক নহে।"

সারঙ্গদেবের ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত হইল। সূর্য্যমল্ল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি মীন জাতি?"

যু। হাঁ।

সূ। তোমার নাম কি?

যু। সাহু।

সূ। তোমার উদ্দেশ্য কি?

যু। আমার উদ্দেশ্য—আপনাদের শত্রুনিপাত।

সূ। আমাদের শত্রুনিপাতে তোমার স্বার্থ কি?

যু। আপনাদের শত্রু আমারও শত্রু।

সূ। সে কে? রায়মল্ল?

যু। না, পৃথ্বীরাজ।

সূ। পৃথ্বীরাজের সহিত তোমার শত্রুতা কেন?

যু। সে আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে।

যুবকের—সাহুর নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, মুহূর্ত্তের জন্য দেহ কাঁপিয়া উঠিল। হস্তস্থিত বর্শা সবলে ভূমিতে আঘাত করিয়া সাহু বলিল,—"এখন আপনারা যাইতে সম্মত কি না?"

সূ। যদি অসম্মত হই?

সাহু। আমি চলিলাম।

সূ। কোথায় যাইবে?

সাহু। অন্য উপায় দেখিতে।

সূ। তুমি শত্রুর গুপ্তচর; আমরা তোমায় বন্দী করিব।

ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া তীব্রকণ্ঠে সাহু বলিল,—"আপনারা কখনও মীন জাতিকে দেখেন নাই।"

সূর্য্যমল্ল বলিলেন,—"তোমারই মত আকৃতির আর একটী বালককে দেখিয়াছি, কিন্তু সে মীন কি না জানি না।"

ব্যগ্রকণ্ঠে সাহু বলিল,—"কোথায় দেখেছেন?"

সূর্য্যমল্ল বলিলেন,—পৃথ্বীরাজের সঙ্গে।"

সাহু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"তা' হ'লে আপনাদের বিশ্বাস, আমি শত্রুর গুপ্তচর।"

সূর্য্যমল্ল বলিলেন,—"না। নদীপারের কি উপায় আছে দেখাইবে চল।"

সূর্য্যমল্লকে সঙ্গে লইয়া সাহু চলিল। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া উভয়ে একটা পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইল। পাহাড়টী ক্ষুদ্র, তাহার পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া নদী প্রবাহিত। সেখানে নদীর আয়তন আরও সঙ্কীর্ণ, কিন্তু স্রোত আরও প্রবল। পাহাড়টী এরূপভাবে অবস্থিত যে, তাহাতে আরোহণ করিয়া অপর পার্শ্ব দিয়া অবতরণ করিলে নদীর অত্যল্পভাগই অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু পাহাড়টী ক্ষুদ্র হইলেও দুরারোহ, এবং নদীও অপেক্ষাকৃত গভীর। সাহু বলিল,—"এই পাহাড় কাটিয়া উঠিবার একটা পথ করিতে হইবে, আর বড় বড় পাথর ফেলিয়া নদীর গভীরতা কমাইয়া দিতে হইবে।"

তাহাই হইল। শত শত লোক আসিয়া পাহাড় কাটিতে আরম্ভ করিল। অল্প সময়ের মধ্যেই পাহাড়ে উঠিবার একটী সঙ্কীর্ণ পথ প্রস্তুত হইল। তারপর বড় বড় পাথর আনিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা হইল। ইহাতে নদীর গভীরতা অনেক কমিয়া গেল, তবে স্রোতের বেগটা একটু বাড়িল। কিন্তু স্রোত অধিক হইলেও জলের গভীরতা কমিয়া যাওয়ায় নদী অতিক্রম করা দুষ্কর হইল না। তখন অল্পে অল্পে সেই স্থানে সৈন্যগণ সমবেত হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পূর্ব্বশিবিরের পট্টাবাস যেমন তেমনই রহিল। পাছে বিপক্ষেরা সন্দেহ করে, এই জন্য তথায় অল্পসংখ্যক সৈন্যও রাখা হইল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ধরণী আচ্ছন্ন হইলে সূর্য্যমল্ল সৈন্যগণকে নদীপার হইবার আদেশ দিলেন। সৈন্যগণ পাহাড় অতিক্রম করিয়া অতি সন্তর্পণে নদী পার হইতে লাগিল। সাহু, সূর্য্যমল্ল এবং সারঙ্গদেব পাহাড়ের মাথার উপর দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে লাগিলেন।

সহসা নদীর পরপারের দিকে সাহুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। দৃষ্টিমাত্র সাহু ধনুকে তীর যোজনা করিয়া সেই দিকে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু জানি না কি কারণে সাহুর অব্যর্থ লক্ষ্যও ব্যর্থ হইল। তখন সে দন্তে অধর দংশন করিয়া আবার তীর ছুড়িল। কিন্তু এবারেও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল। সূর্য্যমল্ল বলিলেন,—"ওকি, তীর ছুড়িতেছ কেন?"

ব্যগ্রস্বরে সাহু বলিল,—"সর্ব্বনাশ হইল, ঐ সেই মীন বালক পলাইতেছে।"

সূর্য্যমল্ল দেখিলেন, বালক পৃথ্বীরাজের অনুচর। উহাকেই লক্ষ্য করিয়া সাহু তীর নিক্ষেপ করিয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তীর তাহার গাত্রস্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি বুঝিলেন, রায়মল্লকে সংবাদ দিবার জন্যই বালক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। তখন তিনি সেই বালককে ধরিবার জন্য পরপারস্থ সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন। কিন্তু বালক তখন বায়ুগতি হরিণের ন্যায় ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। সাহু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিল, "হায় ভালবাসা!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যমুনা গাহিতেছিল,—

শুন শুন ওহে পরাণ পিয়া।
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগ
আর না দিব ছাড়িয়া

তখন অষ্টমীর আধচন্দ্র মধ্যগগনে বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, প্রফুল্ল চন্দ্র-কিরণ গায়ে মাখিয়া মল্লিকা মালতী বেলা বিবশা যুবতীর ন্যায় আবেশে লুটাইয়া পড়িতেছিল, দূরে জ্যোৎস্না-প্লাবিত পর্ব্বতশৃঙ্গে বসিয়া একটা বিরহী পক্ষী জ্যোৎস্নাসাগর মথিত করিয়া বিরহের আকুল-সঙ্গীত গাহিতেছিল, মৃদুবায়ুপ্রবাহে তাহার ক্ষীণপ্রতিধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। আর চন্দ্রকরস্নাত উদ্যানমধ্যে মৃদুতরঙ্গভঙ্গচঞ্চল স্বচ্ছ বাপীতীরে দাঁড়াইয়া, তারার চিবুক ধরিয়া যমুনা গাহি-তেছিল,—

তোমায় আমায় একই পরাণ,
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হৈতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি॥
যে ছিল আমার মরমের দুখ,
সকলি করিনু ভোগ।
আর না করিব আঁখির আড়,
রহিব একই যোগ॥

ঈষৎ হাসিয়া তারা বলিল,—"মর্ পোড়ারমুখি, বুড়া বয়সেও রঙ্গ গেল না।"

যমুনা গাহিল,—

খাইতে শুইতে তিলেক পলকে
আর না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে,
আর কি কাহাকে ডর॥ *

তারা বলিল,—"তোর গানের মুখে আগুন, কলঙ্কে যার খ্যাতি তার কথা আমি শুন্‌তে চাই না।"

"তবে অন্য গান গাই" বলিয়া যমুনা গাহিল,—

"ওরে কালা ভ্রমরা তোমার মুখে নাহি লাজ।
যাও তুমি মধুপুরী যথা নিদারুণ হরি,
আমার মন্দিরে কিবা কাজ।

হাসিতে হাসিতে যমুনার মুখ চাপিয়া ধরিয়া তারা বলিল,—"চুপ।"

---

* জ্ঞানদাস।

মুখ হইতে হাত সরাইয়া দিয়া যমুনা বলিল,—"শ্যামের ভয়ে নাকি ?" যমুনা গাহিতে লাগিল,—

মথুরায় কর বাস থাকহ শ্যামের পাশ,
চূড়ার ফুলের মধু খাও।
সেথা ছাড়ি এথা কেনে দুঃখ দিতে মোর প্রাণে,
মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাও॥"

সহসা গান ছাড়িয়া যমুনা পলায়নোদ্যতা হইল; তারা তাহার অঞ্চল চাপিয়া ধরিল। অদূরে পুষ্পবৃক্ষের অন্তরাল হইতে এক ব্যক্তি বাহির হইয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইল। যমুনা লজ্জায় মুখ ফিরাইল। যিনি আসিলেন, তিনি পৃথ্বীরাজ। পৃথ্বীরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গান থামিল কেন যমুনা ?"

যমুনা মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর করিল,—"আপনাকে দেখিয়া।"

ঈষৎ হাসিয়া পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"কেন, আমাকে দেখিলে কি তোমার গানের তাল ভঙ্গ হইয়া যায় ?"

যমুনা বলিল,—"আপনার শুভাগমনে তাল মান সকলই ছুটিয়া পলায়। সত্য মিথ্যা সখিকে জিজ্ঞাসা করুন।"

পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"তুমি খুব বাক্‌চতুরা।"

য। আপনি যেমন খুব বীর পুরুষ।

পৃ। বীরপুরুষ বলিয়াই বুঝি আমার উপর বাছিয়া বাছিয়া শর নিক্ষেপ কর ?

য। সে শর আপনার নিকট কুসুমশর অপেক্ষাও সুকোমল।

পৃ। বাস্তবিক যমুনা, তোমার নিক্ষিপ্ত শর কুসুমশর অপেক্ষাও সুকোমল বলিয়া বোধ হয়।

য। তবে এখন হইতে দুই চারিটা তীক্ষ্ণ শর সন্ধান করিব কি ?

পৃ। তোমার জিহ্বা-তূণীরে তীক্ষ্ণশরও আছে না কি ?

য। তূণে সকল রকম অস্ত্রই থাকে। খুঁজিয়া দেখিলে বরুণাস্ত্রের সঙ্গে দুই একটা ব্রহ্মাস্ত্রও যে না মিলিতে পারে এমন নয়।

পৃ। কিন্তু আমি তো জানিতাম, বরুণাস্ত্রই তোমাদের প্রধান সম্বল।

য। আপনারা অন্য অস্ত্র সহ্য করিতে অক্ষম বলিয়াই আমরা এই অস্ত্রটা সর্ব্বদা ব্যবহার করি।

পৃথ্বীরাজ হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—"তুমি যখন ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহারেও অভ্যস্ত, তখন আমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইলে কেন ?"

যমুনা বলিল,—"সে কথা সখিকে জিজ্ঞাসা করুন।"

একটা সুকোমল চপেটাঘাত যমুনার পৃষ্ঠে পড়িল। যমুনা চাপা হাসি হাসিয়া বলিল,—"দেখুন বীরবর, আপনার সাক্ষাতেই এটা কোন্ জাতীয় অস্ত্র ছুটিল।"

ভ্রুভঙ্গী করিয়া তারা বলিল,—"রহ পোড়ারমুখি, তোমার জন্য এবার নিপাত অস্ত্রের সন্ধান করিতেছি।"

যমুনা বলিল,—"সে অস্ত্র তো অনেক ক্ষণ পূর্ব্বে সন্ধান করা হয়েছে।"

তা। কখন হ'ল ?

য। যখন হ'তে ব্রজের মায়া কাটিয়ে, যমুনাকে বিরহ-যমুনায় ভাসিয়ে দিয়ে ব্রজরাজ শ্রীমতীর সহিত মথুরাযাত্রার প্রস্তাব করেছেন।

যমুনার অধরে হাসি, নয়নে অশ্রু। সে অশ্রু দর্শনে তারার নেত্রও শুষ্ক রহিল না। সে উভয় হস্তে যমুনার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু কম্পিত স্বরে ডাকিল,—"যমুনা !"

রুদ্ধকণ্ঠে যমুনা উত্তর করিল,—"রাজকুমারি !"

তখন উভয়ে উভয়ের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া উভয়ের বুকে মুখ রাখিল ; উভয়ের নীরব অশ্রুধারায় উভয়ের বক্ষ সিক্ত হইতে লাগিল। পৃথ্বীরাজ সজল দৃষ্টিতে এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভাবিলেন,—"হায় রে, কোন্ বিধাতা সংসার-মরু-ভূমিতে এমন স্নেহের মধুর উৎস—এমন প্রেমের অপার সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছিল !"

ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নিশীথচিন্তা।

(মৃত্যুর প্রতি)

(১) ওহে মৃত্যু মহাকাল চরমের গতি,
অনন্ত জগতে তুমি, জীবের নিয়তি।
তোমার নামেতে হয়, হৃদয় কম্পিত,
তোমার মহিমা সর্ব্ব জগতে বিদিত॥

(২) হরিয়াছ তুমি মোর প্রিয় পরিজন,—
পিতা, পুত্র—প্রেমময়ী বনিতা রতন।
মুহূর্ত্তের মধ্যে সব করিলে বিনাশ,
অতৃপ্ত পিপাসু—যেন নাহি মিটে আশ॥

(৩) এখন (ও) বাসনা যদি থাকে তব মনে,
লও হে আমারে কাল। তোমার চরণে।
না পারি সহিতে আর এ সব যাতনা;
পূরাও দাসের এই মনের কামনা॥

(৪) জানি হে নিঠুর, আমি, স্বভাব তোমার,
অসময়ে হর' তুমি নারী-কণ্ঠ-হার।
অকূলে ভাসাও তারে অনাথা করিয়ে,—
কিম্বা অঙ্ক হ'তে তার পুত্রধনে নিয়ে॥

(৫) তোমার পৌরুষে ধিক—অধিক গৌরবে,
রবি, শশী, গ্রহ, তারা যতদিন রবে;
তব নামে এ কলঙ্ক রবে চিরদিন।
যতকাল ভবে জীব তোমার অধীন॥

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

সমালোচনা।

——(ঃ০ঃ)——

হিন্দু সখা।—দ্বৈমাসিক পত্র। হুগলী, কৈকালা হইতে প্রকাশিত। শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র বি, এ, সম্পাদিত।

আমরা ইহার ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে ধর্ম্ম, সমাজ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা এবং নূতন ও পুরাতন বিবিধ গ্রন্থ প্রচার হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাত বিষয়গুলির কতক কতক অল্পে অল্পে প্রকাশিতও হইয়াছে। তবে তাহার মধ্যে ধর্ম্ম ও পদ্যই অধিকাংশ। শেষভাগে পৃথক্‌রূপে সুকবি জয়দেবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'গীতগোবিন্দ' বঙ্গভাষায় পদ্যানুবাদ সহ প্রকাশিত হইতেছে। চেষ্টা অতীব মহৎ ও প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, তবে অনুবাদ পদ্যে না হইয়া গদ্যে হইলেই ভাল হইত। বাঙ্গালায় পদ্যে জয়দেবের মধুর পদাবলীর অনুবাদ বা অনুকরণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এই দ্বৈমাসিক পত্রে দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশযোগ্য বাজে সংবাদগুলি দিয়া কাগজের কলেবর কেন পূর্ণ করা হয় বুঝিলাম না। যাহা হউক, আমরা ইহার প্রথম সন্দর্শনে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আবরণী পৃষ্ঠায় সহকারী সম্পাদক মহাশয়ের পঙ্‌ক্তিত্রয়ব্যাপী সুদীর্ঘ বিশেষণাবলী সন্দর্শনে বোধ হয় অনেকেই হাস্য সংবরণে অক্ষম হইবেন।

'রাখী'-উৎসবে।

প্রাণে প্রাণে হলো আজি 'রাখী'র বন্ধন,
নব বাঙ্গালার নব সন্তাননিকর!
এস হর্ষে, লয়ে ফুল্ল পবিত্র অন্তর—
স্বাগত মাহেন্দ্র-লগ্নে—মহাশুভক্ষণ!

আট কোটি হৃদি-পদ্ম উঠুক ফুটিয়া
একই মহান্ লক্ষ্যে জননী পূজায়,—
নাহি কোন রুদ্র-শক্তি বিপুল ধরায়
সে অর্চ্চনা করে ব্যর্থ গরবে ভুলিয়া!

দর্পিত-মসীর কৃষ্ণ-কলঙ্ক-রেখায়
বিধি-দত্ত অধিকার হয় নি খণ্ডন,—
সেত এল জাগাইতে সুষুপ্ত-জীবন
শাশ্বত মঙ্গল-বার্ত্তা বিঘোষিয়া হায়!

ত্যজি সর্ব্ব ক্ষুদ্রত্বের তুচ্ছ অভিমান,
হোক্ তবে শর্ব্বরীর চির-অবসান!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

শিখগুরু।

—— ০:*০: ——

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হর কিষণ।

রাম রায় পিতার প্রতিনিধিস্বরূপ দিল্লী রাজসভায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। আজকাল ধনী লোকদের ছেলেরা বিদেশী রাজপুরুষদিগের সঙ্গ পাইলেই যেমন তাহাদের মাথা বিগড়াইয়া যায়, তাহারা না—স্বদেশী না—বিদেশী এক কিম্ভূত কিমাকার জন্তুবিশেষ হইয়া থাকে ও সম্ভব হইলে দেশের অহিতাচরণেও সঙ্কুচিত হয় না, মোগল সংসর্গে রাম রায়েরও পতন তেমনি যতদূর সম্ভব হইয়াছিল। তিনি একটি প্রকাণ্ড বিভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহার পরিচয় আমরা পরে পাইব।

হর রায়ের দুই পুত্র—রাম রায়, বয়স পঞ্চদশ বর্ষ, ও হরকিষণ, বয়স প্রায় ছয় বৎসর (১)। রাম রায় হর রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র হইলেও তাঁহার মাতা নিম্ন শ্রেণীর মহিষী ছিলেন—হরকিষণের মায়ের সমকক্ষ ছিলেন না (২)। কাজেই হরকিষণই গুরুপদের যথার্থ অধিকারী হওয়ায় হর রায় তাঁহাকেই গুরুপদ দিতে বলিয়া যান।

হর রায়ের মৃত্যুর পর শিখেরা বালক হরকিষণকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করিল। এ সংবাদ পাইয়া রাম রায় আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখন দিল্লীতে ছিলেন। তিনি সম্রাটকে বলিলেন—"আমি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র, কাজেই আমিই গুরুপদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারী। হরকিষণ কি বলিয়া তাহা অধিকার করে? আপনার ক্রোধশান্তির জন্যই আমি ঘর ছাড়িয়া আপনার নিকট আসিয়াছিলাম। আমি আপনার দাস। আমার প্রার্থনা যে, আপনি হরকিষণকে এখানে ডাকিয়া পাঠান, সে আসিলে আমি আমার অধিকার আপনার সমক্ষে তাহার নিকট দাবী করিব।" (৩) ছিদ্রান্বেষী সম্রাটও তাঁহার

---

(১)। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে হরকিষণের জন্ম হয়।

(২) রাম রায়ের গুরুপদ অপ্রাপ্তির ইহাই একমাত্র কারণ নয়। আর একটি কারণ এই—পঞ্জাবে যাদুবিদ্যার বহুল প্রচলন। কিন্তু শিখগুরুরা তৎপ্রতি বড়ই বীতশ্রদ্ধ। রাম রায় শিখদের এই সনাতন প্রথা ভঙ্গ করিয়া যাদুবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। এ জন্যও তিনি হর রায়ের বিষদৃষ্টিতে পড়েন।

(৩) M' Gregor.

প্রার্থনানুসারে হরকিষণের নিকট আদেশ পত্র পাঠাইলেন—অবিলম্বে দিল্লীতে উপস্থিত হও। এই আদেশ পাইয়া গুরু অত্যন্ত ভীত হইলেন, বলিলেন—'অভাগা আমি, বসন্ত রোগগ্রস্ত হইয়া মরাই কি আমার ভাগ্য লিপি!' অনেকক্ষণ ব্যস্তভাবে পাদচারণার পর সম্রাটের আদেশ পালনই ঠিক করিলেন। এই সময় দিল্লীতে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

দিল্লীতে যাইলে সম্রাট তাঁহারই অনুকূলে বিচার করেন। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প শুনা যায়। সম্রাটের অন্তঃপুরবাসিনীদের এক সাজে সাজাইয়া একত্র দাঁড় করাইয়া সম্রাট হরকে বলিলেন—সম্রাজ্ঞীকে বাহির কর। বালক রমণীদিগের মধ্য হইতে সম্রাজ্ঞীকে চিনিতে পারায় সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করেন (১)। কিন্তু অধিক দিন গুরুপদে অধিষ্ঠিত থাকা হর কিষণের ভাগ্যে নাই। দিল্লীতে অবস্থান কালেই তিনি বসন্ত রোগগ্রস্ত হন ও তথায় দেহ ত্যাগ করেন। দিল্লীতেই তাঁহার সৎকার হয়। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মার্চ্চ এই ঘটনা ঘটে। দুই বৎসর পাঁচ মাস পাঁচ দিন মাত্র তিনি গুরু ছিলেন। দিল্লীতেই হরকিষণের সমাধি মন্দির স্থাপিত হয়।

হরকিষণের মৃত্যুর পর রাম রায় আবার গুরুপদ পাইবার জন্য চেষ্টা করেন; কিন্তু সেবারেও কৃতকার্য্য হন নাই। হর রায়ের দ্বিতীয় পুত্র তেগ বাহাদুরই গুরু হন। রাম রায় (২) ইহাতে তেগের সহিত কিরূপ ভীষণ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পরে দেখিব।

(১) এটি কানিংহামের ইতিহাসে দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, নির্ব্বাচন ভার ঔরঙ্গজেব নিজে না লইয়া শিখদিগকেই দিয়াছিলেন। তবে হরকিষণ যে দিল্লীতে দেহত্যাগ করেন, ইহা সত্য। তাহাতেই মনে হয়, ঔরঙ্গজেবই নিজে নির্ব্বাচন ভার লইয়াছিলেন।

(২) রাম রায় দ্বিতীয়বার বিফল-প্রয়াস হইলে নিজেই আর একটি সম্প্রদায় সংঘটনে ইচ্ছুক হইয়া দেরাদুনে গিয়া বাস করেন। তিনি স্বীয় অনুচরদিগকে শিক্ষা দেন যে, তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহারও নিকট যেন তাহারা মস্তক অবনত না করে ও তাঁহাকে ব্যতীত আর কোন দেবদেবীর পূজা না করে। রাম রায়ের অনুচরেরা রামরায়ী নামে পরিচিত। রাম রায় গোবিন্দ সিংহের সময় পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই গুরুদের কার্য্যে বাধা দিতেন, তাঁহাদিগকে বিপদে ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। এজন্য শেষে গোবিন্দ সিংহ তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরগণকে শিখ-সমাজ হইতে চ্যুত করেন। cf. Triumpp's Adi Granth.

নবম পরিচ্ছেদ।

তেগ বাহাদুর।

হরগোবিন্দ, হররায়কে উত্তরাধিকারী মনোনীত করায় তেগ বাহাদুরের জননী কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হন। তিনি মনে করিলেন, স্বামীর এ কার্য্য নিতান্তই ধর্ম্ম-বিগর্হিত। তাই হরগোবিন্দ স্ত্রীর প্রীতি সম্পাদনার্থ বলিলেন—'তেগ সিংহাসন পাইবেই; তবে এখন কিঞ্চিৎ শান্ত হও। আমার অস্ত্র নিজের জিম্মায় রাখ। তেগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহাকে এগুলি দিও।' (১)

তারপর অষ্টম গুরু হরকিষণ যখন দিল্লী সহরে দেহত্যাগ করেন, তখন শিখেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—কোন্ ব্যক্তি অতঃপর গুরুপদ পাইবেন? তাহাতে তিনি বলেন—'বাবা বাকালাই অতঃপর গুরু হইবেন।'

বাকালা একটি গ্রামের নাম। ইহা বিপাসা নদীর তীরে ও গোবিন্দ বালের সন্নিকটে অবস্থিত। হরগোবিন্দ পর্ব্বতে গমন কালে এখানে অনেক গুলি অনুচর ও আত্মীয়কে রাখিয়া যান। সেই অবধি তেগ বাহাদুরের মাতাও এখানে বাস করিতেছিলেন।

হরকিষণের মৃত্যুসংবাদ চারিদিকে বিঘোষিত হইবামাত্র, দিল্লীতে রাম রায় ও বাকালার প্রত্যেক গোড়াই গুরুপদ অধিকারের জন্য যত্নপর হইলেন। কিন্তু তেগ বাহাদুর সর্ব্বদাই শান্তিপ্রিয়; তিনি আপনাকে সাধারণে প্রকাশিত করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। তিনি সর্ব্বদাই গুপ্তভাবে থাকিতেন; কাহারও সহিত বড় দেখা সাক্ষাৎ করিতেন না। এখনও—গুরুর মৃত্যুতে যে এক 'হৈ চৈ' পড়িল ইহাতেও তিনি কোনরূপ যোগ দিলেন না; এসব পার্থিব বিষয়ে যেন তাঁহার কোন লক্ষ্যই নাই।

বিধাতার বিচিত্র বিধান বুঝা বড়ই কঠিন। যাঁহারা গুরুপদের জন্য লালায়িত তাঁহারা সকলেই ভগ্নমনোরথ হইলেন; আর যিনি আপনাকে গুরু বলিয়া কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই, সেই নরোত্তম তেগ বাহাদুরই অবশেষে গুরু হইলেন। মাখন সাহ প্রমুখ শিখগণ জোর করিয়া তেগকে গুরুর তক্তায় বসাইলেন। তেগ কিছুতেই বসিবেন না। তিনি কত আপত্তি করিলেন; কিন্তু কেহই সে কথা শুনিল না। তেগ গুরু হইলেন। তেগজননীর আশা এত দিনে পূর্ণ হইল।

(১) M' Gregor's History of the Sikhs.

তেগ গুরু হইলে, গুরু-জননী স্বামিপ্রদত্ত সযত্নরক্ষিত অস্ত্রগুলি আনিয়া তেগকে সাজাইয়া দিলেন। সংসার-বিমুখ তেগ হাসিয়া কহিলেন—"তোমরা ভুল বুঝিয়াছ, কাহাকে ধরিতে কাহাকে ধরিয়াছ। আমার নাম ত' তেগ বাহাদুর নয়—ডেগ বাহাদুর।" অর্থাৎ আমি যোদ্ধা নহি, আহার-সংস্থাতা। (তেগ=অসি; ডেগ=রন্ধনপাত্র)। তেগের এ রহস্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। (১)

তেগ বাহাদুর বেশ যত্নের সহিত শিষ্যগণকে পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। অল্পদিন মধ্যে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়া উঠিল। তাঁহার প্রতাপ বর্দ্ধনে সোড়ীগণের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। তাহারা তাঁহার আন্তরিক শত্রু হইয়া দাঁড়াইল, ও নানারূপে তাঁহার অহিত করিবার চেষ্টায় রহিল। তাহাদের এ ব্যবহার তেগের অসহ্য হইল। তিনি বাকালা হইতে তাহাদিগকে দূর করিয়া দিতে মনস্থ করিলেন। মাখন শাহ সর্ব্বদাই দিল্লীতে বাস করিতেন। গুরুর অভিপ্রায় শীঘ্রই তাঁহার শ্রুতি-গোচর হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ দিল্লী ত্যাগ করিয়া বাকালায় উপস্থিত হইয়া গুরুর মন ফিরাইবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিলেন। বলিলেন—এরূপ করিলে, অনেক শিখই ক্ষেপিয়া যাইতে পারে; তাহাতে ফল বিষময় হইয়া দাঁড়াইবে।

মাখনের কোন যুক্তিই গুরুর নিকট টিকিল না। গুরু বাকালাকে সোড়ীশূন্য করিতে বদ্ধপরিকর। যখন মাখন একেবারে ধরিয়া পড়িলেন, তখন গুরু বলিলেন,—'সোড়ীদের হাত হইতে আমাকে যেরূপেই হউক, উদ্ধার পাইতে হইবে। উহারা আমার ভয়ানক শত্রু। যত শীঘ্র উহাদের সঙ্গ ত্যাগ করি,

(১) তেগের গুরুপদপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নানারূপ গল্প শুনা যায়। কানিংহামের ইতিহাসে এই গল্পটি দেখা যায়:—মাখন শাহ বাকালায় আসিলে হর গোবিন্দের আত্মীয়েরা সকলেই গুরুপদ চাহেন। ইহাতে তিনি একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন। গুরু তাঁহার নিকট ৫২৫৲ টাকা পাইতেন। তিনি ঠিক্ করিলেন, যিনি প্রকৃত গুরু হইবেন, তিনিই এই টাকা তাঁহার নিকট চাহিবেন। এই মনে করিয়া তিনি প্রত্যেক সোড়ীকেই একটি করিয়া টাকা দিলেন। কেহই কিছু বলিল না। শেষে তিনি তেগ বাহাদুরকেও এক টাকা দিলে, তেগ অপর টাকাগুলি চাহিয়া বসিলেন। ইহাতেই তিনি গুরু নির্ব্বাচিত হইলেন। এরূপ গল্পের ভিত্তি কতদূর সত্য, জানি না।

ততই মঙ্গল। তবে চল, তোমার সহিত দিল্লী যাই। মাখনও সম্মত হইলে গুরু সপরিবারে বাকালা ত্যাগ করিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন।

তেগ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া আর এক মহা বিপদে পড়িলেন। রাম রায় গুরুপদ না পাইয়া রুদ্রমূর্ত্তি হইয়া উঠেন ও তেগের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য সমুদ্যত হন। তেগের দিল্লী আগমন বার্ত্তা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি কাল-ভুজঙ্গমের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তিনি সম্রাটকে তেগের বিরুদ্ধে অনেক কথা লাগাইলেন। সম্রাটও কাহারও উন্নতি দেখিতে পারেন না। তিনি গুরুকে রাজসভায় উপস্থিত হইবার জন্য তখনই আদেশ করিলেন। ফলে, তেগকে কিছুকালের জন্য কারাগারে যাইতে হয়। (১)

তেগ গুরুপদ পাইয়াই রাজার ন্যায় বসবাস করিতেছিলেন। তাঁহার অধীনে এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তিনি কর্ত্তারপুরে একটি দুর্গ তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখানে তিনি শিখদের ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি করিবার মানসে একটি আলোচনা সভাও স্থাপন করিয়াছিলেন। (২) এই সব কার্য্যই তাঁহাকে এই বিপদে ফেলে। রাম রায়ের প্ররোচনায় সম্রাট বুঝেন যে, তিনি দেশের শান্তি-ভঙ্গকারী। তাহাতেই তাঁহার এই কারাবাস ঘটে।

যাহা হউক, কিছু কাল কারাযন্ত্রণা ভোগের পর অম্বররাজ রাম সিংহের একান্ত চেষ্টায় তেগ বাহাদুর কারামুক্ত হন। এই সময় রাম সিংহ আসামে যাইতেছিলেন। তেগ দেশভ্রমণের এ সুযোগ ছাড়িলেন না। তিনি রাম সিংহের সহিত বঙ্গদেশ হইয়া আসাম গমন করেন। এখানে তিনি হিন্দু তীর্থ কামাখ্যা পরিদর্শন করেন ও কামরূপরাজের সহিত আলাপ করেন। (৩) পরে তিনি

(১) কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে গুরু কারারুদ্ধ হন নাই। তবে কারারুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, শেষে সভাসদ্‌গণের একান্ত অনুরোধে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তাহা সত্য বোধ হয় না।

(২) ইহাই গুরু গোবিন্দ সিংহ প্রতিষ্ঠিত গুরুমঠের পূর্ব্বাভাস। গুরুরা কোন কালেই আপনার ইচ্ছামত কাজ করিতেন না। অনুগত ও শুভাকাঙ্ক্ষী শিষ্যগণের সহিত পরামর্শ করিতে তাঁহারা কখন কুণ্ঠিত হইতেন না। তবে তেগ বাহাদুরই প্রথম তাঁহাদিগকে লইয়া একটি সঙ্গৎ বা সমিতি গঠন করেন।

(৩) He (Teg Bahadur) meditated on the banks of the Burhampaoter, and he is stated to have convinced the heart of the Raja of Kamroop, and to have made him a believer in his

বিহারে ফিরিয়া আসেন ও পাটনা সহরে বাস করিতে থাকেন। এখানে অবস্থান কালে তিনি এই সহরে একটি শিখ বিদ্যালয় স্থাপন (১) করিয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার ভুবনপ্রসিদ্ধ যুগ-প্রবর্ত্তক পুত্র গোবিন্দ সিংহের জন্ম হয়। এতকাল ধরিয়া শিখ সম্প্রদায়ের প্রতি যে অত্যাচার হইতেছিল, সেই অত্যাচার দূর করিবার জন্যই এই মহাত্মা জন্ম লইলেন। (২) তিনিই বিচ্ছিন্ন শিখগণকে একটি সামরিক সম্প্রদায়রূপে পরিণত করেন। লোক প্রস্তুত না হইলে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় না। পরাধীন অবস্থায় অত্যাচারই লোককে প্রস্তুত হইতে শিক্ষা দেয়। এই গোবিন্দের আবির্ভাবের জন্য কত জন গুরুকে কত না অত্যাচার ভোগ করিতে হইয়াছিল।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

mission. ইহার টীকায় আরও লিখিয়াছেন—These last two claueses are almost wholly on the authority of a manuscript Goormoo-khee summary of Teg Bahadur's life.—*Cunningham*.

(১) Malcolm's Sketch and Allen & Co's The Punjab.

(২) সকল ঐতিহাসিকই বলেন যে, তেগ গুরুপদ প্রাপ্ত হইবার পর প্রথম যেবার পাটনা যান, সেইবার তাঁহার পুত্র গোবিন্দের জন্ম হয়। অথচ সকলেই জন্মের তারিখ দিতেছেন—১৬৬০ খৃষ্টাব্দ। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তেগ বাহাদুর গুরু হন নাই—হররায় তখন গুরু। কাজেই দুই কথার সামঞ্জস্য থাকে না। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে তেগ বাহাদুর স্বর্গারোহণ করেন। ঐ সময় ঐতিহাসিক-দের মতে গোবিন্দের বয়স ১৫ ধরা হইয়াছে, অর্থাৎ ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মকথা মানা হইয়াছে। কিন্তু পূজনীয় শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রধানতঃ শিখগ্রন্থ 'সূর্য্য প্রকাশ' অবলম্বন করিয়া গোবিন্দের জীবনী লিখিয়াছেন। তিনি ঐ পুস্তকের ১০০ পৃষ্ঠার পাদটিপ্পনীতে লিখিয়াছেন যে, 'শিখ-গ্রন্থ অনুসারে গোবিন্দের দশম বৎসর বয়ঃক্রম কালে তেগের মৃত্যু হয়।' তাহা হইলে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, প্রায় ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দের জন্ম হয়। ইহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়, অন্যথা ঐতিহাসিকদের বর্ণনার সামঞ্জস্য থাকে না। অধিকন্তু সূর্য্যপ্রকাশ গ্রন্থখানি প্রামাণ্য। শিখেরা ইহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

নিয়তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

"রাজকুমার!"

"কি বল্‌ছেন খাঁ সাহেব?"

"আপনার সহৃদয়তাকে ধন্যবাদ; কিন্তু আমি মুক্তি চাই না।"

বিস্ময়ের সহিত পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"আপনি একি বলেন খাঁ সাহেব?"

গম্ভীর কণ্ঠে ইসুফ বলিল,—"বল্‌ছি যে, আপনাদের কৃপায় মুক্তিলাভ অপেক্ষা বন্দি-জীবনকেই আমি পরম সুখ ও গৌরবজনক জ্ঞান করি।"

বদন বিনত করিয়া পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"খাঁ সাহেব, আমায় ক্ষমা করুন।"

ইসুফ বলিল,—"আপনাকে ক্ষমা করবার অধিকার আমার নাই রাজকুমার, আপনি খোদার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করুন। কিন্তু জানি না, ন্যায়ময় খোদার নিকট আপনি ক্ষমা পাইবেন কি না।"

পৃথ্বীরাজ অধোবদনে নীরব। ইসুফ বলিল,—"দুঃখিত হ'বেন না রাজকুমার; আমি জানি, আপনি বীর, আপনি সাহসী, আপনি কর্ম্মঠ, কিন্তু হায়, আমি জানতাম না যে, আপনার সম্মুখে পাঠান সর্দ্দার পশুর ন্যায় নিহত হ'তে পারে।"

মস্তক উত্তোলন করিয়া পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"লিল্লা খাঁ পাষণ্ড, সে তার দুষ্কর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েছে।"

গম্ভীর কণ্ঠে ইসুফ বলিল,—"নিশ্চয়ই পেয়েছে। কিন্তু রাজকুমার, আপনাকেও যে একদিন এই দুষ্কর্ম্মের, এই বীর ধর্ম্মের অবমাননার—এই নিরস্ত্র বীরের হত্যাকার্য্যে সহায়তার প্রতিফল পেতে হবে, ইহা যেন বিস্মৃত না হন।"

পৃথ্বীরাজের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; লিল্লার রক্তাক্ত মূর্ত্তি যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার ভ্রুকুটিকুটিল চক্ষুর্দ্বয় ভেদ করিয়া প্রতিহিংসার করাল বহ্নিশিখা ছুটিতে লাগিল। কম্পিত কণ্ঠে পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"খাঁ সাহেব, খাঁ সাহেব!"

বিনয়-নম্রস্বরে ইসুফ বলিল,—"রাজকুমার, আপনার হৃদয়ে ব্যথা প্রদান করার জন্য আমি দুঃখিত।"

মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হইয়া পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"তবে কি বন্দী থাকিতেই আপনার একান্ত বাসনা?"

স্থিরকণ্ঠে ইসুফ উত্তর করিল,—"হাঁ; বন্দীভাবে জীবন যাপন করিতেই আমি ইচ্ছা করি, অথবা তদপেক্ষাও যদি কোন কঠিন দণ্ড থাকে তাহাও গ্রহণ করিতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু আমি মুক্তি চাই না।"

"কে আপনাকে মুক্তি দিতে চায় খাঁ সাহেব?"

তারা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল,—"কে আপনাকে মুক্তি দিতে চায় খাঁ সাহেব?"

বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে ইসুফ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। তারা গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর কণ্ঠে বলিল,—"আপনি আমাদের শত্রু, আপনি তোড়ার শত্রু—আপনি রাজপুত জাতির শত্রু; আপনার অপরাধ অতি গুরুতর।"

পৃথ্বীরাজ ও ইসুফ উভয়েই বিস্ময়ে নীরব; উভয়েরই বিস্মিত দৃষ্টি তারার গর্ব্বস্ফীত বদনমণ্ডলের উপর স্থাপিত। সেই উভয় বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টির মধ্যস্থলে দৃপ্তা রাজহংসীর মত গ্রীব বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া দৃপ্তস্বরে তারা বলিতে লাগিল,—"শুনুন খাঁ সাহেব, আপনার অপরাধ যেমন গুরুতর তেমনই গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। আপনাকে আজীবন ভক্তি ও প্রীতির কঠোর শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে হবে, ইহাই আপনার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি—ইহাই আমার আদেশ।"

ইসুফ বলিয়া উঠিল,—"সত্যই গুরুতর দণ্ড!"

তারা বলিল,—"কন্যার প্রদত্ত দণ্ড গুরুতর হইলেও তাহা গ্রহণ করিতে পিতা বাধ্য।"

ইসুফের নয়নদ্বয় সজল হইল; উন্নত মস্তক অবনত হইয়া পড়িল; বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—"রাজকুমারি, আপনার নিকট আমি পরাজিত হইলাম।"

যমুনা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"পরাজয় নহে খাঁ সাহেব, এ যুদ্ধে আপনিই জয়ী হইলেন।"

ঈষৎ হাসিয়া ইসুফ বলিল,—"সত্য যমুনা, এ বিজয়ে আমি একটী বীর্য্যবতী কন্যা এবং একটী বীরজামাতা লাভ করেছি।"

অভিমান-ক্ষুব্ধকণ্ঠে যমুনা বলিল,—"আর এই যমুনা পোড়ারমুখী বুঝি ভেসে যাবে?"

"তুই কোথায় যাবি যমুনা?" আসন হইতে ত্বরিতে উঠিয়া আসিয়া ইসুফ,

যমুনার হাত ধরিল ; স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিল,—"তুই কোথায় যাবি যমুনা ? এ বিজয়ে যে তোরও অংশ আছে। সেদিনকার রাত্রির কথা কি মনে নাই ? আমার কিন্তু সে কথা বেশ মনে আছে ; তোর সেই বালকবেশ—সেই বীরত্ব-ব্যঞ্জক মুখমণ্ডল এখনও যেন আমি স্পষ্ট দেখিতেছি ; এখনও যেন তোর সেই গর্ব্বিত বাক্য আমার কাণে বাজিতেছে, 'আমরা মাতৃস্তন্যের সহিত দেশভক্তি শিক্ষা করি।' তুই কোথায় যাবি যমুনা ?"

যমুনা লজ্জায় মুখ লুকাইল। পৃথ্বীরাজ সহাস্যে বলিলেন,—"আমি জানিতাম যমুনা, তুমি বাক্যশর নিক্ষেপেই সবিশেষ পারদর্শী।"

মুখ না তুলিয়াই যমুনা বলিল,—"সেটা আপনার মত বীরপুরুষের গুণগ্রাহিতার পরিচয় বটে।"

পৃথ্বীরাজ হাসিলেন, তারা হাসিল, ইসুফও হাসিল। এই অবসরে ইসুফের হাত ছাড়াইয়া যমুনা বন্ধনমুক্তা হরিণীর ন্যায় ছুটিয়া পলাইল। তারা বলিল,—"আমাকে ছেড়ে পোড়ারমুখী বাঁচবে কি ?"

ইসুফের সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইল। আর কয়েকদিন তথায় অবস্থান করিয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ইসুফ মক্কা যাত্রা করিল। পৃথ্বীরাজ তাহাকে স্বীয় সৈন্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু ইসুফ তাহাতে স্বীকৃত হইল না ; বলিল,—"এ জীবনে আর অস্ত্রধারণ করিব না।"

ইহার পর তারাকে সঙ্গে লইয়া পৃথ্বীরাজ সসৈন্যে চিতোর যাত্রা করিলেন। সকলে চলিয়া গেলে যমুনা একা চন্দ্রকরপ্রফুল্ল উদ্যান মধ্যে বসিয়া গাহিতে লাগিল,—

মুড়াব মাথার কেশ ধরিব যোগিনী বেশ
যদি সোই পিয়া নাহি আইল।
এ হেন যৌবন পরশ রতন
কাচের সমান ভেল।

সহসা গান ছাড়িয়া যমুনা উঠিল। নিকটে অশোকের ডালে বসিয়া একটা কোকিল তাহার সুরে সুর দিতেছিল। গাছের ডাল নাড়িয়া যমুনা সেটাকে উড়াইয়া দিল, পাশে কয়েকটা চন্দ্রমল্লিকা তাহার এই রাগ দেখিয়া টিপি টিপি হাসিতেছিল ; যমুনা সেগুলাকে ছিঁড়িয়া লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া আপনার রাগের জ্বালা মিটাইল। কিন্তু ইহাতেও তাহার রাগ থামিল না। তখন সে

ছুটিয়া আপনার ঘরে গেল। ঘরে তারা ও পৃথ্বীরাজের দুইখানা ছবি ছিল; যমুনা ছবি দু'খানাকে টানিয়া আনিয়া শয্যার উপর ফেলিয়া দিল; তাহার এই গায়ের জ্বালা দেখিয়া ছবি দুইখানা যেন হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। যমুনা দশনে অধর চাপিয়া, একখানা কাপড় দিয়া ছবি দু'খানাকে ঢাকিয়া দিল। তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মেজের উপর লুটাইয়া পড়িয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল। যেন সদ্যছিন্ন প্রভাতের পদ্মটী অনাদরে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

—০—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রায় অর্দ্ধাধিক সৈন্য নদী পার হইয়াছে, এমন সময় রায়মল্ল আসিয়া আক্রমণ করিলেন। এ আক্রমণ যে হইবে তাহা সূর্য্যমল্ল পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি অগ্রেই পরপারে গিয়া সেই অর্দ্ধাধিক সৈন্যকে যথাসম্ভব শ্রেণীবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্থানটা যুদ্ধক্ষেত্রের উপযোগী নহে। স্থানটা অসমতল, তাহার দক্ষিণে নিবিড় জঙ্গল পশ্চাতে একটা পাহাড়ের ক্ষুদ্রশাখা, তাহাই আবার ঘুরিয়া গিয়া বামভাগের কিয়দংশ ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সৈন্য সমাবেশ করিতে পারিলে অনেকটা সুবিধা হইত, কিন্তু তাহা আর হইল না; তাহার পূর্ব্বেই রায়মল্ল আসিয়া ভীমবেগে আক্রমণ করিলেন। অগত্যা সেই প্রতিকূল স্থানে দাঁড়াইয়াই সূর্য্যমল্লকে সে আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে হইল। তখন সেই শৈলকানন-বেষ্টিত বন্ধুর ভূভাগে রজনীর অন্ধকারের মধ্যে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল।

অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরই সূর্য্যমল্ল দেখিলেন, এরূপ স্থলে দাঁড়াইয়া বিপক্ষের গতি-রোধ অসম্ভব, কেবল সৈন্যক্ষয় হইবে মাত্র। তিনি তখন পশ্চাতে হটিয়া আসিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু পশ্চাতে বন্ধুর শৈলমালা পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান। একবার বামদিকে চাহিলেন; সে দিকে বন্ধুর পর্ব্বতপার্শ্ব দিয়া কিছুদূর যাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা হইলে বিপক্ষেরা অগ্রসর হইয়া পরপারস্থ সৈন্য-গণকে বাধা দিতে পারে। অগত্যা সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই সূর্য্যমল্লকে যুদ্ধ করিতে হইল; সে যুদ্ধ কেবল সৈন্যক্ষয়মাত্র। কিন্তু ইহা ভিন্ন তখন আর অন্য উপায় নাই। মৃগ আসিয়া আজি নিজে ব্যাধের জালে পড়িয়াছে। এ দিকে রাণা স্বয়ং অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাঁহার জরাজীর্ণ হৃদয়ের

সেই অদম্য উৎসাহ, লোলচর্ম্ম ভুজদ্বয়ের সেই অলৌকিক শক্তি, সেই বীরত্ব-বিস্ফুরিত রৌদ্রমূর্ত্তি সন্দর্শনে সৈন্যগণ উৎসাহিত হইয়া উঠিল; তাহারা প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া মার্ মার্ শব্দে বিপক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

প্রায় এক প্রহর কাল যুদ্ধের পর সূর্য্যমল্ল ভাবিলেন, 'এইবার শেষ, সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল উদ্যম আজি এই গাম্ভিরীর তীরে—এই অরণ্যানী-বেষ্টিত শৈলপদতলে চিরসমাহিত হইবে।' কিন্তু তাহা হইল না; তখন অবশিষ্ট অর্দ্ধেক সৈন্য নদী পার হইয়াছে। সেই সকল সৈন্য লইয়া সারঙ্গদেব তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। নববলে বলীয়ান্ সূর্য্যমল্ল এবার গর্জ্জন করিয়া রায়মল্লকে আক্রমণ করিলেন। সে আক্রমণে রায়মল্লের ক্লান্ত সৈন্যগণ অস্থির হইয়া পড়িল। তখন পূর্ব্বগগনে প্রভাতের আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এবার বুঝি বিজয়লক্ষ্মী সূর্য্যমল্লের প্রতি প্রসন্না হইলেন। তাঁহার নববলদৃপ্ত সৈন্যগণের তেজে বিপক্ষ সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। সর্দ্দারগণ একে একে রণশয্যায় শয়ন করিয়া চক্ষুর্নুদ্রিত করিতে লাগিল। বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে বৃদ্ধ রাণার সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হইল; শোণিতধারায় পরিচ্ছদ রক্তবর্ণ ধারণ করিল; অসির বেগ ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। বিজয়-গৌরবে সূর্য্যমল্লের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আর অল্পক্ষণ—অল্পক্ষণ পরেই চিরবাঞ্ছিত চিতোর সিংহাসন সূর্য্যমল্লের পদতলে লুটাইয়া পড়িবে। উৎফুল্ল কণ্ঠে সূর্য্যমল্ল মুহুর্মুহু সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

সহসা বামভাগে সূর্য্যমল্লের দৃষ্টি নিপতিত হইল। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, ধূলিপটলে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া একদল অশ্বারোহী সৈন্য সেইদিকে তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। সূর্য্যমল্ল তাহা সারঙ্গদেবকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে ইহারা বলিতে পার?"

সারঙ্গদেব অনেকক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন,—"সম্ভবতঃ পৃথ্বীরাজের সৈন্য।"

সূ। কিসে বুঝিলে?

সা। নতুবা আর কে এ সময়ে রায়মল্লকে সাহায্য করিতে আসিবে?

সূ। আমাদের সাহায্যের জন্যও তো কেহ আসিতে পারে?

সা। উহাদের গতি দেখিয়া সেরূপ বোধ হইতেছে না।

সূ। কিরূপ বোধ হইতেছে?

সা। আমাদিগকে আক্রমণই যেন উহাদের উদ্দেশ্য।

সু। উহারা সংখ্যায় কত বলিয়া অনুমান হয়?

সা। এক সহস্রের ন্যূন হইবে না।

সূর্য্যমল্লের হর্ষপ্রফুল্ল মুখে বিষাদের ছায়া পড়িল। তিনি একবার আপন সৈন্যদলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"এই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি আমাদের আছে?"

সারঙ্গদেব বলিলেন,—"শক্তি না থাকিলেও চেষ্টা দেখিতে হইবে। যুদ্ধস্থলে এখনও আমাদের দুই সহস্রের অধিক সৈন্য আছে।"

তখন সারঙ্গদেব ব্যস্ততাসহ এক সহস্র সৈন্য লইয়া বামদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ব্যূহ সজ্জিত হইল; ব্যূহের অগ্রভাগে অশ্বারোহী সৈন্য, তাহার পশ্চাতে পদাতি সৈন্য স্থাপিত করিয়া দুইশত সৈন্যসহ সারঙ্গদেব পাহাড়ের উপর উঠিলেন।

ইহার প্রায় অর্দ্ধদণ্ড পরে পৃথ্বীরাজ এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং ভীমবেগে বিপক্ষপক্ষকে আক্রমণ করিলেন। প্রথম আক্রমণের বেগে বিপক্ষদল একটু হটিয়া আসিল, কিন্তু পরক্ষণেই সারঙ্গদেব সুকৌশলে তাহাদিগকে সংযত করিয়া লইলেন। এদিকে পৃথ্বীরাজকে দেখিয়া রায়মল্লের পরিচালিত সৈন্যগণও দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত অরাতিনিধনে প্রবৃত্ত হইল। উভয় পক্ষেই অনেক লোক হতাহত হইল; নররক্তস্রোতে গাম্ভিরীর স্বচ্ছ সলিলরাশি লোহিতবর্ণ ধারণ করিল।

সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধে জয় পরাজয় নির্ণীত হইল না। সন্ধ্যা আগমনে সেদিনকার মত যুদ্ধ স্থগিত হইল। উভয় পক্ষই স্ব স্ব শিবিরে গিয়া বিশ্রাম লাভের অবকাশ পাইল।

সন্ধ্যার পর এক ভিখারিণী পৃথ্বীরাজের শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইল। ভিখারিণীর বর্ণ ঘনকৃষ্ণ; কিন্তু সেই ঘনকৃষ্ণ বর্ণের মধ্য হইতেই একটা স্থির সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে; তাহার কালো মুখখানির উপর কৃষ্ণতারশোভিত ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটী ঘন ঘন নাচিতেছে, যেন কৃষ্ণতড়াগের বুকে ভ্রমরচুম্বিত পদ্ম দুইটী তরঙ্গতাড়নে হেলিতেছে, দুলিতেছে; কৃষ্ণকুঞ্চিত ঘন কেশরাশি পৃষ্ঠ নিতম্ব ঢাকিয়া জানু স্পর্শ করিতেছে,—যেন স্বচ্ছ নীলাকাশের কোলে নবজলধরের শ্যামশোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শিবিরদ্বারে প্রহরী ছিল। ভিখারিণী গিয়া তাহাকে জানাইল যে, সে

পৃথ্বীরাজের দর্শনাভিলাষিণী। কিন্তু প্রহরী তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে সম্মত হইল না। সে বলিল,—"এখন তাঁহার সহিত দেখা হইবে না।"

ভিখারিণী বলিল,—"কেন হইবে না?"

প্র। তিনি এখন বিশ্রাম করিতেছেন।

ভি। এই সময়েই আমার দেখা করার দরকার।

প্র। কিন্তু তাঁর হুকুম না পেলে ছাড়তে পারি না।

ভি। আমি এখানে দাঁড়াই, তুমি ভিতরে গিয়ে হুকুম আন।

প্র। দ্বার ছেড়ে আমি যেতে পারি না।

ভি। তবে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি নিজেই হুকুম আনি।

প্র। তাও কি হ'তে পারে?

ভি। তবে কি হবে? আমি কি সমস্ত রাত এইখানে দাঁড়িয়ে থাকব?

প্র। রাত্রি এক প্রহরের সময় পাহারা বদল হবে, তখন হুকুম এনে দেব।

অগত্যা ভিখারিণী সেইখানে বসিল। প্রহরী একটু এদিক ওদিক পদচারণা করিয়া আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার বাড়ী কোন্ দেশে?"

ভিখারিণী বলিল,—"সে অনেক দূর। ঠাকুরজি, একটা গান শুন্‌বে?"

বিনা পয়সায় যুবতী রমণীর মুখে গান শুনিতে কে না রাজি হয়? প্রহরীও রাজি হইল। তখন ভিখারিণী গুন্ গুন্ করিয়া একটা গান ধরিল। প্রথমে ধীরে, অতি ধীরে—তারপর স্বর ক্রমে উচ্চে উঠিল। ক্রমে মধ্যম পঞ্চম ছাড়াইয়া সুর নিখাদে চলিল। তখন ভিখারিণী গলা ছাড়িয়া গাহিতে লাগিল,—

তুহি শ্যাম মোর দুনিয়ামে আলা।
তুহারি লাগিয়ে দেশ দেশ ঢুঁরিয়ে
ফিরত হাম গোপবালা।
তু মোর জলদ হাম চাতকিনী,
বারি বারি করি তুহু ফুকারি দিন যামিনী,
তুহি চিতচোর বহুত নিঠুর,
তব তুহু মোর জপমালা।

স্তব্ধ সান্ধ্য গগন ভেদ করিয়া সে সুরের তরঙ্গ উঠিতে পড়িতে লাগিল। শিবিরের মধ্যে থাকিয়া পৃথ্বীরাজও তাহা শুনিলেন। শুনিয়া ডাকিলেন,—"প্রহরি!"

প্রহরী এতক্ষণ মুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই সঙ্গীত-সুধা পান করিতে-ছিল; সহসা পৃথ্বীরাজের আহ্বানে তাহার যেন চৈতন্য হইল। সে ত্রস্তে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিল। পৃথ্বীরাজ জিজ্ঞাসিলেন,—"বাহিরে কে গাহিতেছে?"

প্রহরী উত্তর করিল,—"একটা ভিখারির মেয়ে।"

পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"তাহাকে ভিতরে আন।"

প্রহরী বাহিরে আসিয়া দেখিল, ভিখারিণী নাই। আশে পাশে অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। তখন সে ভিতরে গিয়া জানাইল, "ভিখারিণী চলিয়া গিয়াছে।"

পৃথ্বীরাজ দ্রুতপদে বাহিরে আসিলেন। চারিদিকে ভিখারিণীর অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তাহাকে পাইলেন না। ভিখারিণী চলিয়া গিয়াছে, কেবল তখনও দিগন্ত হইতে তাহার সঙ্গীতের শেষ প্রতিধ্বনি উঠিতেছে,—তব তুহু মোর জপমালা।

পৃথ্বীরাজ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পৃথ্বীরাজ স্তম্ভিতভাবে সেই স্থানে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর শিবিরের মধ্যে না গিয়া বাহিরের দিকে চলিলেন। প্রহরী তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল, কিন্তু ইঙ্গিতে তিনি তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া একাই চলিলেন।

তখন কৃষ্ণাদ্বিতীয়ার চন্দ্র পাহাড়ের পাশ দিয়া ধীরে ধীরে দেখা দিতেছে; ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশে অনন্ত নক্ষত্রমালা স্তব্ধ নয়নে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া আছে; নিম্নে বসুন্ধরা অন্ধকার-বসন পরিত্যাগ করিয়া জ্যোৎস্নাবাসে সর্ব্বাঙ্গ আবরিত করিতেছে, অদূরস্থ রণক্ষেত্র হইতে মুমূর্ষু সৈনিকের শেষ কণ্ঠধ্বনি উত্থিত হইয়া নৈশ-গগনে মিলাইয়া যাইতেছে। সম্মুখে কিছুদূরে বিপক্ষ সৈন্যের পটাবাস হইতে ক্ষীণ আলোকরশ্মি বিনির্গত হইতেছে। পৃথ্বীরাজ অস্থিরচিত্তে মৃদুগতিতে সেই দিকে চলিয়াছেন। যাইতে যাইতে কত কথাই মনে আসিতেছে। সেই সুদূর মীনরাজ্য, নগরপ্রান্তবাহিনী তটিনীতীরে সেই জ্যোৎস্নাপ্রফুল্লা যামিনী, সেই কৌমুদীস্নাত উপলখণ্ড-পার্শ্বে দণ্ডায়মানা রমণীমূর্ত্তি, সেই তাহার স্বভাবসুন্দর মুখখানি, সেই তাহার সরল পবিত্র হাস্যের

অস্ফুট আরাব! অতীতের অন্ধকার ভেদ করিয়া, স্মৃতিসাগর আলোড়িত করিয়া আজি সেসকল কথাই একে একে মনে পড়িতেছে। সে কথা যতই মনে আসিতেছে, ততই তাঁহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিতেছে, গতি ততই অধীর হইতেছে।

এইরূপে চিন্তার ভার বুকে লইয়া পৃথ্বীরাজ অধীরগতিতে সূর্য্যমল্লের শিবির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারের প্রহরী সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। সহসা যেন পৃথ্বীরাজের চমক হইল। তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া মুহূর্ত্তকাল ভাবিলেন; তারপর দ্রুতপদে শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রহরী বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সমস্ত দিবসের যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া সূর্য্যমল্ল তখন শিবির মধ্যে শয়ন করিয়াছিলেন। জনৈক পরিচারক তাঁহার ক্ষতস্থানে ঔষধ লেপন করিতেছিল। এমন সময় পৃথ্বীরাজ তথায় প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন,—"কাকা!"

সূর্য্যমল্ল চমকিত হইয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন। তারপর ত্রস্তে উঠিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে ক্ষতমুখ সকল ফাটিয়া আবার রক্ত নির্গত হইতে লাগিল; সে রক্তে পৃথ্বীরাজের পরিচ্ছদ সিক্ত হইল। সূর্য্যমল্ল অবশভাবে শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন। পৃথ্বীরাজ বলিলেন, "আপনার ক্ষতস্থানের যন্ত্রণার কিছু উপশম হইয়াছে কি?"

ঈষৎ হাসিয়া সূর্য্যমল্ল বলিলেন,—"তোমাকে দেখিয়া যন্ত্রণার অনেকটা লাঘব হইয়াছে বৎস।"

পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"সেই জন্যই কাকা, পিতার চরণ দর্শনের পূর্ব্বেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

তখন পৃথ্বীরাজ গিয়া খুল্লতাতের পার্শ্বে বসিলেন; উভয়ের মধ্যে অতীতের কত সুখদুঃখের কথা, কত হাস্য পরিহাস চলিতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিয়া, সেই সকল অকপট হাস্য পরিহাস শুনিয়া কে বলিবে, আজি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে পরস্পরের অসি পরস্পরের রক্তপানের জন্য লালায়িত হইয়াছিল; আবার কল্য সূর্য্যোদয়ের সহিত উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে অসি নিষ্কোষিত করিবে? যে পৃথ্বীরাজের জন্য সূর্য্যমল্লের নিকট চিতোর সিংহাসনের পথ কণ্টকিত, যে পৃথ্বীরাজ তাঁহার আশায় নিরাশা, উৎসাহে নিরুৎসাহ, আকাঙ্ক্ষায় নিবৃত্তি, যে তাঁহার জীবনে মৃত্যু, নিদ্রায় দুঃস্বপ্ন, কল্পনায় ভয়ঙ্কর, সেই পৃথ্বীরাজ আজি নিরস্ত্র অবস্থায় সহস্র শত্রুবেষ্টিত শিবির মধ্যে একা বসিয়া; আর সূর্য্যমল্লও

অবিকৃত চিত্তে তাঁহার সহিত প্রীতিপূর্ণ হাস্যালাপে নিরত। জানি না, শত্রুর সহিত এরূপ উদার ব্যবহার এক রাজপুত জাতির চরিত্র ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন জাতির চরিত্রে সম্ভবপর কি না।

অন্যান্য কথার পর পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"কাকা, শিবিরে কোনরূপ আহারীয় আছে কি? আমার অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে।"

সূর্য্যমল্ল তৎক্ষণাৎ পরিচারককে আহারীয় আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে তাহা আনীত হইল। তখন খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়ে একত্র বসিয়া হাস্যালাপসহ আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

আহারান্তে পৃথ্বীরাজ বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায় কালে বলিলেন,—"কাকা, কল্য আবার যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।"

সূর্য্যমল্ল সহাস্যে সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিলেন। পৃথ্বীরাজ চলিয়া গেলেন। সূর্য্যমল্ল শয্যার উপর পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"হায়, লালসা! হায় সন্ন্যাসিনি!"

শিবির ত্যাগ করিয়া পৃথ্বীরাজ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে তাঁহার বোধ হইল, কেহ যেন পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে। তিনি পাছু ফিরিয়া চাহিলেন। তখন একখণ্ড মেঘ আসিয়া চাঁদের হাসিকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল, সুতরাং পশ্চাতে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন আপনারই উষ্ণ মস্তিষ্কের ভ্রান্তি স্থির করিয়া পৃথ্বীরাজ অগ্রসর হইলেন। সহসা বামপার্শ্বের বৃক্ষান্তরাল হইতে একটা তীর আসিয়া শন্ শন্ শব্দে তাঁহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। চমকিত হইয়া পৃথ্বীরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা তীর ছুটিল। কিন্তু সে তীর পৃথ্বীরাজের অঙ্গ স্পর্শ করিল না; মুহূর্ত্ত মধ্যে পশ্চাৎ হইতে কে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়াইল; নিক্ষিপ্ত তীর সবেগে আসিয়া তাহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে সে পৃথ্বীরাজের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। পৃথ্বীরাজ বিস্মিত স্তম্ভিত। কিন্তু সে বিস্ময় মুহূর্ত্তের জন্য। মুহূর্ত্ত পরেই পদতলে লুণ্ঠিত আহতের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তখন মেঘ সরিয়া গিয়াছে; চাঁদের হাসিতে আকাশ পৃথিবী হাসিয়া উঠিয়াছে। আহতের মুখের দিকে চাহিয়াই পৃথ্বীরাজ শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—"কানাইয়া!"

ক্ষীণকণ্ঠে কানাইয়া উত্তর করিল,—"প্রভু!"

তখন পৃথ্বীরাজ ক্ষিপ্রহস্তে কানাইয়ার বক্ষোবিদ্ধ তীর উৎপাটিত করিতে গেলেন। সহসা পথিমধ্যে কালসর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিত হইয়া

পশ্চাৎপদ হয়, পৃথ্বীরাজও তেমনই চমকিয়া একপদ পশ্চাতে সরিয়া আসিলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার কানাইয়ার মুখের দিকে চাহিলেন। তারপর ছুটিয়া আসিয়া সেই ছিন্ন ব্রততীর ন্যায় দেহলতাকে বুকের উপর তুলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, "শীলা! শীলা!"

কম্পিত কণ্ঠে শীলা উত্তর করিল,—"প্রভু!"

চীৎকার করিয়া পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"কোন্ পিশাচ তোমায় এরূপে হত্যা করিল শীলা?"

ক্ষীণস্বরে শীলা বলিল,—"সে—সে—তাহাকে ক্ষমা করিও।"

"কখনই না" বৃক্ষান্তরাল ত্যাগ করিয়া এক কৃষ্ণকায় যুবক পৃথ্বীরাজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"কখনই না, সাহু—রাজপুতের ক্ষমার ভিখারী নয়।"

সাহুর হাতে বর্শা ছিল; সে তাহা সবলে আপনার বুকে বসাইয়া দিল; দেখিতে দেখিতে ছিন্নমূল পাদপবৎ তাহার উন্নত দেহ কাঁপিতে কাঁপিতে সেই স্থানে পতিত হইল। পৃথ্বীরাজ ডাকিলেন,—"শীলা!"

শীলা আর কোন উত্তর দিল না। সেই নির্ম্মল নৈশ নীলাকাশতলে ফুল্লচন্দ্রালোকে পৃথ্বীরাজের বুকে মাথা রাখিয়া সে ধীরে ধীরে নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিল। তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিল না কি?

পরদিন প্রভাতে আবার রণভেরী বাজিয়া উঠিল। সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল। সে দিন যুদ্ধে সারঙ্গদেব যে অসাধারণ বিক্রম প্রদর্শন করিলেন, তাহা দেখিয়া শত্রু মিত্র সকলেই বিস্মিত হইল। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী, মহাবল পৃথ্বীরাজের প্রতি অনুকূল; সূর্য্যমল্ল পরাজিত হইলেন, এবং বাতেরো নামক দুর্গম বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিজয়নাদে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া পৃথ্বীরাজের সৈন্যগণ চিতোরে প্রত্যাবৃত্ত হইল; কিন্তু পৃথ্বীরাজ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না, কয়েকজন মাত্র সৈন্য লইয়া তিনি সূর্য্যমল্লের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভারতে বস্ত্র-শিল্প।

—:*:—

ভারতের বস্ত্র-শিল্পের আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে বোম্বাই প্রদেশের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে। ম্যাঞ্চেষ্টারী বস্ত্রের প্রতি-যোগিতায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্প যখন দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইতেছিল, তখন একমাত্র বোম্বাই প্রদেশই পাশ্চাত্য প্রণালীর কল কব্জা আনাইয়া ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের পুনরুদ্ধার মানসে বদ্ধপরিকর হন। তাই ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে ভারতের সর্ব্বপ্রথম কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়।

বোম্বায়ের এই নবপ্রতিষ্ঠিত কাপড়ের কলে তখন সূক্ষ্ম সূত্র ও সূক্ষ্মবস্ত্র প্রস্তুত হইত না। ওদিকে ম্যাঞ্চেষ্টারের সূক্ষ্মবস্ত্রে তখন ভারতের বাজার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল, কাজেই বোম্বের কলে প্রস্তুত মোটা কাপড় ভারতের বাজারে প্রত্যাখ্যাত হইল। ফলে কলের পরিচালকগণকে ক্রেতার অনুসন্ধানে বহির্গত হইতে হইল। চীনদেশ তখন অহিফেনের নেশায় অচৈতন্য! জাপানও কেবল চক্ষুরুন্মীলন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং সুযোগ বুঝিয়া বোম্বের বস্ত্র-ব্যবসায়িগণ চীন ও জাপানে কাপড় চালান দিতে আরম্ভ করিলেন। সুলভ ভারতীয় মোটা বস্ত্র চীনে ও জাপানে প্রচুর পরিমাণে কাট্‌তি হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই প্রদেশে ও ভারতের অন্যান্য স্থানেও কাপড়ের কল সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। কিন্তু ভারতীয় কলওয়ালাদের এ সুবিধা অধিক দিন রহিল না। উন্মীলিতচক্ষু জাপান জগতের বাণিজ্যক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি-য়াই নিজেদের হীনতা বুঝিতে পারিল এবং তৎপ্রতিবিধানে মনোনিবেশ করিল। স্বাধীন জাপান দেখিতে দেখিতে বহু কলকারখানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বস্ত্র জাপান হইতে নির্ব্বাসিত হইল। বোম্বের কলওয়ালা-গণ তখন মিশর, এডেন প্রভৃতি স্থানে বস্ত্র বিক্রয় করিয়া এ ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বৈদেশিক বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। কেবল মাত্র চীনদেশ তখন তাঁহাদের সম্বল। কিন্তু সেখানেও বাজার ক্রমেই মন্দা পড়িতে লাগিল। পার্শ্ববর্ত্তী জাপান চীন দেশের

বাজার ক্রমেই দখল করিয়া লইতে লাগিল। ভারতীয় বস্ত্রের কাট্‌তি চীনে ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকিল।

ভারতীয় কলওয়ালাগণ তখন নিরুপায়। ওদিকে আবার (১৮৯৬ সালে) দেশীয় বস্ত্রের উপর শুল্ক স্থাপিত হইল। ফলে বোম্বায়ে অনেক কল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বন্ধ হইয়া গেল। যাঁহারা কোনরূপে কাজ চালাইতে লাগিলেন, তাঁহাদেরও লাভ অপেক্ষা ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক রহিল। ১৯০৪ সালে অধিকাংশ কলের অবস্থাই এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিল যে, কল-স্বত্বাধিকারিগণ কল ও কলের বাটী বিক্রয় করিয়া ব্যবসান্তর গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। যদি তখন ক্রেতার অভাব না হইত তবে বোম্বের অধিকাংশ কলই হস্তান্তরিত হইয়া যাইত।

ভারতীয় কলসমূহের যখন এইরূপ চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত, তখন শুভমুহূর্ত্তে জননীর আশীর্ব্বাদ স্বরূপ (১৯০৫ খৃঃ) বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলন আরব্ধ হইল। জননীর পূতস্তন্য পানে সমস্ত কলকারখানা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বস্ত্রসমূহেরও পুনঃ সৌভাগ্যের উদয় হইল। যাঁহারা ৫।৭ বৎসর যাবৎ ক্রমাগত লোকসান দিয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা সহসা শতকরা ৯০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ প্রাপ্ত হইয়া নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিলেন। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে যুগান্তর উপস্থিত হইল। ফলে, ১৯০৭ সালে ভারতবর্ষে বস্ত্র ও সূত্রের কল ২১৭টীতে উন্নীত হইল। অনেক পুরাতন কল তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দ্বিগুণ আকার ধারণ করিল। বঙ্গে 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল' বাঙ্গালীর হস্তে আসিয়া পুনর্জ্জীবন লাভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষুদ্র কলও স্থাপিত হইল। আমাদের এই জলপাইগুড়ীতেও একটী ক্ষুদ্র কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে এবং বিগত ডিসেম্বর মাস হইতে নানাবিধ বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে।

বোম্বাই প্রদেশের যৌথ কারবারসমূহের রিপোর্টে প্রকাশ—১৯০৭—৮ সালে একমাত্র বোম্বাই প্রদেশে ৬৯টী বস্ত্র ও সূত্র নির্ম্মাণের কল স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ কলই আবার লভ্যাংশের টাকা হইতে স্থাপিত। বোম্বাই মহাজন সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত ভিটলদাস দামোদর থাকুরূপে মহোদয়ের বক্তৃতায় প্রকাশ, বিগত তিন বৎসরে বোম্বের কলওয়ালাগণ চারি কোটী টাকারও উপর লভ্যাংশস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এরূপ অত্যধিক লাভ তাঁহারা যে আর কখনও প্রাপ্ত হন নাই তাহা সুনিশ্চিত।

স্বদেশী আন্দোলনের কল্যাণে কেবল যে কলওয়ালারাই এরূপভাবে লাভবান্ হইয়াছেন তাহা নহে, হস্তচালিত তাঁতে যাহারা কাজ করে তাহারাও প্রভূত

উপকৃত হইয়াছে। তাঁতী জোলা প্রভৃতি যাহারা তাঁত ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিয়াছিল—তাহারা আবার জাতীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছে। তসর, গরদ, এণ্ডি, মুগা প্রভৃতি রেশমী বস্ত্র গত তিন বৎসর যেরূপ প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইয়াছে এরূপ আর কখনও হয় নাই।

১৯০৫।৬ সালে বোম্বায়ের কলসমূহে ২৫৫৪৭৯৩৪ পাউণ্ড ওজনের ধুতি প্রস্তুত হইয়াছিল, ১৯০৭।৮ সালে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭৮৩৪৩৮৬ পাউণ্ড হয়। ড্রিল জিন ৩৬ হাজার পাউণ্ড হইয়াছিল, গত বৎসর প্রায় ৫০ হাজার পাউণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। অন্যান্য নানাপ্রকার বস্ত্র ১৩ কোটি পাউণ্ড হইতে ১৫ কোটি পাউণ্ডে উঠিয়াছে। কেবলমাত্র ধুতির পরিমাণ দেড়গুণ অপেক্ষাও অধিক। ইহা অবশ্যই বঙ্গবাসীর বয়কটের ফল। যদি ভারতের অন্যান্য প্রদেশও বাঙ্গালীর ন্যায় বিদেশীপণ্য বয়কট করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেন, তবে বস্ত্রশিল্পের যে আরও বহুল পরিমাণে উন্নতি হইত তদ্‌বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে বোম্বাইবাসী বয়কটের দ্বারা এরূপ অভূতপূর্ব্ব উপকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বয়কট করিতে অধিকতর পশ্চাৎপদ। ইহা অপেক্ষা আর ক্ষোভের বিষয় কি হইতে পারে!

যাহা হউক, বাঙ্গালী যদি কখনও দাসত্বের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে বোম্বাইবাসীকে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিফল পাইতে হইবে। কিন্তু যে বাঙ্গালা দেশ স্বদেশী আন্দোলনের জন্মভূমি, সেই বাঙ্গালাদেশে একটীমাত্র কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা কি নিতান্তই লজ্জাকর নহে? বাঙ্গালীর 'সবে ধন নীলমণি' বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে যে কাপড় প্রস্তুত হয়, তদ্দ্বারা বাঙ্গালার একটীমাত্র জেলার লজ্জা নিবারণ হওয়াই সুকঠিন। যদি বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায় এক একটী বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল স্থাপিত হয়, তবে বাঙ্গালীর লজ্জানিবারণ হইতে পারে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? ব্যবসাবিমুখ বাঙ্গালী কি বাঙ্গালার সুখ ঐশ্বর্য্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন? বাঙ্গালার অশিক্ষিত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কেবল ক্রয় বিক্রয়রূপ নিম্নশ্রেণীর ব্যবসাতেই নিযুক্ত। উচ্চশ্রেণীর ব্যবসায়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই প্রবৃত্ত হইতে হইবে। শিক্ষিত লোক যতদিন ব্যবসা বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ না করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি কিছুতেই হইবে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় দাসত্বকেই জীবনসর্ব্বস্ব মনে না করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি মনোনিবেশ করুন ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীনবকুমার দত্তগুপ্ত।

স্বদেশী ভূত।

—০:*:০—

সে ছিল বিদেশী ভক্ত, নামটী তার রঘু ;
স্বদেশীর ভিটেয় সে চরিয়ে বেড়ায় ঘুঘু।
খাওয়া পরা শোওয়া বসা সবই তার বিলাতি,
যা' বিলাতি তা' মিষ্ট তার—মায় বিলাতি লাথি।
গ্রামের ভিতর ছেলেগুলা 'পিকেটিং' করে,
তাই দেখে রঘু যেন জ্বলে পুড়ে মরে।
গায় যখন তারা 'বন্দে মাতরম্' গান,
দুই হাতে রঘু নিজের ঢেকে রাখে কাণ।
ভাবে রঘু একি আপদ এল দেশের মাঝে,
ছেলে মেয়ে বুড়াবুড়ী স্বদেশী বাঁদর সাজে !
নেহাৎ যখন অসহ্য হয় ঘরে রইতে নারে,
ছুটে যায় রঘুনাথ থানা ঘরের দ্বারে।
মারপিট, নুণ ফেলা কাপড় পোড়ান আদি,
কত মামলায় সাক্ষী রঘু, কত মামলায় বাদী।
কত ছেলে জেলে গেল, কত বেত খায় ;
কি আপদ, তবু তো এ পোড়া ভূত না যায় ?

তারপর কলিকাতায় বেরুল যখন বোমা,
তখন আর রঘুনাথের আনন্দের নাই সীমা।
দিনরাত থানায় রঘু আনাগোনা করে,
খানাতল্লাস বাকী আর রইল না কার(ও) ঘরে।
কত পটকা বোমা হ'য়ে হাতে দেয় দড়ি,
বন্দুকের টোটা হ'লো কবিরাজের বড়ি।
উনুন ফোঁকা চোঙা হ'লো রিভলভারের নল ;
'আরম্স্ এ্যাক্টে,' প'ড়ে লাঠী গেল রসাতল।
কিন্তু হায় বলতে গেলে দুঃখে বুক ফাটে ;
তবু তো স্বদেশী ভূত বেড়ায় মাঠে ঘাটে।

'রাখীর' দিনে বাঙ্‌লা জুড়ে উঠে গণ্ডগোল;
ছেলে বুড়া রাখী বেঁধে পরস্পর দেয় কোল।
কেহ খায় গুড় চিঁড়া, কেহ পান্তা ভাত,
বন্দেমাতরম্ গান গায় দিন রাত।
রঘু বলে, হায় ইংরাজ ধিক্ ধিক্ তোমারে;
ম্যাক্সিম্ গন্, গোরা ফৌজ আছে কিসের তরে?
এমন সময় এক দল ছোট ছোট ছেলে,
ছুটে এসে রঘুর হাতে রাখী বেঁধে দিলে।
খড়ের গাদায় যেন কেউ ধরিয়ে দিলে আগুন,
রাগে কেঁপে রঘু তাদের কর্‌তে যায় খুন।
যত মুখে আসে রঘু পাড়ে তাদের গালি,
দূরে থেকে ছেলেরা সব দেয় হাততালি।

'বন্দেমাতরম্' গেয়ে ছেলের দল ফিরে,
এমন সময় পুলিশ সাহেব দাঁড়ায় তাদের ঘিরে।
রঘুনাথকে ডেকে সাহেব বলে চড়াস্বরে,—
কোন্ কোন্ আদ্‌মী তোমায় মারপিট করে?
দশ বছরের একটী ছেলে এগিয়ে এসে বলে,—
আমিই একা দোষী সাহেব, দিবে চল জেলে।
আর একটী ছেলে—বয়স হবে বছর সাত,
আগু হ'য়ে বলে সাহেব, ঝুটা ওর বাত।
আমিই বেঁধে দিছি রাখী রঘুনাথের হাতে,
জেলে যেতে হয় আমি রাজি আছি তাতে।

ব্যাপার দেখে সাহেব হতভম্ব হয়ে দাঁড়ায়,
সবাই বলে 'আমিই দোষী' কারে ধরা যায়?
ধমক্ দিয়ে রঘুকে বলে, আসামী কোন্ হ্যায়?
রঘুর মুখে কথা নাই শুধু ফ্যাল ফ্যাল চায়।
ক্রমে তার চক্ষুদু'টা সজল হ'য়ে আসে;
চোখের জলে রঘুনাথের পাষাণ বুকটা ভাসে।

"ওগো সাহেব মিছা কথা" কেঁদে রঘু বলে,
কেউ আমায় মারেনি, এরা শান্তশিষ্ট ছেলে।
'ড্যাম্ আদ্‌মী' ব'লে সাহেব চেয়ে রাঙ্গা চোখে,
শীকারভ্রষ্ট বাঘের মত ফিরে মনের দুঃখে।
চারিদিকে উঠে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ;
ডুক্‌রে কেঁদে রঘু বলে, "হায় কি পাপী আমি।"

*   *   *   *

এমনি ধারা কত রঘু ভূতের ভয়ে ছুটে,
ভূত তাড়াতে গিয়ে শেষে ভূতের পায়ে লুটে।

শ্রীমতী লবঙ্গলতা দেবী।

আমি।

ছি ছি ছি! আমি কর্‌ছি কি? আমার এই নবীন বয়স, এত রূপ বৃথা যাইতে বসিল! আমি কেন যৌবন ভোগ করি না—রূপ জগতকে দেখাইনা, তা' হ'লেত আমার সকলি সার্থক হ'ল। মাথার উপর মণিমুক্তাখচিতচন্দ্রাতপ-তুল্য তারকাবিভূষিত নীলাকাশ—পদনিম্নে বাসনাপ্রবাহতুল্যা পূর্ণযৌবনা জাহ্নবী, মধ্যে আমি—বিকসিত যৌবনের চাঞ্চল্য ও সৌন্দর্য্য লইয়া মধ্যে আমি। আকাশ গরবে ফুলিয়া উঠিয়া, জগতকে আপন সৌন্দর্য্য দেখাইতেছে—ভাগীরথী যৌবন-চাঞ্চল্যে অধীর হইয়া শস্যশষ্পসমাচ্ছন্নক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তবে আমি কেন নীরব থাকি? আমি কেন রূপের তরঙ্গে জগতকে প্লাবিত না করি?—বাসনার প্রবাহ ছুটাইয়া অতৃপ্ত হৃদয়ের জ্বালা পরিতৃপ্ত না করি?

জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনী,—আকাশ পৃথিবী হাসিয়া উঠিয়াছে। যেখানে যা' কিছু সৌন্দর্য্য লুকান ছিল, সব অন্ধকার ছাড়িয়া জগতের নয়নসমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ ঘোমটা টানে নাই, সঙ্কোচ করে নাই,—রূপের ডালা মাথায় করিয়া গরবে ফুলিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে। আমিও কেন হাসি না?

—ঘোম্‌টা টানিয়া ফেলিয়া, জগতের ন[illegible]াইয়া রূপের ডালা মাথায় করিয়া দাঁড়াই না কেন?

তোমরা বলিবে, আমি হিন্দুকুলবধূ—বালবিধবা,—আমাকে পরদা ছাড়িয়া জগতের সমক্ষে দাঁড়াইতে নাই—রাজহংসীর ন্যায় বাসনার প্রবাহে দেহ ভাসাইয়া ছুটিতে নাই। কেন নাই? তুমি পার, আমি পারি না? তুমি শাস্ত্রকার, বিপত্নীক হইলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ কর; গ্রহণ করিয়াও অন্য রমণীতে আসক্ত হও। এই কি তোমার সংযম? সংযমী না হইয়া সংযম শিখাইতে চাও? ছি ছি! বৃথা তোমার হবিস্যান্ন, বৃথা তোমার শিক্ষাদান! আমি তোমারি কথা শুনিব না।

কেনই বা শুনিব? ভগবান আমাকে রূপযৌবনৈশ্বর্য্য, ভোগ-স্পৃহা লালসা সকলি দিয়াছেন; তবে কেন আমি হবিষ্যান্ন খাইয়া, কম্বলাসনে একাকিনী শুইয়া দরিদ্র ভিক্ষুকের ন্যায় দিনযাপন করি? যা'র যৌবন গিয়াছে, সে হরিনামের মালা হাতে করুক—যা'র রূপ নাই সে মুখের উপর ঘোমটা টানুক—যে দরিদ্র, সে কদর্য্য অন্ন খাইয়া দেহ পুষ্ট করুক। আমি কেন করিব? আমার কিসের অভাব? আমি ইচ্ছা করিলে জগতের আহার্য্য একত্র করিয়া রসনা পরিতৃপ্ত করিতে পারি—যৌবননদে তরঙ্গ ছুটাইয়া আকুল লালসানল শান্ত করিতে পারি। তবে কেন আমি অসংযমীর মুখে সংযমের শিক্ষা লইয়া আজীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিব?

আবার সেই কথা! পরোপকার! বারম্বার সেই উপদেশ দিতেছ? কেন আমি তা' করিব? তোমার উপকারে আমার লাভ কি? তোমার মাতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত—তুমি অবিবাহিতা কন্যা লইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত, আমার তাতে কি? তোমার মা স্বর্গে গেল বা না গেল,—তোমার অরক্ষণীয়া কন্যা পাত্রস্থা হ'ল বা না হ'ল, আমার তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? হাঁসপাতালের অভাবে ঔষধ না পাইয়া তোমরা দলে দলে মরিয়া যাইতেছ—এই দুর্ভিক্ষের দিনে এক মুঠা অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া পালে পালে মানুষগুলা মরিতেছে; আমি মনে করিলে আমার অগাধ ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে দেশে দেশে হাঁসপাতাল স্থাপন করিতে পারি—গ্রামে গ্রামে অন্নসত্র খুলিতে পারি। কিন্তু কেন তা' করিব? তোমরা বাঁচ বা মর তা'তে আমার লাভালাভ কি? যাহারা রুগ্ন, পীড়িত—যাহাদের অর্থ নাই, অন্ন নাই তাহাদের মরিয়া যাওয়াই উচিত,—আমি তোমাদের জন্য কিছু করিতে পারিব না।

জ্যোৎস্না-প্রফুল্ল নিশি। আমার ফুলের বাগান হাসিয়া উঠিয়াছে। আমি

সেই পুষ্পোদ্যান মধ্যে মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত বেদীর উপর শুইয়া ফুলের শোভা দেখিতে লাগিলাম। কত রকমের কত ফুল। কোনটা সুইটব্রায়ার, কোনটা বা পলনিঁয়ো, কোনটা মালতী, কোনটা বা মাধবী। কোথাও বেল ফুটিয়াছে—কোথাও বা বকুল ফুটিয়াছে। কোন স্থানে রজনীগন্ধা—কোন স্থানে চন্দ্রমল্লিকা; কোথাও জুঁই--কোথাও চাঁপা; এখানে বৌপাগ্‌লা—সেখানে সেফালিকা; কোথাও জেস্‌মিন—কোথাও মল্লিকা ফুটিয়া উঠিয়া গন্ধরাশি বিস্তার করিতেছে। আমি সেই সুগন্ধামোদিত, মলয়ানিল-সেবিত, নক্ষত্রপ্রফুল্ল নীলাকাশতলে শুইয়া আমার বাসনামুখরিত হৃদয়ের কোমল আরাব শুনিতে লাগিলাম।

আমার মনে হইতে লাগিল, কে যেন নিশীথিনীর কোমল অঙ্কে শুইয়া দূর হইতে গাহিতেছে—

> সুদূর আঁখির আড়ে কে গায় বিষাদ গান ;
> স্মৃতির তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিয়া আসিছে তান ॥
> না হ'তে যৌবনোদ্গত
> জীবনের সাধ যত
> বায়ুমুখে ফুলমত অকালে দিতেছে প্রাণ ;
> জীবন ফুরায়ে গেল' শুনিতে শুনিতে বিষাদ গান ॥

গান শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমার মনে হইল, আমি যেন ঘুমঘোরে—অথবা স্বপ্নে ঠিক তা' বলিতে পারি না—আমি যেন আমার দেহ ছাড়িয়া কোন এক অপরিচিত দেশে * আসিয়া পড়িয়াছি। দেহ ছাড়িয়া বেশী দূর আসি নাই—বাগানের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; অথচ আমার ধারণা হইল, আমি যেন কোন এক অজ্ঞাত-রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। দেখিলাম, অদূরে বেদীর উপর আমার দেহ—রত্নালঙ্কার-বিভূষিত পিঞ্জর পড়িয়া রহিয়াছে; দাসীরা চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আমার খোলস বা আবরণটাকে বীজন করিতেছে। আমি মনে মনে একটু হাসিলাম।

আমি বিস্মিত অন্তরে শৃঙ্খলমুক্তা হরিণীর ন্যায় উদ্যান মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। পলনিঁয়োর কাছে গিয়া দেখি, তা'র ভিতর একটা বিবস্ত্রা যুবতী বসিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কে ?"

---

* Astral World.

যুবতী নিরলঙ্কারা; উত্তর করিল, "আমি ক্লিওপেট্রা; রূপ ও ঐশ্বর্য্যে একদিন আমি ভুবনবিখ্যাত ছিলাম। বাসনার তরঙ্গে গা ভাসাইয়া আজীবন প্রবৃত্তির সেবা করিলাম; কিন্তু কখন তৃপ্তি বা শান্তি পাইলাম না। এখন—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "মিথ্যা কথা! ভোগে নিঃসন্দেহ তৃপ্তি।"

আমি সেখানে আর দাঁড়াইলাম না—বকুলের কাছে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি, পাতার নল কাণে গুঁজিয়া একটা পুরুষ মানুষ ডালে ডালে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কে?"

সে বলিল, "আমি পত্রিকা সম্পাদক। আমার মাসিক প্রকাশের কোন ত্রুটি ছিল না—প্রবন্ধ নিঃসরণেরও কোন অভাব ছিল না। কিন্তু আমার গ্রাহক জুটিল না। আমি নিজে লেখাপড়ার বড় একটা ধার ধারি না। তা' সংসারে পাঁচজন ত আছে; তবে আমার ব্যবসায়ের ক্ষতি হয় কেন? আমার বাসনা ছিল, পত্রিকাখানা কোন রকমে চালাইয়া অর্থ ও নাম করিব। কিন্তু আমার কপাল গুণে দেনার জ্বালায় কাগজখানা বিক্রীত হইয়া গেল। হায় হায়, আমার অর্থ সঞ্চয় হইল না—যশও হইল না,—আমি শুধু আকুল বাসনা-রাশি হৃদয়ে ধরিয়া ছুটাছুটি করিয়া মরিলাম।"

সম্পাদকের নিরাশ হৃদয়ের ব্যথা শুনিতে শুনিতে আমি রজনীগন্ধার কাছে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি, একটা অন্ধ দন্তহীন পুরুষ মানুষ হামাগুড়ি দিয়া গাছের তলায় তলায় বেড়াইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে একটা বড় চাকুরে ছিল; কখন কলিকাতায়, কখন বা মফঃস্বলে ফুটিত। উন্নতির আশায় প্রলুব্ধ হইয়া দুষ্টের পালন শিষ্টের দমন করিয়া আসিয়াছে। চোখ বুজিয়া ন্যায়কে দমন করিত বলিয়া সে চক্ষু হারাইয়াছে—ফলের আশায় গাছের তলায় তলায় বেড়াইত বলিয়া পা হারাইয়াছে। এখনও—এই বিষহীন অবস্থাতেও আকাঙ্ক্ষা ছাড়িতে পারে নাই, তাই আজও ফুল বা ফলের আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এ সব জীবকে দূরে রাখিয়া জেস্‌মিনের কাছে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি, সাইলক্ প্রভু নিক্তি হস্তে সুদ মাপিতেছেন, আর মৃদুস্বরে এক দুই তিন গণনা করিয়া যাইতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?"

উত্তর হইল, "আমি—এক, দুই, তিন,—সাইলক্—এক দুই—"

প্রশ্ন। কি গণিতেছ?

উত্তর। সুদ—এক, দুই, তিন।

প্রশ্ন। কত টাকা করিয়াছ ?

সাইলক্ উত্তর না দিয়া একটু হাসিল মাত্র। আমি তাহার হাসির অর্থ বুঝিলাম। বুঝিয়া সেখান হইতে বিদায় হইলাম; এবং সেফালিকার তলায় গিয়া দাঁড়াইলাম। সেফালিকা-গিন্নি হাসিয়াই আকুল। কিন্তু সে হাসির অর্থ বুঝিতে না বুঝিতে আমাকে সে স্থান ত্যাগ করিতে হইল। কে আমায়—কোন এক প্রবল শক্তি আমায় টানিয়া লইয়া চলিল। যে স্থানে আমার দেহ পড়িয়া ছিল, সে স্থানে বিদ্যুদ্বেগে আসিলাম। দেখিলাম—যাহাকে আমি সুখের উপকরণ বলিয়া মনে করি সেই নবীন যুবা পুরুষ আমার পতিত দেহটা ঠেলিয়া আমায় জাগ্রত করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

সহসা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বুকের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ড ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখি, মাথার উপর নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ। চারিদিকে গাছ পালা। সাইলক্ বা ক্লিওপেট্রা কাহাকেও দেখিলাম না। পদতলে একজন কে বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে চিনিলাম,—সে আমার মনোমোহন নবীন যুবা পুরুষ। আমি চক্ষু মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে বেদীর উপর উঠিয়া বসিলাম।

পরমুহূর্ত্তে বন্দুকের গুলি আসিয়া আমার ললাট ভেদ করিল। আমি হতচৈতন্য হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলাম।

* * *

ক্ষণপরে একটু ঊর্দ্ধে উঠিয়া দেখি, আমার রক্তাক্ত দেহ ধরাপৃষ্ঠে লুটাইতেছে; আমার জনৈক আত্মীয় বন্দুকহস্তে নিকটে দণ্ডায়মান। দুইজন ভৃত্যের সাহায্যে আমার দেহ লুক্কায়িত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। উদ্যানের একাংশে একটা গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে দেহ নিক্ষেপ করিবার আয়োজন হইতেছিল। আমি ভাবিলাম, এইবার দেহের ভিতর ফিরিয়া যাই। চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না।—যেন কোন এক অনিবার্য্য কারণে, যেন কোন এক অলঙ্ঘনীয় শক্তি প্রভাবে আমি বিফলমনোরথ হইলাম। যখন আমি নিদ্রিত ছিলাম—যখন বেদীর উপর দেহ রক্ষা করিয়া উদ্যানময় পরিভ্রমণ করিতেছিলাম, তখনত বিনা চেষ্টাতেই দেহ মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছিলাম। এখন পারিতেছি না কেন ? এখন দেহের মৃত্যু ঘটিয়াছে ? মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়াই কি আমি পুনরায় দেহাবলম্বন করিতে পারিতেছি না ? নিদ্রা ও মৃত্যুতে কি এই প্রভেদ ? সুপ্তাবস্থায় আমার সহিত দেহ যে সামান্য সূত্রে আবদ্ধ ছিল, সে

সূত্রটুকু বুঝি এখন কাটিয়া গিয়াছে। তা' ছাড়া নিদ্রা ও মৃত্যুতে আরত কোন প্রভেদ দেখি না।

আমি সচকিতে দেখিলাম, আমার দেহ প্রোথিত না করিয়াই আমার আত্মীয় সভয়ে পলায়ন করিল। কারণটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। দেখিলাম, আমার দেহের অনুরূপ আর একটা দেহ * আমার পরিত্যক্ত দেহের সন্নিকটে—শূন্যে—দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বুঝিলাম, এই নব দেহটা বায়বীয়; কিন্তু দেখিতে ঠিক আমার পার্থিব দেহের মত। উভয় দেহের ললাট রক্তাক্ত—বন্দুকের গুলিতে আহত। বিস্মিত নয়নে দেখিলাম, এই নব দেহটা বায়ুহিল্লোলে ক্রমে মিলাইয়া গেল। কিন্তু আমার আত্মীয় আর ফিরিয়া আসিল না,—ভূত মনে করিয়া 'রাম' 'রাম' করিতে করিতে সভয়ে পলাইল।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দীক্ষা।

—:+:—

(১)

"বউ মা, মঙ্গল ঘট পেতেছ গা?"

"হাঁ মা, পেতেছি।"

এক মাসের ছুটী লইয়া অখিলচন্দ্র বাটী আসিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে ছুটী ফুরাইয়া গেল। ছুটীগুলা চিরদিন এমনই ফুরাইয়া যায়। আজ বেলা তিনটার সময় অখিলচন্দ্র কর্ম্মস্থলে যাত্রা করিবেন। তাই স্নেহময়ী জননী পুত্রের শুভ কামনায় মাঙ্গলিক আচরণে ব্যাপৃতা; বধূ সন্ধ্যামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঘট পেতেছ গা?"

বারিপূর্ণ একটি ঘটের মুখে একটি আম্রশাখা, দুটি বিল্বপত্র, দুটি সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া সন্ধ্যামণি উত্তর করিল,—"হাঁ মা, পেতেছি।"

পুত্র অখিলচন্দ্র পূর্ণ কুম্ভের পাদমূলে প্রণাম করিয়া মাতার পদধূলি মাথায় লইলেন; পরে স্নেহশীলা প্রেমময়ী পত্নীর নিকট বিদায় লইতে আসিলেন।

* Etheric double.

একটি পাঁচ বৎসরের পুত্র, একটি দুই বৎসরের কন্যা, মায়ের হাত ধরিয়া বাপের মুখপানে চাহিয়া রহিল। কাহারও মুখে কথা নাই—সব নীরব। অখিল চন্দ্রের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল।

বালক বালিকার গণ্ডে নিঃশব্দে চুম্বন দিয়া অখিলচন্দ্র বাষ্পগদগদ কণ্ঠে ডাকিলেন,—"সন্ধ্যা—আমার সন্ধ্যা—"

সন্ধ্যামণি উত্তর করিল না,—স্বামীর মুখপানে চাহিয়া নীরব রহিল। অখিল চন্দ্র বলিলেন,—"আবার আমি শীঘ্র আসিব মণি, তোমায় ছেড়ে আমি কতদিন থাকিতে পারিব।"

চক্ষু মুছিয়া অখিলচন্দ্র বিদায় লইলেন।

অমাবস্যার অন্ধকাররাশি হৃদয়ে ধরিয়া সন্ধ্যামণি সেইখানেই বসিয়া রহিল। ভাবিল,—"চিরদিন ত এমনি করে এমনি ভাবে বিদেশে গিয়া থাকেন, তবে আজ আমার প্রাণ কাঁদে কেন? কি যেন একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছে। এ কি হ'লো, ভগবান!"

(২)

কিছু দিন পরে সংবাদ আসিল, অখিলচন্দ্র রোগশয্যায় শায়িত। বাড়ীতে হাহাকার উঠিল। অখিলের মা বৎসহারা গাভীর ন্যায় ঘরবার করিতে লাগিলেন। অবশেষে বধূমাতার সহিত পরামর্শ করিয়া অখিলের কর্ম্মস্থানে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর যাইতে হইল না,—অবিলম্বে সংবাদ আসিল, অখিল প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। জননী কাত্যায়নী ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। পতিপ্রাণা সন্ধ্যামণি চৈতন্য হারাইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন। হায়, এই আশঙ্কায় বুঝি সাধ্বীর প্রাণ পূর্ব্ব হইতেই কাঁদিয়াছিল।

(৩)

তিনদিন পরে সন্ধ্যামণির জ্ঞান সঞ্চার হইল। তখন সে ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল পুত্র কন্যা কাছে বসিয়া কাঁদিতেছে। বাড়ীতে অনেক স্ত্রীলোক জমিয়াছে; সকলেরই মুখ বিষাদাচ্ছন্ন। বিস্মিত নয়নে সন্ধ্যা সকলের মুখপানে চাহিয়া দেখিল। তারপর সহসা বিদ্যুদ্বেগে সেই কথা— সেই সর্ব্বনাশের কথা মনের ভিতর জাগিয়া উঠিল। সন্ধ্যা আবার চৈতন্য হারাইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল।

প্রতিবেশিনীদের যত্নে সন্ধ্যা অচিরে জ্ঞান লাভ করিল। তখন শাশুড়ী

কাত্যায়নী বধূর মুখে চোখে জল দিয়া বলিলেন,—"উঠ বউমা, আজ তিনদিন মুখে জল দেও নাই। হায়, হায়, এমন কপালও মানুষের হয়।"

কাত্যায়নী কাঁদিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার ছেলেটি মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "মা উঠ, মা খাও।"

সন্ধ্যা উঠিল; কিন্তু কেহই তাহাকে কিছু খাওয়াইতে পারিল না। নিদাঘের জলভরা মেঘখণ্ডের স্থায় সন্ধ্যা উঠিয়া গিয়া একটি জনশূন্যগৃহে কবাট বন্ধ করিয়া দিল। তারপর ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়া অশ্রুজলে ধরণী সিক্ত করিতে করিতে কহিল, "স্বামিন্, প্রভু, দেবতা, আজ তিন দিন দাসীকে ছাড়িয়া গিয়াছ। গেছ, যাও—দাসীও তোমার পিছনে যাইতেছে। কিন্তু যে লোকে তুমি গিয়াছ, সে লোকে আমি যাইতে পারিব কি?—সে লোকে যাইবার আমি কি উপযুক্ত? না, এখন দেহ ত্যাগ করিব না। আগে সাধনাবলে তোমার দর্শন পাবার যোগ্য হই, তা'রপর এ মাটীর ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তোমার অনুসরণ করিব।"

সন্ধ্যা উঠিয়া বসিল। চোখের জল না মুছিয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিল, "তুমি আমার ইষ্টদেব, তুমি আমার যোগ, তুমি আমার ধর্ম্ম। আজ হ'তে যতদিন এ দেহ থাকিবে ততদিন এই যোগ, এই ধর্ম্ম সাধনা করিব। অন্তরীক্ষে কোথায় আছ প্রভু, আশীর্ব্বাদ কর, দাসীর সাধনা যেন সিদ্ধ হয়।"

সন্ধ্যা এবার চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

(৪)

দিন যেমন যায় তেমনই যাইতে লাগিল। তপনদেব আগে যেমন কিরণ ছড়াইয়া পৃথিবী উদ্ভাসিত করিতেন এখনও তেমনই করিয়া থাকেন। নিশীথে সুনীল আকাশে শশধর তেমনই হাসিয়া চারিদিকে মাধুর্য্য বিকীরণ করে। বাতাস তেমনই হেলিতে দুলিতে বহিয়া যায়। মানুষ তেমনই হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। একজনের সর্ব্বনাশে সৃষ্টির কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

অখিলচন্দ্র নাই, তবু একবৎসর কাটিয়া গেল, সময় দাঁড়াইল না—সৃষ্টির কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। সব তেমনই চলিতে লাগিল, শুধু অভাগিনী সন্ধ্যামণি সধবার বেশ ছাড়িয়া ব্রহ্মচারিণীর বেশ পরিগ্রহ করিল। সন্ধ্যামণিতে আর যৌবনের চাঞ্চল্য নাই, চাঞ্চল্য কাটিয়া গিয়া এক্ষণে প্রৌঢ়ার গাম্ভীর্য্য আসিয়াছে—যেন বৈশাখের জলঝড়ের পর দিগদিগন্তে প্রসন্নতা আসিয়াছে। সন্ধ্যামণি সেই প্রসন্নতাটুকু বুকে ধরিয়া যোগিনী বেশে সংসারে ঘুরিয়া বেড়ায়। পূর্ব্বে

বুঝি তাহার এত রূপ ছিল না। নিরাভরণা, শ্বেতবসনা, স্বামীধ্যাননিরতা সন্ধ্যার রূপ দিন দিন উছলিয়া উঠিতেছিল। কে বলে অলঙ্কারে রূপ বাড়ে?

সন্ধ্যা শাশুড়ীর আদেশে সংসারের কাজে ঘুরিয়া বেড়াইত বটে, কিন্তু নিজের কাজ মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইত না। অরুণোদয়ের পূর্ব্বে উদ্যানে উদ্যানে ঘুরিয়া পুষ্পচয়ন করিত। তারপর চন্দন ঘষিয়া লইয়া স্বামীর অর্চ্চনায় বসিত। যে দিন ফুল বেশী পাইত সেই দিন একছড়া মালা গাঁথিয়া উদ্দেশে স্বামীকে পরাইয়া দিত। এক একটি করিয়া ফুল লইয়া সকলগুলিই স্বামীর চরণোদ্দেশে অর্পণ করিত। ভগবানকে একটিও দিত না,—সব কুড়াইয়া লইয়া স্বামীর উদ্দেশে অঞ্জলি দিত।

কখন কখন বা দিবা দ্বিপ্রহরে ছেলেদের আহারাদি করাইয়া সন্ধ্যা দ্বিতীয়-বার পূজায় বসিত। কখন কখন বা তাহার পূজা করা হইত না,—কাঁদিয়াই ভাসাইয়া দিত। যখন তাহার মুদিত নয়ন হইতে জলধারা গড়াইয়া অঞ্জলিবদ্ধ পুষ্পনিচয় সিক্ত করিত তখন যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইত তাহা বুঝি আকাশের গায়, প্রকৃতির বুকেই শুধু চিত্রিত দেখা যায়। আবার সন্ধ্যা যখন সেই অশ্রুসিক্ত চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পাঞ্জলি, মানসমন্দিরস্থাপিত পতি দেবতার চরণোদ্দেশে স্ফীতবক্ষে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে অর্পণ করিত, তখন মনে হইত এ চিত্র বুঝি হিন্দুরমণীর হৃদয় ভিন্ন ত্রিভুবনে আর কোথায় জন্মিতে পারে না।

(৫)

"আমাকে কেন ডেকেছ মা?"

"গুরুদেব, বড় বিপদে পড়েছি।"

"কি বিপদ?"

"ছেলে হারাইয়া এখন ছেলের বউকে নিয়ে বিপদে পড়েছি।"

"বউকে নিয়ে বিপদ! সে কি মা?"

কাত্যায়নী চক্ষের জল অঞ্চলে মুছিয়া উত্তর করিলেন,—"বউ খায় না দায় না—সংসার দেখে না—ছেলে পিলের পানে ফিরে চায় না, কি এক রকম পাগলের মত হয়ে গেছে।"

গুরুদেব প্রকাণ্ড একটিপ নস্য সশব্দে গ্রহণ করিয়া অশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে উত্তর করিলেন, "বধূঠাকুরাণী শোকে অভিভূতা হইয়াছেন; ব্যবস্থা কর্ত্তব্য।"

কাত্যা। কি ব্যবস্থা করিতেছেন?

গুরু। মন্ত্র দিব।

কাত্যা। বেশ কথা; কবে দিবেন?

গুরু। আগামী কল্য শুভদিন আছে। উদ্যোগ আয়োজন কর গে।

গৃহিণী প্রফুল্লচিত্তে উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যাপৃতা হইলেন; কিন্তু সন্ধ্যাকে কিছু বলিলেন না।—সন্ধ্যাও কিছু জানিল না।

(৬)

পরদিন প্রভাতে সন্ধ্যা স্নানাদি সমাপন করিয়া পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হইল। আজ ফুল অনেক; সন্ধ্যা সাজি পূর্ণ করিয়া গৃহে ফিরিল। পূজার ঘরে নিভৃতে বসিয়া একাগ্রচিত্তে সন্ধ্যা মালা গাঁথিতে লাগিল। মালা গাঁথিতে গাঁথিতে কণ্টক ও সূচিকায় তাহার হস্ত ক্ষতবিক্ষত হইল, সে দিকে সন্ধ্যার দৃক্‌পাত নাই। সে একবার ফিরিয়াও দেখিল না; দেখিল না,—শুভ্রকায় মল্লিকার অঙ্গ রুধির-রাগে কেমন রঞ্জিত হইয়াছে—রুধিরবরণ গোলাপ রক্তলিপ্ত হইয়া কেমন লাল-বসনা উষার ন্যায় দেখাইতেছে। সন্ধ্যা কোন দিকে মন দিল না,—স্বামীর চরণ ধ্যান করিতে করিতে মালা গাঁথা শেষ করিল।

তারপর চন্দন ঘষা। চন্দন ঘষিতে ঘষিতে সন্ধ্যা সহসা যেন দেখিল, চন্দন পিঁড়িতে তাহার স্বামীর চরণ—চন্দন কাষ্ঠে স্বামীর চরণ—ঘর্ষিত চন্দনে স্বামীর চরণ। তাহার সমস্ত দেহ পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে চন্দনঘষা ছাড়িয়া আকুলনয়নে চন্দনপিঁড়িপানে চাহিয়া রহিল। চন্দন পড়িয়া রহিল—সযত্নগ্রথিত পুষ্পমাল্য, আয়াস-সঞ্চিত ফুলরাশি উপেক্ষিত হইল; সন্ধ্যা নিবিষ্ট-চিত্তে অনন্যকর্ম্ম হইয়া চন্দনপিঁড়িপানে চাহিয়া রহিল।

ক্রমে চন্দনপিঁড়ি অন্তর্হিত হইল—শুধু চরণ রহিল। অবশেষে চরণও অদৃশ্য হইল; কিছুই রহিল না,—আকাশ পৃথিবী, আলো অন্ধকার, ফুলচন্দন, স্বামী-চরণ কিছুই রহিল না—সব কোথায় অদৃশ্য হইল।

সন্ধ্যা ভূম্যাসনে উপবিষ্টা, স্পন্দরহিতা, জ্ঞানশূন্যা। তাহার মাথার কাপড় খসিয়া পড়িয়াছে—আলুলায়িত সিক্ত কেশরাশি ভূপৃষ্ঠে লুটাইতেছে। তাহার দেহ স্থির, নেত্রদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত, শ্বাস রুদ্ধ, অধরোষ্ঠ বিযুক্ত। সন্ধ্যা যেন তাহার দেহ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে সেই কক্ষে কাত্যায়নী ও তাঁহার গুরুদেব আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। সম্মুখেই দেখিলেন, সন্ধ্যার জ্ঞানশূন্য সমাধিস্থ দেহ। ফুল চন্দন মালা পড়িয়া রহিয়াছে—পূজার উপকরণ চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; মধ্যে স্থির নিষ্কম্প জ্ঞানবিরহিতা সন্ধ্যা। নয়নে পলক নাই, নাসিকায় নিশ্বাস নাই, দেহে স্পন্দন নাই। গুরুঠাকুর নীরবে নির্নিমেষলোচনে সন্ধ্যার পানে চাহিয়া রহিলেন।

কিন্তু গৃহিণী আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না,—তিনি বধূর অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া বধুকে জড়াইয়া ধরিবার উপক্রম করিলেন। গুরুদেব ইঙ্গিতে গৃহিণীকে সংযত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,"বধূ ধ্যাননিমগ্না—বিরক্ত করিও না।"

কথাটায় গৃহিণীর বিশ্বাস হইল না। কেননা, হরিনামের মালা হাতে করিয়া তিনিও অনেক জপধ্যান করিয়াছেন; কিন্তু এমনি ধারা মরা মানুষের মত ভাব কখনও তাঁহার হয় নাই। এমন কি ধ্যানাবস্থায় তাঁহার বুদ্ধিশক্তি, তাঁহার কার্য্যতৎপরতা এতই প্রবল হয় যে, তিনি মনে মনে সাংসারিক আয়ব্যয়ের হিসাব, বিড়াল কুক্কুরাদির শাসন পর্য্যন্ত করিতে সক্ষম হন। মরিয়া যাওয়া দূরে থাক্ তখন তিনি আরও সজীবতা লাভ করেন। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া গৃহিণী গুরুদেবের কথায় সন্দিহান হইলেন; কিন্তু তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করিলেন না। কিছু না বলিয়া বধূমাতার পার্শ্বে বধূমাতার মুখপানে সোৎসুক নয়নে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

গুরুদেব ধীরে ধীরে উঠিলেন—নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৃহবাহিরে আসিলেন; এবং ইঙ্গিতে শিষ্যাকে ডাকিলেন। শিষ্যা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলেন। তখন গুরুদেব মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার পুত্রবধূর দীক্ষা নিষ্প্রয়োজন।"

গৃহিণী সবিস্ময়ে বলিলেন,—"সে কি ঠাকুর!"

গুরু। তিনি পূর্ব্বাহ্নে দীক্ষিতা হইয়াছেন।

গৃহিণী আঁচলটা উঠাইয়া লইয়া একগাল হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"না ঠাকুর, বউমার মন্ত্র লওয়া হয় নি—আপনি জানেন না।"

গুরু। বিশ্বাস কর, আমি বল্‌ছি তোমার বউমার মন্ত্র লওয়া হইয়াছে।

কাত্যা। কে মন্ত্র দিল ঠাকুর? তুমি না আমি?

গুরু। কাহাকেও দিতে হয় নি—তিনি আপনিই কুড়াইয়া পাইয়াছেন।

কথাটা কাত্যায়নীর বিশ্বাস হইল না, গুরুদেব তাহা বুঝিলেন। তিনি বলিলেন,—"শুন মা, গুরুর কথায় অবিশ্বাস করিও না। আমি এ সত্তর বৎসর বয়সেও যাহা করিতে পারি নাই, এ ক্ষুদ্র বালিকা স্বল্পকাল মধ্যে তাহা করিয়াছে, এ তেজোদ্দীপ্তা বালিকার দীক্ষার প্রয়োজন নাই।"

কাত্যা। তবে শুন ঠাকুর, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে বউমার পূজা অর্চ্চনা সকলি দেখে আসছি; আমি কখন তাঁকে ঠাকুর-দেবতাকে ডাকৃতে শুনিনি—কখন তুলসী গাছকে বা কালী জগন্নাথের পটকে প্রণাম করতে দেখি নি। যে এমন মূর্খ, ধর্ম্মহীন, আমি কেমন করে বল্‌ব ঠাকুর তা'র দীক্ষা হইয়াছে?

গুরু। তবে বল দেখি তোমার বউমা চুপ করে ব'সে থেকে কি করে?

কাত্যা। কি করে তা' আমি কেমন করে জান্‌ব? তবে বিড়্‌বিড়্‌ করে বকে—মাঝে মাঝে 'স্বামী' 'স্বামী' করে ডেকে উঠে; ভুলেও একবার 'হরি' 'হরি' করে না। এক গাছা তুলসীর মালা গোপীনাথের পায়ে ঠেকিয়ে এনে দিলাম, তা' বউ যদি ভুলেও একবার মালা হাতে ক'রে বসে।

গুরু। তোমার বউ জপতপের অতীত। ন্যাস-প্রণাম, প্রণব কর্ম্ম তোমার আমার জন্য—সম্মুখে যা'কে সমাধিস্থ দেখিতেছ, তার জন্য নয়। বুঝেছ?

কাত্যা। কই আর বুঝলুম? যে মেয়ে ঠাকুর দেবতার নাম ছেড়ে আজীবন 'স্বামী' 'স্বামী' করে কাটালে তা'র ধর্ম্ম আমার ধর্ম্মের চেয়ে বড় হল? তুমি কি বল্‌ছ ঠাকুর?

গুরু। তুমি বিস্মিত হইতেছ মা, স্বামীপূজাই নারীজন্মে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

শ্রীসুরেশ্বরী দেবী।

স্বাবলম্বন।

—:*:—

সর্ব্বজীবশ্রেষ্ঠ মানব, কেবলমাত্র হস্তপদাদি, বাক্‌শক্তি ও পশুদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টবুদ্ধির অধিকারী হইয়া প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে না। কতকগুলি গুণ আছে যাহা স্বর্গীয় ও পশু-গুণাতীত; সেই গুণরাজির অধিকারীই প্রকৃত মনুষ্য। বিবেকচালিত স্বাবলম্বন সেই গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম।

যে গুণের সাহায্যে মানব পরমুখাপেক্ষী না হইয়া সর্ব্বদা স্বকীয় পুরুষকারের অনুসরণ করে, সেই গুণ স্বাবলম্বন নামে কথিত হয়।

স্বাবলম্বন শিক্ষার সময়। পৃথিবীতে এমন কোনও শিক্ষার্হ বিষয় নাই,—যাহা মাতৃগর্ভ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে সৎ-পিতামাতার সৎবৃত্তি সমুদয়, সন্তান, জন্মাবধি আংশিকভাবে অধিকার করে বটে, কিন্তু সেই সকলের উত্তমরূপ চালনা না হইলে শিশু কখনই তাহাদের পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।—পরন্তু যে শিশু অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যাবধি সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, সেও উত্তরজীবনে সুশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাল্যাবধি যে যেরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত

হয়, সে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া সেইরূপে জীবনাতিপাত করে। সুতরাং শৈশবাবস্থাই স্বাবলম্বন শিক্ষার প্রকৃত সময়।

কিরূপে স্বাবলম্বন শিক্ষা হয়। শিশু, শৈশবাবস্থায়, অধিকাংশ সময়, মাতৃদেবীর নিকট অবস্থিতি করে; সুতরাং জননী, শিশুর স্বাবলম্বন শিক্ষার সর্ব্বপ্রধানা শিক্ষয়িত্রী। বাক্‌স্ফূর্ত্তি ও জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিশু যাহাতে উক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য মাতা বিশেষ চেষ্টিতা থাকিবেন, আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের বৃত্তান্ত তাহাদিগকে গল্পচ্ছলে বুঝাইবেন ও নিজে সাংসারিক ঘটনাবলী দ্বারা শিশুকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিবেন।

অধিকাংশ (প্রায় সকল) ধনি-গৃহে গৃহিণী অতিরিক্ত পরিমাণে অন্য-নির্ভরশীলা। যদি বায়ুবেগে একখানি মূল্যবান বস্ত্র গৃহাভ্যন্তরে পতিত হয়, তবে যে পর্য্যন্ত না দাসী আসিয়া সেই বস্ত্রখানি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে, তদবধি তাহা সেই স্থানেই পতিত থাকে; গৃহিণী মনে করেন, ইহা তাঁহার কার্য্য নহে, দাসদাসীর কার্য্য। এইরূপ সামান্য সামান্য কার্য্যে ধনি-গৃহকর্ত্রী সর্ব্বদা অন্য-নির্ভরশীলা। দরিদ্রালয়েও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব অবিরল। দরিদ্র-গৃহকর্ত্তা অর্থচিন্তায় সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকেন, সুতরাং তাঁহার দ্বারা সাংসারিক কার্য্য অত্যল্প পরিমাণে সংসাধিত হয়; এবং প্রায় সমস্তই গৃহিণীর উপর নির্ভর করে। এস্থলে যদি গৃহিণী আলস্য-বিরহিতা হয়েন, তবেই গৃহ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন থাকে, নচেৎ উহা আবর্জ্জনাময় ও বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে প্রায় অধিকাংশ দরিদ্র-আলয় শেষোক্ত আকারে দৃষ্ট হয়। এই সকল বাটী প্রবেশ করিলেই, এখানে কতকগুলি জঞ্জাল, ওখানে কতকগুলি লম্বমান অপরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ড, কোথাও বা ধূলামণ্ডিত শিশুগুলির ক্রন্দন রোল উঠিতেছে; দেওয়ালের কোন কোন স্থান চূণ দ্বারা শ্বেতবর্ণ, কোথাও বা পানের রং দ্বারা লোহিতবর্ণ এবং কোথাও বা কালি প্রভৃতির দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে।—এতদ্ভিন্ন আরও বিবিধভাবে গৃহখানি সর্ব্বদা বিশৃঙ্খলা পূর্ণ। এরূপ বিশৃঙ্খলার কারণ কি? স্বাবলম্বনহীনা গৃহিণীই ইহার কারণ। তিনি যদি ইহা ভাবিতেন যে, আমার উপরই গৃহের সমস্ত কার্য্য, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য নির্ভর করিতেছে, সুতরাং আমি এই বিষয়ে যত্নশীলা না হইলে আর কে হইবে? এবং যদি ঐ ভাবনার বিষয় কার্য্যে পরিণত করিতেন, তাহা হইলে গৃহের দশা এরূপ ঘটিত না; ঐ ক্ষুদ্র গৃহ যেন হাসিত; মনে

শান্তি আসিত ও গৃহস্থ পরিবারবর্গ সকলে সুখী হইতে পারিত। কিন্তু তাহা ত নয়; গৃহিণী উহা মনে জানিলেও, স্বাবলম্বন শিক্ষার অভাবে, আলস্য-বশীভূতা হইয়া, স্বাস্থ্যসুখজনক কার্য্য হইতে বিরতা থাকেন।

যে শিশু পূর্ব্বোক্তরূপা মাতার অধীনে শৈশবজীবন অতিবাহিত করে, তাহার স্বাবলম্বন শিক্ষা যে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে সম্পন্ন হয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? তবে যে শিশু সৌভাগ্যক্রমে বাল্যাবধি উপরোক্তা নারীর বিরূপভাবাপন্না জননীর অনুকরণ ও উপদেশ শ্রবণ করে, সে শিশু ভবিষ্যতে আত্ম-নির্ভরশীল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বাল্যকালে বালকবালিকাদিগকে ভূত বা জুজুর ভয় দেখাইয়া তাহাদিগের মনে বৃথা আশঙ্কা জন্মাইয়া দেওয়া কোনও ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে; কারণ এরূপ হইলে, তাহারা বাল্যাবস্থায়, রজনীযোগে, একা কোনও স্থানে যাইতে পারে না; এই সামান্য বিষয়ে অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়; এই কুসংস্কার হৃদয়ে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, বৃদ্ধাবস্থাতেও অনেকের হৃদয় হইতে ইহা উৎপাটিত হয় না। এইরূপ বিবিধ প্রকারে শিশু, শৈশবকাল হইতেই আত্ম-নির্ভরশূন্য হইয়া পড়ে। এই সময়ে যদি সৎমাতা (অর্থাৎ আলস্যহীনা ও আত্মনির্ভরশীলা জননী) সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ-বাণী দ্বারা শিশুর কুসংস্কার দূর করিয়া দেন ও শিশু-সাধ্যোচিত কার্য্যাবলী শিশুকেই সম্পন্ন করিতে বলেন, তবে শিশু স্বাবলম্বন শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে থাকে। শিশু যদি উত্তরোত্তর এই উপদেশ ও শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করিতে থাকে, তবে সেই শিশু আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠে।

স্বাবলম্বন শিক্ষার উপকার। আত্মনির্ভরশীলের জগৎ অপেক্ষাকৃত সুখপূর্ণ। আত্ম-নির্ভরশীল অপেক্ষাকৃত দ্বেষহীন, সুতরাং অপেক্ষাকৃত শান্তি-অধিকারী। যে ব্যক্তি আত্মনির্ভরশীল, তিনি পরের সাহায্য অপেক্ষা করেন না; তিনি স্বকীয় অভাব অনুভব করিয়া স্বাবলম্বনপ্রভাবে সেই অভাব দূরীভূত করেন। স্বীয় ক্ষমতাজনিত অভাবপূর্ণতারূপ প্রকৃত সুখ তিনি ব্যতীত পৃথিবীর অপর কেহ অনুভব করিতে পারেন না; সুতরাং তিনি অপেক্ষাকৃত সুখী।

অস্বাবলম্বনশীল ব্যক্তিবর্গ অন্যের নিকট হইতে অনেক বিষয়ের আশা করেন। অন্যের নিকট সকল আশার পূরণ কখনই সম্ভবে না; যাহাদিগের নিকট সফল-কাম হইতে পারেন না, তাহাদিগের প্রতি উক্ত ব্যক্তিবর্গ বিদ্বেষী হন। বিদ্বেষ অশান্তির অন্যতম কারণ; সুতরাং তাঁহারা অশান্তিপূর্ণ থাকেন; কিন্তু আত্ম-

নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করেন না, সুতরাং আশাভঙ্গজনিত বিদ্বেষও তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় না; কাজেই তাঁহারা অপেক্ষাকৃত বিদ্বেষহীন ও শান্তি-অধিকারী।

স্বাবলম্বনশক্তিপ্রভাবে দেশ উন্নতি সোপানে অধিরূঢ় হয়। যে দেশের অধিবাসিবর্গ এই শক্তির উপাসক, তাহারা অতি সত্বর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজাতিগণমধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হয়। কারণ তাঁহারা আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রাপ্তি ও আধুনিক সময়োচিত যাবতীয় অভাব পূরণ নিমিত্ত আপনাদিগের দেশে বিবিধপ্রকার শিল্পের উৎকর্ষসাধন, কলনির্ম্মাণ ও নবোদ্ভাবিত যন্ত্রাদির বহুলপ্রচার করেন; এবং দেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য স্থলযুদ্ধ ও নৌযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন।

যে জাতি জগতকে স্তম্ভিত, বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে—যে জাতি অনধিক পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অনুপম বলবীর্য্য শৌর্য্যের ও খ্যাতি ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছে—যে জাতি এই নবযুগে অধীন দেশসমূহের গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই জাতি—জাপানী—কি গুণ অবলম্বন করিয়া এত শীঘ্র উন্নতি লাভ করিয়াছে? প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধান করিলে জানা যায়—স্বাবলম্বনই ইহার মূল কারণ। স্বাবলম্বনই মনুষ্যের—জাতির—সমাজের নেতা, উদ্ধারকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সর্ব্বসুখদাতা।

পূর্ব্বোক্ত কারণপরম্পরায় ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, যে জাতির স্বাবলম্বন নাই, সে জাতি জাতিই নয়; যে মনুষ্য আত্মনির্ভরতাশূন্য, সে মনুষ্য মনুষ্যই নয়। সুতরাং প্রত্যেক জাতি, যদি দেশের উন্নতিসাধন করিতে চায়—প্রত্যেক মনুষ্য যদি জীবনে উন্নতি লাভ করিতে চায় বা প্রকৃত মনুষ্য হইতে চায়—তবে আত্মনির্ভরশীল হউক; নচেৎ চিরকাল ঘোর অন্ধকারে—ঘোর কারাগারে—ঘোর অশান্তিতে কালক্ষেপণ করিতে হইবে—অন্য উপায় নাই।

শ্রীফণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

পরিবর্ত্তন।

পরিবর্ত্তনই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। অভ্রভেদী তুঙ্গশৃঙ্গ হিমালয় হইতে অণুবীক্ষণদৃশ্য অতি ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত সকলেই এই নিয়মের অধীন।

বহুসহস্রযোজনব্যাপী ঐ যে বিশালকায় গ্রহ উপগ্রহমণ্ডলী, ঐ যে সীমাশূন্য উত্তালতরঙ্গমালা-সমাকুল বিশাল জলধি, ঐ যে ব্যোমস্পর্দ্ধী উত্তুঙ্গশিখরশোভিত ভূধরমালা, উহাদেরও যেমন পরিবর্ত্তন আছে, ঐ পদদলিত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ধূলিকণারও তেমনই পরিবর্ত্তন রহিয়াছে। এই যে পরিদৃশ্যমান জড়চেতনাধারভূত বিশ্ব, ইহাও ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চমহাভূতের পরিবর্ত্তন-প্রসূত। আবার ঐ বিশ্বকারণ পঞ্চমহাভূতও অনাদি প্রকৃতির ত্রিগুণাত্মক পরিবর্ত্তনের ফল। এই পরিবর্ত্তনই বিশ্বস্রষ্ট্রী আদ্যা প্রকৃতির অমোঘ যন্ত্রবিশেষ।

এককালে যে মানবসমাজ অসভ্য বন্যপশুর ন্যায় নগ্নদেহে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং অপক্ক পশুমাংস ও গাছের ফলমূল খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত, তাহারা যে আজি সমাজবদ্ধ এবং সুসভ্য হইয়া জ্ঞানরাজ্যে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, ইহা সেই প্রকৃতির পরিবর্ত্তন-নীতি প্রভাবেই সংঘটিত হইয়াছে। মনস্বী ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ অনেকের নিকট উপহাসাস্পদ হইলেও এরূপ অনুমান ও যুক্তি যে নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। হিন্দুর অবতারবাদের ক্রমবিকাশ আলোচনা করিলেও এ তত্ত্ব অনেকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সৃষ্টির প্রারম্ভে বিশ্ব যখন জলময়, তখন তৎকালোচিত অবতার—জলচর মীন। পরে সেই জলরাশি ক্রমে যখন মৃত্তিকাতে পরিণত, সম্পূর্ণ মৃত্তিকা নহে—জল ও মৃত্তিকার সংযোগে কর্দ্দমরূপ প্রাপ্ত, তখন দেখিতে পাই, ভগবান্ কর্দ্দমচর বরাহরূপে অবতীর্ণ। তৎপরে যখন সেই কর্দ্দম কঠিন মৃত্তিকারূপে পরিণত হইল, এবং তাহা জীববাসের উপযুক্ত হইয়া উঠিল, তখন অর্দ্ধনরাকৃতি অর্দ্ধসিংহমূর্ত্তি—নরসিংহ। তৎপরে খর্ব্বাকৃতি বিকৃত নরাকার বামন। অনন্তর সম্পূর্ণ মনুষ্যরূপী ক্রোধাবতার পরশুরাম। ইত্যাদি।

এই সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরিবর্ত্তন যেমন জগতের স্বাভাবিক নিয়ম, পরিবর্ত্তনের সহিত ক্রমোন্নতিও সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী। অতিক্ষুদ্র অচেতন পরমাণু হইতে মানবাদি যাবতীয় চেতন প্রাণী পর্য্যন্ত সকলেই আপনার ক্রমোন্নতির জন্য ব্যাকুল। ঐ যে ক্ষুদ্র পরমাণুটী, উহা আর একটী বা দুইটী পরমাণুর সহিত যোগ দিয়া দ্ব্যণু বা ত্র্যসরেণু হইবার জন্য ব্যস্ত। ঐ যে ক্ষুদ্র বীজটী—উহা বৃক্ষরূপ উন্নতি লাভের জন্য অঙ্কুর উৎপাদনে নিরত। ঐ যে ক্ষুদ্র বৃক্ষটী, উহা শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক ফলফুলে সুশোভিত হইবার জন্য প্রাণপণে ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করিতেছে। ঐ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকাকণা, উহারা দ্বীপরূপ প্রাপ্তির জন্য পরস্পর সম্মিলিত হইতেছে। ঐ যে

ক্ষুদ্র তটিনী তরঙ্গাঘাতে নিয়ত উভয় কূল ভগ্ন করিতেছে, উহারও হৃদয়ে আপনার অবয়ববৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে। ঐ যে মানবকুল জ্ঞান বিজ্ঞান লইয়া অহরহঃ প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছে, ক্রমোন্নতি লাভই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ফল কথা, পরিবর্ত্তন যেরূপ জগতিক স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম, ক্রমোন্নতিও তাহার সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী ফল।

আজি সেই প্রাচীন বৈদিকযুগের কথা,—ভারতে আর্য্যগণের প্রবেশ কাহিনী স্মরণ কর। তার পর পৌরাণিক যুগ, আর্য্য নরপতিগণের ভারত শাসন, কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরাভিনয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও পতন, বৈদিক ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়, শঙ্করাচার্য্যের অদ্ভুত দিগ্বিজয়কাহিনী সমস্তই একে একে স্মৃতিপটে জাগ্রত করিয়া লও। ইহার পর মুসলমানের ভারত আক্রমণ, মোগল ও পাঠান-শক্তির ভীষণ সংঘর্ষ, ভারতে ব্রিটিস অধিকারের সূত্রপাত, এ সকলই ভাবিয়া দেখ। দেখিতে পাইবে, পরিবর্ত্তন এবং ক্রমোন্নতি সকলেরই সহিত দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ। ৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালার অবস্থা বেশ করিয়া মিলাইয়া দেখ, নিরীহ শান্তশিষ্ট বাঙ্গালীর সহিত আজিকার স্বরাজস্থাপন-প্রয়াসী বাঙ্গালীর তুলনা কর, সেই অসীম সহিষ্ণুতার পার্শ্বে এই নিদারুণ অধৈর্য্যকে স্থাপন কর, দেখিবে ইহার মধ্যে কতটা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। সেই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির সহিত এই জলশূন্যা ফলশূন্যা শস্যসম্পদ্‌বিহীনা মরুভূমির তুলনা করিয়া একবার পরিবর্ত্তনের অবস্থাটা ভাবিয়া দেখ।

পরিবর্ত্তন দুই প্রকার—সু ও কু। শুভফলদায়ক পরিবর্ত্তন সু এবং তদ্বিপরীত পরিবর্ত্তনই কু নামে অভিহিত। কিন্তু এই সু ও কু নিত্য-সঙ্গী। আলোকের পার্শ্বে ছায়ার অবস্থান যেমন স্বাভাবিক, শুভের সহিত অশুভের অবস্থানও তেমনই স্বাভাবিক। সুতরাং যুগব্যাপী পরিবর্ত্তন নীতির প্রভাবে আমরা যতটা সু পাইয়াছি, তদনুপাতে কিঞ্চিৎ কুও যে না পাইতে হইয়াছে এমন নহে। কিন্তু ইহা প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নীতি। অবিমিশ্র সুখ জগতে দুর্ল্লভ।

এই পরিবর্ত্তন নীতিই একদিন বাঙ্গালীকে নির্জ্জীব মৃতপ্রায় করিয়া রাখিয়াছিল, আবার তাহারই প্রভাবে এই মৃতজাতির মধ্যে আবার জীবনীশক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তাই জড় আজি নব জীবনীশক্তি লাভ করিয়া জগতের সমক্ষে আপনাকে দাঁড় করাইতে প্রয়াসী হইয়াছে; পরপদলেহনকারী আত্মনির্ভরতাশূন্য বাঙ্গালী স্বাবলম্বন মন্ত্রের উপাসক হইয়াছে। পরিণামে যাহাই হউক, আপাত-দৃষ্টিতে এই পরিবর্ত্তনকে কে শুভ না বলিয়া থাকিতে পারিবে?

জগতে অশুভটা যত শীঘ্র যত অনায়াসে পাওয়া যায়, শুভটা তত সহজলভ্য নহে। ভাঙ্গিতে বড় অধিক সময় লাগে না, কিন্তু একটা কিছু প্রস্তুত করিতে অনেকটা সময়, অনেকটা পরিশ্রম ব্যয় করিতে হয়। জগতে সকলেই স্ব স্ব মঙ্গল লাভের জন্য লালায়িত। আমি বড় হইব, আমি ধনী হইব, আমি জ্ঞানী হইব, আর সকলে আমার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইবে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা সকলেরই আছে, যাঁহার নাই, তিনি এ জগতের অতীত। তা' হিন্দুর বেদই বল, খ্রীষ্টানের বাইবেলই বল, আর মুসলমানের কোরাণই বল, সর্ব্বত্রই এই আত্মপ্রতিষ্ঠার সূক্ষ্ম নীতি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং একজন উন্নতি কামনায় মাথা তুলিতে গেলে উন্নতিপ্রয়াসী অপর ব্যক্তি তাহাকে চাপিয়া ধরিবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। পৃথিবীর সকল দেশে সকল জাতিই এই স্বভাবসিদ্ধ নীতির অনুবর্ত্তী। সুতরাং ভারতকে মাথা তুলিতে দেখিয়া ইংরাজের হৃদয়ে যে ঈর্ষার আবির্ভাব হইবে, এবং তাঁহারা যে প্রাণপণে ভারতের এই মস্তকোত্তোলনে বাধা দিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বা বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। বরং ইহার বিপরীত ভাব দেখিলেই বিস্মিত হইতে হইত।

কিন্তু এই বাধাদান নিষ্ফল। ঐ যে জাহ্নবী প্রবলবেগে সাগরসঙ্গমে ছুটিতেছে, বাধা দিয়া হয়তো উহারও গতি স্থগিত করিতে পার, উহাকে বিপথগামিনী করিতে পার, কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের স্রোতকে কিছুতেই বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না। সকল বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া এ স্রোত অপ্রতিহত প্রভাবে স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথে প্রধাবিত হইবেই হইবে। অনন্ত-শক্তিময়ী প্রকৃতির প্রভাবের নিকট ক্ষুদ্র মানব তুমি, তোমার ক্ষমতা, তোমার চেষ্টা অতি তুচ্ছ। যে শক্তির মহান্ আকর্ষণে গ্রহ-উপগ্রহমণ্ডলী স্ব স্ব কক্ষে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিভ্রমণ করিতেছে, যে শক্তির ইচ্ছায় সাগর ভূধর এবং ভূধর সাগর হইতেছে, সে শক্তির গতি রোধ করা মানবের সাধ্য নহে। অসাধ্য বলিয়াই ভারতের এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের গতি কিছুতেই রুদ্ধ হইতেছে না এবং হইবে না, মানবের সহস্র চেষ্টা, সহস্র বাধাকে উপহাস করিয়া, পদদলিত করিয়া আপনার পথ উন্মুক্ত করিয়া লইবে। তাহার গতিরোধে অগ্রসর হও, ভাগীরথী-তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত দর্পান্ধ ঐরাবতের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যাইবে।

ভারতেও সম্প্রতি এই পরিবর্ত্তনের স্রোত আসিয়াছে; কিন্তু এ সময়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। এ সময়ে অধীরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। কৌশলে এই স্রোতের সম্মুখে আপনাকে স্থির রাখিতে হইবে; নতুবা শেষে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল লাভ অবশ্যম্ভাবী। এ সময়ে মনে রাখিতে হইবে আমরা হিন্দু, মনে রাখিতে হইবে আমাদের ধর্ম্মের সুর কোন্ উচ্চগ্রামে বাঁধা, মনে রাখিতে হইবে একমাত্র ধর্ম্মরূপ বিরাট স্তম্ভের অবলম্বনেই আমরা শত বিপ্লবের মধ্যেও আজিও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছি। এ সময়ে ভুলিলে চলিবে না, যাহা অনার্য্যের কর্ত্তব্য তাহা আর্য্যসন্তানের অকর্ত্তব্য, যাহা অন্যদেশে সম্ভব তাহা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সম্ভব নহে। স্মরণ করা উচিত, আগে কর্ম্ম পরে ফলভোগ। কর্ম্ম এখনও আমাদের নিকট হইতে দূরবর্ত্তী, এ সময়ে একেবারে

ফলের আশা করা বাতুলতামাত্র। যদি ফলভোগের আশা কর, তবে আগে কর্ম্মী হও—প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তনের সহিত আপনাকেও পরিবর্ত্তিত কর; আলস্য ছাড়িয়া কর্ম্ম কর, জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া সচেতন হও। শ্রীঃ—

নূতন চাষা।

—০:*:০—

যবে কর্ম্ম-কোলাহল দীর্ঘ দিনমান,
উত্তপ্ত প্রান্তর বক্ষে করি অবসান,—
অস্তগামী সূর্য্যপানে কাতরে চাহিয়া,
জোত, দড়ি, দড়া হাল, বলদ খুলিয়া,—
গৃহে ফিরি' হৃষ্টচিত্তে সুধাসম তার—
খাবারে নিবারি' ক্ষুধা, হুঁকা কলিকার
সাথে, একে একে মণ্ডলের খোড়ো ঘরে,
আসি' আবাদের কথা কয় পরস্পরে।
চাকরাণ বাজেয়াপ্ত কারো বা হয়েছে,
না ফুটিতে চারা—জমি শুকায়ে গিয়েছে।
বেশী জলে পাটক্ষেতে বীজ না ফুটিতে,
সাধে এসে কারে ফড়ে দাদন লইতে।
জমিদার কারো সাথে বিবাদ করিয়া,
হাতী আনি' বোনা ভুঁই দিয়াছে ভাঙ্গিয়া।
মহাজন আদালত হ'তে—ঘুষ দিয়া—
চুপে চুপে ক্রোকের পরোয়ানা নিয়া,
বীজবোনা চষা ভুঁই লয়েছে দখল;
ফুরায়ে গিয়েছে তার সকল সম্বল।
হুঁকা হাতে লয়ে কেহ নামি' আঙ্গিনায়,
ব্যগ্রভাবে পশ্চিম আকাশ পানে চায়।
বৃষ্টি যদি নাহি হয় আজি রাত্রিকালে,
দেড়বিঘা ভুঁই বোনা হবে এক হালে।
এইরূপে বসি' সবে সন্ধ্যা-অবসরে,
সুখ দুঃখ কত কথা কয় পরস্পরে।
হারাধন তখনও হয়নিক চাষা,
কাটাইত দিন খেলি' দাবা তাস পাশা।
উঁকি মেরে দেখি সভা মণ্ডলের ঘরে,
হেসে হেসে দূর হ'তে চলে যেত ফিরে।
চাষের কথায় হেসে হইত অজ্ঞান;
সে হারু হয়েছে আজি নূতন কৃষাণ;
মণ্ডলের খোড়ো ঘরে লয়ে চাষীদলে,
সকলের আগে আবাদের কথা বলে।
আকাশে উঠিলে মেঘ হারু আগে কয়,
দেবতা আজিকে যেন ভারি জল হয়।
ঘুমায়ে স্বপন দেখে রোয়া ধান তার,
চুরি করে খেয়ে গেল গরু গোয়ালার।
হারু ফেরে মাঠে, ঘরে আসিতে না পারে,
আবাদের কথা কয় যারে পায় তারে।
সেদিন হইল দেখা বছরের পরে—
লাঙ্গল লইয়া কাঁধে হারু যায় ঘরে।
কহিলাম, একি হারু করেছ কি চাষ?
হারু কহে চাষা আমি, ভরসা আকাশ।
নূতন করেছি হাল, হয়েছিত চাষা,
সময়ে হবে ত জল—পুরিবে কি আশা?
বুঝি নাই আগে বাবু আসিয়াছে হাস,
মেঘ বৃষ্টি—চাষাদের স্বপ্ন বারমাস।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।